রবীন্দ্র প্রসঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

রবীন্দ্রনাথের পঁচিশোত্তর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংকলন

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

Rabindra Prasanga
A collection of essays in Bengali published to commemorate the 125th birth anniversary of Rabindranath Tagore.
1st Ed. May 8, 1988
2nd revised ed. Calcutta Bookfair, January 1997
Edited by Arun Kumar Basu

রবীন্দ্রনাথের পঁচিশোত্তর জন্মশতবর্ষপূর্তি
উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংকলন
প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৯৫, ৮ মে ১৯৮৮
পরিমার্জিত সংস্করণ : কলকাতা বইমেলা, মাঘ ১৪০৩, জানুয়ারি ১৯৯৭

বর্তমান সংস্করণের সম্পাদক :
শ্রীঅরুণকুমার বসু

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০

মুদ্রক :
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকার-অধিগৃহীত সংস্থা)
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

দাম : ১০০ টাকা

অনুবন্ধ

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ সংকলন গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে, ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী ১২৫তম রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠতর পরিচয়-সাধনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবর্ষে অনেকগুলি কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। দেশবাসীর জন্যে স্বল্পমূল্যে রবীন্দ্র রচনাবলী মুদ্রণের ব্যবস্থা ছাড়াও, তার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাধনার মানবতান্ত্রিক দিকগুলির উপর আলোকপাত করে বিদগ্ধ রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধের একটি ব্যবহারযোগ্য স্থায়ী সংগ্রহগ্রন্থ প্রস্তুত করা। রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থটি সেই প্রকল্পের অঙ্গরূপে, রবীন্দ্র-ভাবনায় নিবেদিত প্রবীণ ও নবীন বিয়াল্লিশজন বিশেষজ্ঞ গবেষক ও শিক্ষাবিদের মূল্যবান আলোচনা ও বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। একটি অভিজ্ঞ সম্পাদনা-পর্ষদ সংকলনটির সৌষ্ঠবসম্মত গ্রন্থন-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রকাশের স্বল্পকালের মধ্যেই জনসমাদরধন্য রবীন্দ্র প্রসঙ্গ নিঃশেষিত হয়। ইতিমধ্যে সংকলনভুক্ত লেখকদের মধ্যে পনেরো জন লেখক এবং সম্পাদক-মণ্ডলীর দুজন শ্রদ্ধেয় সদস্য প্রয়াত হয়েছেন।

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের প্রায় এক দশক পরে নবকলেবরে মুদ্রিত হল। বর্তমান সংস্করণটি সযত্নে সম্পাদনা করেছেন বাংলা আকাদেমির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক অরুণকুমার বসু। এই সংস্করণে পূর্বপ্রকাশিত রচনাগুলি যথাযথ পুনর্মুদ্রিত হলেও বিষয়ক্রমে সেগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রকাশকাল অনুসারে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বাংলা রচনার একটি গ্রন্থপঞ্জি, রবীন্দ্রনাথের একটি আদ্যন্ত পুনর্লিখিত জীবনপঞ্জি ও একটি নির্ঘণ্ট যোজিত হয়েছে। এই নবসংযোজনা অংশগুলি সংকলটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে এবং রবীন্দ্রগবেষক ও রবীন্দ্রচর্চায় নিবেদিত অনুসন্ধিৎসুবৃন্দের বিবিধ প্রয়োজন চরিতার্থ করবে। আশা করি, রবীন্দ্রানুরাগী মহলে রবীন্দ্র প্রসঙ্গের এই নতুন সংস্করণটিও যথাযোগ্য সমাদর লাভ করবে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

১১ মাঘ ১৪০৩ — সচিব, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

প্রথম সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলী :
শ্রীক্ষুদিরাম দাস (সভাপতি), চিন্মোহন সেহানবীশ, শ্রীনেপাল মজুমদার, শ্রীদিলীপ ভট্টাচার্য, শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীপবিত্র সরকার, শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রীতীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (সদস্য-সচিব)

সম্পাদনা-সহযোগী :
শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদার ও শ্রীমুকুলেশ বিশ্বাস

বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা-সহযোগী:
সর্বশ্রী স্বপন মান্না, শাশ্বতী চট্টোপাধ্যায়, সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়,
জলি চৌধুরী, ঈশানী মৈত্র ও
প্র সূ ন দ ত্ত

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ সংকলন-গ্রন্থে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের
স্বহস্ত-অঙ্কিত চিত্র, পাণ্ডুলিপি চিত্র এবং অন্যান্য শিল্পী-
রচিত চিত্রলিপি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

জাতির ভাবী আশা-আকাঙক্ষার প্রতিনিধি মহাকবি ও মনীষী রবীন্দ্রনাথের পঁচিশোত্তর জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কর্তৃক 'নন্দন'-কক্ষে আহূত বিদগ্ধসভায় জনসাধারণ-মধ্যে রবীন্দ্র-আদর্শ সম্প্রসারণ-কল্পে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সমাজ-সংগঠন-চিন্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে সাম্প্রতিক বাংলার লেখক ও গবেষকদের লেখা প্রবন্ধের একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি সংকলন প্রকাশনা অন্যতম। এই মর্মে পরে একটি উপসমিতি গঠিত হয় ও স্থির হয় যে প্রবন্ধ-সংকলন এমন হবে যে তাতে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী অভিব্যক্তির বিষয়গুলি আলোচিত হবে। উপসমিতির পর পর কয়েকটি অধিবেশনে বিষয় ও লেখকদের নামের তালিকা প্রস্তুত হয় এবং লেখকদের অনেকেই লেখা পাঠালে পর সেগুলি প্রেসে পাঠানো হতে থাকে। লেখা পাওয়া ও সেগুলির মুদ্রণ ও প্রকাশনায় অনিবার্য কিছু বিলম্ব ঘটেছে ঠিকই, তবে শেষ পর্যন্ত ১৯৮৮ সালের প্রথম দিকে প্রকাশ করতে পারায় সমিতি আনন্দ অনুভব করছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্র-স্মারক এরকম একটি বাংলা প্রবন্ধ-সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয় কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতী কর্তৃক জয়ন্তী-উৎসর্গ নামে, আর একটি রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রায়ণ নামে পুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনায়। এবারকার এই সংকলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্‌যোগে।

মহাকবি ও মহামনীষীর বাণীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে দৃষ্টিকোণ কালে কালে অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তা স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে। বাংলায় তাঁর সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনার প্রসার ঘটে বিশেষভাবে তাঁর কাব্য-কবিতার আবেদন বিশ্বে স্বীকৃত হওয়ার পর থেকে। তার পূর্বেকার অধ্যায়ে তিনি মুখ্যভাবে পত্র-পত্রিকায়, বিশেষে 'সাহিত্য' পত্রিকায় সমালোচিত হয়ে আসছিলেন। সমালোচনা অর্থে নিছক দোষদর্শন নয়, উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও তাঁর প্রাপ্য হয়েছিল। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকেই তাঁর সাহিত্যকৃতি নিয়ে সমালোচনামূলক বই লিখিত হতে থাকে। কিন্তু কথা এই যে, যৌবনকাল এবং প্রথম প্রৌঢ়ত্বের রবীন্দ্রনাথ সমগ্র রবীন্দ্রনাথের অর্ধাংশ মাত্র। প্রথমার্ধে কবির স্বপ্নকল্পনার আতিশয্য লেখক ও পাঠকসমাজকে এমনভাবে সমাচ্ছন্ন করেছিল যে তাঁর সমাজমুখী ও পরিবর্তনকামী সত্তার দিকে আলোচকদের দৃষ্টি পড়েনি। তাছাড়া পরবর্তীকালের সৃষ্টি মিলিয়ে তাঁর যে সামগ্রিক পরিচয় উত্তরোত্তর প্রস্ফুট হয়েছে তাও তাঁর পূর্বাধ্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়েনি। ফলে তখনকার অভিভূত অবস্থায় তাঁকে সহজেই অধ্যাত্মদর্শী ও উপনিষদ্‌বাদী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং তাঁর বিশুদ্ধ কবিকল্পনা ও বাস্তব মানবিকতার দিকগুলি উপেক্ষিত হয়েছিল এমন বললে ভুল হবে না। এ বিষয়ে কবির নিজের প্রতিবাদও যে ছিল না এমন নয়। যাই হোক, নানা কারণে তখনকার দিনের পক্ষে যা স্বাভাবিক তা-ই হয়ত হয়েছে। কিন্তু আজ আমরা বলতে পারি যে রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর থেকে তাঁর সম্পর্কে জনচিত্তে যে অনুরাগ ও উৎসাহের জোয়ার জেগেছে এবং তাঁর সামাজিক রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলি ও সংগঠন কর্মের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যকীর্তিকে সমন্বিত করে যে বিস্তৃত

অধ্যয়ন চলেছে, কবি তাঁর অভিপ্রেত মানবিক মুক্ত ও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হচ্ছেন। বলা যেতে পারে, একই সঙ্গে সমাজ-সংসক্ত ও সমুচ্চকল্পনাশীল মহাগীতিকবির অবদান শতদলের পাপড়িগুলি অল্প অল্প করে খুলে যাচ্ছে এবং উন্নত কবি হয়েও তিনি যে মানবিক আদর্শদ্রষ্টা এটি প্রমাণিত হচ্ছে। রবীন্দ্র-প্রদর্শিত জীবনালোকে জনগণের দৃষ্টি সম্পূর্ণ অবারিত হোক এটি তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সামাজিকদের একান্ত কামনা।

এই সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের অবসরে যে ক'টি প্রবন্ধ আমাদের হাতে এসেছে সেগুলি যেমন আধুনিক চিন্তার ছাপ বহন করছে তেমনি রবীন্দ্র-বিষয়ে নূতনতর তথ্যের সন্ধানও দিতে পেরেছে। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে দেশের শতকরা পঁয়ষট্টিজন মানুষ আজও শিক্ষা-বঞ্চিত। প্রবন্ধ-নিবন্ধের সাহায্যে তাঁদের দ্বারে পৌঁছানো যাবে না। সেজন্য হয়ত নাট্য, যাত্রাগান, ছায়াছবি, চিত্র-প্রদর্শনী প্রভৃতির প্রয়োজন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্‌যোগে পূর্বেই উন্নতমানের রবীন্দ্র-রচনাবলি প্রকাশন ও স্বল্পমূল্যে বিতরণের উদ্‌যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন প্রকাশিত হল এই প্রবন্ধ-সংগ্রহ।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
ক্ষুদিরাম দাস

বর্তমান সংস্করণ-প্রসঙ্গে

রবীন্দ্র প্রসঙ্গের বর্তমান সংস্করণে রচনাগুলির বিন্যাস পরিবর্তিত হলেও তা হয়তো সর্বত্র অভ্রান্ত মনে হবে না। শ্রেণী বা পর্যায় পূর্বনির্দিষ্ট থাকলে অন্তর্গত রচনায় বিষয়ানুক্রম রক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে তা হয়নি বলে প্রকাশিত রচনার আপাত প্রকৃতি ও বিষয়গত সাম্যে একটি কল্পিত পর্যায় অনুসৃত হয়েছে মাত্র।

বানান সম্পর্কে গ্রন্থমধ্যে সাধ্যমতো সমতা রক্ষার চেষ্টা ঘটলেও লেখক-নির্বিশেষে বানানের স্বাতন্ত্র্য বিলোপ বা সাধারণীভবন সম্ভব হয়নি। যথা গান্ধিজী-গান্ধীজী-গান্ধীজি, এণ্ডরুজ-এণ্ড্রুজ-এনড্রুজ, আগস্ট-অগস্ট-আগাস্ট, বেশান্ত-বেসান্ত, অ্যাঁরি বারবুস-আঁরি বারবুস, বউঠাকুরানীর হাট-বৌঠাকুরানীর হাট, আর্নল্ড-আরনলড-আরনল্ড, উর্বশী-উর্বশী, মাওৎ সে তুঙ-মাও সে তুঙ, রোটেনস্টাইন-রোদেনস্টাইন, শিলার-শীলার, সেক্‌সপিয়ার-শেকসপীয়ার, সিপাহী-সিপাই, পল্লী-পল্লি ইত্যাদি বেশ কয়েকটি উদাহরণ উত্তরমুদ্রণ পর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রবন্ধ মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রচনার উদ্ধৃতিগত বানান যথাসম্ভব অবিকৃত রাখা গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো সেইসব বানানেও রূপান্তরীকরণ প্রক্রিয়া ঘটে গেছে। এ সবই অনবধানতাবশত সন্দেহ নেই। নির্ঘণ্টে গ্রন্থনাম, প্রবন্ধনাম, চিত্র, চলচ্চিত্র বা এই জাতীয় বস্তুবাচক নামে একটি উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহৃত, ব্যক্তিনামে নয়। বিদেশি নামের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদবি পূর্বে, ক্বচিৎ বিশিষ্ট পরিচিতিবাচক নাম হলে সেটি আগে দেওয়া হয়েছে। জীবনপঞ্জি বা গ্রন্থপঞ্জির তথ্য নির্ঘণ্টে অনুপস্থিত।

২৫ জানুয়ারি ১৯৯৭

সূচি

❑ ১ রবীন্দ্রনাথের মননলোক ❑

বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ	:	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৩
হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ	:	প্রবোধচন্দ্র সেন	৭
রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজবাদ	:	চিন্মোহন সেহানবীশ	১৭
রবীন্দ্রনাথ : রাষ্ট্রচিন্তা, দেশাভিমান, বিশ্বমানবিকতা	:	হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২০
রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষীয়তা ও বাঙালিত্ব	:	গোপাল হালদার	২৭
রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ উন্নয়নচিন্তা	:	ভবতোষ দত্ত	৩১
প্রাচীন ভারতীয় ভাবাদর্শ ও রবীন্দ্রনাথ	:	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	৩৮
নবজাগরণ প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ	:	নরহরি কবিরাজ	৪৩
রবীন্দ্র-চিত্তে বিজ্ঞানের সক্রিয় পদক্ষেপ	:	ক্ষুদিরাম দাস	৪৯
রবীন্দ্রচিন্তায় আমাদের সমাজশক্তি ও সভ্যতার সংকট	:	হরপ্রসাদ মিত্র	৬৬
'অরণ্যসমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব' ও 'সভ্যতার বজ্র'	:	দেবীপদ ভট্টাচার্য	৭০
রবীন্দ্রনাথ ও মানবধর্ম	:	অরবিন্দ পোদ্দার	৭৯
যুদ্ধ : কবির যন্ত্রণা	:	অমিতাভ চৌধুরি	৮৩
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা	:	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৯০
গণমুক্তির স্বপ্ন, তার বাস্তবরূপ এবং রবীন্দ্রনাথ	:	জ্যোতির্ময় ঘোষ	১০৩

❑ ২ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যলোক ❑

সাহিত্যবিচারে রবীন্দ্রনাথ	:	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	১২৭
রবীন্দ্রনাথের শিশুচরিত্র	:	লীলা মজুমদার	১৩৪
রবীন্দ্রসাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব	:	সুকুমারী ভট্টাচার্য	১৪০
রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের শিল্পমূল্য	:	ভূদেব চৌধুরী	১৬০
রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীপ্রগতি	:	কনক মুখোপাধ্যায়	১৭০
রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগ-ভাবনা	:	চিত্তরঞ্জন লাহা	১৮২
রবীন্দ্রনাথের গল্প : বিষয় রাজনীতি	:	ক্ষেত্র গুপ্ত	১৯৬
সুকুমার রায় : রবীন্দ্রনাথ—স্নেহে ও শ্রদ্ধায়	:	শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়	২০০
রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব	:	পবিত্র সরকার	২০৯
রবীন্দ্রনাথের নাটকে সাধারণ মানুষ	:	হীরেন ভট্টাচার্য	২২৯
রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য-প্রীতি	:	দিব্যজ্যোতি মজুমদার	২৪১
রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব	:	বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়	২৫৪

❑ ৩ রবীন্দ্রনাথের শিল্পলোক ❑

বাংলা রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাটক	:	অজিতকুমার ঘোষ	২৬৯
রবীন্দ্রনাথের মঞ্চপ্রতিমা	:	কুমার রায়	২৭৫
রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে : নাটক ও অভিনয়	:	অমিতা ঠাকুর	২৮৪

রবীন্দ্রসংগীতের মর্মলোকে : শৈলজারঞ্জন মজুমদার ২৮৮
বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসংগীতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের স্থান : শান্তিদেব ঘোষ ২৯৬
রবি-বাউলের উৎসমুখে : অরুণকুমার বসু ৩০২
শিলাইদহ পর্ব ও চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২২

❑ ৪ রবীন্দ্রনাথের কর্মলোক ❑

বাসা : মৈত্রেয়ী দেবী ৩২৯
গ্রামসংগঠনে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ : প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৫
রুজভেল্টের কাছে রবীন্দ্রনাথের তার : রাজনৈতিক পটভূমি : নেপাল মজুমদার ৩৪৪
বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ : প্রণবরঞ্জন ঘোষ ৩৫৬
তীর্থদর্শন ও উত্তরণ : অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ৩৬১
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী : নারায়ণ চৌধুরী ৩৭৬
রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী : বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮৫

❑ ৫ বিবিধ ❑

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্রচর্চা : রামবহাল তেওয়ারী ৪০৩
রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি /সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি/ লেখক-পরিচিতি ৪১১
নির্ঘণ্ট ৪৭৫

❑ ৬ চিত্রসূচি ❑

রবীন্দ্রনাথ : বোরিস জর্জিয়েভ ১
রবীন্দ্রনাথ : অবনীন্দ্রনাথ ২০ক
রবীন্দ্রনাথ : অবনীন্দ্রনাথ ১০০ক
আত্মপ্রতিকৃতি : রবীন্দ্রনাথ ১৩২ক
রবীন্দ্রনাথ : শশিকুমার হেস ১৬৪ক
রবীন্দ্রনাথ : অবনীন্দ্রনাথ ১৮০ক
রবীন্দ্রনাথ : গগনেন্দ্রনাথ ২১২ক
শ্যামলা : রবীন্দ্রনাথ ২৬০ক
রবীন্দ্রনাথ : অতুল বসু ২৭৬ক
আত্মপ্রতিকৃতি : রবীন্দ্রনাথ ৩০৮ক
পুষ্প : রবীন্দ্রনাথ ৩২৪ক
রবীন্দ্রনাথ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ৩৪০ক
আত্মপ্রতিকৃতি : রবীন্দ্রনাথ ৩৫৬ক
পাণ্ডুলিপি চিত্র : রক্তকরবী ... ৩৭২ক
রবীন্দ্রনাথ : জু পিয়োঁ ৩৮৮ক
রবীন্দ্রনাথ : আবক্ষ মূর্তি : রামকিংকর বেইজ ৪০৪ক
রবীন্দ্রনাথ : আবক্ষ মূর্তি : জ্যাকব এপস্টাইন ৪৩৬ক

রবীন্দ্রনাথের মননলোক

বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কবির ভাষায় বলি 'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলার দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো'। বিশ্বভারতী বিশেষ কোনো সরকারি আইনের বলে একদিন বিশেষ একটি স্থানে, বিশেষ দেশ, বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ নগরীর নামে সৃষ্ট হয়নি। ভারতের প্রায় একশটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাদের নাম এইভাবে প্রদত্ত, যেমন—কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ; আবার গুরু নানক, কুরুক্ষেত্র মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি। 'বিশ্বভারতী' এই শব্দের দ্বারা কোনো স্থান, ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা ধর্ম বোঝায় না—এটি একটি আইডিয়া। এই আইডিয়া কবির মনে ধীরে ধীরে জন্মায়। একদিন অকস্মাৎ এর আবির্ভাব ঘটেনি। 'বিশ্বভারতী' স্থাপিত হবার বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চল্লিশ বৎসর বয়সে বোলপুরের নিকট তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমে পাঁচজন কিশোরকে নিয়ে তাঁর 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। একটি তিনকুঠুরির ঘরই ছিল ছাত্র-শিক্ষকের বাসস্থান। এই বাড়িটি নির্মাণ করেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ইচ্ছা ছিল এখানে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শে একটি বিদ্যাশ্রম রচনা করা। তাঁর অকালমৃত্যুতে তা সম্ভব হয়নি—রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথের কল্পনাকে নতুনরূপ দান করে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন ১৩০৮ সালের ৭পৌষ, মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষার দিন।

ব্রাহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে শিক্ষকও। সমস্যা হল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত যাঁরা, তাঁরা জাতপাত মানেন না। ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের প্রশ্ন ব্রাহ্মণ ছাত্ররা কী করে কায়স্থর পদধূলি নেবে! রবীন্দ্রনাথও তখন মহাস্বাদেশিক, তিনি যা বললেন তা হিন্দুসংহিতার বিরোধী। কয়েক বৎসর পর আরও সমস্যা দেখা দিল। আগরতলার ডাক্তার কাজিসাহেব ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। তাঁর কন্যা সোফিয়া কাজি কলেজে পড়ে, তাঁর ইচ্ছা তাঁর একমাত্র পুত্র রবি কাজিকে শান্তিনিকেতনে ছাত্ররূপে পাঠাবেন। ব্রাহ্মণ শিক্ষকরা মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন—মুসলমান আর ব্রাহ্মণ একত্রে খাবে? পৃথক না হয় খেল, কিন্তু এক আচ্ছাদনের তলায় তো খাওয়া যায় না। সমস্যার সমাধান হল, যখন তাঁরা জানতে পারলেন পারিবারিক নানা কারণে রবি কাজিকে আশ্রমে পাঠানো হচ্ছে না! কালে সেই রান্নাঘরে খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা সৌকত আলিকে বিধুশেখর শাস্ত্রী স্বয়ং খাবার জন্য নিয়ে যান। যদিও সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল।

ব্রহ্মবিদ্যালয় গৃহের উত্তরে ছিল একটি খড়ের বড়ো ঘর, যেখানে ব্রাহ্মণ পাচক ও অন্যান্য ভৃত্যরা বাস করত বলে সে ঘরটার নাম ছিল চাকরদের ঘর। আর ছাত্র-শিক্ষকদের রান্নাঘর ছিল পশ্চিমে—আশ্রম সীমানার বাইরে। কারণ আশ্রমের ট্রাস্টপত্র অনুসারে—এই সীমানার মধ্যে জীবহিংসা নিষিদ্ধ ছিল। তাই নতুন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্র-শিক্ষকদের রন্ধন ও আহারাদির ব্যবস্থা হয় আশ্রমসীমানার বাইরে। আশ্রমে ছাত্রদের নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা হয় ১৯০৫ সাল থেকে।

বিংশ শতকের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতা তথা হিন্দু জাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের পর তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন, "ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তি শ্রদ্ধাবান করিতে চাই। অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো, তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা ঠিক নহে।" কিন্তু এটাই কবিমনের পূর্ণ বিকাশ নিশ্চয়ই নয়। স্বদেশীযুগে কবি গান লিখেছেন, 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'। দেশকে বন্দনা করেও মনে হচ্ছে সব কথা বলা হয়নি। তাই লিখছেন স্বদেশের মধ্যে 'বিশ্বময়ীর, বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা'। 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও'—এই গানটি লেখেন বিলাত যাবার পূর্বে। সেই বিশ্বের সাথে পরিচয়ের জন্যই তাঁর বিলাতযাত্রা। পথের সঞ্চয় গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'যাত্রার পূর্বপত্রে' এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন খুবই স্পষ্টভাবে। কবি লিখছেন, "য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, এই একটা বুলি চারিদিকে প্রচলিত হইয়াছে।" কবি একথা অস্বীকার করে বলেছেন, "মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে কোনো মঙ্গল দেখি না কেন তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে।" কবির মতে, "আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে, কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে।" কবিমনের মুক্তি সেইসঙ্গে বিশ্বসাথে যোগের ভাবনা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ইংলন্ডে ও পরে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ দেখেন, তখন তাঁর মনে বিশ্বভারতীর স্বপ্ন জাগরিত হয়েছিল কি? তারপর এণ্ডরুজ ও পিয়ার্সনের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে কবির জীবনে এবং ঐ দুইজন পাদরির জীবনে যে পরিবর্তন আসে তা বিশ্বমানবতারই দ্যোতক। বিলাত থেকে প্রত্যাগমনের পর খ্রিস্টান এণ্ডরুজ, খ্রিস্টান পিয়ার্সন এলেন। তার পূর্বে আসেন কাপ্তেন পেটাভেল ও তাঁর স্ত্রী। জাতের বেড়া ভাঙতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। স্কুলের দুটি ছাত্র একটি মুসলমান অপরটি সাঁওতাল দপ্তরির কাজ শিখছে, বাঁধানোর কাজ শিখছে। তাদের নিয়ে পৃথক স্থানে ভোজন করছে দুজন স্কুলের ছাত্র।

বৃহত্তর জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে কবির মানসলোকে তার প্রতিক্রিয়ার ছবি আঁকা চলছে। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে জাতীয়তাবাদের উগ্রমূর্তি দেখা দিয়েছে দিকে দিকে। জাপান চীনের উপর উপদ্রব শুরু করেছে সেদিনকার চীনের গৃহযুদ্ধ ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। কবি আছেন আমেরিকায় বক্তৃতা-সফরে। ন্যাশনালিজমের উগ্রতার তীব্র সমালোচনা করে বক্তৃতা দিলেন জাপানে ও আমেরিকায়। ভারতে কবি হলেন রাজনৈতিক নিন্দার পাত্র। ন্যাশনালিজম্ যে বিশ্বশক্তির শেষ কথা নয়—একথা কবি স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন। Interdependence হচ্ছে সভ্যতার মৌল কথা।

১৯১৬ সালে কবি আমেরিকায় একাই গিয়েছেন বক্তৃতা-শফরে। সেখান থেকে রথীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে যে পত্র লেখেন তাতে আমরা বিশ্বভারতী স্থাপনের প্রথম আভাস পাই। কবি লিখছেন—"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।" এই ভাবনার কয়েক বৎসর পরে কবি আশ্রমের তরুণ শিক্ষক সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে

লেখেন, "ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে যাক—সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক—সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন।"

বিশ্বভারতী ভাবনার উদয়ে যে বিদ্যাসমবায়ের আয়োজন হয় তাতে বিদ্যার্থী হয়ে এলেন সুদূর সিলেট থেকে সৈয়দ মুজতবা আলি, আর এলেন আরও সুদূর লাহোর থেকে জিয়াউদ্দীন, নাগপুর থেকে এলেন খ্রিস্টান বিনায়ক মাসোজি। মোটকথা জাতপাতের বাঁধ ভাঙছে আর বিচিত্র মানুষের আনাগোনা শুরু হয়েছে—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' বাস্তবে রূপ নিতে চলল। মনে পড়ছে ছোটো একটা ঘটনা। পাঞ্জাব থেকে মুসলমান ছাত্ররা বেড়াতে আসে। তখন পাকিস্তানের কল্পনায় পাঞ্জাবিরা উন্মত্ত হয়ে ওঠেনি। ছাত্ররা এসে রান্নাঘরে সকলের সঙ্গে খায়, এই ঘটনা তাদের খুবই মুগ্ধ করে। তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. কুরেশির ভাই সেই দলে ছিলেন। পরে কুরেশি আমায় বলেন, "ছাত্রেরা মুগ্ধ হয়েছে, তারা ভাবতে পারে না যে, হিন্দু-মুসলমান একত্রে ভোজন করবে।" এ ঘটনা ভারতের আর কোথাও সম্ভব হত না সেই কালে। এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই, কবি কখনো কোনোও কিছু জোর করে আশ্রমবাসীদের উপর চাপাননি। তাঁর বক্তব্য তিনি বলে গিয়েছেন। তিনি জানতেন, যা সত্য তা একদিন আপনা হতেই স্বীকৃতিলাভ করবে।

এবার একটু ইতিহাসের কথা বলি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল ১১ নভেম্বর ১৯১৮ সালে। তার একমাস পরে শান্তিনিকেতনে নিভৃতে মুষ্টিমেয় সমদরদী লোকদের নিয়ে শান্তিবাদ ও বিশ্বমৈত্রীর প্রতীক বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল (ডিসেম্বর ২৩, ১৯১৮, ৮ পৌষ, ১৩২৫)। কবির সৃজ্যমানস (creative mind) যে শুধু সাহিত্য বিষয়ে নব নব সৃষ্টি করে চলে তা নয়, শিক্ষাবিষয়েও তা সম্প্রসারী। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আঠারো বৎসর পূর্ণ হয়েছে, কবির মনে হচ্ছে শান্তিনিকেতনের জন্য কিছু করণীয় আছে। এমন সময় দক্ষিণ-ভারত থেকে বক্তৃতাদানের আহ্বান এল। কবি লিখলেন The Centre of Indian Culture। তাঁর মাথায় ঘুরছে তখন বিবিধ সংস্কৃতি চর্চা-কেন্দ্র স্থাপনের কথা। দক্ষিণভারত সফরে যান ১৯১৯ সালের গোড়ায়। কলকাতায় ফিরে এসে বসুবিজ্ঞান মন্দিরে কবি তাঁর The Centre of Indian Culture ভাষণটি পাঠ করলেন (মার্চ ২৭, ১৯১৯, ১৩ চৈত্র, ১৩২৫)। এই হল বিশ্বভারতীর ভূমিকা। ১৯১৯ সালের মে মাসে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় কবি সর্বপ্রথম বাংলায় তাঁর বিশ্বভারতী সম্বন্ধে মনের কথা বললেন। এই প্রবন্ধে কবি যা লিখলেন তা জিজ্ঞাসু পাঠক সামান্য সন্ধান করলেই পাবেন। কলকাতায় ভাষণদানের তিনমাস পরে, গ্রীষ্মকালের শেষে বিদ্যালয় খুললে অত্যন্ত দীনভাবে বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হল। অধ্যাপনা ছাড়া অধ্যয়নও যে শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য, এই মত প্রতিষ্ঠিত হল।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার ইউরোপে যান, ইউরোপ থেকে প্রত্যাগমন করে কবি বিশ্বভারতীকে সাধারণের হাতে উৎসর্গ করবার জন্য সভা আহ্বান করলেন (১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর), সেই সভার সভাপতি ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। সেদিনকার ভাষণে আচার্য বিশ্বভারতীর মর্মার্থটি অতি সুন্দরভাবে বললেন। তিনি বললেন যে, "বিশ্বভারতীর আক্ষরিক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন, আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর একটি ধ্বনিগত অর্থ আছে—বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে

অনুরঞ্জিত করে, ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে।"

রবীন্দ্রনাথ সেদিন যা বলেছিলেন তার মধ্যে ভাববার কথা আছে। অর্ধশতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর ও ভারতের যে পরিবর্তন হয়েছে তা অভাবনীয়, কিন্তু কবির বক্তব্য ভবিষ্যৎবাণীর ন্যায় সত্য। তিনি বললেন, "কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যবশত ধর্ম ও সম্প্রদায়কে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে।" তিনি প্রশ্ন করলেন, "স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সবচেয়ে বড়ো গৌরব?"

ব্রিটিশ সাহিত্যিক রুডিয়ার্ড কিপলিং লিখেছিলেন—"The East is East, and West is West, And the twin can never meet". বিশ্বভারতীর মন্ত্র 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। আদর্শ হল "To seek to realise a common fellowship of study the meeting of the East and the West, and thus ultimately to strengthen the fundamental conditions of world peace through the establishment of free communication of ideas between the two hemispheres". কবির স্বপ্ন বাস্তবে রূপদানের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে। কবি উক্ত memorandum-এ লিখেছেন, এই শান্তিনিকেতনে ভাবীকালে "And with such ideals in view to provide at Santiniketan aforesaid a Centre of Culture where research into and study of the religion, literature, history, science and art of Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian and Civilisation may be pursued along with the culture of the West, with that simplicity in externals which is necessary for true spiritual realisation, in amity, good fellowship, and co-operation between the thinkers and scholars of both Eastern and Western countries, free from all antagonisms of race, nationality, creed or caste and in the name of the One Supreme Being who is Shantam, Shivam, Advaitam."

এইখানে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যেবার বিলাত যান, সেবার সেখানে কেদারনাথ দাশগুপ্ত The Union of East and West Society-র উদ্যোগে Caxton Hall-এ কবির সংবর্ধনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন, কবির সে ভাষণগুলি Sadhana নামে প্রকাশিত হয়। এই ভাষণগুলিতে কবির ধর্ম, সমাজদর্শন ও বিশ্ববোধের আভাস পাই।

সবকিছু বিভেদের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী ও বিশ্বমানবতাবাদ একই অর্থবোধক। এই কথা কবি স্পষ্ট করে বলেন 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে। এতকাল ধর্ম হয়েছে সম্প্রদায়কেন্দ্রিক—যেমন, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম। তাদের প্রত্যেকটি বহু উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত, মানুষকে পরপারের কাছে নেবার অনেক বাধা—ঈশ্বরই মানুষের মিলনের বাধারূপে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই কবি বললেন, 'ধর্ম একটাই—তা হচ্ছে মানুষের ধর্ম।' শেষ গান লিখলেন 'ঐ মহামানব আসে'। মহামানব কোনও মহাপুরুষ নয়,—মহামানব হচ্ছে The MAN, অর্থাৎ সমগ্র মনুষ্যত্বের প্রতীক 'মহামানব'।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

প্রবোধচন্দ্র সেন

ভারতবর্ষের দুই প্রধান সমস্যা, ভাষাসমস্যা ও হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা। অখণ্ড বাংলাদেশের (তথা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের) প্রধান সমস্যা একটাই, সেটি আমাদের দুই প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের সমতা বা সমন্বয়-বিধানের সমস্যা। কী পূর্ব কী পশ্চিম, দুই বাংলার এটাই সবচেয়ে জটিল সমস্যা। এই সমস্যার হিমশৈলে আহত হয়ে আমাদের জাতীয় তরণী সহসা দ্বিখণ্ডিত হয়ে আজ লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে চলেছে নির্মম ইতিহাসের খরস্রোতে। এই অসহায় অবস্থাটা যে-কোনো চিন্তাশীল দেশপ্রেমিককে সবচেয়ে বেশি পীড়িত করে। বলা বাহুল্য, কোনো প্রকার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারাই এর প্রতিকার সম্ভব নয়। কারণ এটা আসলে সামাজিক সমস্যা এবং এর শিকড় নিহিত রয়েছে দীর্ঘকালের ইতিহাসের মধ্যে। এর ঐতিহাসিক স্বরূপ নিরূপণ না করে শুধু তুকতাক বা হাতুড়ে চিকিৎসার দ্বারা এই ব্যাধির প্রতিকারের আশা দুরাশা মাত্র। আজ পর্যন্ত কেউ এই সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ ও তার মূল কারণ নিরূপণে এবং তার প্রতিকারের উপায় উদ্‌ভাবনে প্রয়াসী হয়েছেন বলে জানি না। অথচ আমাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এই কাজেই ব্রতী হওয়া উচিত ছিল সর্বাগ্রে। তার মূল কারণ ও বিষয়ে আমাদের প্রায় সর্বজনীন ঔদাসীন্য, অথবা জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, উভয় পক্ষের মনের সুগভীর ও ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের দেশে পুরোপুরি নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক মননপরায়ণতার বড়ই অভাব। বলা যায় এ বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। তিনি কখনো এ বিষয়ের সামগ্রিক আলোচনায় প্রয়াসী হননি। বিভিন্ন সময়ে নানা উপলক্ষ্যে তিনি এ বিষয়ে যেসব মত প্রকাশ করেছেন তার থেকেই তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নানা রচনায় এ বিষয়ে তাঁর যেসব মন্তব্য বিকীর্ণ হয়ে আছে সেগুলিকে একত্র সংকলন করে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে এ বিষয়েও তাঁর মনোভাবের ক্রমপরিণতি আছে এবং সে পরিণতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার দিকে। শুধু তাই নয়, তাঁর চেষ্টা এই সমস্যার ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল সন্ধানের দিকে। রবীন্দ্রভাবনার এই দিকটার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে হলে একটি নাতিক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করতে হয় এবং তার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য এ বিষয়ে রবীন্দ্রচিন্তার ঐতিহাসিক পরিবেশের একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়া। যে সামাজিক ও মানসিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছিল তার পরিচয় না পেলে তাঁর পরিণত মনোভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক কী রকম ছিল সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য জানা যায় তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধে (১৩৪০ শ্রাবণ) থেকে। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি এই—"সে (মুসলমান) যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল। কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর

এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের। ···মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে, কিন্তু তার বিষয়বস্তু কিংবা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখি নে।" অর্থাৎ দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করলেও সামাজিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের প্রতি উদাসীন ও প্রায় নিঃসম্পর্ক হয়েই রইল। "দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়নি তা নয়, কিন্তু তা সামান্য।" বহু শতাব্দী কাটল এভাবেই। অবশেষে ইংরেজ রাজত্বকালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। কিন্তু সে পরিবর্তনটাও সুফলপ্রসূ হল না। মুসলমানরা দীর্ঘকালের রাজক্ষমতা হারিয়ে ইংরেজ জাতি, ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ হয়ে তাঁদের সনাতন ধর্মসংস্কৃতিকেই আঁকড়ে রইল। আর হিন্দুরা দীর্ঘকালের মুসলমান রাজত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত শান্তিশৃঙ্খলাকে আশীর্বাদ বলেই গ্রহণ করল এবং শাস্ত্রীয় বিধিবিধানকে উপেক্ষা করে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বরণ করে নিতে দেরি করল না। ফলে মুসলমানরা মক্তব-মাদ্রাসার চৌহদ্দির মধ্যেই আটকা পড়ে রইল। আর হিন্দুরা স্কুল-কলেজি শিক্ষার সহায়তায় প্রভাব-প্রতিপত্তিতে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল। এভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবধান ও অসমতা বেড়ে গেল। এই ব্যবধান ও অসমতা স্বভাবতই তাদের মানসিকতাতেও প্রতিফলিত হল। দুশ্মন ইংরেজকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নেবার ফলে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানের স্বাভাবিক বিরূপতা ক্রমে দৃঢ়তর হতে লাগল। আর হিন্দুরাও মুসলমানকে অবাঞ্ছিত বিধর্মী ও বিদেশী বলে গণ্য করতে লাগল। আর হিন্দু কলেজ, হিন্দু হস্টেল, হিন্দুমেলা প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানকে 'হিন্দু' নামে চিহ্নিত করে কার্যত মুসলমানকে বহিষ্কৃত করার ফলও ভাল হতে পারে না। মুসলমানের প্রতি এই অবজ্ঞার মনোভাব তখনকার হিন্দুরচিত সাহিত্যেও কিছু প্রতিফলিত হয়েছিল। যেমন, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ('কানপুরের যুদ্ধজয়')—

> কেবলি মর্জি তেড়া, কাজে ভেড়া মাথা যত।
> নরাধম নীচ নাই নেড়েদের মত ॥

এখানে যে অতিমাত্র উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে তা কিছু পরিমাণে বিপক্ষের প্রতি যুদ্ধকালীন বিদ্বেষের ফল। কিন্তু পুরোপুরি তা নয়। স্বাভাবিক বিরূপতার সঙ্গে যুদ্ধকালীন বিদ্বেষ মিলে এই উগ্রতার প্রকাশ ঘটেছে।

কানপুরের যুদ্ধের প্রায় দশ বছর পরে হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা (১৮৬৭)। এই মেলা চলে অন্তত চোদ্দ বছর (১৮৮০ পর্যন্ত)। এই মেলা বাঙালির জাতীয় জীবনে একটা বড়ো রকমের আলোড়ন আনে, বস্তুত বাঙালির ইতিহাসের গতিকে মোড় ফিরিয়ে দেয় একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। অথচ এই মেলায় মুসলমানের কোনো স্থান ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম মেলার নবম অধিবেশন (১৮৭৫)। এই অধিবেশনে ওস্তাদ মৌলা বক্সের সংগীত সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। তার কারণ সম্ভবত এই যে, মৌলা বক্স ছিলেন বরোদা রাজ্যের অধিবাসী এবং হিন্দু সংগীতের অনুরাগী। তাই হিন্দুমেলায় যোগ দিতে তাঁর মনে দ্বিধা ছিল না।

হিন্দুমেলার নামান্তর ছিল 'জাতীয় মেলা' অর্থাৎ হিন্দুর জাতীয় মেলা বা হিন্দুজাতির মেলা। বার্ষিক হিন্দুমেলার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে তার সঙ্গে যুক্ত ছিল তার একটি মাসিক কর্মসমিতি, নাম 'জাতীয় সভা' (National Society)। "হিন্দুজাতির সর্বশ্রেণীর মধ্যে

জাতীয় ভাবের বর্ধন এবং ...উন্নতিসাধন করাই এই সভার মূল উদ্দেশ্য। অন্যূন এক মুদ্রা বার্ষিক দান করিলে হিন্দু নামধারী মাত্রেই এই সভার সভ্যপদের অধিকারী হইবেন।" আর হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল—'সর্ব-সাম্প্রদায়িক' হিন্দুর স্বজাতীয় সর্বপ্রকার উন্নতিপক্ষে উৎসাহদান ও উপায় অবলম্বন। 'সর্ব-সাম্প্রদায়িক' হিন্দু বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভার অন্যতম প্রধান উদ্‌যোক্তা মনোমোহন বসুর একটি উক্তি থেকে। তাঁর মতে হিন্দুমেলা হবে এমন একটি মিলনস্থল যেখানে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক-নির্বিশেষে ভারতবর্ষস্থ সর্ব শ্রেণীর হিন্দু ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত মতভেদ ভুলে সকলেই সৌভ্রাত্র ও সৌহৃদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। তা ছাড়া 'নেপালী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী' প্রভৃতি সর্বভারতের হিন্দুরাই এখানে মিলিত হবেন, তা-ও ছিল হিন্দুমেলায় উদ্‌যোক্তাদের অভিপ্রায়। অর্থাৎ হিন্দুমেলা ও তার অনুষঙ্গ জাতীয় সভায় মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি অহিন্দুর কোনো স্থান ছিল না। সুখের বিষয় তখনকার দিনেও অনেকেই ভারতবর্ষের জাতীয়তা সম্বন্ধে এ-রকম সংকীর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন না। তাঁদের মতে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সব ভারতীয়কে নিয়েই ভারতবর্ষের জাতীয়তা, শুধু বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুকে নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত তাকে কিছুতেই 'জাতীয়' বলা যায় না। হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভার দুই প্রধান নেতা নবগোপাল মিত্র ও মনোমোহন বসু, এঁরা উভয়েই এই মনোভাবের প্রতিবাদ করেন। মনোমোহন বসু তাঁর সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় বলেন, হিন্দুরা একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্রকে 'জাতীয়' বলে অভিহিত করার কোনো আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। ন্যাশনাল পেপার-এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্র বলেন (১৮৭২, ডিসেম্বর ৪)-"We do not understand why our correspondent takes exception to the *Hindoos who certainly form a nation by themselves,* and as such a society established by them can very well be called a National Society." সুতরাং স্বীকার করতেই হবে, হিন্দুমেলার অনুষঙ্গ 'জাতীয় সভা'-কেই উত্তরকালীন 'হিন্দুমহাসভা'র আদিরূপ বলে বর্ণনা করা অন্যায় নয়, আর মহম্মদ আলী জিন্নার বহুনিন্দিত দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবীজ রোপণ করেছিলেন হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভার প্রতিষ্ঠাতারাই। এই দুই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রাণপুরুষ রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণ প্রবন্ধটিও পড়েছিলেন এই জাতীয় সভারই এক অধিবেশনে (১৮৭২, সেপ্টেম্বর ১৫)। তা ছাড়া তিনিই পরবর্তীকালে (১৮৮৬) ইংরেজি ও বাংলায় লিখিত 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামে এক পুস্তকে 'মহা-হিন্দুসমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার বিবরণ দেন। এই মহা-হিন্দুসমিতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজনীতি ক্ষেত্রেও হিন্দুজাতির অধিকার রক্ষা ও উন্নতিসাধন। এখানে সেই হিন্দুসভারই পূর্বাভাস সূচিত হল। ১৮৮১ সালে রাজনারায়ণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে বলেন—"মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত ভূমিখণ্ড কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেরূপ হিন্দুসমাজই আমাদিগের কার্যে প্রধান ক্ষেত্র হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষ ···যেরূপ উন্নত অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, পুনরায় সেই অবস্থা লাভ করিতে আমরা সমস্ত হিন্দুজাতিকে উত্তেজিত করিব। যাহাতে···রাজপুতানার বীরকলচূড়ামণি প্রতাপ সিংহের

সময় পর্যন্ত ভারতের মহিমার প্রধান কথা অবলম্বন করিয়া হিন্দুজাতি উন্নতির মঞ্চে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় আমরা প্রাণপণে এরূপ চেষ্টা করিব। যাহাতে হিন্দুগণ ভ্রাতৃভাবে সম্বন্ধ হয়, যাহাতে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী প্রভৃতি হিন্দুবর্গ একহৃদয় হয়, যাহাতে তাহাদের সকলপ্রকার স্বাধীনতা লাভের জন্য ধর্মসংগত বৈধ সমবেত চেষ্টা হয়, তাহাতে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব।" এই হল তৎকালীন হিন্দু জাতীয়তার মূল কথা।

সেকালে ঠাকুর পরিবারেও এই হিন্দু জাতীয়তার হাওয়া প্রবল ছিল। হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা স্থাপনের মূলে ছিল ঠাকুর পরিবারেরই সহায়তা ও সমর্থন। হিন্দুমেলা তথা জাতীয় সভার প্রথম দুই সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের বিভিন্ন উক্তিতে বারবারই 'হিন্দুজাতি' কথাটা উচ্চারিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারত-সন্তান' ইত্যাদি বিখ্যাত জাতীয় সংগীতটি তো আসলে হিন্দু ভারতেরই জয়গান। তাতে ভীষ্ম-দ্রোণ থেকে পৃথ্বীরাজ পর্যন্ত বীরদের কীর্তি মহিমা উদ্‌গীত হয়েছে। তার পরেই 'যবনের' আবির্ভাবের ফলে 'অধীনতা আনিল রজনী'। অর্থাৎ বৈদেশিক বিজেতা মুসলমানের হাতেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও কীর্তিগৌরব বিনষ্ট হয়। সেই স্বাধীনতা ও গৌরব ফিরিয়ে আনাই যেসব প্রতিষ্ঠানের (হিন্দুমেলা, জাতীয় সভা তথা রাজনারায়ণের সঞ্জীবনী সভা) লক্ষ্য, স্বভাবতই বিজেতৃজাতীয় মুসলমানকে সেসব প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা চলে না।

কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের মনোজীবন গড়ে উঠেছিল এই হিন্দু জাতীয়তাবোধের পরিমণ্ডলেই। তাঁর প্রথম জীবনের অনেকগুলি কবিতাতেই তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। এখানে শুধু দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়াই যথেষ্ট। 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতায় (১৮৭৫) দেখি রাজা যুধিষ্ঠির আর্য-সিংহাসনে বসে স্বাধীন ভারতে যে স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারই মোহময় কল্পনায় বালক রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত বিভোর হয়ে আছে। আবার দেখি এই ভারতভূমিতে বিগতকালের মহিমামণ্ডিত রামরাজত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য কবি-হৃদয় ব্যাকুল হয়ে আছে :

> শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
> রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার
> শাসিতেন হায়, এ ভারতভূমি,—
> আর কি সে দিন আসিবে ফিরে!

সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় তিনিও প্রাচীন হিন্দুভারতের শেষ বীর হিসাবে পৃথ্বীরাজের নাম উল্লেখ করতে ভোলেননি। তবে এ কবিতায় বালক রবীন্দ্রনাথ তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা দুর্গাবতীর নাম উল্লেখ করে হিন্দুভারতের গৌরবযুগকে আর-একটু প্রসারিত করেছেন। হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতায় (১৮৭৭) আছে :

> এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরী,
> স্বর্গরসাতল জয়নাদে ভরি
> রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,
> তখনো একত্রে ভারত জাগেনি—ইত্যাদি।

এর থেকেও বোঝা যায় তখনকার দিনে হিন্দু জাতীয়বাদীদের মতে মুসলমান বিজেতাদের আক্রমণেই ভারতীয় স্বাধীনতা ও গৌরবযুগের অবসান ঘটে। সেকালে অনেক

হিন্দুর মনই প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণের নানাপ্রকার কল্পিত গৌরবস্মৃতিতে পরিপূর্ণ থাকত। 'আর্য তেজ গর্বভরে পৃথ্বী থরথর', রবীন্দ্রনাথের এই উত্তরকালীন উক্তিটি প্রধানত এইকালের পক্ষে প্রযোজ্য।

পূর্বে বলেছি 'জাতীয় সভা' প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালেই কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, শুধু হিন্দুকে নিয়ে গঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানকে 'জাতীয়' বিশেষণে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। এই মনোভাবের লোক তখনকার দিনে বিরল ছিল বলেই মনে হয়। তবু অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতেন এমন দু-এক জনের কথা কিছু বলা প্রয়োজন। আলোচ্য বিষয়টাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক, পৃথ্বীরাজের পরবর্তী বহু শতাব্দীব্যাপী মুসলমান-রাজত্বকালে ভারতবর্ষের পরাধীনতার কাল বলে চিহ্নিত করা সংগত কি না? দুই, আধুনিককালে মুসলমানকে ভারতীয় জাতীয়তার অঙ্গ বা অংশভাগ বলে গণ্য করা যায় কি না? এই দুই বিষয়ে প্রথমেই বহুনিন্দিত বা বহুবিতর্কিত বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ইতিহাসপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের দেশে খুব কমই জন্মেছেন। ইতিহাসপ্রজ্ঞার দৃষ্টিতে তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মগত পার্থক্যটা কখনো প্রাধান্য পায়নি, প্রাধান্য পেয়েছে সামগ্রিকভাবে দেশের জনকল্যাণের প্রশ্নটা। তাই তিনি তাঁর 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১২৮০ ভাদ্র) বলেছেন—"যে রাজ্য পরজাতিপীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন, অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। ···পক্ষান্তরে, কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে। যথা, নর্মানদিগের সময়ে ইংলন্ড, ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষ। আমরা কুতবউদ্দীনের অধীন উত্তর-ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।" দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ভারতবর্ষের মুসলমান-রাজত্বকালকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরাধীনতার কাল বলা সংগত নয়।

সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে শুধু বাংলা দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত কী, তা-ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ) তাঁর একটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ওই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্দশা ঘটে নাই। রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না। ···পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক স্ফূর্তি নিবিয়া যায়। পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত ; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্তা রঘুনাথ শিরোমণি ; এই সময়ে স্মার্ততিলক রঘুনন্দন ; এই সময়েই চৈতন্যদেব ; এই সময়েই বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের অপূর্ব গ্রন্থাবলী ;—চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীর মধ্যেই ইহাদের সকলেরই আবির্ভাব। এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।" স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বাংলাদেশের এই দুই শতাব্দীব্যাপী মুসলমান-রাজত্বকালকে বঙ্কিমচন্দ্র পরাধীনতার যুগ বলে চিহ্নিত করেননি, বরং স্বাধীনতার যুগ তথা পরম গৌরবের যুগ বলেই স্বীকার করেছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও স্পষ্ট করেই বলেছেন—"অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে-আকবরকে আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ। মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ্ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাহিয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠানই আমাদের মিত্র। ···বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগলকর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীর্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্তির চিহ্ন পাওয়া যায়। ···কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোনো কীর্তি কেহ দেখিয়াছে?" আধুনিক কালের বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেকটি উক্তি পুরোপুরি সত্য বলে গণ্য না হতে পারে, কিন্তু তাঁর উদার মনোভঙ্গি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। সে মনোভঙ্গিকে আর যাই বলা যাক, সংকীর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বা হিন্দু জাতীয়তার মনোভঙ্গি বলা যায় না।

১৮৮০ সালে লেখা 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধেও (বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ অগ্রহায়ণ) বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপ কথাই লিখলেন—"মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগমাত্র হইয়াছিল।" দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতা সম্বন্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদীর মনোভাব যে বঙ্কিমচন্দ্র পোষণ করতেন না, তাতে লেশমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। পাঠানও মুসলমান, মোগলও তাই। কিন্তু বঙ্কিমের মতে পাঠানদের আমলে বাংলা স্বাধীন ছিল, মোগলদের আমলে পরাধীন। আবার আকবর প্রমুখ মোগলের শাসনে ভারতবর্ষ ছিল স্বাধীন, কিন্তু তাঁদের শাসনকালেই বাংলাদেশ ছিল পরাধীন, হৃতসর্বস্ব। অর্থাৎ বঙ্কিমের মতে দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতার বিচারে শাসকের জাতি বা ধর্ম বিবেচ্য বিষয় নয়, দেশের কল্যাণ-অকল্যাণই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। সম্রাট আকবরের শাসন সামগ্রিকভাবে উত্তর ভারতের পক্ষে কল্যাণকরই হয়েছিল, তাই আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলতে বঙ্কিম দ্বিধাবোধ করেননি। 'পক্ষান্তরে এই আকবরই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন', এ কথাও তিনি সমান জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। কারণ তাঁর মতে আকবরের বঙ্গবিজয় বাঙালির পক্ষে কল্যাণকর হয়নি।

এবার আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাক বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তৎকালীন হিন্দু জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত হতে পেরেছিল কি না। মীর মশাররফ হোসেনের 'গোরাই ব্রিজ' অথবা 'গৌরীসেতু' নামক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১২৮০ পৌষ) লেখেন, "তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ···বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ, একা হিন্দুর দেশ নহে। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য *নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে।* যত দিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাহাদের ভাষা নহে, ...ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেন না জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা"। দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাংলাদেশ যেমন একা হিন্দুর দেশ নয়, তেমন শুধু হিন্দুকে নিয়েই বাঙালি জাতি গঠিত নয়। বাংলাদেশ যেমন হিন্দু-মুসলমানের দেশ, বাঙালি জাতিও তেমনি হিন্দু-মুসলমানের জাতি। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রয়াস ছাড়া বাঙালি জাতির প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নেই। 'উচ্চ শ্রেণীর' মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বহুবাঞ্ছিত বাঙালি জাতীয়তার

প্রধানত অন্তরায়। দুঃখের বিষয় ঠিক সে সময়েই অঙ্কুরিত হল হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা-লালিত হিন্দু জাতীয়তাবোধের বিষবৃক্ষ। সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ছিল বাঙালি জাতীয়তাবোধের প্রাধান্য। একদিকে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং অপরদিকে নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু ও রাজনারায়ণের প্রচেষ্টায় নবোদভূত হিন্দু জাতীয়তার আদর্শ, এই দুই-ই হয়েছিল বঙ্কিম-লালিত বাঙালি জাতীয়তা বিকাশের প্রধান অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথ যে অনতিকালের মধ্যেই এই বাঙালি জাতীয়তার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার বহু নিদর্শন আছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। এখানে সে প্রসঙ্গের উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন।

'আর্যদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণও (১৮৪৫-১৯০৪) তৎকালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর এই বিরোধিতা ছিল বঙ্কিমের চেয়ে স্পষ্টতর। তা ছাড়া তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরই পক্ষপাতী। এখানে তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্‌ধৃত করে দিলেই তাঁর এই অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ কত গভীর ছিল তা বোঝা যাবে। হিন্দুমেলার সংকীর্ণতা তাঁকে কতখানি মর্মপীড়া দিত তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর এই উক্তিতে—"বিংশতি কোটি ভারতবাসী যদি বৎসরে অন্ততঃ একদিনও জাতি, ধর্ম, সমাজের পার্থক্য ভুলিয়া ভ্রাতৃভাবে একত্র মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে জানিতে পারিব যে ভারতের সৌভাগ্যসূর্য উদিত হইতে আর বিলম্ব নাই। ···আমরা মেলার অধ্যক্ষদিগের নিকট করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই, তাঁহারা যেন এই মেলাকে কোনো সংকীর্ণ ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত না করেন। আমাদিগের ভিক্ষা তাঁহারা যেন এই মেলাকে এখন হইতে 'হিন্দুমেলা' নাম না দিয়া ভারতমেলা নাম দেন। যেন ইহা এখন হইতে ভারতবাসী মাত্রেরই উৎসবস্থল হয়। হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি ইহাতে যোগ না দেন—আমরা কাঁদিব। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয় কোনো ভ্রাতার বিরুদ্ধে ইহার দ্বার অবরুদ্ধ রাখিব না। আমরা সকলকেই ইহার অভ্যন্তরে আহ্বান করিব। আমরা কোনক্রমেই দলাদলির ভিতর যাইব না। দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। যে দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ আমাদিগের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে আমরা আর তাহার শরণাপন্ন হইব না।" এই উক্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি তা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু হিন্দুমেলাকে ভারতমেলায় রূপান্তরিত করার জন্য যোগেন্দ্রনাথের এই যে সনির্বন্ধ প্রার্থনা, সেকালে ওই মেলার নেতৃবর্গ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। আমরা কি আজ তার বিষময় ফলভোগ করছি না?

যোগেন্দ্রনাথের প্রার্থিত 'ভারতমেলা' প্রতিষ্ঠিত হল না বটে, কিন্তু কিছুকালের মধ্যে অনুরূপ আদর্শের প্রেরণায় স্থাপিত হল একটি নতুন সঙ্ঘ, নাম ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা 'ভারতসভা' (১৮৭৬, জুলাই ২৬)। এই ভারতসভাকে সানন্দ অভিনন্দন জানিয়ে যোগেন্দ্রনাথ লিখলেন—"যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসীর প্রত্যেকে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে শিখেন, ···যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসী জাতি, ধর্ম, সমাজ ভুলিয়া এক রাজনৈতিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে শিখেন··· সেই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত ১২ই শ্রাবণ বুধবার কলিকাতা মহানগরীস্থিত আলবার্ট হলে 'ভারতসভা' নামক এক নূতন রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিন ভারতের পুনর্জন্মদিন। এই দিনে সমস্ত ভারতে এক অপূর্ব রাজনৈতিক ধর্ম প্রতিষ্ঠাপিত হইল। ···এ ধর্মে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-

জৈন, সেশ্বর-নিরীশ্বর, সাকার-নিরাকার, খ্রীষ্টান-হীদেন সকলই সমান। এই জন্যে ভারতসভা সকলকেই ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে। ভারতবাসী! হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, সীক! আপনারা সকলেই এই সভায় যোগ দিউন। দেখিবেন, ভারতের সুখসূর্য অচিরাৎ সমুদিত হইবে।" ভারত্সভা প্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভার স্বীকৃত হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রত্যাখ্যাত হল এবং হিন্দুমেলার মুখ্য নায়ক নবগোপাল মিত্রও এই নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন, এমনকী তার অন্যতম অধ্যক্ষরূপেও বৃত হলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব নিঃশক্তি বা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল না। বরং নানা কারণে তার শক্তি ও ব্যাপ্তি ক্রমে বেড়েই চলল। তাই দেখি 'ভারতসভা' স্থাপনের পরবর্তী কালে যোগেন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় জাতীয়তাবাদেও পরোক্ষভাবে একটু সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়া লেগেছে। যোগেন্দ্রনাথ, 'গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' গ্রন্থের (১৮৯০) 'উদ্‌বোধন' অংশে লিখলেন—"শিবাজীও একদিন হিন্দুধর্মের রক্ষার জন্য ভবানী ও ভবানীপতির ঘোরতর আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ও তদীয় মহারাষ্ট্রীয় জাতির 'হর হর বোম্ বোম্' রবে একদিন সমস্ত ভারত উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই মহতী সাধনার বলে একদিন মহারাষ্ট্রীয় শক্তি ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়াছিল। ···এস ভাই! আবার একবার পঁচিশ কোটি ভারতবাসী অসংখ্য সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া সকলে মিলিয়া সেই দেবদেব ভগবানের নামকীর্তন করি। একবার এই জাতীয় দুর্গতির দিনে প্রাণ খুলিয়া তাঁহার নিকট দুঃখ জানাই। এস, আর দেরি করিও না। সময় আসিয়াছে। সকলে গগন বিদারিয়া গাও 'বন্দে মাতরম্', 'বন্দে হরিচরণারবিন্দম্'। স্বদেশানুরাগ ভগবদ্‌ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভারতে আবার নবযুগের উৎপত্তি করুক।" এই যে স্বদেশানুরাগের সঙ্গে ধর্মের মিশ্রণ, এখানেই নিহিত ছিল ভবিষ্যৎ বিষবৃক্ষের বীজ। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর উত্তরজীবনে ধর্মানুরঞ্জিত স্বদেশভক্তির পক্ষপাতী হয়েছিলেন। এখানেই আসে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রশ্ন। এই ধর্মপ্রতিষ্ঠ স্বদেশপ্রীতির মধ্যেই সূচিত হল ভাবী কালের ধর্মানুগত দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা দেশবিভাগের পূর্বাভাস। তা ছাড়া, যোগেন্দ্রনাথের এই শেষের উক্তিগুলি কি প্রায় অনিবার্যরূপেই বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত শিবাজী-উৎসব, ভবানী-মন্দির পরিকল্পনা এবং হিন্দুধর্মাশ্রিত বিপ্লবপ্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না! সবচেয়ে বড়ো কথা হল, নানা দিক থেকে হিন্দু জাতীয়তার নব-অভ্যুদয়ের এই যে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, তাতে স্বতই হোক বা ইংরেজ সরকারের ইঙ্গিতেই হোক অথবা দু-এর মিলিত প্রভাবেই হোক দেশে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধও ক্রমেই প্রবল ও সক্রিয় হয়ে উঠছিল এবং ফলে লর্ড কার্জনও বাংলাবিভাগে উৎসাহিত হয়েছিলেন।

সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের প্রতি যতখানি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তার চেয়ে কম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাঁর উপরে বঙ্গদর্শনের প্রভাবও হিন্দুমেলার চেয়ে কম ছিল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন যোগেন্দ্রনাথের সম্পাদিত আর্যদর্শনেরও গভীর অনুরাগী পাঠক। ফলে তাঁর হৃদয় ক্রমশ পূর্বতন হিন্দু জাতীয়তার আদর্শ ছেড়ে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তা তথা ভারতীয় জাতীয়তার প্রতি আকৃষ্ট হল। তাঁর মনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয়তার আদর্শই ক্রমে প্রবল হয়ে উঠল। ১৮৯২ সালে ইংরেজ সরকার যে শাসন-সংস্কার আইন প্রবর্তন করেন তার মধ্যেই প্রথম হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক জীবনে রাজনৈতিক বিচ্ছেদের বীজ বপন করা হল। তার কিছুকাল পরেই রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের

'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ (সাধনা, ১৩০০ আশ্বিন-কার্তিক)। প্রবন্ধটি পঠিত হয় চৈতন্য লাইব্রেরিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে। সভায় পঠিত হবার পূর্বেই এটি বঙ্কিমচন্দ্রের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। এই প্রবন্ধে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আজকাল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে, আমরা আপনাদের মধ্যে তাহা লইয়া ···কি গোপনে বলি না যে, এই উৎপাতের প্রধান কারণ ইংরাজরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না। ···ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশি করিয়া বপন করিয়াছে। ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছে এমন নাও হইতে পারে; কিন্তু আকবর যে-একটি প্রেমের আদর্শে খণ্ড-ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইংরাজের পলিসির মধ্যে সেই আদর্শটি নাই বলিয়াই এই দুই জাতির স্বাভাবিক বিরোধ হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে।' এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন—"একজন মহদাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ (আকবর) যে অত্যুচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, একটি সমগ্র জাতির (ইংরেজের) নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না।"

আকবরের আদর্শ কী ছিল তার পরিচয়দান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আকবর সকল ধর্মের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া যে-একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয় মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত, নিষ্ঠার সহিত, হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান পারসি ধর্মজ্ঞদিগের ধর্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও তিনি হিন্দু রমণীকে অন্তঃপুরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রিসভায়, হিন্দু বীর-গণকে সেনানায়কতায় প্রধান আসন দিয়াছিলেন। তিনি কোন রাজনীতির দ্বারা নহে, প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন।"

হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই যে উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, তা সর্বতোভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের সানন্দ অনুমোদন লাভ করেছিল এ কথাটা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহ ছিলেন বলেই তিনি তাকে বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছিলেন। আকবর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোল্লিখিত সশ্রদ্ধ মনোভাবের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে এবং আকবরের উদার রাজনীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব দীর্ঘকাল পরে প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্টতর ও গভীরতর রূপে তাঁর 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' প্রবন্ধে (প্রবাসী, ১৩২৪ মাঘ)। —"মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন রাষ্ট্রীয় চাঞ্চল্যের ভিতরে ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্‌বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগল সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্র-সাম্রাজ্য নয়, একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল, অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে ঐক্যের অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।"

এ তো অন্তরের মিলনের কথা। কিন্তু দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল বাইরের সংসারে যেখানে অনৈক্য প্রবল হয়ে ওঠে সেখানে অন্তরের মিলনপ্রচেষ্টাও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। বাইরের সাংসারিক অনৈক্য ও হানাহানি দীর্ঘকাল ধরে দেশটাকে অন্তহীন দুর্দশার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথও তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে তার শেষ বিভীষিকাময় রূপ দেখে যাবার দুর্ভাগ্য তাঁর হয়নি। তিনি নানা উপলক্ষ্যে ও নানা ভাবে এই কঠিন সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন, কারণ নিরূপণও করেছেন ; কিন্তু তার সমাধানের কোনো সহজ সূত্র নির্দেশ করতে পারেননি। কারণ কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তিনি এই সমস্যার যে তিতিক্ষা ও প্রতীক্ষাসাপেক্ষ সমাধানের কথা বলেছেন ('হিন্দু-মুসলমান', ১৩২৯ শ্রাবণ), তা এই—"সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে এসে পৌচেছে, হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ···আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে—ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে—তারপরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই। কারণ, অন্য দেশের মানুষ যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব। যদি না আসি তবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

বলা বাহুল্য আমরা এখনও সংস্কারের গুটি কেটে মুক্ত জ্ঞানের আলোতে বেরিয়ে আসতে পারিনি। কারণ শিক্ষার অবাস্তবতা ও অব্যাপকতা। এ ক্ষেত্রে যে শিক্ষার আলো মনের সংস্কার ঘোচাবার প্রধান সহায়ক, তা হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা। যে ইতিহাস আমরা পড়ি তা আমাদের জীবনপ্রতিষ্ঠ নয়, আমাদের সামাজিক সংস্কারমোচনের সহায়ক নয়। এখানে [illegible] কর্তব্য বাংলার (পূর্ব ও পশ্চিম) হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং বিহার বা উত্তর প্রদেশের সমস্যা গুরুত্বে ও প্রকৃতিতে এক নয়। সুতরাং বাঙালির এই বিশেষ সমস্যার সমাধান হতে পারে শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসের শিক্ষার আলোকে। সামগ্রিকভাবে ভারত-ইতিহাসের সহায়তায় বাংলার সমস্যা-নিরসন সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গভীরভাবে বাংলায় ইতিহাসচর্চার কোনো ব্যবস্থা এখনও হয়নি, অদূর ভবিষ্যতে হবার কোনো লক্ষণও দেখা যায় না। সুতরাং বলা যায়, বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক সমতাবিধানের আশু সম্ভাবনা নেই। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় বাণীর প্রতিধ্বনি করে বলতে হয়—আমাদের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও বাংলায় ইতিহাসচর্চার ব্যবস্থা চাই, নইলে বাঙালির ভরসা নেই।

রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজবাদ

চিন্মোহন সেহানবীশ

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁর 'India Through the Ages' —বইয়ে (M. C. Sarkar & Sons, 1951) লিখছেন :

"কিছুটা সাহিত্যিক খ্যাতি আছে এমন এক বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলেন যে একদিন ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি যখন জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন এক রোঁদের কনস্টেবল দপ্তরের দরজায় এসে স্যালুট করে রিপোর্ট জানান 'তিন নম্বর দাগী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাল রাত্‌কো ঘর্ পৌঁছা!' আমার এখনো মনে আছে এ-গল্প বলার সময়ে কবি ঈষৎ ঠোঁট বেঁকিয়ে এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন তাঁর এই মন্তব্য, 'আমার মনে হয় ওদের নথিপত্রে আমার সে দাগ এখনো ঘোচেনি' (তর্জমা লেখকের, পৃ ৯৬)।"

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনি তাঁর Rabindranath Tagore—a Biography-তেও এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন—তবে সেখানে কবির নম্বর দিয়েছেন 'বি ক্লাস, ১২ নম্বর' (ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন 'বি ক্লাস'-এর বিশেষ তাৎপর্য!) প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন :

"কয়েক বছর পরে লন্ডনে এজরা পাউন্ডের সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিশ্চয়ই এ-কাহিনীটি বলে থাকবেন, কারণ বর্তমান লেখকের (অর্থাৎ কৃপালনিজী—চ. স.) সঙ্গে ঐ বিশিষ্ট মার্কিন কবির ১৯৫৯ সালে যখন রাপালোতে দেখা হয় তখন স্মৃতিচারণের মেজাজে তিনি বলেন, নানান উপলক্ষ্যে বলা রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য সব মন্তব্য (যা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি) ধরে রাখা দরকার। আমায় তিনি একবার বলেছিলেন 'আমার দেশে সন্দেহভাজনদের তালিকায় আমার নম্বর হল বি ক্লাস, ১২ নম্বর' (তর্জমা লেখকের, পৃ ২০৪)!"

১৯৭৪ সালের ৮ই আগস্ট হিরণকুমার সান্যাল 'আকাশবাণী'তে ১৯৩৫ সালের গোড়ায় জোড়াসাঁকোর এক আসরের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গত এই ঘটনাটির উল্লেখ করেন :

"সেদিনকার আসরে আরেকটি প্রসঙ্গ বিশেষ করে মনে পড়ছে। 'কোমাগাটা মারু' নামটি আজকের শ্রোতাদের কজন শুনেছেন জানি না। কিন্তু তখনই এই নামটি একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, খবরের কাগজে, লোকের মুখে মুখে।...নামটি একটি জাপানি জাহাজের। এই জাহাজে কানাডা থেকে বিতাড়িত 'গদর' দলের সভ্যরা ভারতে ফিরছিলেন। এঁরা ছিলেন প্রায় পুরোপুরি শিখ।

কিন্তু বজবজে জাহাজ থেকে নামামাত্র (২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪—চ. স.) পুলিশ হামলা শুরু করল ওদের ওপর। এঁরাও কেউ হয়তো রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এরপর চলল পুলিশের গুলি। অনেকে প্রাণ দিলেন, অনেকে পালালেন। যাঁরা পালালেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী বাবা সুরদিৎ সিং। এরপর ধরপাকড়, অত্যাচার সমানে চলল ঐসব শিখদের ওপর।

এদের প্রসঙ্গ উঠিয়েছিলেন বোধহয় এণ্ডরুজ সাহেব। ভারতবাসীদের ওপর অত্যাচারের খবর পেলে তিনি অধীর হয়ে তার প্রতিকারের জন্য ছুটোছুটি করতেন। কবি বললেন, 'কোমাগাটা মারু' থেকে যারা পালিয়েছে সরকারী নীতি হল তাদের 'ক্রমাগত মারো'— এ অসহ্য! এণ্ডরুজ সাহেবকে তিনি বললেন, এর প্রতিকার চাই। যা করতে পারি, বললে আমি নিশ্চয় করব" (আকাশবাণীর ও অনুলেখিকা শ্রীমতী পদ্মা গাঙ্গুলির সৌজন্যে)।

কৃপালনিজীর পূর্বোল্লিখিত রবীন্দ্রজীবনী থেকে জানা যায় যে এর কিছুদিনের মধ্যেই ১৯১৬ সালের মাঝামাঝি কবি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন কানাডা সফরের। 'কোমাগাটা মারু' ট্রাজেডির সূত্রপাত যে ভারতবাসীর প্রতি কানাডা সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতি থেকে, রবীন্দ্রনাথ সে-কথা বিলক্ষণ জানতেন। তাই তিনি নির্দ্বিধায় কানাডা সফরের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন এই কথা জানিয়ে যে, যে-দেশ তাঁর দেশবাসীকে অপমান করে তার দেওয়া সম্মান গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব (পৃ ২৫৭)।

১৯২১ সালে লেনিন ভারতীয় বিপ্লবী আবদুর রব পেশোয়ারিকে অনুরোধ করেন তাঁর জন্য ভারতের জাতীয় আন্দোলন বিষয়ক বইয়ের একটি তালিকা করে দিতে। আবদুর রব লেনিনের জন্য ৩৭টি বইয়ের যে তালিকা তৈরি করে দেন তার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের Nationalism। লেনিন ঐ বই ছাড়াও কবির আরো চারটি বই সংগ্রহ করেন তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির জন্য (ঘরে-বাইরে, গীতাঞ্জলি, Personality ও Gardener—বইগুলি সবই রুশ বা জার্মান সংস্করণ)। একটা জিনিস লক্ষ করলাম—Nationalism বইটির বহু পাতায় দাগ দেওয়া—খোঁজ নিয়ে জানলাম—লেনিনের নিজের হাতে। জার্মান জানি না—তাই Nationalism-এর কোন্ অংশ লেনিনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল, তা ধরতে পারলাম না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রায় দেশেই দেখা দেয় বিপ্লবী অভ্যুত্থান। সে লড়াই চলে বহুদিন ধরে। চীন, ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়া জয়যুক্ত হয়—অন্যত্র পর্যুদস্ত হয় শেষ পর্যন্ত। এই দ্বিতীয় ধরনের দেশের মধ্যে রয়েছে বর্মা। আমাদের মস্ত বড়ো গৌরব যে সেখানকার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন বেশ কিছু বাঙালি তরুণ। এঁরা অনেকেই শহীদ হয়েছিলেন সেই বিপ্লবী সংগ্রামে। তাঁদেরই একজনের কথা পড়ে সেদিন চমৎকৃত হলাম।

১৯৫৬ সাল। পেন্ডইয়োনা পর্বতমালার অতি দুর্গম অঞ্চলে বর্মার সশস্ত্র বিদ্রোহীদের গোপন আস্তানা থেকে এক বার্তাবাহী এল সুবোধ মুখার্জির চিঠি নিয়ে। বিদ্রোহীদের প্রথম শ্রেণীর নেতা সুবোধকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে এক লক্ষ মুদ্রা পুরস্কারের সরকারি ঘোষণা তখন বহাল রয়েছে। চিঠিতে চেয়ে পাঠিয়েছেন—বিদ্রোহ পরিচালনার কোনো উপকরণ নয়—রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংকলন সঞ্চয়িতা। রেঙ্গুনের কোথাও বইটা পাওয়া গেল না। লোক মারফৎ কলকাতা থেকে আনিয়ে সেটা পাঠালাম। কিছুকাল পরই ঘটনাচক্রে সুবোধের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটে যায়। জিজ্ঞাসা করলাম, 'সুবোধদা, তোমাদের সশস্ত্র সংগ্রামে রবি ঠাকুরের কবিতা কী কাজে লাগে?' স্বভাবসিদ্ধ প্রাণখোলা অট্টহাসি হেসে বললেন, 'তোকে কত কবিতা শুনিয়েছি ছাত্রজীবনে, ভুলে গেছিস?' ···আবৃত্তি করে গেলেন, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী...।'

তার অল্পকাল পরেই রেঙ্গুনের সব দৈনিক কাগজেই খবর বের হল—বিদ্রোহী নেতা সুবোধ মুখার্জি নিহত হয়েছেন। সঙ্গে রয়েছে ছবি—সুবোধের ছিন্ন মস্তকধারী একজন ফৌজি জোয়ানের (Ex-Burma Students XI Annual Get Together Souvenir, 1979-80)। 'পরিচয় গুপ্ত' ছদ্মনামে এ-লেখা লিখেছেন সুবোধ মুখার্জিরই একজন কমরেড।

বাংলাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক বন্ধুবর শওকৎ ওসমানের মুখে শুনেছি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে (১৯৭১) তাঁর বিশেষ বন্ধু এনায়েৎ করিম সাহেব ছিলেন নিউ ইয়র্কে পাকিস্তান রাষ্ট্রদূত দপ্তরের সচিব। শওকৎ ওসমান ঐ সময়ে তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের এই দুই ছত্র উদ্‌ধৃত করে—

জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন,
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।

এনায়েৎ করিম পরে শওকৎ ওসমানকে বলেন যে, তাঁরা তখন পাকিস্তানের পক্ষ ছাড়বেন কিনা এই দোটানার মধ্যে পড়েছিলেন। কবির ঐ দুই ছত্র তাঁকে ও তাঁর ১৪ জন বাঙালি সহকর্মীকে মনস্থির করতে শক্তি জোগাল। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে তাঁরা ১৫ জন রাজকর্মচারী পাকিস্তানের পক্ষ ছেড়ে যোগ দিলেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে।

ইন্দোনেশীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য, নিয়োটো সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। দণ্ডাজ্ঞা শোনার পর তিনি একটি অন্তিম বিবৃতি দেন। বিবৃতি তিনি শেষ করেন রবীন্দ্রনাথের গানের এই দুই কলি আবৃত্তি করে—

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলা বারেবারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ মার্চ, ১৯৬৬)

রবীন্দ্রনাথ : রাষ্ট্রচিন্তা, দেশাভিমান, বিশ্বমানবিকতা

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১

১৯৩১ সালে সত্তর বৎসর বয়সে খ্যাতির তুঙ্গে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ জন্মদিন উপলক্ষ্যে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরেই তাঁর প্রায়-আজীবনসঞ্চিত এক খেদের উল্লেখ না করে পারেননি— "খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে-গ্লানি এসে পড়ে, আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি।" এর প্রায় পাঁচ বৎসর পরেও গভীর বেদনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী-কে স্বদেশবাসীর মুখে কুৎসার অন্তহীন বীভৎসতা দেখে, "যেদেশে এটা সম্ভবপর হয় সেদেশে এই অভ্রভেদী অপমানের মন্দিরই আমার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাক্, এর বেশি আমি আর কিছু চাইনে।" সম্প্রতি আদিত্য ওহ্‌দেদার 'রবীন্দ্র-বিদূষণ ইতিবৃত্ত' আখ্যা দিয়ে যে গবেষণাগ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন, তাতে অনেক তথ্য রয়েছে যা ভুলে যাওয়া হবে অপরাধ। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে রাজশেখর বসু-র মতো যুক্তিসিদ্ধ সংযতবাক্ মহাজনের কথা ('গ্রন্থবার্তা', কলকাতা, মে ১৯৬০, পৃ ৭১-৭৩) যে ধর্মনেতা বা জননায়ক না হয়েও দেশবাসীর 'হৃদয়ের পূজা' পেয়ে রবীন্দ্রনাথ হলেন আমাদের অনন্য মহাত্মা।

তবু স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের মনে আজীবন যে-অভিমান জমেছিল তাকে অহেতুক বলে উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত হবে। বাঙালি মানসিকতায় হয়তো যে পাপ লুকিয়ে আছে তাকে ক্ষালন ব্যাপারে যেন এক্ষেত্রে আমাদের অনীহা না দেখা দেয়। তাৎপর্য কি নেই আপাতদৃষ্টিতে সম্ভবত সামান্য এক ঘটনার, যার বর্ণনা দিয়েছেন শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থে (কলকাতা ১৯৬১, পৃ ২৬৭), জীবনাবসানের অনতিপূর্বে কবি বুঝি একদিন অল্প কয়েকজন অন্তরঙ্গকে কাছে ডেকে বলেছিলেন যে কেউ হয়তো জানবে না নিজের দেশকে তিনি কতো ভালোবেসেছেন, আর তারপর অতি মৃদুকণ্ঠে গেয়েছিলেন, "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে/সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে"। তাৎপর্য কি নেই যখন অসম্ভবরকম অপ্রতিভ বোধ করি দেখে যে আজও 'জনগণমনঅধিনায়ক' রচনাকে (১৯১১) রবীন্দ্রনাথের ব্রিটিশ-রাজভক্তির প্রমাণ বলে কদর্য কলঙ্ক-রটনাকে উৎপাটিত করার প্রয়োজন ঘটছে? লজ্জা রাখার জায়গা কোথায় আমাদের যদি দেশের কোন্ প্রান্তে কোন অপোগণ্ড সম্প্রতি সেই জঘন্য মিথ্যাচারের পুনরাবৃত্তি করেছে বলে 'সংশয়'-নিরসনে নামার দরকার পড়ে?

সহজে মোহগ্রস্ত এবং প্রায় তেমনই সহজে মোহমুক্ত হওয়ার একটা ধারা হয়তো আমাদের অনেকের আবেগপ্রবণ মনে একটু বেশি মাত্রাতেই আছে। এজন্য বলতে হয় যে রবীন্দ্রগরিমার গুণকীর্তনের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে রবীন্দ্রকীর্তির মূল্যায়নে বিচারবুদ্ধিবলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত সমালোচনা থেকে সর্বদা নিবৃত্ত থাকা যেমন অনুচিত (এবং

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই অনভিপ্রেত), তেমনই অনুচিত ও অসংগত হল রবীন্দ্রজীবন ও প্রতিভার সামগ্রিকতাকে ভুলে যাওয়া। প্রায় যেন চরাচরব্যাপ্ত এই পুরুষোত্তমের 'অখণ্ডমালাকার' ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টির মহিমাকে সম্যক্ উপলব্ধির মধ্যে আনা সহজ কর্ম নয়। যাই হোক এ-প্রসঙ্গে প্রবেশ করলে রচনাকে বিশাল (এবং সম্ভবত বিরক্তিকর) আকার না দিলে চলবে না। সে-পথে না গিয়ে ভূমিকাস্বরূপ বলা যাক—রামমোহন রায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি (১৪ পৌষ, ১৩৪০) উদ্‌ধৃত করে—"আমাদের সকল দুর্গতির উপরে সর্বোচ্চ আশার কথা এই যে [রবীন্দ্রনাথ] এদেশে জন্মেছেন। তাঁর মধ্যে ভারতের পরিচয়"।

২

ভারত এবং বাংলাদেশ, এই দুই স্বাধীন স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রের নির্বাচিত জাতীয় সংগীতের রচয়িতা হলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' যিনি লিখেছিলেন, যিনি দেখেছিলেন, এই 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি/তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী', যিনি হলেন 'স্বদেশী গান' বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রধান স্রষ্টা, যাঁর জীবনে এমন সময় গিয়েছে যখন বিচলিত হতেন ভেবে যে, জন্মান্তর থাকলে যদি বাংলার আকাশ-বাতাস যেখানে নেই সেদেশে জন্মালে যে কী বিপত্তি ঘটবে, 'স্বদেশী সমাজ' ছিল যাঁর পরিকল্পনা আর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন যাঁর স্বহস্ত সৃষ্টি, তাঁর বাঙালি সত্তা যে প্রশ্নাতীত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'ভারতপন্থ'-এর প্রবক্তা মহাত্মা কবীর এবং যাঁকে রবীন্দ্রনাথই অভিহিত করেছিলেন 'ভারতপথিক' বলে সেই রামমোহন রায়-এর মতো তিনিও ছিলেন ভারতভাবনার অতুলন দিশারি, বলিয়েছিলেন 'গোরা'-র মুখ দিয়ে—"আজ আমি ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত। সকলের অন্নই আমার অন্ন।"পরাধীন ভারতবর্ষের যন্ত্রণা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন বলে 'ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে প্রাণ দাও প্রাণ দাও দাও দাও প্রাণ হে' ছিল তাঁর প্রার্থনা, চেয়েছিলেন যাতে নির্জিত দেশ আবার 'স্থান' পায় জগতের 'জনসমাজে'। প্রকৃত বাঙালি এবং প্রকৃত ভারতবর্ষীয় বলেই রবীন্দ্রনাথ 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' সবাইকে ডাক দিতে পেরেছিলেন, 'যেখানে বিশ্ব একটি পাখির বাসার মতো', ('যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্') তেমনই জমাট, সহজ সখ্যে সম্বদ্ধ সর্বমানবকে আহ্বান করেছিলেন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালে (১৯২১)। একাধারে এমন সুশোভন সংহতি রবীন্দ্র-চরিত্রকে বহ্নিমান্ করেছিল এমনভাবে যে তার সেই যুগন্ধর দ্যুতি অপরিম্লান আছে এবং থাকবে।

৩

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ-এর জীবদ্দশায় ঠাকুরপরিবারে কয়েকদিন অতিথি হয়েছিলেন এক রুশ অভিজাত 'প্রিন্স্' সল্‌টিকভ্। এঁর কথা আছে ১৮৫৩ সালে লেখা কার্ল মার্ক্‌স্-এর ভারতবিষয়ক প্রবন্ধে। অধঃপতিত ভারতবাসীর মধ্যেও যে বহুগুণ রয়েছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে সল্‌টিকভ্ বুঝি বলেন যে এদেশের মানুষ ইতালিয়ানদের চেয়েও 'বেশি মার্জিত আর সুনিপুণ'। স্বয়ং মার্ক্‌স্-এর মনে হয়েছিল যে, ভারতের জাটদের মধ্যে তিনি দেখছেন প্রাচীন জার্মানের চেহারা আর ব্রাহ্মণেরা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে প্রাচীন গ্রীকদের

কথা—এ-হেন দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মার্ক্স্‌-এর শঙ্কা ছিল না। যাই হোক, পারিবারিক সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ সুযোগ পেয়েছিলেন একটি বিশিষ্ট উত্তরাধিকারের। সহজাত কবিত্বশক্তি নিয়ে তিনি যদি নিজের একান্ত সত্তার মধ্যে আশ্রয় চাইতেন আর শিল্পীর 'গজদন্ত মিনার'-এর সুরভিত অবসরে কালযাপন করতে চাইতেন তো তা সাধারণ বিচারে দোষার্হ হত না। কিন্তু তিনি এসেছিলেন কালজয়ী প্রতিভা নিয়ে। 'দেবতার দীপ হস্তে' হয়েছিল তাঁর আবির্ভাব। আমাদের সৌভাগ্য যে দেখতে পেয়েছি তার দেদীপ্যমান্ মহিমা।

বালক বয়সেই রাজনারায়ণ বসু-র মতো সরল সাহসী, সদাশয়, তেজস্বী অথচ মরমী জ্যেষ্ঠের সান্নিধ্যে থেকে ভারতবর্ষের শৃঙ্খলামোচনের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অন্ধকার গৃহে, নাটকীয় কায়দায় মন্ত্রগুপ্তি ঢঙে শপথ গ্রহণের মধ্যে হাস্যকর উপাদান যে কিঞ্চিৎ ছিল তা রবীন্দ্রনাথ তো নিজেই জানিয়ে গেছেন। কিন্তু তাতে কোনো তরলতা ছিল না, তৎকালীন পরিস্থিতিতে অসংগত ছিল না, সত্যের ব্যত্যয় ছিল না। কবি লিখে গেছেন যে, "আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে।" সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশাভিমানও তাঁর হৃদয়-মনকে অধিকার করে রেখেছিল। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের বিবিধ পরম্পরা তাঁকে ধ্যান এবং কর্মের সাধনায় প্ররোচিত করেছিল, জগতের সর্বজনের আত্মীয়তা তাঁর কাছে যেমন সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তরূপে দেখা গিয়েছিল তেমনই স্বদেশের মর্যাদাকে তখনকার ধূল্যবলুণ্ঠিত দুর্দশা থেকে উত্তোলন করার ব্রতে টেনে এনেছিল—বলতে পেরেছিলেন পরিণত বয়সে উদার উদাত্ত কণ্ঠে—'মিলে গেছে আজ বিশ্বদেবতা/মোর সনাতন স্বদেশে'।

এজন্যই আশ্চর্য নয় যে যখন তিনি ত্রয়োদশবর্ষীয় কিশোর, তখন 'আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে বহে নতশির' বলে তখনকার রাজনীতি যে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মহড়া শুরু করেছিল তাকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতেন সেদিনের অবস্থায় কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব এবং সম্ভাবনা। তাই ১৮৮৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে উদ্বোধনী গাইলেন রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনা রামপ্রসাদী সুরে গাঁথা, 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'। এর পরবর্তী যে অধিবেশন কংগ্রেসের বসল কলকাতায়, তা-ও শুরু হল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গান দিয়ে। সে-কণ্ঠ না কি ছিল অতুলন, যার আস্বাদ বহুবার দেশবাসী পেয়েছেন, কিন্তু আমরা যারা তাঁকে দেখার ও শোনার সুযোগ পেয়েছি তারা জেনেছি সেই অপরূপ কণ্ঠের ধ্বংসাবশেষ মাত্রকে।

বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গেলে অজস্র তথ্যের অবতারণা না হলে চলে না কারণ সে ভূমিকা ছিল ব্যাপক, বিশাল বিচিত্র ঐশ্বর্যে খচিত। শুধু ভোলা যায় না যে তাঁর মতো মানুষ রাখীবন্ধনে সবাইকে মেলাবার মিছিলে অগ্রণী, ১৯০৬ সালের ৩০শে আশ্বিন লোকমান্য তিলক-প্রমুখের নায়কত্বে বঙ্গভঙ্গ রোধকল্পে গঙ্গাভিমুখী জনতাকে রবীন্দ্রনাথ গানে গানে মাতিয়ে রেখেছেন। এর কিছু পরে তাঁর মনে এসেছিল অবসাদ, বিপুল নিঃসঙ্গতা, বহুজনকে নিয়ে আলোড়নের প্রায় যেন অবশ্যম্ভাবীরূপে আনুষঙ্গিক বিচিত্র যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা, মনুষ্যচরিত্রে শুভ-অশুভের সহাবস্থান যে কণ্টক উৎপাদন করে তার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত কবিকে যেন আশ্রয় নিতে হল নিভৃত নির্জন কক্ষে—এর প্রদীপ্ত পরিচয় তাঁর তৎকালীন রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে। তবু সন্দেহ নেই যে স্বদেশীযুগের উন্মাদনায় তিনি পূর্ববর্তী রাজনীতির নিছক আবেদন-প্রবণতা

এবং আত্মশক্তির উদ্রেক বিনাই বিদেশী শাসনের কুক্ষিগত হয়ে থেকে অল্প কিছু রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের প্রয়াসের মধ্যে যে পৌরুষহীনতা ও মানসিক দৈন্য ছিল তাকে পরিহার করার সুযোগ এসেছে ভাবতে পেরেছিলেন।

স্বদেশীযুগের প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় "বহুদিনের পূর্বের কথা। তখনকার দিনে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অঞ্জলি তোলা ছিল রাজপ্রাসাদের দুর্গম উচ্চ শিখর থেকে প্রসাদকণা বর্ষণের প্রত্যাশায়।" এক বন্ধুর নির্বন্ধে কংগ্রেস নেতাদের সান্ধ্যভোজনকালে বিনোদন উদ্দেশ্যে তরুণ রবীন্দ্রনাথকে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের গান শোনাবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। 'ঠিক যাবার পূর্বক্ষণেই' রচনা করেছিলেন আজও অবিস্মরণীয় এক গান, "আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না/এ কি শুধু হাসিখেলা প্রমোদের মেলা/শুধু মিছে কথা ছলনা..."। কবি নিজেই লিখে গেছেন—"এই গান গাবার পর আর আসর জমল না। সভাস্থগণ খুশি হননি।" হবেন-ই বা কেমন করে, যখন শুনিয়েছিলেন : 'কে জাগিবে আজ কে করিবে কাজ/কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ…'। স্বদেশীযুগে অন্তত কিছুকাল ভেবেছিলেন দুয়ার ভাঙছে, জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব বুঝি আসন্ন—কিন্তু জীবন কঠোর, বিশেষত ভারতবর্ষীয় পরিস্থিতিতে আমাদের এই মান্ধাতাগন্ধী সমাজে বিপ্লব দূরে থাকে, প্রকৃত পরিবর্তনের পথেও যে বাধা-বিপত্তি-বিড়ম্বনার অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল আহত মনে ম্রিয়মাণ হয়ে আধ্যাত্মিকতার নিভৃতে না থেকে পারেননি, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। 'আবাল্য উপনিষদ আবৃত্তি'-তে অভ্যস্ত এই মানুষটির সত্তার গভীরে প্রবেশ করা তো সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া দুঃখই বা আমরা করব কেন, যখন দেখি যে সেই প্রায়-অজ্ঞাতবাসকালে লিখলেন নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি প্রভৃতিতে বিধৃত অপরূপ রচনা? রাজনীতি আমরা যাকে বলি তা তো কখনো তাঁর মুখ্য চিন্তা ছিল না। থাকা সম্ভব বা সমুচিতও ছিল না।

৪

প্রায় সব কথাই বাদ দিয়ে যেতে হচ্ছে কারণ একটা প্রবন্ধে কিছু গুছিয়ে বলা যায় না রবীন্দ্রনাথের মতো সার্বভৌম স্রষ্টার কোনো একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধেও। তবে জীবনের এই পর্বে রবীন্দ্রানুভূতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যে কত মহামূল্য তা অনেক সময় স্বীকৃত হতে দেখি না। ১৯০৮ সাল নাগাদ সময়ে লেখা 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে রয়েছে, "রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই, তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপর দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না, এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল। কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিলাইয়া দিয়া অঞ্জলি পূরণ করেন নাই।" আরও পাই কবির লেখায়, "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।" এই মহা গুণেরই সন্ধান রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন মহামতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে। অগ্রজ রামমোহন এবং অনুজ রবীন্দ্রনাথের মতোই বিদ্যাসাগরের মাহাত্ম্য ভারতবর্ষের

ভূমি থেকে তেজ ও জ্যোতিকে আত্মস্থ করতে পেরেছিল, আর ঠিক সেজন্যই তাঁদের আসন 'দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে।'

নিজের দেশ সম্বন্ধে অপরিমেয় আস্থা ছিল বলেই আবার রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমকে নন্দিত করতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের সমাবেশে প্রয়াসী হয়েছিলেন, বিশ্বকে আহ্বান করতে পেরেছিলেন শান্তিনিকেতনের নীড়ে। 'পূর্ব পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে'—এ হল তাঁরই কথা। 'এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব। আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।' তাই 'ভারত আজ সমস্ত পূর্ব ভূ-ভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক'—সবাই তো জানি 'যেথা গৃহের প্রাচীর/বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,' 'নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ/ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।' এ ছিল তাঁর প্রার্থনা ।

৫

সন্দেহ নেই যে ভারতবর্ষের ইতিহাস, তার অতীত আর ভবিষ্যৎ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে মায়াময় ভাবাবাদী ধারণার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মাঝে মাঝে তাঁর কবিচিত্ত বাস্তবের আঘাতে ক্লিষ্ট হয়েছে—যেমন হয়েছিল যখন তিনি লেখেন 'ঘরে বাইরে' আর পরবর্তীকালে 'চার অধ্যায়', যাতে তাঁর বহু প্রকৃত অনুরাগী দেশভক্ত কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সবাই জানেন যে 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন' যাদের, সেই অকুতোভয় উৎসৃষ্টপ্রাণ মুক্তি-সংগ্রামীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও মমতার সীমা-পরিসীমা ছিল না। 'হায় সে কী সুখ, এ-গহন ত্যজি, হাতে লয়ে জয়তূরী/জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে/রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে/অত্যাচারীর বক্ষে বসিয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি'—এ কথা যিনি লিখেছেন, তাঁরও মনের একান্তে কিন্তু বিশ্বাস ছিল যে ব্রহ্মবল ক্ষাত্রবলকে পরাস্ত করতে পারে। 'একই ব্রহ্মদণ্ডে সর্ব অস্ত্রকে পরাস্ত' করার শক্তি বিষয়ে যে সুপ্রাচীন উক্তি তাকেই গ্রহণ করতে তাঁর মন চেয়েছিল। সম্প্রতিকালে 'ক্ষমতার উৎস হল বন্দুকের নল' বলে মাওৎসে তুং-য়ের বহুবিশ্রুত বাক্যের মধ্যে বাস্তব বিচারে যে-সত্য আংশিক হলেও আছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা সহজগ্রাহ্য ছিল না। এজন্যই দেশমুক্তির উদ্দেশ্যে হলেও সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে অরুচি তাঁর কখনো কাটেনি ; বহুজনকে সংগঠিত করে দেশের স্বাধীনতা বা অনুরূপ কোনো শ্রেয়স্কর লক্ষ্যসাধনে সংগ্রামের যে-পরিস্থিতি মাঝে মাঝে অকাট্য হয়ে পড়ে, তাতে রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তি ঘটত। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কখনো কার্যক্ষেত্রে তাঁকে দেশের যুক্তিপ্রয়াস কিম্বা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-তোষণপুষ্ট ফ্যাসিজ্‌ম্‌কে পরাভূত করতে হলে তার মূল্য দেবার জন্য তৈরি থাকার চেতনা বিষয়ে পরাঙ্মুখ দেখা যায়নি। ১৯৩০ সালে সোভিয়েট দেশ থেকে কোরিয়া-র মুক্তিপ্রয়াসের কথা শুনে স্বদেশবাসীকে সাবধান করে জানিয়েছিলেন যে, ইংরেজ শাসনকে দূর করতে হলে আরও বহু যন্ত্রণা সহ্য করার সংগতি চাই। আর ফ্যাসিস্ট দৌরাত্ম্যে দুনিয়া যখন ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে তখন ডাক দিতে তাদের ভোলেননি "দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

সহজ সৌম্য পরিবেশে প্রশান্তির মধ্যে জীবনযাপনের প্রলোভনে তাই কখনো তিনি পড়েননি। শান্তিনিকেতনকে তাই ইংরেজ সরকার প্রায় যেন শত্রুশিবির বলে মনে করত।

অন্তত সেখান থেকে যে 'অশান্তি' ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র আর ইংরেজ শাসন বিপন্ন হবে তা তারা জানত। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড আর গোটা পঞ্জাব জুড়ে ইংরেজ শাসনের নগ্ন কদর্যতার (১৯১৯) প্রতিবাদে ব্রিটিশ খেতাব পরিত্যাগ করে স্বদেশবাসী সকলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কবি, সর্ববিধ সাংসারিক প্রত্যাশাকে তুচ্ছ করে—আশা ছিল যে রাজনীতিক্ষেত্রে যারা নায়ক তারা সাড়া দেবে—কিন্তু দেয়নি। ১৯১৯ সালের শেষে অমৃতসর কংগ্রেসে তিলক, অ্যানি বেশান্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য-প্রমুখ সকলে এ-বিষয়ে বিমুখ হয়ে রইলেন, কবি মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। যেমন স্বদেশীযুগে তেমনই গান্ধিযুগের প্রারম্ভেও আবিষ্কার করলেন বাস্তব রাজনীতির কলুষ। একটু দূরে থাকলেন তাই যখন ১৯২০-২২ সালে মহাত্মা গান্ধির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে দেশ প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হল, কিন্তু কখনো ইতস্তত করলেন না জনজাগরণকে নন্দিত করতে। নিজস্ব আপত্তি অবশ্য জানালেন যুক্তিবর্জিত, আবেগাতিশয্য কণ্টকিত পথে দেশের মানুষকে যেতে দেখে, 'সত্যের আহ্বান' ভাষণে স্বয়ং গান্ধির সঙ্গে গভীর বিতর্কে লাগলেন, কেউ বলতে পারবে না কবি ছিলেন উদাসীন। এজন্যই দেখি আবার ১৯৩০ সালে ভারতে জন অভ্যুত্থান বিষয়ে তিনি লিখছেন—'আমার চিত্ত আমার দেশের সঙ্গে প্রবল বেদনায় সম্মিলিত হয়েছে।' ওই বৎসর সোভিয়েট দেশে তিনি দেখলেন 'ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ'। যা চাক্ষুষ না করলে তাঁর 'জীবনের তীর্থপরিক্রমা' অসম্পূর্ণ থাকত, সবাইকে জানালেন যে 'ঐ তপোভূমিতে' লোভ বলে যে এক 'মৃত্যুশেল' সমাজপঞ্জরে রয়েছে তাকে সমূলে উৎপাটিত করার প্রচণ্ড প্রয়াসে তারা নেমেছে, আশ্চর্য হলেন সেই কর্মকাণ্ড দেখে, আশীর্বাদ করলেন তাদের ইতিহাস-সৃষ্টিকারী উদ্যোগকে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি দোষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আমি চাই তোমাদের কাজ একেবারে নিখুঁত হোক, 'চাঁদের অন্ধকার দিক'-টার কথাও বলে গেলাম, তোমাদের ব্রত সার্থক হোক।

গোয়েন্দা পুলিশের খাতায় রবীন্দ্রনাথের নাম ইংরেজ সরকার লিখে রেখেছিল। আশ্চর্য নয়, কারণ স্বদেশচেতনা ছিল কবির সর্ব কর্ম আনন্দের ভিত্তি। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে শুধু শিক্ষাসংস্কার নয়, পল্লী-উন্নয়ন (পাম্প্, টিউব-ওয়েল, ট্র্যাক্টর, তাঁতের কারখানা, চর্মশিল্প, বৈজ্ঞানিক কৃষি, কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন, সালিশীপ্রথা প্রবর্তন ইত্যাদি) এবং সর্বজনের সার্বিক সমুন্নতি ছিল তাঁর নিয়ত চিন্তা। এজন্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানে যখন যান তখন বাংলার লাট কর্ড কার্মাইকেল (যিনি শিল্পবেত্তারূপে ঠাকুর পরিবারের বন্ধু ছিলেন) রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি জানিয়ে জাপানে ব্রিটিশ রাজদূতকে পত্র দেওয়ার অপরাধে প্রায় পদচ্যুত হতে বসেছিলেন, নিজে একজন প্রভাবশালী অভিজাতবংশীয় হওয়া সত্ত্বেও। এ-ধরনের কত কথাই আজ আমাদের জানা, তার বিবরণ এখানে সম্ভব নয়। পরে আর এক লাট অ্যান্ডারসন পুলিশ পাহারা নিয়ে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে গেলে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে সেখানকার প্রতিটি অধিবাসী তখন অনুপস্থিত। স্বাধীনতাযুদ্ধে লিপ্ত যারা তাদের পথ ও পদ্ধতিকে মানতে না পারলেও কত না তাঁর মমতা! যতীন দাশের বন্দী অবস্থায় অনশনে মৃত্যুতে তাঁর আকুলতা, হিজলি জেলে বন্দীহত্যা বুকে বাজল এমনই যে 'এবার ফিরাও মোরে'-র যে-উপসংহার—'এ-দুঃখ মাঝারে কবি/একবার নিয়ে এসো স্বর্গহতে বিশ্বাসের ছবি'—তাকে পরিহার করে বললেন রবীন্দ্রনাথ—'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু/নিভাইছে তব আলো/তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ/তুমি কি বেসেছো ভালো?'

সোভিয়েট দেশে গিয়ে যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, স্টীভ্‌ন্‌ হে-সাহেব থেকে কৃষ্ণ কৃপালনি-মহোদয় পর্যন্ত বহু গুণীর বিরক্তি সত্ত্বেও মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার কারণ তিনি নিজেই বলে গেছেন—"এদের এখানকার বিপ্লবের বাণী ··· বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটি দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।" যখন সোভিয়েট দেশে যান তখন সেখানকার দৈন্যদশা দূর হয়নি ; প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাও সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু নিজেই লিখে গেছেন যে তার পরই আমেরিকা গিয়ে মন হাঁপিয়ে পড়েছে। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের মধ্যে দেখেছিলেন কুবের-এর কুশ্রী মূর্তি, আর স্বস্তি পেয়েছেন ভেবে যে বাহ্যিক জীবনে অভাবের চিহ্ন সত্ত্বেও সোভিয়েটে সমসুযোগের সমাজ পরিগ্রহ করেছে লক্ষ্মীর 'কল্যাণী' মূর্তি। স্বদেশের জন্য তাঁর চিরন্তন কামনা ছিল 'জনগণমঙ্গলদায়ক', 'জনগণ-ঐক্যবিধায়ক', 'জনগণ-পথপরিচায়ক' শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত দেখা। সেজন্যই এদেশে ধর্ম, জাতি, বর্ণ ইত্যাদি নিয়ে প্রভেদের প্রমত্ততা বিদূরণে ক্লান্তি বা শৈথিল্য সর্বদা তাঁর ধিক্কার পেয়েছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এই হল যে-দেশের মর্মবাণী, তারই তুলনাহীন প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কর্মের অপরিমেয় বিন্যাসে।

'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' বিষয়ে তাঁর জীবৎকালেই প্রকাশিত এক শ্রদ্ধান্বিত অথচ সীমিত গ্রন্থ তাঁকে যেন একটু অপ্রসন্ন করেছিল। তার যথেষ্ট কারণও রয়েছে; তাঁর বোধি আর বিচারকে খণ্ডিত করে দেখা প্রকৃতই প্রত্যবায়। এ কথা লিখেই মনে হচ্ছে বাগাড়ম্বর স্তব্ধ করতেই হবে। তাই দেশাভিমান, সমাজচিন্তা ও বিশ্বমানবিকতার অপরূপ সম্মিলন ঘটেছিল যে দিব্য প্রতিভায়, তারই প্রায় শেষ প্রকাশ ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ 'সভ্যতার সঙ্কট' শীর্ষক তাঁর তুলনাহীন ভাষণ স্মরণ করি। 'এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই মানুষের চরম আশ্বাসের কথা' জগৎ জানবে, রবীন্দ্রনাথের এই দেদীপ্যমান ভরসা আমাদের মলিন, কুণ্ঠিত, বহুধা অসার্থক জীবনকে প্রবুদ্ধ করুক।

রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষীয়তা ও বাঙালিত্ব

গোপাল হালদার

বিশ্বকবি—রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয় পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত কিনা জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষে তো নিশ্চয়ই এবং পৃথিবীর অন্যত্রও বহু-স্বীকৃত। এই কথাও বোধ হয় শিক্ষিত জগতের জানা আছে—তিনি ভারতীয় কবি হলেও বাংলা ভাষার কবি। ভারতবর্ষীয় বলে তো কোনো একটি ভাষা নেই—আছে অনেকগুলি গৌণ ও অন্তত বিশটিরও অধিক কিছু প্রধান গণ্য ভাষা, যাতে কিছু-না-কিছু সাহিত্যচর্চা আধুনিক জগতে হয়। গৌণ ও প্রধান ভাষারই নাম ভারতবর্ষীয় নয় ; আবার ভারতবর্ষীয় ভাষা বলতে সব কয়টিই ভারতীয়—'নামে' তারা বিভিন্ন, 'স্বতন্ত্র' বলেই তারা গণ্য। এরূপই ভারতবর্ষীয় মানুষ। যেমন ভারতীয় 'মহাজাতি'র মধ্যে আছে নানা 'জাতি'র মানুষ, নৃতাত্ত্বিক গণনায় জীবনযাত্রার পার্থক্যে অনেক—যাকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় 'নেশন' বলা দুঃসাধ্য, আর সম্ভবত একেবারে 'নেশন' নয় বলাও দুঃসাধ্য। 'নেশন' যদি হয় শত দুই-তিন বৎসরে সৃষ্ট 'রাষ্ট্রজাতি' (এ শব্দটিও রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে অনুমোদন করেছিলেন), তাহলে ভারতবাসী 'নেশন' হতে চেয়েও হতে পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে কিনা সন্দেহ। তবে তখনো ভারতবাসী সামাজিক গণনায় 'মহাজাতি' ছিল (সে শব্দটিও রবীন্দ্রনাথেরই উদ্ভাবিত নাম বলে জানি) ; আর ভবিষ্যতে পাকিস্তান সামাজিকতায় ভিন্নজাতি রূপ গ্রহণ করবে কিনা জানি না, কিন্তু সামাজিক গণনায় ভারতবাসীদের 'মহাজাতি' গণ্য করা সম্ভব হবে (অবশ্য আধুনিককালে নানা কারণে এখনকার রাষ্ট্রীয় জাতিদের অর্থাৎ জাতিদের অর্থাৎ নেশনদের কত রূপান্তর ঘটতে পারে, কে বলবে?)। মূলত একভাষী মানুষদেরই 'একজাতিক' বলা বোধ হয় শ্রেয় ; বাঙলাভাষীরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক হিসাবে বাঙালি, হোক রাষ্ট্রীয় (ভবিষ্যতের প্রশাসনিক পরিবর্তনে) কেউ 'বাংলাদেশী', অথবা পশ্চিম বাঙালি, কি রাঢ় বাঙালি, কি অন্য আরও কিছু।

প্রথম কথাটা তাই এই—রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতীয়, তেমনি বিশেষ করে বাঙালি কবি, আবার ভারতের কবি, আরও একটি বৃহত্তম (এবং আরও খাঁটি) অর্থে 'বিশ্বকবি' বা 'মানুষের কবি'। তবু রবীন্দ্রনাথকে আরও বিশিষ্টতর অর্থে একাধারে ভারতের ও বাঙালির কবি বলার মধ্যে একটি তাৎপর্য আছে। যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই সূত্রটিকে আমরা বুঝবার চেষ্টা করতে চাই—বুঝি-না তা নয়, সহজ সুস্থির অর্থেই তা বুঝি, কিন্তু আরও একটু তলিয়ে বোঝা দরকার। আবার একটি সাময়িক প্রবন্ধে তা সম্ভব নয়, যোগ্যতর কোনো বিচারক হয়ত লিখবেন হাজার দুয়েক পৃষ্ঠায়—তাতে কবির গদ্য পদ্য নানা জাতীয় লেখার সামান্য করেও উদ্‌ধৃতি দেওয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে। —আমরা আমাদের স্বল্প অভিজ্ঞতাতেই অবশ্য বলছি।

প্রথমত, ভারতীয় কবি বলতে আমরা এই বিশেষ ক্ষেত্রে কী মনে করি? ভারতবর্ষে জন্ম? ভারতের (কোনো) ভাষায় লিখেছেন? নিশ্চয়ই। ভারতীয় আকাশের তলায় ও

ভারতের মৃত্তিকার ওপরে তার সৃজনমূলক রচনার প্রাণ বিকশিত ও বিচ্ছুরিত কিন্তু সে বিকাশ এই ভারতের প্রাকৃতির (বা নিসর্গ) সীমায় আবদ্ধ নয়। ভারতীয় সেই প্রাকৃতিক আবেষ্টনী ছাড়িয়ে তা যে বহুলাংশে বিশ্বপ্রকৃতিকে শুদ্ধ গ্রহণ করেছে, তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে তার অন্তঃপ্রকৃতি বিচ্ছুরিত হয়েছে এক দেশে কালে এক এক লোকে, যাকে আধ্যাত্মিক (অতিলৌকিক নয়) বলা ছাড়া আর কোন কথা নেই। ভারতীয় বহিঃপ্রকৃতির এই প্রাণরূপা তার ফ্লোরা ও ফনামাত্র নয়, ট্রপিকাল মণ্ডলের আকাশ শুদ্ধ ভৌগোলিক হিসাবটাও সে পক্ষে যথেষ্ট নয়—পদ্মা গঙ্গার মত রবীন্দ্রনাথের বিকাশের পক্ষে আরও সত্য ছিল হিমালয়, ভারতসমুদ্র। এ সবের বাস্তবিক একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তাঁর কবিচেতনাকে নানাভাবে স্পর্শ করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে, বিশ্বেরও সঙ্গে তাঁকে মিলিয়েছে (তারই প্রমাণ 'বসুন্ধরা' থেকে 'আফ্রিকা' অবধি তাঁর কবিতা) মেলাবার স্বপ্ন ও সাধনা জুগিয়েছে।

'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' সর্ব মানুষের মিলনের সাধনা কিন্তু ভারতপ্রকৃতি থেকে শুরু। ভারত ইতিহাস থেকে ভারত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে মানব প্রকৃতির যে বিশেষ পথ একটু একটু করে গড়ে আসছে, সেই 'ভারতপথ' রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন 'শক হূন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন'—ইতিহাসের মধ্যে। এ সত্য উদ্‌যাপন করতে করতে ভারতবর্ষ এগিয়েছে। বিচিত্রের মধ্যে চলছে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা, এই ভারতের পথ—বহু জাতি বহু ধর্ম, বহু জনগোষ্ঠী চিন্তার ও জীবনযাত্রাকে নিয়ে মহৎ ক্রমসম্মেলনের। এই ইতিহাসের পথই ভারতের ইতিহাস। সে পথ চিরন্তন ভারত অতিবাহিত করতে করতে গতিরুদ্ধ হয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে—একদিনের আচার নিয়মকেই ভ্রান্তিবশে করতে চেয়েছে চিরদিনের। পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তার আশ্রয় (যেমন করতে চেয়েছিল গোরা)—অথচ তার চিরদিনের ভারতপথও সে ছেড়ে যেতে পারেনি যেমন পারেনি জ্ঞানের শান্ত দীপ্তির মধ্য দিয়ে পরেশবাবু প্রাণের চরম সত্যের বলে আনন্দময়ী। আর সেখানেই 'ভারতপথের' আবার নতুন যাত্রা। পরেশবাবুর কাছে গোরা সুচরিতার দীক্ষা গ্রহণে, আনন্দময়ীর মধ্যে মা তুমিই আমার ভারতবর্ষ ; তোমার ঘৃণা নেই, লজ্জা নেই ইত্যাদি ···এই চিরদিনকার ভারতেতিহাসেই আধুনিক কালের রূপান্তরের কথা—এই তো 'গোরা', রবীন্দ্র-প্রতিভায় প্রত্যক্ষীকৃত 'এপিক' উপন্যাস। আবার এই ভারতপথই পৃথিবীর জাতিতে জাতিতে মিলনের আভাসবাহী বর্তমান জগতের সাধনা—'বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য' সৃষ্টির মধ্যে মানব-মহারূপের আহ্বান। একাধারে ভারতের ও বিশ্বের জীবন-পথের বিকল্প মন্ত্র রবীন্দ্র-প্রতিভাই মেলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ ভারতপথিক ও বিশ্বকবি।

উপন্যাস গল্প কবিতা ছেয়ে কবির চিন্তা কর্ম ও মানবচেতনার এই সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর অজস্র প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' থেকে 'সভ্যতার সংকট' অবধি। শুধু কাব্যযোগে নয় কর্মযোগেও তাই তিনি আবহমান ভারতেতিহাসের মহাবাহন। তিলক যখন কবিকে বিলেতে বক্তৃতা করবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তখন এই কথা অনুভব করেই বলেছিলেন—কবির বাণীর মধ্য দিয়েই ভারতের অন্তর সত্যরূপ গ্রহণ করবে, কবিকে পলিটিক্যাল বক্তৃতা করতে হবে না। কবির স্বধর্ম অপরিত্যাজ্য যেমন সেই স্বধর্মের (কবি-বাণীর) মধ্য দিয়েই ভারতের নিগূঢ় মর্মবাণী হবে প্রকাশিত।

অথচ কবিবাণীর মধ্যে ভ্রান্তি নেই—সেই ভারতপথ ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধকদের পথ। কবির প্রতিভায় উজ্জ্বলীকৃত সেই পথকে বাহিরের ও ভেতরের নানা অপকীর্তি সত্ত্বেও, দেড়-দু হাজার বৎসরের মধ্য দিয়ে প্রসারিত। বারে বারে 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। মানুষকে শূদ্র ম্লেচ্ছ বলে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। দেশের অর্ধেক মানুষকে নারী বলেই মানুষের অধিকারচ্যুত করে রেখেছে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করা অবধি তোমার ভারতপথও রুদ্ধ থাকবে, হে ভারত তোমাকেও অপমান হতে হবে এই অপমানিতের সমান। ভারতাত্মার মধ্যে আপনাকে মিশিয়ে দিয়েও কবি অন্ধ ভারতীয়তার আপনার স্বধর্ম বিস্মৃত হননি—রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম যে মানবধর্মও। সর্বোপরি সেই কবি সকলকে জানিয়ে গেলেন যে 'মহামানব' আসছেন—তিনি কোনো অপার্থিব পৃথিবীর অধীশ্বর নন ; বিশ্বের সকল মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর পথ তৈরি করে আসছেন তিনি বিশ্বমানব।

মনে হবে যেন কি অনেকখানি নিচে নামিয়ে আনালুম—'আকাশ-ভরা সূর্য তারার' মধ্য থেকে নেমে এলুম এই আমাদের পরিচিত বাংলা দেশের বাঁশবনের ঝিঁ ঝিঁ ডাকা মশা-মাছি-ভরা ক্লেশ-কঠিন মাটি-কাদার মধ্যে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল না—তিনি তাতে ভূমি-ভ্রষ্ট হয়ে কোনো অন্ধকারবর্জিত স্বপ্নালোকের 'আকাশ-বাতাসেই' (কল্পনার উজ্জয়িনীপুরেই) ভেসে বেড়াতে চাননি। বাস্তব জীবনে বাংলার বৈশাখের গ্রীষ্মক্লান্ত দিনে নিজের হাতপাখা চালিয়েছেন। চেয়েছেন অর্ধভুক্ত কৃষকেরা সমবায় ও সচেতন হাল-চালনায় পৃথিবীর সত্যকে কর্মযোগের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করুক। তেমনি বাংলার ঋতুতে ঋতুতে পেয়েছেন তার ফল-জল জীবজগতের সঙ্গে হবার 'আনন্দ-যজ্ঞে আপনার নিমন্ত্রণ'। বঙ্গলক্ষ্মীর ক্ষুদ্র ভাণ্ডারের মধ্যেও চেয়েছেন বিশ্বলক্ষ্মীর মুঠি মুঠি দান—ঐশ্বর্যের দান নয় বরং শ্যামলশ্রী,—যে শ্যামলশ্রীর মূর্তিমতী রূপ দেখে আমাদের অন্তর বলে 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'—এই শস্যময়ী বাংলা দেশকে আমিও জানি 'কালো, তা সে যতই কালো হোক দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ'।

'সোনার বাংলা', 'কালো হরিণ চোখের' কালো মেয়ে তবু যে কী ভালো রবীন্দ্রনাথ এই বাংলাকে বাসতেন তা 'ছিন্নপত্র' থেকে শেষের দিনের ছড়াগুলিতেও দেখতে পাই। আজীবন জানিয়ে গিয়েছেন—রাঢ়ের রাঙা মাটি আর পদ্মার গেরুয়া জল কিছুই তিনি ছাড়তে চান না। —না, রবীন্দ্রনাথ ভুলতে চান না তাঁর বাংলার এই বাঁশবন আর শেয়াল-ডাকা জঙ্গল, ভুলতে আরও পারেননি—সেই চণ্ডীমণ্ডপের ঘোঁট-পাকানো আর পরশ্রীকাতর সর্বকর্মে দৈন্যগ্রস্ত অন্তরের অ-মানুষ বাঙালিদের—যাদের হাতের অবহেলা ছিল তাঁর পক্ষে চিরযাতনার স্মৃতিকণ্টক। যেমন ভুলতে পারেননি ভারতীয় আত্মবিস্মৃতি, আত্মক্ষয়, তেমন ভুলতে পারেননি এই হীনচিত্ত বাঙালিকে—যাদের ভাষা তবু তাঁর কাছে মধুর ; আপনার থেকেও বেশি আপনার,—যে ভাষায় তাঁর প্রতিভা আপনাকে প্রকাশের অবকাশ পেয়েছে, সে ভাষার তুচ্ছ বাগ্‌ভঙ্গি, তার ছড়া, তার গ্রাম্য গান, তার বাউল গান ; আবার ভোলেননি কুৎসিত-কদর্যতার মধ্যে প্রস্ফুটিতা কুমুকে, অশান্ত দামিনীকে, সহজ মেয়ে ললিতাকে, সুচরিতাকে, আর আবেগ উচ্ছ্বাসে ক্লান্ত বিভ্রান্ত একালের বিমলাকে আর একালের দুর্ভাগ্যমণ্ডিতা প্রাণস্ফুলিঙ্গ এলাকে। আরও কতশত শহরের ও পল্লীগ্রামের

বাঙালি মেয়েদের—সকলেই যারা 'কৃষ্ণকলি' আর লোকে যারে কালো বলে। কিন্তু যে যা বলে বলুক, লাবণ্য কেটি মিত্তিরকে—এমন দুহাত ভরে বাংলাকে—বাঙালি মেয়েকে বাঙালি পুরুষকে, তরুণ অমূল্যর মত, হতভাগ্য অতীনের মত প্রাণকে বিলিয়ে দেয় যে বাঙালি—তাদের কাউকে ভুলে যাবার কোন সামান্য অজুহাতও তিনি পৃথিবীর মানুষকে দিয়ে যাননি। সকল দুর্ভাগ্যের মধ্যেও যে বাংলার মানুষকে তিনি মানুষের রূপ, মানুষের যন্ত্রণা, মানুষের মমতাভরা প্রাণবস্তুকে আপন মনে যন্ত্রণা-আনন্দ অনুভব করেছেন—তিনি বাঙালি, বাঙালির ভাষায় পৃথিবীর মানুষের স্রষ্টা—এ কথা কে ভুলতে পারে? একাধারে ভারতীয় ও বাঙালি, বিশ্বমানুষের কবি—তবু কবি তিনি বাংলার মাটি, বাংলার জল আর বাংলার যত ভাইবোনের।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ উন্নয়নচিন্তা

ভবতোষ দত্ত

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববন্দিত সাহিত্যকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক নানা সমস্যার নানা দিকে তাঁর যে চিন্তাধারা ছিল তার মূল্যও অপরিসীম। এই চিন্তাধারা আশ্রমবাসী ঋষির কর্মনিরপেক্ষ তাত্ত্বিক চিন্তা নয়—বহু ক্ষেত্রে, বিশেষত শিক্ষাদানে ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যবস্থাপনায় তাঁর চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আদর্শ নিয়ে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও পরে বিশ্বভারতী স্থাপন করেছিলেন তার থেকে আমরা বহুদূরে সরে এসেছি। কিন্তু গ্রামীণ উন্নয়নে তাঁর নিজের কাজের সাফল্য বা অসাফল্য যাই হোক না কেন, তাঁর মুল চিন্তাধারা স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের পরিকল্পনায় একটা বিশেষ স্থান পেয়েছে। আমাদের বর্তমানকালের গ্রামোন্নয়ন-চিন্তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে কতটা ব্যাপক ও গভীর সেটা সব সময়ে আমরা অনুধাবন করি না। অবশ্য মহাত্মা গান্ধির নাম উল্লেখ করি অনেকটা আনুষ্ঠানিকভাবে, কিন্তু নানা দিকে মতামতে পার্থক্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধির গ্রামীণ উন্নয়ন-পরিকল্পনাতে যে সাযুজ্য আছে সেটা আমাদের চোখে পড়ে না।

মহাত্মা গান্ধির অর্থনৈতিক চিন্তা সামগ্রিকভাবে স্বাধীন ভারত গ্রহণ করেনি। গান্ধিতন্ত্বের মূল সূত্র ছিল—যন্ত্রশিল্পের পরিহার এবং গ্রামে গ্রামে কুটিরশিল্পের প্রসার (বিশেষত চরকার), গ্রামীণ কৃষির উৎপাদন বাড়ানো, গ্রামীণ সমাজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা, যাতে অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিকেন্দ্রিত করা, দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি করে এবং ধনীদের সমাজের অন্য শ্রেণীর জন্য ট্রাস্টি বা ন্যাস-রক্ষক হতে উদ্‌বুদ্ধ করা। আজ মহাত্মা গান্ধি বেঁচে থাকলে তাঁর শেষ সূত্রটি সম্বন্ধে হতাশ হতেন। অন্য সূত্রগুলি নিয়ে এখনো আমরা আলোচনা করি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি না। 'শ্রীনিকেতন' এখনো আছে। পল্লীচর্চা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ভারত সরকার শান্তিনিকেতনে কৃষি-অর্থনীতির গবেষণাগার করেছেন। কিন্তু, সবসুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন চিন্তাধারার রূপায়ণের দিকে অগ্রগতি খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়নি। সারা ভারতে যে ২৮ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে, তাদের অধিকাংশই পল্লীবাসী। আর রাজ্যে রাজ্যে প্রভেদ বিস্তর—গ্রামীণ দারিদ্র্য পাঞ্জাব হরিয়ানাতে খুব কম, দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে আনুপাতিকভাবে অনেক বেশি। ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ও ন্যায়বিচারের পরিকল্পনাতে তাই গ্রামোন্নয়নের স্থান সর্বাগ্রে।

গ্রামোন্নয়নের জন্য—কৃষি, সেচব্যবস্থা ইত্যাদির উপরে—এখন কয়েকটি বিশেষ প্রকল্প আছে—যেমন 'সু-সংহত গ্রামোন্নয়ন কার্যসূচি', 'জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কার্যসূচি' ও 'জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থানের গ্যারান্টির কার্যসূচি'। এর আগে ছিল 'কাজের বদলে খাদ্য' কর্মপন্থা এবং তারো আগে ছিল 'কমিউনিটি প্রজেক্ট'। এই কমিউনিটি প্রজেক্টের জন্য প্রথম দিকে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু বহু কারণের সংমিশ্রণে এই উৎসাহ পরে কমে

যায়। একটা বড়ো কারণ হল অতিমাত্রায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ। মহাত্মা গান্ধি এটা একেবারেই চাননি এবং রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ'কে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী এবং সরকার-অনপেক্ষ হতে বলেছিলেন। গ্রামোন্নয়ন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার প্রথম সম্পূর্ণ প্রকাশ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেছিলেন ১৯০৪-এ—অর্থাৎ ঐতিহাসিক স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার প্রায় এক বছর আগে।

এই প্রবন্ধটি রচনার তাৎক্ষণিক কারণ ছিল প্রদেশব্যাপী অনাবৃষ্টি ও জলকষ্ট, কিন্তু এর বিষয়বস্তু ছিল ব্যাপক এবং একটি স্বয়ংক্রিয় কার্যসূচির প্রস্তাবও এতে ছিল। জলকষ্ট নিবারণে সরকার কী কী পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সে বিষয়ে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন স্বাবলম্বন। প্রবন্ধের সূচনাতেই তিনি লিখেছিলেন, "সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতক-পক্ষীর মতো ঊর্ধ্বের দিকে তাকাইয়া আছে—কর্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই। গুরু গুরু মেঘগর্জন শুরু হইয়াছে—গভর্নমেন্ট সাড়া দিয়াছেন—তৃষ্ণা নিবারণের যা-হয় একটা উপায় হয়তো হইবে—অতএব আমরা সেজন্য উদ্‌বেগ প্রকাশ করিতে বসি না। আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, পূর্বে আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল, যাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত—দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না।"[১]

এই প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল মহাত্মা গান্ধির 'হিন্দ স্বরাজ' বইটি প্রকাশের চার বছর আগে। গান্ধি-অর্থনীতি তখনো ভারতে প্রচারিত হয়নি। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধির পক্ষেও তখন রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' পড়া সম্ভব হত না। অথচ, এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর মূল আদর্শ প্রায় একরকম। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন জলকষ্ট ও অন্যান্য সমস্যার নিরাকরণে স্বেচ্ছাসেবামূলক স্বাবলম্বী প্রচেষ্টা। ইংরেজের আসার আগে গ্রামের অবস্থা কী ছিল তার যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন তাতে হয়তো আতিশয্য ছিল, কিন্তু তাতে তাঁর প্রস্তাবিত কার্যধারার গুরুত্ব কমেনি। তিনি চেয়েছিলেন আবেদন-নিবেদনের পথে না গিয়ে, মফস্‌সলের শিক্ষিত উচ্চবিত্ত শ্রেণী পল্লী-উন্নয়নের কাজে এগিয়ে আসবেন। তাঁরা হবেন 'সমাজপতি' এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন বিভিন্ন বিষয়ের 'নায়ক' দল। গ্রামবাসীরা অল্প পরিমাণে চাঁদা দেবেন আর বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সময়ে একটু বিশেষ অনুদানও দেবেন। গ্রামের মেলাগুলিকে 'নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব' করে তুলতে হবে। সমাজপতিরা মিলিত হয়ে 'কোনো প্রকার নিষ্ফল পলিটিকসের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচরভূমি' প্রভৃতি সম্বন্ধে কর্মসূচি গ্রহণ করবেন।[২]

প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং তাতে নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছিল। এর বক্তব্য নিয়ে বহু আলোচনা ও বিতর্ক হয় এবং পরে রবীন্দ্রনাথ তার দু-একটির উত্তরও দেন। পরবর্তী একটি সভাতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বাধিনায়ক করে একটি সমিতি গঠন করা হয় এবং তার পরে এর একটি সংবিধানও রচনা করা হয়।[৩] 'সমাজ'-এর কাজের পরিধিতে থাকবে—সামাজিক আচরণ-বিধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পকলা, সাহিত্য এবং বিরোধ-মীমাংসা। আয়-অনুসারে একটা চাঁদার হারও বেঁধে দেওয়া হয়—মাসিক সর্বনিম্ন চার আনা ও সর্বোচ্চ ত্রিশ টাকা। বিধানগুলিতে অনেক ফাঁক ছিল, যার ফলে আকাঙ্ক্ষিত অর্থসংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কাজের তালিকা ছিল দীর্ঘ—পানীয় জলের সরবরাহের বৃদ্ধি, নদী, খাল, রাস্তাঘাট,

শ্মশান ইত্যাদির উন্নতি, কৃষি ও পশুপালন শিক্ষা দেবার জন্য 'আদর্শ খামার' স্থাপন, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য 'ধর্মগোলা'-র ব্যবস্থা এবং আর্থিক, সামাজিক ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সংকলন। এটা উল্লেখ করা উচিত যে এই সব প্রস্তাব অনেকটা ইংলন্ডের 'কাউন্টি কাউনসিল' বা 'প্যারিশ কাউনসিলে'র কর্তব্যের মতোই ছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব খুব সীমিত ক্ষেত্রের বাইরে কার্যকর হয়নি। পতিসর-এ তাঁর নিজের জমিদারিতে স্বদেশী সমাজ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন এবং পরে শ্রীনিকেতন থেকে বোলপুর অঞ্চলে কিছুটা কাজ হয়। কিন্তু, সারা দেশে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত সমাজের নেতৃত্বে কোনো কর্মধারা গৃহীত হয়নি। এখন গ্রামের জমিদারশ্রেণী অবলুপ্ত, কিন্তু তাঁদের স্থান যাঁরা নিয়েছেন, তাঁরা সম্পূর্ণভাবে সরকারি সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল। আর তাছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাব দিয়েছিলেন ১৯০৪-এ, আর জমিদারি প্রথার বিলোপ হয় ১৯৫৫-তে। মাঝখানের পঞ্চাশ বছরে গ্রামের নেতৃত্ব যাঁরা নিতে পারতেন তাঁরা শহরে চলে এসেছিলেন। গ্রাম থেকে অর্জিত উদ্‌বৃত্ত শহরে এসে ব্যয়িত হয়েছে। অবশ্য, ব্যতিক্রমও অনেক ছিল। জমিদাররা কেউ কেউ মুক্তহস্তে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য টাকা দিয়েছেন, সাহিত্য-পরিষৎ ইত্যাদি গড়ে তুলেছেন। কিন্তু অবিভক্ত বঙ্গদেশে সরকারি রাজস্ব তিন কোটি টাকা জমা দেবার পরে যে প্রায় ১৩ কোটি টাকার উদ্‌বৃত্ত জমির মালিকদের হাতে থেকে যেত, তার একটা সামান্য অংশমাত্র সমাজসেবার কাজে লাগত।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাতে জমিদারদের নেতৃত্বের আশা ছিল, কিন্তু জমিদারি প্রথা সম্বন্ধে তখনো তিনি বিশেষ কিছু বলেননি। তিনি নিজে এক বড়ো জমিদার পরিবারের সন্তান এবং জমিদারি প্রথাটার বিরুদ্ধে তিনি কখনো যাননি। জমিদার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল, তাঁরা হবেন পিতৃপ্রতিম দয়াশীল অভিভাবকের মতো। জমিদারি পরিচালনার কাজে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন—তাঁর বড়োদাদার মতো মহর্ষির হুকুমে তাঁকে ফিরে আসতে হয়নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ জমিদারি দেখাশোনা করতে গিয়ে টাকা সংগ্রহের বদলে প্রজাদের দেবার জন্য মহর্ষির কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

জমিদারি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত অনেকটা স্পষ্ট হল যখন প্রমথ চৌধুরী ১৯২৬-এ 'রায়তের কথা' নামে একটি ছোটো বই লিখলেন।[৫] বইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন 'শ্রীমান প্রমথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু' সম্বোধনে এবং সে চিঠিটি সে বছরই 'সবুজ পত্রে' ছাপা হয়। প্রমথ চৌধুরী যখন বইটি লেখেন তখন রায়তের অধিকার বৃদ্ধির জন্য ফজলুল হক যে আইন পাশ করাতে চান সেটাকে নিয়ে তুমুল বিতর্ক হচ্ছিল এবং বিতর্কটা রাজনৈতিক এবং এমনকী সাম্প্রদায়িকও হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের স্বরাজ দল বিলটির বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' ১৯২৮-এ পাশ হয়ে যায় এবং তাতে রায়তের অধিকার বাড়ানো হয়।

প্রমথ চৌধুরী নিজেও জমিদার ছিলেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলে দেবার বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে রায়তের দেয় খাজনা কমবে না, বরং বাড়তে পারে। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যে জোত-স্বত্বের অধিকারী রায়তেরা তাদের অধিকার হস্তান্তর করবার ক্ষমতা পাক, গাছ কাটবার অধিকার পাক। পাকা বাড়ি তৈরি এবং কূপ-পুষ্করিণী খননের অধিকার পাক। সর্বোপরি তিনি চেয়েছিলেন যে জমিদারদের দেয়

'জমা' যেমন ১৭৯৩-তে চিরস্থায়ী করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি জোত-স্বত্বধারীদের দেয় খাজনাও চিরস্থায়ী করে দেওয়া হোক। প্রায় এক শতাব্দী আগে ১৮৩২-এ রাজা রামমোহন রায়ও হাউস অফ কমন্সের 'সিলেকট কমিটি'র কাছে এই প্রস্তাব-ই করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন যে, রায়তের এবং জমিদারের পক্ষ নিয়ে যে দু দল আন্দোলন করছেন, তাঁরা সবাই আইনজীবী, শিল্পপতি বা জমির মালিক। তাঁদের যুক্তি ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুললেন, জমিদারদের মালিকানা বিলুপ্ত হলে, সেই মালিকানা কার হাতে যাবে? যদি রায়তেরাই জমির মালিক হয়, তাহলে প্রত্যেক বড়ো জমিদারের স্থান নেবে 'দশ ছোটো জমিদার'। যদি এক জমিদারের বদলে অন্য জমিদার আসে তাহলে 'গোলামচোর খেলার গোলাম যাকেই গছিয়ে দিই—তার দ্বারা গোলামচোরকে ঠকানো হয় না।' আর 'জমি যদি খোলাবাজারে বিক্রি হয়ই, তাহলে যে ব্যক্তি চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা খুবই কম।'

জমির মালিকানা যে সরকার অধিগ্রহণ করতে পারেন জমিদারকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সে সম্ভাবনার দিকে প্রমথ চৌধুরী বা রবীন্দ্রনাথ কেউ-ই যাননি, কিন্তু মনে হয় দুজনেই অবহিত ছিলেন যে রায়তের নিচেও রায়ত আছে এবং শেষ পর্যন্ত আছে ভাগচাষী ও ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক। কিন্তু এ-সব নিয়ে ভাবনা তখনো শুরু হয়নি। রায়তের দেয় খাজনা বৃদ্ধি হওয়া উচিত নয় এ-কথা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু, এ-কথা অনস্বীকার্য যে জমিদারি প্রথার কুফলের সব দিকে তিনি নজর দেননি। জমির অধিকার পেলে চাষীর উৎপাদনশক্তি যে বাড়তে পারে সেটাও তাঁর চোখে পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়নের চিন্তাধারায় এই দৌর্বল্য অনস্বীকার্য। মনে রাখা উচিত যে মহাত্মা গান্ধিও জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে যাননি। তাঁর 'নো-রেন্ট' কর্মসূচি সরকারের প্রাপ্যের বিরুদ্ধে ছিল, জমিদারের প্রাপ্যের বিরুদ্ধে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছিলেন যে 'মা-বাপ' জমিদার প্রজার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে এবং তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে এ রকম জমিদার অনেক আছে। অন্য দিকে অবশ্য বলা যায় 'দুই বিঘা জমি' রবীন্দ্রনাথই লিখেছিলেন।

গ্রামীণ কুটিরশিল্প সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই রকম মত পোষণ করতেন, কিন্তু বৃহৎ শিল্প বা আধুনিক যন্ত্রশিল্পের একেবারেই কোনো প্রয়োজন নেই এ-কথা রবীন্দ্রনাথ মানতেন না। ১৯২৫-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অনুযোগ করেন যে, রবীন্দ্রনাথ চরকা-চালনায় উৎসাহ প্রকাশ করেননি। উত্তরে যে প্রবন্ধটি লেখা হল তাতে তিনি বলেছিলেন যে, চাষিরা ও তাদের পরিবারের লোকেরা অবসর সময়ে চরকা কাটলে উপকার হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু শুধু চরকা কেটেই 'দারিদ্র্য-বিদূরণ এবং ইংরেজ-বিতাড়ন সফলভাবে করা যাবে, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না।'[৫] যান্ত্রিক সভ্যতা রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত ছিল না—এটা তাঁর বহু রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন ছাড়া কোনো দেশই সমৃদ্ধ হতে পারেনি। তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেন বঙ্গদেশের কাপড়ের কল আর তাঁতের উৎপাদনের। এই সমস্যার মূল কোথায় তা-ও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, "ব্যক্তিগত অনুরাগের টানে মহাত্মাজীর কাছ থেকে চরকায় দীক্ষা নেবার প্রবল ইচ্ছা বারে বারে আমার মনে এসেছে। কিন্তু আমার বুদ্ধি-বিচারে চরকার যতটুকু মর্যাদা তার চেয়ে পাছে বেশি স্বীকার করা হয় এই ভয়ে অনেক দ্বিধা করে নিরস্ত হয়েছি।"[৬] যে কথাটা

তিনি বলতে পারতেন সেটা হল, চরকাপ্রেমী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই বেঙ্গল কেমিক্যাল স্থাপন করেছিলেন এবং আরও অনেক যন্ত্রভিত্তিক শিল্পের প্রেরণা দিয়েছিলেন।

গ্রামের চাষ আর কুটিরশিল্প, এই দুই ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন সমবায়নীতির বিরাট সম্ভাবনা। এই নীতির রূপায়ণের পক্ষে প্রবল যুক্তি দিয়ে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন 'ভাণ্ডার' পত্রিকাতে ১৯১৮ থেকে। কিন্তু আমাদের দেশের সমবায়-ব্যবস্থার প্রধান অংশই ছিল ঋণদান সমিতি। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে সত্যিকারের উন্নয়নের জন্য ঋণদান সমিতির অবশ্য প্রয়োজন হবে, কিন্তু সমবায়-ব্যবস্থায় উৎপাদনের কাজে অগ্রসর না হলে আসল কাজ কিছু হবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক আগে অবিভক্ত বঙ্গদেশে সমবায় ঋণদান সমিতির সংখ্যা ছিল প্রায় ৪,০০০ এবং বাকি ১২৭টির মধ্যে ৮টি ছিল ক্রয়-বিক্রয় সমিতি, চারটি ছিল দুগ্ধ-উৎপাদন প্রতিষ্ঠান। সমস্ত প্রদেশে একটিমাত্র বড়ো সমবায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ছিল—তার উৎপন্ন জিনিস ছিল গাঁজা। এটি ছিল রাজশাহী জেলার নওগাঁতে। রবীন্দ্রনাথ একবার ডেনমার্কে গিয়ে সেখানে সমবায় উৎপাদন (বিশেষত দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের) দেখে উৎসাহিত হন।

সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদনের প্রতি তাঁর আগ্রহ অনেকখানি বেড়ে গেল ১৯৩০-এ রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে। সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় চিন্তা, মার্কস্-দর্শন ইত্যাদি নিয়ে তাঁর মনে অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু তিনি দেখেছিলেন যৌথ উদ্যোগে উৎপাদন করলে উৎপাদন পদ্ধতিকে আধুনিক করা যায়, উৎপাদন বাড়ানো যায় এবং আর্থিক অসাম্য কমানো যায়। একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "কো-অপারেটিভের যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু এগোয় না। কেন না, ধার দেওয়া, তার সুদ কষা এবং দেনার টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীরু মনের পক্ষেও সহজ কাজ, এমন কি ভীরু মনের পক্ষেই সহজ, তাতে যদি নামতার ভুল না ঘটে তাহলে কোনো বিপদ নেই।" আর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন করছে। সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা-উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।"

আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "এখানে (রাশিয়ায়) এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে, সে হচ্ছে ধনগরিমায় ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব" এবং অন্যত্র, "যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই তার প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।"[৭]

তিনি বুঝেছিলেন যে, রুশ সরকারের কর্মপন্থায় 'জবরদস্তির সীমা নেই'। এর রাজনৈতিক দিকটার আলোচনার স্থান এটা নয়, এখানে শুধু লক্ষ করা যায় যে, কৃষি উন্নতির বিষয়ে তাঁর নিজের ধারণা আর রাশিয়ার ঐকত্রিক কৃষি-ব্যবস্থা তাঁর কাছে তুলনীয় মনে হয়েছিল। এবং রাশিয়া যাবার অনেক আগেই তিনি লিখেছিলেন, "যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্র্যাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেন না, সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না।"[৮] অর্থ অর্জনে এই ভেদ আছে লাভ আর মজুরির মধ্যে, ভেদ আছে শহরবাসী আর পল্লীবাসীর আয়ের মধ্যে।

পল্লীবাসীর কৃষিজমিতে আয় বাড়াতে হলে সমবায় বা কোনো ধরনের ঐকত্রিক চাষ ছাড়া সেটা সম্ভব হবে না, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সুস্পষ্টভাবে এবং আজ পর্যন্ত আমরাও বুঝছি।

মহাত্মা গান্ধি দ্বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি অল্পকয়েক মাসের জন্য দেখে গিয়েছিলেন এবং দেখেছিলেন উন্মূলিত জনগণের মধ্যে হিংসার নগ্ন প্রকাশ। যাঁরা দেশের কর্তৃত্বভার নিলেন, তাঁরা গান্ধিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করতেন না। কম্যুনিটি প্রজেক্টের মধ্যে গান্ধির প্রভাব দেখা যায় কিন্তু সে প্রকল্পও বিদেশী অনুপ্রেরণাতে জন্ম নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন ভারত দেখে যাননি, আগস্ট আন্দোলনও দেখেননি। তাঁর মৃত্যুর মাত্র ছয় বছর পরে যে দেশ স্বাধীন হবে সেটা বোধ হয় তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। স্বাধীনতার কামনাকে তিনি উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন, পরাক্রান্ত শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা ভারতে বিদেশী শাসন অব্যাহত থাকবে এইটে ধরে নিয়েই গড়ে উঠেছিল।

সরকারি প্রচেষ্টাতে কোনো নৈতিক বা রাজনৈতিক আপত্তি থাকতে পারে না, যদি সরকার গঠিত হয় জন-প্রতিনিধিদের নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত কার্যনীতিকে যদি আজকালকার ভাষায় একটা 'মডেল' (বা রূপাদর্শ) বলে চিহ্নিত করা যায় তাহলে তার চেহারা হবে এরকম—শিক্ষিত নেতাদের পরিচালনায় গ্রামীণ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা সমবায় প্রথায় চাষ, যথাসম্ভব আধুনিক প্রযুক্তি কুটিরশিল্প ও শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিকে কাম্য অগ্রগতি, সরকারের সাহায্য না নিয়ে। বড়ো শিল্পেরও স্থান ছিল এই মডেলে, যদি এই শিল্পের মালিকানা হয় ভারতীয়। এবং এর সঙ্গে গ্রথিত আছে আর্থিক অসাম্য কমানো। আমাদের আজকালকার পরিকল্পনার সঙ্গে এই 'টেগোর মডেল'-এর কোনো বিরোধ নেই, কিন্তু অসম্পূর্ণতা আছে। দেশব্যাপী ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিদেশী-বাণিজ্য, যান-চলাচল ইত্যাদি সব নিয়েই তৈরি হয়েছে আমাদের বর্তমানের মডেল এবং এতে সরকারি অর্থব্যয় প্রয়োজন হয় বিরাট অঙ্কের। তার ফলে সরকারি নিয়ন্ত্রণও আসে। সরকারি আর বেসরকারি উদ্যোগের সহাবস্থান সংগঠিত আমাদের 'মিশ্র অর্থনীতি' রাশিয়ার ভাবধারাও নিয়েছে, পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশের ভাবধারাও নিয়েছে। 'টেগোর মডেল' ত্যক্ত হবার কথা ওঠে না, কিন্তু এটাকে অধিকতর প্রসারিত মডেলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

আর তাছাড়া আর একটা বড়ো কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ বা মহাত্মা গান্ধি প্রদর্শিত পথের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর তখনই সম্ভব হতে পারে যখন শীর্ষস্থানে সর্বজন-সম্মানিত কোনো মহান নেতা থাকেন। এঁরা দুজনেই যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁদের চারপাশে একটি স্বার্থত্যাগী অনুগামী দল তৈরি করতে পেরেছিলেন। এটা আজ আর সম্ভব হবে না। আদর্শবাদ এখন উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন দার্শনিক-রাজনীতিক যাঁকে সবাই 'মহাত্মা' বলে মনেপ্রাণে স্বীকার করে নিয়েছেন বা একজন কবি-দার্শনিক যাঁকে সবাই 'গুরুদেব' বলে মেনে নিয়েছেন, যাঁরা বিরাট জনসংখ্যায় পিতৃপ্রতিম 'ফাদার-ফিগার', তাঁরা আর বোধ হয় জন্মাবেন না। কিন্তু এঁরা দুজনেই ভারতের অর্থনীতির সমস্যার মূল রূপটি দেখতে পেয়েছিলেন, এবং যদিও একদিক থেকে মনে হবে যে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এখন পরিত্যক্ত, অন্যদিক থেকে গভীরভাবে দেখলে এঁদের চিন্তাধারাতে এখনো অনেক নতুন সব চিন্তার খোরাক পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে কিছু উদ্‌ধৃতি এখানে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু তাঁর বহুব্যাপ্ত প্রবন্ধসংগ্রহে—বিশেষত, স্বদেশ, সমাজ, কালান্তর, পল্লীপ্রকৃতি ইত্যাদি সংকলনে এখনো অনেক অনুন্মোচিত রত্নভাণ্ডার পরবর্তী যুগের গবেষকের অপেক্ষায় আছে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা হয়তো ঘরে বাইরে-তে নিখিলেশের কথায় বা মুক্তধারা-র বিষয়বস্তুতে রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তার কোনো কোনো দিক খুঁজে পাবেন। তাঁরা পড়বেন, 'তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ'। অর্থনীতিবিদের দৃষ্টি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ, উদার দৃষ্টিসম্পন্ন কর্মযোগী কবি সব সমস্যাকে একসঙ্গে এক প্রেক্ষাপটে দেখতে পান। তিনি বলতে পারেন, 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু। চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট'। এরই নাম 'মানব-সম্পদ বিকাশ'। আমরা নামটা নিয়েছি, কিন্তু তার সম্পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করতে পারিনি, কারণ আমাদের দৃষ্টিতে ব্যাপকতা ও গভীরতা দুয়েরই অভাব।

১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬২, পৃ ৬৮৩।

২। তদেব, পৃ ৬৮৮।

৩। তদেব, পৃ ৭০৩, ৭৮০-৯৫।

৪। তদেব, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৬১, পৃ ৩৪৩-৫০। প্রমথ চৌধুরী : রায়তের কথা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ সংস্করণ ১৯৪৪।

৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ ৩২৭।

৬। তদেব, পৃ ৩৩৬।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি, ১৯৩০, পৃ ২৩, ১১৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ ৬৭৮-৭৯, ৬৮৪-৮৫।

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায়নীতি, বিশ্বভারতী, ১৯২৮, পৃ ১৭-১৮।

প্রাচীন ভারতীয় ভাবাদর্শ ও রবীন্দ্রনাথ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

জার্মান পণ্ডিত শ্লেগেল বলেছেন, বিশিষ্ট স্রষ্টা লেখক ও শিল্পী যাঁরা, তাঁদের প্রতিভা বিচারে অন্যের প্রভাব কথাটা আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা সংগত নয়। নানা দেশ জাতি ও কালের চিন্তা এবং আদর্শে তাঁদের মননশীলতার বনিয়াদ গড়ে ওঠে, এ কথা ঠিক। কিন্তু আপন প্রতিভার রহস্যলোকে তাঁরা এই সব বহিরুপাদানকে এমনভাবে ভেঙে-চুরে নতুন করে সৃষ্টি করে নেন যে তা তাঁদের অধিকারে এসে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিসে পরিণত হয়। তখন তার আদি উৎসের সঙ্গে সম্পর্কসূত্র খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

কথাটা তিনি বলেন শেক্‌সপিয়ার সম্বন্ধে। শেক্‌সপিয়ারের বেশির ভাগ বিখ্যাত নাটকই যে তাঁর পূর্বে প্রচলিত থিয়েটারি নাটকের কাঠামো অনুসরণে লেখা, এ সবাই জানেন। শেক্‌সপিয়ার শুধু পুরোনো নাটকের আখ্যানাংশই নেননি, তার পাত্র-পাত্রী ও সংলাপও বহু স্থানে অব্যাহত রেখেছেন। এ ছাড়া প্লুটার্কের জীবনীমালা এবং হলিনশেডের ক্রনিকেল থেকেও তিনি বহু জিনিস গ্রহণ করেছেন, করেছেন বোকেচ্চিওর কাহিনী থেকে। তা সত্ত্বেও কবি হিসাবে, স্রষ্টা হিসাবে শেক্‌সপিয়ারের মৌলিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলতে পারেন কি কেউ? মিলটনও ওলন্দাজ কবি বন্ডেলের লুশিফার কাব্যকাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লেখেন তাঁর প্যারাডাইস লস্ট। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শয়তানের যুদ্ধ এবং শয়তান চরিত্রে দুর্ধর্ষ ব্যক্তিত্ব আরোপ তিনি করেছিলেন ওই কাব্যের প্রভাবেই। তবু মিলটনের মৌলিকতা নিয়েও কোনো দিনও প্রশ্ন ওঠেনি।

রবীন্দ্রনাথের উপর প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনার শুরুতে এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন এইজন্যে যে রবীন্দ্রনাথও যেখান থেকেই বা যা থেকেই প্রভাবিত হন, সব কিছুকেই স্বকীয় প্রতিভার অনুরঞ্জনে রসায়িত করে তিনি নিজের করে নিয়েছেন। কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভায় পরানুকরণের ছায়াপাত হয়েছে, এ কথা বলা যায় না। তবু চলতি আলোচনার ক্ষেত্রে প্রভাবের প্রসঙ্গটি অনুল্লেখযোগ্য নয় এই কারণে যে তার সূত্র ধরে রবীন্দ্রপ্রতিভার গভীরে প্রবেশ সহজসাধ্য হয় অনেকটা। মনে রাখতে হবে স্রষ্টা যত বড়োই হন, তাঁর সৃষ্টি স্বয়ম্ভু নয়। তার শিকড় জাতীয় সংস্কৃতির প্রাণমৃত্তিকায় নিবদ্ধ থাকে। সে মৃত্তিকার পরিচয় না মিললে, প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যে পিতার সাহচর্য থেকে উপনিষদের মর্ম-পরিচয় লাভ করেছিলেন এ তো সুবিদিত ঘটনা। তাঁর সারা জীবনের রচনায় যে আনন্দবাদ, যে অনন্তবাদ, যে বিশ্বমৈত্রীবাদ পরিস্ফুট, তার মূল যে উপনিষদ, এ কথা নিশ্চয় প্রমাণ করতে হবে না। আর যে নির্মুক্ত বিবেক ও করুণার, যে উদার মানবাত্মবাদের প্রচারকরূপে তিনি বিশ্ববিখ্যাত, তা তিনি আহরণ করেছিলেন বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র থেকে, এ-ও সম্ভবত বলে দিতে হবে না। তাঁর মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ বুদ্ধ জীবন ও বৌদ্ধ শাস্ত্র বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর বুদ্ধকথা

নামক এক কালপ্রসিদ্ধ বই-ই তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্রবে অনেক দিন ছিলেন। অনুমান করলে ক্ষতি নেই যে বৌদ্ধ জীবনদর্শনে তাঁর দীক্ষা হয় সত্যেন্দ্রনাথের কাছেই প্রথম। আর যে সর্বস্ব উজাড়-করে-দেওয়া প্রতিদান-কামনাহীন প্রেমের বাণী তাঁর গানে ভাষা পেয়েছে, তা তিনি পেয়েছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ও উত্তর ভারতীয় সন্তদের কাছ থেকে, এ তো বলাই অনাবশ্যক। কম বয়সে লেখা ভানুসিংহের পদাবলী থেকে শুরু করে পরিণত বয়সের গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য পর্যন্ত, সর্বত্র তাঁর প্রেমসংগীতে বৈষ্ণবীয় নতি ও আত্মসমর্পণের বাণী ধ্বনিত হয়েছে। বাউল ও উদাসী সম্প্রদায়ের প্রভাবও অল্প নয় তাঁর রচনায়। জগৎ ও জীবন-রহস্যের ব্যাখ্যানে যে মরমিয়া তত্ত্বকে তিনি বারবার ব্যক্ত করেছেন, তার উৎস নিঃসন্দেহে বাউল-সংস্কৃতি।

জীবন ও মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, এক অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহের লীলারূপে। প্রকৃতিকে দেখেছেন প্রাণসত্তার আধারীভূত এক অনন্ত শক্তিরূপে। প্রেমকে দেখেছেন সীমার বন্ধন থেকে অসীমে যাওয়ার সেতুরূপে। সুখ-দুঃখ হাসি-অশ্রু মিলন-বিরহকে দেখেছেন জীবন-সমুদ্রে ফেনায়িত বিচিত্র ভাবতরঙ্গরূপে। এই যে বিরতিহীন অম্লান অফুরন্তের খেলা, এর পিছনে তিনি উপলব্ধি করেছেন এক লীলাময় জীবন-দেবতার অস্তিত্ব। এই গুহায়িত অনির্বচনীয় প্রাণময়তা, বের্গসঁ যাঁকে বলেছেন এলান ভিটাল, অথবা উপনিষদ যাঁকে সমস্ত জগতাধার ব্রহ্ম বলেছেন, তিনি? এ বিতর্কের সমাধানে শক্তিক্ষয় করে লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ বা তারও বেশি সময় যে ভাববাদী চিন্তা ও জীবন-দর্শনের অনুগামিতা করেছেন, এ তারই অনতিক্রমণীয় প্রতিক্রিয়া, এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ কবিরূপে প্রধানত প্রাণধর্মী ও তথাকথিত অতীন্দ্রিয় রসানুভূতির প্রবক্তা বলে প্রসিদ্ধ হলেও, বাস্তব জীবন ও সংসারকে তিনি কোনো দিন উপেক্ষা করেননি। জগৎ ও জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য-বৈষম্যকেও তিনি সমভাবে লক্ষ করেছেন, সমস্ত আঘাত-সংঘাত ও বিরোধের, সমুদয় ক্ষয়-ক্ষতি ও অপূর্ণতার বেষ্টনী অতিক্রম করেই তিনি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়াস করেছেন। এ থেকেই এসেছে তাঁর বাসনাবিজয়ী আনন্দময় বৈরাগ্যবাদ, যা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্বমৈত্রীবাদে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্যের মধ্যেই মানবতার এই আদর্শ তিনি আহরণ করেছেন হিন্দু সংস্কৃতি থেকে। আবার বাস্তবতাবিমুখ প্রাচ্যদর্শনের বাতাবরণ তিনি সবলে ভেদ করে বস্তুবাদী প্রতীচ্য দর্শনকেও স্বাগত করেছেন। এইখানেই হয়েছে রবীন্দ্রমননে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাব-সম্মেলন।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী যখন প্রথম ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছেছিল, তাঁরা রবীন্দ্রমননের এই দ্বৈত স্বরূপটি ধরতে পারেননি। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করেছিলেন প্রাচ্য সংস্কৃতি ও সাধনার অগ্রপুরোহিতরূপে এবং তাঁর বাণীর মধ্যে মানবমুক্তির নিগূঢ় নির্দেশ আছে মনে করেছিলেন। এর কারণ সুস্পষ্ট। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্ব থেকে বিজ্ঞানের ত্বরিত উন্নতির ফলে ইউরোপের জীবনে এক দিকে যেমন ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অহংকার জমে উঠেছিল, অন্যদিকে তেমনি তার অন্তরের সম্পদ, তার পুরাতন খ্রিষ্টীয় প্রেমধর্ম, তার সহজ প্রত্যয় ও অনাড়ম্বর জীবনবোধ ক্ষয়িত হয়ে একটা ভোগমুখী উত্তেজনা ও অসুস্থতার বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছিল। সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রমত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইউরোপ হারিয়ে ফেলেছিল জীবনের শান্তি ও শ্রেয়মান।

পরিণামে ঘটেছিল সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮), যা সজোরে ঘা দিয়েছিল তার সমাজ ও সংস্কৃতির মূলে। এমন দিনে রবীন্দ্রনাথের বাণী তাঁদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয় একটা কল্যাণ ও শান্তির অনাবিষ্কৃত দুনিয়া। ফলে কবি ও সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মর্যাদাই সেদিন বেশি স্বীকৃতি লাভ করে প্রতীচ্যে।

দেশেও রবীন্দ্রনাথ এর পর থেকেই আচার্য পদবী-ভূষিত হন। কেননা ইউরোপের চোখ দিয়েই তখন আমরা সব কিছুকে, এমনকী ভারতবর্ষকেও দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। এ কথা বলছি এই জন্যে যে এর আগে পর্যন্ত দেশের সনাতনী সমাজ তাঁর লেখায় বিলেতিয়ানার বাড়াবাড়ি আছে বলে ধুয়ো তোলেন। তাঁর কবিতায় গানে অবোধ্যতা ও গল্প উপন্যাসে অশ্লীলতার অভিযোগ তুলে যথেচ্ছ কুৎসাও করতে থাকেন। দেশের জ্ঞানীগুণী ও রসিক সমাজে তাঁর অনুরাগী সেদিনও অনেক ছিলেন, তার আগেও ছিলেন। কিন্তু বৃহৎ একটা গোষ্ঠী এই যে প্রতিকূলতার আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, এতেই প্রমাণ হয় যে রবীন্দ্র-রচনার, অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম তাঁরা ধরতেই পারেননি। তা পারলেন ইউরোপীয় স্বীকৃতির, বিশেষ করে নোবেল প্রাইজ পাবার পর। একান্ত দুঃখের কথা হলেও, এটা সত্য কথা।

এই সূত্রে আর একটা কথারও অবতারণা প্রয়োজন। রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে প্রাচ্য সংস্কৃতির দাবিটা অগ্রগণ্য মনে করা হলেও, রবীন্দ্রনাথ কি ষোল আনাই প্রাচ্য সংস্কৃতির সৃষ্টি? লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রতীচ্যের হিংস্র স্বাজাত্যবাদ ও তার বস্তুমুখী ইহসর্বস্বতাকে কঠিন ভাষায় আক্রমণ করলেও, রবীন্দ্রনাথ তার বৈজ্ঞানিক মনীষাকে, পৌরুষদীপ্ত সজীব প্রাণধর্মকে কোনো দিন অস্বীকার করেননি। এই জন্যেই তাঁর রচনায় প্রতীচ্য বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদ থেকে বের্গসঁর পরম প্রাণবাদ পর্যন্ত যেমন সুস্পষ্ট ছায়া ফেলেছে, তেমনি প্রতীচ্য সাহিত্য ও শিল্পের জাগ্রত জৈব কামনা ও দুর্বার প্রকৃতিপ্রেমের বাণীও অনুরণিত হয়েছে। উপনিষদ বৈষ্ণব কবিতা ও বাউল গানের মতো তাঁর রচনায় ডারউইন হার্বার্ট স্পেন্সার মিল বের্গসঁ ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলি সুইনবার্নকেও অহরহ দেখতে পাওয়া যায়। অহল্যা বসুন্ধরা মানসসুন্দরী উর্বশী চিত্রাঙ্গদা থেকে শুরু করে বলাকা ও মহুয়ার বিখ্যাত কবিতাগুলি পর্যন্ত, রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি স্তরেই প্রতীচ্য দর্শন ও জীবনচিন্তার রূপায়ণ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের চোখে সমভাবেই ধরা পড়বে। বরং এমন কথাও মনে হতে পারে যে প্রতীচ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিলেন বলেই, তাঁর হাত দিয়ে প্রাচ্য জীবনবোধ নতুন ধারায়, নতুন আঙ্গিকে মূর্তি পরিগ্রহ করতে পেরেছিল। কারণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুইয়েরই সুষ্ঠু সমন্বয় হয়েছিল বলেই, তাঁর বাণী এত পূর্ণ ও প্রাণবন্ত হয়ে এ কালের মনকে আকর্ষণ করতে পেরেছে। বিশুদ্ধ ওরিয়েন্টালিস্ট হলে, রবীন্দ্রনাথ এমন সর্বজনগ্রাহ্য হতেন কি না, তা নিয়ে নিশ্চয় সন্দেহের অবকাশ আছে।

কাজেই তাঁর প্রথম বয়সের রচনায় তাঁর সমসাময়িক লেখক ও পাঠকরা যে বৈদেশিকতার প্রাচুর্য দেখে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, তাঁর বেশির ভাগ রচনাকে প্রাচ্য প্রাণধারায় নিষিক্ত বলে মনে করতে পারেননি, এই জন্যে তাঁদের অরসিক বা অতত্ত্বজ্ঞ বলে ধিক্কার দেওয়া চলে না। তাঁরা একটা বহিরূপাদানের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার স্বরূপটা বুঝে উঠতে পারেননি। চিত্রাঙ্গদা বিসর্জন ঘরে-বাইরে গোরা অচলায়তন চতুরঙ্গ প্রভৃতির বিষয়বস্তু নিয়ে এবং এ সবের অন্তর্নিহিত মতবাদ নিয়ে একদিন কী রকম কলহ কোলাহল হয়েছে, বাল্যকালে আমরা তা দেখেছি। তাঁর প্রেম-কবিতার দেহাত্মবাদ নিয়ে, তাঁর শব্দ

গঠনের বিদেশী ঢং নিয়ে, ইউরোপীয় আদর্শে মূক প্রকৃতিতে মানবিক সত্তা আরোপ করে তার উদ্দেশে আবেগ অনুরাগ প্রকাশ নিয়ে হয়েছে তুমুল বাদানুবাদ। আসলে এগুলো যে বৈদেশিক প্রভাব সঞ্জাতই, তবে ভারতীয় মননের জারক রসে আত্মস্থ করে নেওয়া, তা সেদিন অনেকের চোখে ধরা পড়েনি। বলা বাহুল্য এ জন্যে সময়ের প্রয়োজন ছিল। আজ এসেছে সে সময়।

সব শেষে রবীন্দ্রনাথের ভারতেতিহাস ও ভারতীয় সংস্কৃতি ব্যাখ্যান সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে দেখেছেন বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মিলনতীর্থরূপে। ইউরোপের উগ্র ও সংঘাতশীল জাতীয়তাবাদকে তিনি কোনো দিন শ্রেয় বা সমর্থনীয় মনে করেননি। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রদত্ত বক্তৃতায় এই হিংস্র জাতীয়তা ও তজ্জাত যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা স্থান পেয়েছে। তার বিকল্পে তিনি তুলে ধরেছেন ভারতীয় মৈত্রী দর্শন ও সহাবস্থানের আদর্শ। তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষ কোনো দিন রাষ্ট্রগৌরব দিগ্‌বিজয় ও সাম্রাজ্য-বিস্তারকে বা ঐহিক সমৃদ্ধি-অর্জনকে বড়ো করে দেখেনি। তাই অন্যের সম্বন্ধে অপ্রেম অবিশ্বাস বা বৈরিতা তার চিন্তায় স্থান পায়নি। গ্রীক হূণ ইরানি আরব পারসিক ইহুদি ইংরেজ ফরাসি ওলন্দাজ, যিনি যেখানে থেকে এসেছেন, ভারতবর্ষ কারোকেই পর করে রাখেনি। সকলকেই গ্রহণ করেছে এবং তাঁদের যেমন আপন সংস্কৃতির স্তন্যে লালন করেছে, তেমনি তাঁদের সংস্কৃতি থেকে প্রাণরস আহরণ করে নিজেও পুষ্ট হয়েছে। এই সমন্বয়বোধই হল রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ রূপ এবং এখানেই পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার মৌল পার্থক্য।

বলা অনাবশ্যক যে এ ব্যাখ্যা ভারতীয় সংস্কৃতির একটা দিকের পরিচয় মাত্র উদ্‌ঘাটিত করে এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথের এই জীবনদর্শনই দেশবিদেশে সর্বাধিক প্রচারিত হয়েছে, তাই এই মতবাদের আলোতেই তাঁর সমস্ত রচনাকে বোঝার ও বোঝানোর প্রয়াস হয়ে থাকে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা যে অসম্পূর্ণ বা ঐকদেশিক, তা স্বীকার করতেই হবে। সবাই জানেন, ভারতবর্ষের শাক্ত শৈব অধ্যুষিত সুপ্রাচীন দ্রাবিড়সভ্যতা একদিন বৈদিক আর্যদের অভিযানে বিধ্বস্ত হয় এবং সেই সভ্যতার অধিকারী জাতিগোষ্ঠীগুলি আপন আপন শিক্ষা সংস্কৃতির ঐশ্বর্য নিয়ে পূর্বে ও দক্ষিণে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন, আর পলায়নে অশক্তেরা শিক্ষা সংস্কৃতি ও সামাজিক অধিকার-বঞ্চিত শূদ্র বা দাস জাতিতে পরিণত হন। এই নিগৃহীত শূদ্রজাতির ঘৃণা ও অসন্তোষ একদিন বৌদ্ধ বিপ্লবের মধ্যে প্রকাশমান হয়ে বেদ ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রমের মূলে কঠিন আঘাত হানে, আর তথাকথিত অনুন্নতদের জন্যে উন্মুক্ত করে সামাজিক সাম্যের দরজা। কুমারিল ভট্ট ও শংকরের নেতৃত্বে পরিচালিত বর্ণ-হিন্দু পুনরুত্থানের আন্দোলনে এই সাম্যের সংগঠন ভেঙে পড়ে এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুরা আবার সেই অস্পৃশ্য শূদ্রে পরিণত হন। এই অবনমিত হিন্দুর আক্রোশই তারপর নবাগত ইসলামকে আমন্ত্রণ জানায় এবং তাঁরা দলে দলে মুসলমান হন। মুসলিম শাসকদের ভেদনীতি কোনো দিন হিন্দুমুসলমানে যথার্থ ঐক্য হতে দেয়নি। তার ফলে তৈরি হয় ইংরেজ শাসনের পটভূমি, যা শেষ হয় ভারত ও পাকিস্তান দুই অংশে দেশ ভাগ করে। পাকিস্তান তারপর আবার ভাগ হয় বাংলাদেশের উদ্‌ভবে।

এই কমবেশি চার হাজার বছরের ইতিহাসে সত্যকার সমন্বয় বা সহাবস্থান যদি সম্ভব হত কোনো অধ্যায়ে, তা হলে জাতিভেদ, অধিকার-ভেদ, ব্যক্তিমানুষের মর্যাদা ও মূল্যমানের

অস্বীকৃতি ভারতের সমাজজীবনকে এতখানি বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল ও দুর্বল করত না। এমনভাবে দফায় দফায় বৈদেশিক আক্রমণ ও শোষণকে অনায়াসসাধ্যও করে তুলত না। অর্থাৎ সর্বস্তরের জীবনে সমন্বয় মৈত্রী ও প্রেমধর্মের ব্যাপ্তি হয়নি। দুই-তৃতীয়াংশ দেশ অন্ধকারে হাবুডুবু খেয়েছে, খুব অল্প একটা অংশে জ্বলেছে জ্ঞান বিবেক ও মনুষ্যত্বের আলো। সেটুকু মিথ্যা হয়তো নয়, কিন্তু তা গোটা দেশ ও জাতির সামগ্রিক পরিচয় বহন করে না। এই আলোটুকুকেই মহিমান্বিত করে দেখা ও দেখানো হয়। রবীন্দ্রনাথের ভারতব্যাখ্যাও সেই ধারা ধরে চলেছে। এই জন্যেই তথাকথিত তপোবন-সভ্যতাকে তিনি অত উজ্জ্বল ও অনবদ্য করে এঁকেছেন। শুধু আঁকা নয়, বাস্তবে তপোবনের আদর্শে তিনি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যা কালক্রমে বিবর্তিত হয়েছে বিশ্বভারতীতে।

আসলে তপোবন সভ্যতা এবং ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস মানবজীবনের জন্যে ব্যবস্থিত এই চতুরাশ্রম রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদিতে প্রকীর্তিত কবিকল্পনা মাত্র। এই মনোহর কবিকল্পনাকে রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্যের সামনে নতুন জীবনদর্শনরূপে তুলে ধরার জন্যে আপন চিন্তা ও রচনার মধ্যে স্থান দেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ভারতকে তিনি চেনেননি, এ কথা সত্য নয়। তার বাস্তব সংস্থিতির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় কম ছিল না। যে ভারতবর্ষে শত শত বৎসর ধরে মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হয়েছে, যুক্তির চেয়ে সংস্কার যেখানে প্রাধান্য নিয়েছে, বৈধতার চেয়ে বিধি যেখানে সর্বগ্রাসী প্রভুত্ব লাভ করেছে, দারিদ্র্য অশিক্ষা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অস্তিমান ও নাস্তিমানে দুস্তর ব্যবধান-বিড়ম্বিত সেই ভারতবর্ষকে তিনি যথেষ্ট চিনেছেন। তাকে ভেঙে নতুন করে গড়ার আদর্শও দিয়েছেন। এই জায়গায় রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর আসন এক পঙ্‌ক্তিতে সুচিহ্নিত। স্রষ্টা ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মতো এই সংস্কারক রূপটাও তাঁর কম গণনীয় নয়। দুঃখের বিষয় শুধু সমন্বয়বাদ মরমিয়াবাদ ও বিশ্বমৈত্রীর উদ্‌গাতারূপেই প্রতীচ্য তাঁকে গ্রহণ করেছে। দেশের মানুষও করেছেন তারই প্রতিধ্বনি। আর একটা দিক যা তিনি বাইরে ইচ্ছা করেই উদ্‌ঘাটিত করেননি, ঘরেও তা অনুদ্‌ঘাটিত থেকে গেছে আমাদের অবিবেচনায়। আজ তা সংশোধনের দিন এসেছে।

নবজাগরণ প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ

নরহরি কবিরাজ

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায়, ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে একটি নতুন ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

এই নতুন শ্রেণীর উদ্ভবের তাৎপর্য মার্কসের চোখে ধরা পড়েছিল। তিনি লিখেছেন—"কলকাতায়, ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে, অনিচ্ছা সহকারেও স্বল্পপরিমাণে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইওরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত।" (ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল।)

হিন্দু কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অনুমোদিত কলেজগুলি থেকে বেরুতে লাগল একদল ইংরেজি শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট। পারিবারিক সূত্রে এঁরা অধিকাংশই তদানীন্তন সমাজের উপরতলা থেকে এসেছিলেন। এঁরা ছিলেন 'স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্ত' এই অর্থে যে ইংরেজরা তাঁদের শিক্ষার যে নিয়ন্ত্রিত সিলেবাস স্থির করেছিল তার চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই তাঁদের অগ্রসর হতে হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক দেশের রুদ্ধ পরিবেশে, সীমাবদ্ধ আকারে হলেও এঁরাই ইউরোপীয় রেনেশাঁস, রিফরমেশন, এনলাইটেনমেন্টের চিন্তাধারার সঙ্গে দেশবাসীকে পরিচিত করলেন। ইউরোপীয় চিন্তায় সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের, নতুন বুর্জোয়া জীবনধারা গড়ে তোলার যে সংকল্প ছিল সেটি এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সংক্রামিত হল। এর প্রভাবে তাদের মধ্যে জাগল একদিকে নিজ দেশের সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসন সম্পর্কে সুতীব্র ঘৃণা, অপরদিকে ইউরোপীয় চিন্তায় উদ্দীপ্ত, নতুন ধরনের জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা।

এই নতুন যুগধর্মের আলোকে তাঁরা বিচার করলেন সতীপ্রথা, কৌলীন্যপ্রথা, জাতিভেদপ্রথা প্রভৃতি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আরম্ভ করলেন এই ধরনের সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনগুলির বিরুদ্ধে সাহসী আন্দোলন। নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবি, বিজ্ঞান শিক্ষার দাবি, মাতৃভাষার উন্নতিবিধান—এইগুলির মধ্য দিয়ে আরম্ভ হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনার প্রাথমিক অভিব্যক্তি।

এর পাশাপাশি চলল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি থেকে দেশকে নতুন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা ; ইংরেজ শাসন বিদেশী শাসন, ভারত পরাধীন দেশ—এই অনুভূতি। ধীরে ধীরে ভারতকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে এগোতে হবে—ভারতের জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হবে : পুরানো সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা নয়, ইউরোপের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নতুন ধরনের স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা।

সমগ্রভাবে বিচার করলে, এই ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী আমাদের মতো পরাধীন দেশের মাটিতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি গড়তে সাহায্য করল। এইখানেই এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

বুর্জোয়া শ্রেণীর যখন আবির্ভাব ঘটেনি, সেই সময়ে আমাদের দেশে নতুন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্‌বোধন করলেন এঁরাই। ফলে এই আন্দোলন হয়ে রইল অপরিণত, নানা স্ববিরোধিতায় আচ্ছন্ন।

ভারতকে শোষণ করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসন আধুনিকতার যে উপকরণগুলি (স্টিম এঞ্জিন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ, সংবাদপত্র প্রভৃতি) ছড়িয়ে দিল, ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার সুফলগুলি আয়ত্ত করার জন্যে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

এই গোষ্ঠীর নেতারা ভৌগোলিক আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পবিপ্লব প্রভৃতির সুফলগুলিকে আকণ্ঠ পান করতে চাইলেন। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যাপ্রসূত জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বিশেষভাবে অনুভব করলেন। স্টিমএঞ্জিন, রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত কৃৎকৌশলগত জ্ঞান আহরণে তাঁরা আগ্রহী হলেন। বিজ্ঞানকে সামাজিক প্রয়োজনে ব্যবহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁরা অবহিত হলেন, প্রকৃতপক্ষে এই বিজ্ঞান-সচেতনতা বাংলার জাগরণের সবচেয়ে বড়ো ইতিবাচক দিক।

রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে যে চিঠি লেখেন (১৮২৩) তাতে এই বিজ্ঞান-সচেতনতা খুবই স্পষ্ট। রামমোহন লিখলেন—"এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা যদি গবর্নমেন্টের আকাঙক্ষা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎপরিবর্তে এদেশীয়দিগের উন্নতি-বিধান যখন গবর্নমেন্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষাবিষয়ে উন্নত ও উদার নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যারা অপরাপর বিষয়ের সহিত গণিত, জড় ও জীববিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থান-বিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।"

এই বিজ্ঞান-সচেতনতা 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতে স্টিম এঞ্জিনের প্রবর্তনকে তাঁরা বিশেষভাবে স্বাগত জানান। বর্ধমান রাজমহল ও পালামৌ অঞ্চলে কয়লাখনি আবিষ্কারকে (১৮৩৮) তাঁরা অভিনন্দন জানান। 'মেডিক্যাল কলেজ' (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৩৫) শরীরবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারে যে বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে আরম্ভ করেছিল তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে তাঁরা মন্তব্য করলেন—এই প্রতিষ্ঠানটি দেশবাসীর মধ্যে শরীরবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রসারে সাহায্য করছে—এটি চিহ্নিত করছে মান্ধাতার আমলের কুসংস্কারের জায়গায় মুক্তি ও জ্ঞানের জয়যাত্রা।

অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বিজ্ঞান-সচেতনতা প্রচারে এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় বিজ্ঞান-বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সম্পর্কে তাঁর সুতীব্র কৌতূহল বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেন নিজস্ব অনবদ্য ভঙ্গিতে। তিনি লিখলেন, "আমাদের দেশের মঙ্গল হইতেছে। কী মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লৌহ-বর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ একদিনে যাইতেছে। ঐ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গমালায় দিগ্‌গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণী ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া

বাণিজ্যদ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে—বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রিমধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলে, যে রোগ পূর্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাস ছিল। ঐ যে দেখিতেছ রাজপথ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ঐস্থানে সন্ধ্যার পর কাদার পিছলে পা-ভাঙিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিতে, এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটিচন্দ্র জ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাঁড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে কাঁথা, ছেঁড়া সপ ছিল, এখন সেখানে কার্পেট, কোঁচ, ঝাড়, ক্যান্ডেলাব্রা, মারবেল, আমবেস্টার—কত বলিব? যে বা যাহারা—দূরবীন করিয়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জন্মিলে উনি এতদিন চাল-কলা ধূপ-দীপ দিয়া বৃহস্পতির পূজা করিতেন। আর আমি হতভাগ্য চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ-কাগজে 'বঙ্গদর্শনের' জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, এক শত বৎসর পূর্বে হইলে আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া তুলট নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কিনা, সেই কচ্‌কচিতে মাথা ধরাইতাম। তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় মঙ্গল, তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর"। (বঙ্গদেশের কৃষক)।

এই বিজ্ঞান-সচেনতা বাংলার জাগরণের নেতাদের নতুন ধরনের এক সমাজ-চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করল। তাঁরা বুঝতে শিখলেন—প্রকৃতির 'লীলাখেলা'কে যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনি মানব-সমাজের উত্থান, বিকাশ ও অগ্রগতির এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব। তদানীন্তন কালের সর্বাধুনিক বুর্জোয়া জীবনদর্শনের মধ্যে তাঁরা যুগধর্মের ইঙ্গিত লক্ষ করলেন। যুগধর্মকে গ্রহণ করার মধ্যেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির চাবিকাঠি রয়েছে—বাংলার জাগরণের নেতাদের মনে এই বিষয়ে গভীর প্রত্যয় জন্মেছিল।

যুগধর্মের প্রতি আকর্ষণ রামমোহন চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পতন, ধনতন্ত্রের উদ্ভব, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা—এই বিষয়গুলি রামমোহনের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আধুনিকতা বিদ্যাসাগর চরিত্রেরও সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগর মনে করতেন—ইউরোপের আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে গভীর পরিচয়—ভারতের পুনরুজ্জীবনের জন্যে একান্ত আবশ্যক। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারজনিত জড়তা যা ভারতবাসীর জীবনের গতি রুদ্ধ করে রেখেছিল তাকে উপড়ে ফেলে দিতে কৃতসংকল্প ছিলেন। তিনি বলতেন—ইংরেজ জাতির কাছে থেকে ভারতবাসীর শিক্ষার অনেক কিছু আছে—যেমন, নিয়মানুবর্তিতা, সত্যনিষ্ঠা, কর্মোদ্যোগ প্রভৃতি।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ও এই আধুনিকতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল।

'সোমপ্রকাশে'র পাতায় (২১ পৌষ, ১২৮১) ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ অনুসরণ করে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি ও আমেরিকা যে বিপুল বৈষয়িক উন্নতিসাধন করেছে তার প্রতি বার বার দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। লেখা হল—ইউরোপীয় কায়দায় যন্ত্রচালিত শিল্প প্রবর্তন, মূলধন নিয়োগ ও তৎসম্পর্কিত কৃৎকৌশল অর্জন—এগুলি থেকে

আমাদের শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। দেশীয় ধনিকদের প্রতি আবেদন জানানো হল—আপনারা নিজেদের গচ্ছিত মূলধন আধুনিক শিল্পে (কাপড়ের কল, কয়লাখনি, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি) বিনিয়োগ করুন এবং এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা সৃষ্টির কাজে অগ্রসর হোন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতায় পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে (ফ্রান্স, রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি), জমিতে কৃষকের স্বত্ব প্রতিষ্ঠার নীতির (Peasant proprietorship) ভিত্তিতে যেভাবে কৃষক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে তার প্রতিও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে—এটিই আমাদের দেশেও কৃষক সমস্যা সমাধানে প্রকৃষ্ট পথ। লক্ষণীয় যে, জমিতে রায়তের স্বত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি কেন্দ্রস্থলে রেখে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুস্তকের পর পুস্তক রচিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে বঙ্কিমের 'বঙ্গদেশের কৃষক', সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গল রায়ত', রমেশচন্দ্র দত্তের 'দি পেজান্ট্রি অব বেঙ্গল', অভয়চরণ দাসের 'দি ইন্ডিয়ান রায়ত' প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন বঙ্কিম কর্তৃক সোশ্যালিজম, কমিউনিজম প্রভৃতি কথাগুলির উল্লেখ একটি আকস্মিক ব্যাপার নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে—ইউরোপে ১৮৪৮ খ্রিঃ বিপ্লবের পরের বছরগুলিতে—এই সব মতবাদের প্রচার আরম্ভ হয়। আমাদের দেশে সমসাময়িক কালের সংবাদপত্রগুলিতে ইংলন্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন, ফ্রান্সে সদ্য গজিয়ে-ওঠা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, রাশিয়ার নিহিলিস্ট আন্দোলন, আয়ার্ল্যান্ডের ফেবিয়ান আন্দোলন, এমনকী 'ইন্টারন্যাশনাল' সম্পর্কে মাঝে মাঝে সংবাদ প্রকাশিত হত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের পাতায় এই সমস্ত মতবাদ সম্পর্কে মন্তব্যও প্রকাশিত হত। কেউ কেউ এই সব মতবাদের মধ্যে যে একটি ভালো দিক (সমানাধিকারের দিক) আছে সেটি স্বীকার করতেন। যেমন 'সোমপ্রকাশ' প্যারি কমিউন, 'আন্তর্জাতিক', প্রভৃতি সম্পর্কে শুধু সংবাদ পরিবেশন করেছে তাই নয়, কমিউনিস্ট মতবাদের আদর্শগত দিকটির উচ্চপ্রশংসা করার পর মন্তব্য করেছে—এই মত বর্তমানে কার্যকর করা সম্ভব নয়, 'এ অবস্থায় আসিতে জগতের এখনও অনেক সময় লাগিবে'।

বাংলার জাগরণের এই দুটি দিক—এই দুটি দিক—বিজ্ঞান-সচেতনতা ও আধুনিকতা—রবীন্দ্রনাথের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এই বিজ্ঞান-সচেতনতা রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি লিখেছেন—"বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে, সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে। আজ সেই পরম যুগের আহ্বান এসেছে। আজ মানুষকে বলতে হবে, 'তোমার এ শক্তি অক্ষয় হোক ; কর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হোক'।" (পল্লীপ্রকৃতি)।

রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বও তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল এই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই। রামমোহনের কর্মকাণ্ডকে তিনি অভিনন্দন জানালেন এই বলে যে—"নবযুগের প্রথম প্রবর্তক রামমোহন রায় ... তিনি যে পশ্চিমকে দেখতে পেয়েছিলেন সে তো শস্ত্রধারী পশ্চিম নয়, বাণিজ্যজীবী পশ্চিম নয়, সে হচ্ছে জ্ঞানে-প্রাণে উদ্‌ভাসিত পশ্চিম।"

বিদ্যাসাগর চরিত্রও তিনি এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করেছেন। তিনি লিখেছেন—বিদ্যাসাগর মহাশয় "আচারের যে হৃদয়হীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে মেরেছে, রক্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে দেবতা বলে মানেননি, তাকে

আঘাত করেছেন।" বিদ্যাসাগর চরিত্র রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল এই কারণে যে "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করে, এই দেশেরই একজন ...নবীনের বিদ্রোহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।" রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—'তার (বিদ্যাসাগরের) নবীনতাই আমার কাছে সবচেয়ে পূজনীয়।'

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পরাধীন দেশের কবি। পরাধীন ভারতে রবীন্দ্রনাথের জীবনারম্ভ, পরাধীন ভারতেই এই জীবনযজ্ঞের সমাপ্তি। তাই পরাধীনতার চেতনা, পরাধীনতার জ্বালা রবীন্দ্রমানসের একটা মস্ত দিক জুড়ে ছিল।

তিনি মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হননি যে ভারতের শত্রু একটি নয়, দুটি ; একটি ভিতরের, আর একটি বাইরের। তিনি বিশ্বাস করতেন—শুধু ইংরেজকেই তাড়ালে ভারতের মুক্তি আসবে না। দেশের ভিতর থেকে তিলে তিলে যে শক্তিটি দেশের ঐক্য, দেশের সংহতি, দেশের প্রাণশক্তিকে পিষে মারার চেষ্টা করছে সেই শক্তিকে নির্মূল করতে না পারলে দেশের মুক্তি সম্ভব নয়।

গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনকে—বিশেষ করে তার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে তীব্রভাবে কষাঘাত করেছেন।

গ্রামাঞ্চলের লোকেদের অজ্ঞতা, সংস্কার, ভীরুতা দেখে গোরার মনের ভিতরে ভারতীয় আচার-ব্যবস্থার প্রতি বিরূপতা জেগেছিল। গোরা তাই আক্ষেপের সুরে বলতে বাধ্য হয়েছিল—"সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে রেখেছে। দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, হাঁচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ—ভয় যে কত তার ঠিকানা নেই।—জগতে সত্যের সঙ্গে কী রকম পৌরুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তা এরা জানবে কী করে।"

রবীন্দ্রনাথের গোরা সাম্প্রদায়িকতা-গন্ধহীন মানবতাবাদের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল। আচারের আবর্জনা নয় ; হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা নয় ; ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়িকতা নয় ; আচারের আবর্জনা ভেদ করে, সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করে গোরা মানুষকে সর্বোচ্চ আসনে বসাবার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল।

দেশপ্রেম ও বন্ধনমুক্তি ছাড়া রবীন্দ্রচিন্তায় আরও একটি দিক বড়ো হয়ে উঠেছে, সেইটি বিশ্বদৃষ্টির দিক।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন যে দেশের স্বাধীনতা যেমন সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তেমনি দেশের চিন্তার সঙ্গে বিশ্বচিন্তার যোগ থাকা চাই। তিনি তাই বললেন—"আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।" (ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা)।

তাই তিনি জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে—'স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্য রূপে পাওয়া যায়।'

বলাই বাহুল্য, পরাধীন দেশের মানুষের দৃষ্টি থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে দেখেছিলেন। তাই ইউরোপে জাতীয়তাবাদের আবরণে যে জাতীয় মদমত্ততার উদ্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তাকে উচ্চকণ্ঠে নিন্দা করেছেন। 'My country, right or wrong'—এই ধরনের চিন্তার তিনি মুখোশ উন্মোচন করেছেন তাঁর 'ন্যাশনালিজম' নামক গ্রন্থে।

এই জাতীয়তাবাদের আবরণেই ইংলন্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মুনাফা-শিকারিরা পৃথিবীতে উপনিবেশবাদের চেহারাটি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টিতে উপনিবেশবাদীদের এই কারসাজি ধরা পড়ে গিয়েছিল। তিনি তাই লিখেছেন—"একদা য়ুরোপ হতে বণিকের পণ্যতরী যখন পূর্ব মহাদেশের ঘাটে ঘাটে পাড়ি জমালে তখন থেকে পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাসে এক নতুন পর্ব ক্রমশ অভিব্যক্ত হয়ে উঠল।"

"...এই লাভের মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে যখন ছড়াতে লাগল তখন দূরবাস অনাত্মীয়, যারা নির্ধন, তাদের আর উপায় রইল না—চীনকে খেতে হল আফিম ; ভারতকে উজাড় করতে হল তার নিজস্ব ; আফ্রিকা চিরদিন পীড়িত, তার পীড়া বেড়ে চলল।"

বিশ্ব ধনবাদী ব্যবস্থার সংস্পর্শে এসে শুধু এশিয়া ও আফ্রিকাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা নয়। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের ধনবাদী দেশগুলির ভিতরেও দেখেছিলেন ক্ষয়িষ্ণুতার অসংখ্য চিহ্ন, তাই ইউরোপের দেশগুলির অভ্যন্তরীণ চিত্রটি তুলে ধরে তিনি মন্তব্য করলেন—"সেখানে প্রভুর দলে, দাসের দলে, ভোগীর দলে, অভুক্তের দলে—সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করে সমাজদেহে প্রাণপ্রবাহের সঞ্চরণকে অবরুদ্ধ করেছে।"

পশ্চিম পরিভ্রমণের পরে আক্ষেপের সুরে তিনি তাই বলেছিলেন—"পশ্চিমের দেশ-বিদেশ হতে এত দুঃখ আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে ভিতর থেকে—এ রকম চিত্র যে আমি দেখব মনে করিনি।"

তাঁর মনে পশ্চিমের ধনবাদী সভ্যতা সম্পর্কে যখন প্রশ্ন উপস্থিত হয়েছে ঠিক সেই সময়েই তিনি রাশিয়া ভ্রমণে যান। রাশিয়া ভ্রমণের পর রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার যে রূপান্তর দেখা দেয় তার প্রতি তিনি অভিনন্দন জানান। সোভিয়েত বিপ্লবের কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—"যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত ও প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে, এই সোভিয়েত বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে ; এত বড়ো বন্ধনজর্জর জাতিকে এত অল্পকালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়।" (রাশিয়ার চিঠি)। সোভিয়েত রাজনীতি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—'সেখানকার পলিটিক্স মুনাফালোলুপদের লোভের দ্বারা কলুষিত নয়।' এই বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য অনুধাবন করে তিনি আরও মন্তব্য করেছিলেন—ফরাসী বিপ্লবের মত 'এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।'

বস্তুত, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের অনেক দুর্বলতার দিক ছিল। এটি ছিল অনেক দিক থেকে খণ্ডিত, এমনকী অর্ধসমাপ্ত। যা ছিল অসম্পূর্ণ তাকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার জন্যে, খণ্ডিতকে সমগ্রতায় ভরিয়ে তোলার জন্য, রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রতিভাকে উৎসর্গ করেছিলেন। বাংলার নবজাগরণের তরঙ্গশীর্ষে যে রবীন্দ্রযুগের আবির্ভাব ঘটেছিল তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে নবজাগরণের সার্থকতা।

রবীন্দ্র-চিত্তে বিজ্ঞানের সক্রিয় পদক্ষেপ

ক্ষুদিরাম দাস

রবীন্দ্রনাথ নিসর্গ ও মানুষের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে আমাদের মানসলোক সম্পূর্ণ অধিকার করেছেন, আধুনিক বিশ্বে বাংলার তথা ভারতের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু তিনি যে নিতান্ত আত্মমগ্ন কবি ছিলেন না, স্বদেশে ও বাইরের পৃথিবীতে ছোটোবড়ো যেসব ঘটনা মানুষের সমাজমূর্তি বদলে দিচ্ছে তার প্রতি যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি তাঁর দীর্ঘ আয়ুষ্কালে যেসব উল্লেখ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটেছে—যা জীবজগৎ, বস্তুপৃথিবী ও মহাকাশকে একসূত্রে গেঁথে তুলেছে—মহাবিস্ময়ে তা লক্ষ করেছেন, তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন অজস্র গানে, কবিতায় ও প্রবন্ধে। আমাদের মহাকবি স্বয়ং বিজ্ঞানী না হলেও খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকেরা পুনঃপুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে এবং গণিতের সূক্ষ্ম গণনায় প্রাণ ও প্রাণী, পৃথিবী ও মহাকাশ, গতি ও পরিবর্তনের যেসব রূপরেখা চিত্রিত করেছেন তাতে তিনি গভীর আস্থা রেখেছেন আর তারই অনুপ্রেরণায় হয়ে উঠেছেন নতুনতর কল্পনার পথিক। বিজ্ঞান-সখা কবির ঐসব নব নব কল্পনায় আমরা ক্রমাগতই অভিভূত হয়েছি। বিজ্ঞানের সত্যকে সাহিত্যিক সত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশিয়ে পাঠক সাধারণের মানসিক আনন্দের পরিধি এমনভাবে প্রসারিত করে তোলা যায় তা রবীন্দ্রনাথই বিশেষভাবে প্রমাণ করলেন। তাঁর এই বিশিষ্ট অবদানের বিষয়টিই আমরা তুলে ধরতে চাই।

কবির বয়স যখন দশ, গৃহশিক্ষক কৌতূহলী বালককে হাতে-কলম বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে জল গরম করলে তা উপরে ওঠে, আর ঠাণ্ডা জল নিচে নেমে যায় এবং তার ফলেই সশব্দ আলোড়ন ঘটে। আরও সেইসঙ্গে অনেক প্রাথমিক প্রকৃতি-কথা। কিন্তু জল ও মাটির স্পর্শে শুকনো বীজ থেকে কেন ও কীভাবে অঙ্কুর গজায় সে কৌতূহল বালকচিত্তে বহুদিনই ছিল। এ তাঁর অজানার প্রতি চিরবিস্ময়ের একটি অংশ যার আভাস লেগেছে যৌবনে লেখা 'বসুন্ধরা' কবিতায় :

> সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
> সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
> তোমার মৃত্তিকা-মাঝে কেমনে শিহরি
> উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর!

ক্রমশ বিজ্ঞানের দীক্ষায় কবির এ বিস্ময় কতকটা নিবৃত্ত হয়েছে বটে, কিন্তু আরও গভীরতর, আরও অজানা রহস্য তাঁর চিত্ত অধিকার করেছে এবং বিজ্ঞানের সহায়তায় তা মোচন করতে করতে চলেছেন শেষ দিন পর্যন্ত।

গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য ও রাশিচক্র নিয়ে যে জ্যোতির্বিজ্ঞান তার সঙ্গে কবির প্রাথমিক পরিচয় ঘটে পিতৃদত্ত শিক্ষণে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

"বয়স তখন হয়তো বারো হবে, পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ডালহৌসি পাহাড়ে। ...তিনি চৌকি আনিয়ে বসতেন। দেখতে দেখতে গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিষয় জানিয়ে যেতেন।"

বিজ্ঞানের যে শাখা কবিকে সব থেকে বেশি অভিভূত ও অনুসন্ধানী করে তুলেছিল তা হল এই জ্যোতির্বিজ্ঞান, আজকে যার সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক আখ্যা হল নভোবস্তু-বিজ্ঞান অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। একই সূত্রে পরে পরে কবিকে বিচলিত করেছে পৃথিবীর রহস্য অর্থাৎ ভূবিজ্ঞান এবং চৈতন্যময় প্রাণরহস্য বা প্রাণবিজ্ঞান।

গ্যাস-ধূলি-সমাকীর্ণ ছোটোবড়ো-নক্ষত্রখচিত ছায়াপথ থেকে অগ্নিবাষ্পময় সূর্যের এবং সূর্যদেহ থেকে একই ধরনের পৃথিবীর উৎপত্তি প্রায় পাঁচশ কোটি বছর আগে ঘটেছে। ক্রমে ছিটকে-পড়া পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে থাকল, দেহ হল জমাট দগ্ধ প্রস্তরতুল্য, আরও কোটি কোটি বছর পরে ঘূর্ণমান পৃথিবীর গ্যাসীয় আবরণে সংহত হতে থাকল নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড। মূল হাইড্রোজেন স্পর্শে হল বারিবর্ষণ, এল জল। এবার চলল জলে স্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তখনও স্থলে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেনি। ঘটল অনেক অনেক পরে, আজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। প্রথমে সামুদ্রিক গুল্ম, পরে স্থলজ ঘাস ঝোপ। তার পরের অধ্যায়ে এল প্রাণের বিস্ময়। শৈবালজাতীয় তরলকোষী জীব, শামুক, বিষাক্ত কীট, অমেরুদণ্ডী, তারপর মেরুদণ্ডী। এর মধ্যেকার পৃথিবী ভয়ংকরী। অগ্ন্যুৎপাতে জলোচ্ছ্বাসে, বিষাক্ত কীট সরীসৃপ ও বিপুলদেহী উভচর প্রাণীর আস্ফালনে পৃথিবীর অরণ্য-মরুভূমি-সমুদ্র-তুষার তখন বিক্ষুব্ধ। এইভাবে কাটল আরও বহু কোটি বছর। জল-স্থল-অরণ্য-পর্বতবেষ্টিত ধরিত্রী ক্রমে শান্ত হয়ে এল। পরিশেষে এল আদি মানুষ ও বর্তমান মানুষ অনুকূল পরিস্থিতিতে। সে প্রায় দশ লক্ষ বছরের কথা।

কবি বিজ্ঞান-কাহিনী থেকে এই অভিব্যক্তির স্তরগুলি মনে গেঁথে রেখে কাব্যাকারে প্রকাশ করেছেন নানান স্থানে—যখনই পৃথিবীর বিষয় তাঁকে বলতে হয়েছে। বত্রিশ বছর বয়সে লেখা একটি কবিতায় পুরাতনী এই ধরিত্রীর বিষাদমূর্তি কল্পনা করে কবি লিখলেন :

ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ননিমেষে
কত যুগ-যুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীব-জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্যনীহারিকা,
তার পরে প্রজ্জ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ। (সন্ধ্যা)

ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে জলে-স্থলে রেষারেষির ও মুহুর্মুহু ভূমিকম্পের বর্ণনার সঙ্গে সমকালীন একটি কবিতাতেও সমুদ্র-বর্ণনায় কবি জানাচ্ছেন—হে আদি-জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার। কল্পনায় কবি চলে গেছেন সেই আদিম অবস্থায় যখন বিশাল জলরাশি সমুচ্ছ্বসিত হচ্ছে পাষাণময়ী পৃথিবীর উপর, আর তারই জঠরে সম্ভাব্য জীব-কণিকার রূপে তিনি নিজে রয়েছেন সুপ্ত হয়ে। তাই সমুদ্র-দর্শনে তাঁর সেই আদিম আত্মীয়তার কথাই মনে পড়েছে। ভূবিজ্ঞান স্পর্শ করে কবির এই আশ্চর্য কল্পনা ধরা দিয়েছে এইভাবে :

মনে হয়, যেন মনে পড়ে,
যখন বিলীনভাবে ছিনু ঐ বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে।

আদিম দিনের ভূকম্পের পরিচয় দিলেন পাললিক ও আগ্নেয় শিলাময় হিমালয়ের উদ্ভবের একটি ছবি কল্পনায় দেখে :

হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দম অগ্নিতাপ-বেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে

—ইত্যাদি। পৃথিবীর সৃষ্টি ও বিকাশের বিজ্ঞান-চিন্তিত ধারার স্বীকরণেই অবশেষে শোনালেন নিজ অভিব্যক্তির অপূর্ব পরিচয় :

গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে
পথের চিহ্ন এলেম এঁকে
কত যে লোক-লোকান্তরের
অরণ্যে পর্বতে।

অভিব্যক্তির ইতিবৃত্ত মনে রেখে পৃথিবীর আদিম রূপ আরও স্পষ্টাক্ষরে চিহ্নিত করলেন শেষ জীবনে লেখা 'পৃথিবী' কবিতায় :

তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয় ;
সে পুরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশলবর্জিত ;
গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত ;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।
জড় রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের 'পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা।
দেবতা এলেন পরযুগে—
মন্ত্র পড়লেন দানবদলনের,
জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত ;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানপ্রীতির উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুসম্পর্ক স্থাপন। জগদীশচন্দ্র সেই সবে লন্ডন থেকে ফিরেছেন তাঁর বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গের সাহায্যে বিনা-তারে বার্তা প্াঠনোর গবেষণা সমাপ্ত করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গৃহে গিয়ে দেখতে না পেয়ে টেবিলে ম্যাগনোলিয়া-গুচ্ছ ও কয়েক ছত্র লেখা রেখে ফিরে আসেন। এই বন্ধুত্বের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাঁইত্রিশ, জগদীশচন্দ্রের চল্লিশ। জগদীশচন্দ্র দ্রুত লন্ডনে ফিরে যান। লক্ষ্য—বাহির থেকে দেওয়া কোনো উত্তেজনায়, কেবল বৃক্ষলতাই নয়, জড়বস্তুও সমানভাবে সাড়া দেয় এটি প্রমাণ করা। আচার্যের এই আশ্চর্য আবিষ্কার ইংল্যান্ড ও প্যারিসকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে অভিভূত করে এবং পত্র-পত্রিকায় এর সংবাদ প্রচারিত হয়। এখানে এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ অপরিসীম আনন্দ ও গর্ব অনুভব করে চিঠিতে অভিনন্দন পাঠান :

সত্যের মন্দিরে তুমি যে দীপ জ্বালিলে অনির্বাণ।
তোমার দেবতা সাথে তোমারে করিল দীপ্যমান।

এখানে 'দেবতা' অর্থে স্বদেশ। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের মর্ম বাংলায় বোঝাবার জন্য কবি লেখেন 'জড় কি সজীব' নিবন্ধ ; যার উত্তরে আচার্য কবিকে লেখেন—"তুমি যে এত সহজে বৈজ্ঞানিক সত্য স্থির রাখিয়া এরূপ সুন্দর করিয়া লিখিতে পার ইহাতে আমি আশ্চর্য হইয়াছি।" একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা ও কল্পনা' কাব্য দুটি জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করে অভিনন্দিত করেন এবং

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
হে আর্য আচার্য জগদীশ

ইত্যাদি দীর্ঘ একটি কবিতায় জগদীশচন্দ্রের গৌরব ঘোষণা করেন। বস্তুত 'বৃক্ষলতা ও মানুষের সঙ্গে জড় পদার্থেও একই চৈতন্যের লীলা'—এ রবীন্দ্রনাথেরও কল্পনায় অনুভূত সত্য। বিজ্ঞানে তারই প্রমাণ পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখলেন :

এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র-পশুপক্ষী-ধূলায়-প্রান্তরে
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক-'পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সংগীতে।

আচার্যের সত্তর বৎসর পূর্তিতেও বিমুগ্ধ কবি বৈজ্ঞানিকের ঐ বিশেষ কীর্তির বিষয়ই সাগ্রহে ঘোষণা করেছিলেন :

...হে তপস্বী তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে, অরণ্যের অন্তর-বেদনা
শুনেছ একান্তে বসি ; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জনম মরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।

সুতরাং এমনই সম্ভব যে জগদীশচন্দ্রের এই বৈজ্ঞানিক কীর্তিই কবির বিজ্ঞান বিষয়ে পরবর্তী ঔৎসুক্য বাড়িয়ে তোলে :

লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।

পরমাণু-বিজ্ঞান ও তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত
সৌর-নক্ষত্র-নীহারিকা বিজ্ঞান অর্থাৎ
নভোবস্তুবিজ্ঞানে কবির আগ্রহ

আচার্য জগদীশচন্দ্র যে সময় লন্ডনে বৃক্ষলতা ও জড়ের সাড়ার সমতা নিয়ে গবেষণায় প্রায় সিদ্ধিলাভ করে এসেছেন, ঠিক সেই সময়েই প্যারিসে মাদাম কুরি বিশ-শতকীয় পরমাণুবিজ্ঞানের সূচনা করলেন 'রশ্মি-কণিকা-নিঃসারী' রেডিয়াম আবিষ্কার করে। এই মৌল আবিষ্কার ক্রমশ বিশেষ যাবতীয় বস্তুর তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্বধারণার পরিবর্তন সূচিত করে ও পরমাণু-তত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে আলোক, বৈদ্যুতি-কণা, মহাকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ ও প্রাণীর সূক্ষ্মতম প্রকৃতি বিষয়ে যথাযথ ধারণায় পণ্ডিতদের অনুপ্রেরিত করেছে। এমনকী মহামনীষী আইনস্টাইনের বৈপ্লবিক গণিত-নির্ভর আবিষ্কারগুলিও সহজসাধ্য করেছে। বিজ্ঞান-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুগভীর কৌতূহল পরমাণুর ক্ষেত্রেও যে সমানভাবে জাগ্রত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নৈবেদ্য থেকে আরম্ভ করে উৎসর্গ, গীতাঞ্জলি ও গীতালির বহু কবিতায় ও গানে। নৈবেদ্যে রয়েছে :

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণু-পরমাণুদের নৃত্যকলরোল।

মহাকাশ-গবেষণায় পরমাণু-বিজ্ঞানের অবদান ও কবিচিত্তে প্রতিক্রিয়া

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহু দূরে
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্র-পথে ঘুরে।
কত বেগ, কত তাপ, কত ভার, কত আয়তন,
সূক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন
পণ্ডিতেরা, লক্ষ কোটি ক্রোশ দূর হতে
দুর্লক্ষ্য আলোতে।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে পরমাণু-সত্য নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হলে পর সূর্য-নক্ষত্রের গ্যাসীয় পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র পাওয়া গেল। এর পূর্বে বর্ণলিপির সাহায্যে বিভিন্ন গ্যাসের অস্তিত্ব বোঝা গেলেও কতকগুলি বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না। পরমাণুর বিকিরণ এবং শোষণের চরিত্র, তাদের বিশ্লেষ ও সংশ্লেষধর্ম আবিষ্কৃত হলে পর নভোবিজ্ঞান যুক্তিসংগত পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হল, নীহারিকা থেকে নক্ষত্রের উদ্ভব, কার্বন-চক্রে তাদের আভ্যন্তর পরিবর্তন, সংকোচন ও বিস্ফোরণ, জন্ম ও মৃত্যু নির্ণীত হতে লাগল। সুদূর-রহস্য-প্রিয় কবি এখন থেকে মহাকাশ-রহস্যে নিমগ্ন হলেন। অনুভব করলেন :

প্রথম আদি তব শক্তি
আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে
গগনে গগনে।

আবার, সৌররশ্মি-কণিকার পার্থিব প্রতিক্রিয়ায় বিস্মিত বিমুগ্ধ হলেন এবং অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করতে লাগলেন সৃষ্টির জন্মমৃত্যু-লীলা। কবির ঐ বিশ-শতকীয় নভোবিজ্ঞান-সচেতনতা প্রথম ধরা পড়ল উৎসর্গের একটি কবিতায় :

আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই
কিসের বাতাস লেগেছে—
জগৎ ঘূর্ণি জেগেছে।
ঝলকি উঠেছে রবি শশাঙ্ক,
ঝলকি উঠেছে তারা,
অযুত চক্র ঘুরিয়া উঠেছে
অবিরাম মাতোয়ারা।

নীহারিকায় গ্যাসধূলি চঞ্চলতাধর্মে একত্র সংহত হচ্ছে, উত্তপ্ত হচ্ছে, আকর্ষণে বিকর্ষণে চক্রগতিলাভ করে ঘনীভূত বাষ্পতেজসহ সূর্য-তারকার রূপে উদ্ভাসিত হচ্ছে, এসব নভোবিজ্ঞানীদের কথা। কবিপক্ষে তা জানার ফলে বিস্ময় গাঢ়তর হয়, তাই গেয়ে ওঠেন :

আকাশ-ভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥

মহাকাশ থেকে নীহারিকা-নক্ষত্র-সূর্যের থেকে এ বিশ্ব পৃথক নয়, এমন নিঃসংশয় উপলব্ধির মূলে রয়েছে নভোবস্তু-বিজ্ঞানীদের প্রমাণিত পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যনক্ষত্রে বস্তুগত উপাদানের যোগ এবং রশ্মির বিকিরণ ও গ্রহণের সম্বন্ধ।

জ্যোতি-পরমাণুর জটিলতার রূপান্তরে পৃথিবী, তার সৌন্দর্য আর মানুষের দেহপ্রাণ। অপূর্ব, তবু শাশ্বত নয়। মহাকাশ-বক্ষ-সংলগ্ন সূর্যের স্থিতিও চিরকালের নয়। নক্ষত্রদের সহোদর সে। আয়ুশেষে হয় একদিন সেও বিস্ফুরিত হয়ে গ্যাসরশ্মি পদার্থকণা উল্কা ধূমকেতু বিক্ষিপ্ত করতে করতে সপরিবারে নিঃশেষ হয়ে পড়বে, ঘনীভূত সংকুচিত হতে হতে

মহাকর্ষে গ্রহ-উপগ্রহ টেনে নিয়ে ছাই করে দিয়ে মৃত জড়বস্তুরূপে শূন্য আকাশে তার যৌবনস্মৃতি-চারণা করতে থাকবে। নতুন সৃষ্টির জন্য এই মৃত্যু-লীলাই যখন অনিবার্য সত্য তখন চিরপথিক কবি কোনও ভয়ই রাখতে চান না, ধ্বংসের সঙ্গী হওয়াতেই তাঁর আনন্দ :

যাব উদ্দামের পথে, যাব আনন্দিত সর্বনাশে,
রিক্তবৃষ্টি-মেঘসাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,
যাব, যেথা শংকরের টলমল চরণ-পাতনে
জাহ্নবী তরঙ্গমন্দ্র-মুখরিত তাণ্ডব-মাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল,
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উজ্জ্বল
আত্মঘাত-মদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে
নির্মম উল্লাসবেগে, খণ্ড খণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে
কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ।

পৃথিবী-পতি সূর্যের ও নক্ষত্রদের এই অনিবার্য মরণযাত্রায় যোগ দিতে কবি দীন উদাসীন আমাদেরও আহ্বান জানাতে ভোলেননি :

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে।
(এই) খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে ॥...
পাতিয়া কান শুনিস না যে
দিকে দিকে গগন-মাঝে
মরণ-বীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা-চন্দ্রে রে ॥

নটরাজ-লীলা

বিশ-শতকীয় আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় শাখার ভিত্তি হল ঐ পরমাণু-তত্ত্ব। পরমাণু অর্থে প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন পজিট্রন প্রভৃতি। জটিল ও অদ্ভুত এদের চরিত্র। ইলেকট্রন ঘোরে প্রোটন-নিউট্রনের চারদিকে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে অনেকটা গ্রহদের সূর্য-পরিক্রমার মতো। অথচ কক্ষ-পরিবর্তন এমনকী বন্ধন ত্যাগও করতে পারে। বৈদ্যুতি মুক্ত করে কখনও স্থির প্রোটনের কাছাকাছি আসে, কখনও উচ্চতর শক্তি নিয়ে লাফ দেয় উপরের কক্ষে। এমনকী বাইরেও এরই জন্য বর্ণলিপিতে ফুটে ওঠে উজ্জ্বল রেখা ও কৃষ্ণ রেখা। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা এই শক্তির পরিমাপ করেছে, কিন্তু বৈদ্যুতিনীর কেন এই বিক্ষোভ তা ধরা যায়নি। এই খেয়ালি চরিত্রধর্ম নিয়ে পদার্থে, রশ্মিতে, তরুলতায়, বর্ণসৌন্দর্যে, এমনকী জীবদেহে মনে-প্রাণেও এগুলিরই সূক্ষ্মতম বিক্রিয়া। মহাকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত এই যে একের সূক্ষ্মতম বোধাতীত লীলা চলছে, জীবন এবং মৃত্যু, সৃষ্টি এবং ধ্বংসে যে-অধরা শক্তির খেয়ালি রূপান্তর ঘটে চলছে, ভাবুক-কবি কল্পনায় সেই নিয়মের শক্তিকে আঁকলেন নৃত্যপরায়ণ শংকর বা নটরাজ বলে। সমাজ-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাকে নাম দিলেন মহাকাল। কবির ভাষায়—"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক

আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হতে থাকে।" মহাকাশ ও পৃথিবীর জীবনমৃত্যুর অদৃশ্য সঙ্গী এই মহাবৈজ্ঞানিক সত্তার সৌন্দর্যের লীলা-পরিচয় বোঝাতে গিয়ে কবি বলছেন :

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।...
নৃত্যের বশে সুন্দর হল
বিদ্রোহী পরমাণু।
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র ভানু।

এ কবিত্বের মূল্য কোটি স্বর্ণমুদ্রার উপরে। পরমাণুরা কীভাবে বিদ্রোহী হচ্ছে আর তার ফলে কীভাবেই বা উদ্ভব হচ্ছে জ্যোতিঃপুঞ্জের, তার মূল তত্ত্ব কবিই জানচ্ছেন তাঁর গদ্যে লেখায়—

"ইলেকট্রন বাইরের থেকে ভিতরের পথে দর্শন দেয়। কেন দেয় এবং হঠাৎ কখন দেখা দেবে তার কোনো বাঁধা নিয়ম পাওয়া যায় না। তেজ শোষণ করে ইলেকট্রন ভিতরের পথ থেকে বাইরের পথে লাফিয়ে যায়। এই লাফের মাত্রা নির্ভর করে শোষিত তেজের পরিমাণের উপর। ইলেকট্রন তেজ বিকীর্ণ করে, কেবল যখন সে তার বাইরের পথ থেকে ভিতরের পথে আবির্ভূত হয়। ছাড়া-পাওয়া এই তেজকেই আমরা পাই আলো রূপে।" (বিশ্বপরিচয়)

মহাকাশের জ্যোতি-পদার্থের এই পরিস্থিতিতে সৃষ্টি-ধ্বংস পৃথক কোনো ব্যাপার নয়। ধ্বংস-মৃত্যুতে সীমিত সংকীর্ণ আমরাই শুধু বিচলিত হই। নটরাজ যেমন সন্ন্যাসী, তেমনই আবার সুন্দর, শিব-শান্ত, ভয়ংকর একাধারে। সত্তরের পথে অগ্রসর কবি এই বিপরীতের লীলায় মগ্ন হয়ে নিজেকে নীহারিকা-নক্ষত্র থেকে সূর্যের মধ্যস্থতায় পৃথিবীতে আকস্মিকভাবে বিক্ষিপ্তকণিকারূপে অনুভব করছেন ও মহা উৎসাহে জীবন-মৃত্যুকে সমভাবে বরণ করেছেন :

মোর সংসারে তাণ্ডব তব
কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণিতালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে।

কবি-অনুভবের মধ্যে সংগ্রামী মানুষ বিপ্লবী মানুষের সপক্ষে যে উৎসাহ-বাণীর সান্নিধ্য আমরা বারংবার অনুভব করি, তার সঙ্গে বস্তুসত্যধারী বিজ্ঞানের বিষয়ে কবির ধারণাকেও মিলিয়ে নিতে হবে।

কিন্তু তবু একথা বলা যায় যে বৈজ্ঞানিক মহাকাশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখার উচ্ছ্বাসে কবি বৈরাগ্যব্রত সাময়িকভাবেই স্বীকার করেছেন। পরমুহূর্তেই ঝুঁকেছেন সৌন্দর্য ও রূপের দিকে, যা তিনি কবিস্বভাব অনুসারেই ছাড়তে পারেননি কখনও। সুতরাং মহাকাশ প্রসঙ্গে কবির এই ছবিতে রূপের অভিলাষ এবং বিস্ময়কর মানব-মহিমার কথাও ব্যক্ত হয়েছে :

আদিতম যুগ হতে অন্তহীন অন্ধকারপথে
আবর্তিছে বহ্নিচক্র কোটি কোটি নক্ষত্রের রথে...
অণুতম অণুকণা আকাশে আকাশে নিত্যকাল
বর্ষিয়া বিদ্যুৎবিন্দু রচিছে রূপের ইন্দ্রজাল ;
নিরুদ্ধ প্রবেশদ্বারে উঠে সেথা মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

কবি-জীবনে সৌরপ্রেরণা

আশৈশব কবি আলোকপ্রিয় এবং সূর্যের অনুচর। শুনেছিলেন, বেদ-উপনিষদে বলা হয়েছে সূর্য থেকেই জীবের প্রাণ মন বুদ্ধির বিকাশ। সূর্যে রয়েছেন ভর্গদেব, নারীরূপে যিনি সরস্বতী। আধুনিক বিজ্ঞান দেখেছে মাঝারি নক্ষত্র এই সূর্যে দুকোটি সেন্টিগ্রেড তাপে হাইড্রোজেন কণিকারা জ্বলছে, ভাঙছে, জোড়া হয়ে হিলিয়মে রূপান্তরিত হতে গিয়ে প্রচুর অগ্নিতেজের উচ্ছ্বাস ঘটাচ্ছে। সূর্য কার্বন-চক্রে অগ্রসর হচ্ছে। কবি সেই বৈদিক কল্পনার সঙ্গে বিজ্ঞান-কথিত সত্য মিলিয়ে নিয়ে সৌর-পরিস্থিতি এবং সূর্য-প্রেরণার আধুনিক পরিচয় সন্নিবেশ করে লিখলেন বিজ্ঞান-উদ্‌বোধিত একটি অপূর্ব কবিতা— 'সাবিত্রী'।

মেঘে-ঢাকা ম্লান দিনে কবি তাঁর জ্যোতির্ময় বন্ধুর সাক্ষাৎ চাইছেন—'হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি দেখা দিক ফুটি'। এরই পরে বর্ণনায় যা বললেন তা বেদ পুরাণের অনুগামী নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের সূর্যদর্শন। বললেন, সূর্যের কেন্দ্রে আমাদের চৈতন্যের উদ্‌বোধয়িত্রী যে সরস্বতী রয়েছেন, তাঁর বুকে বাজছে বহ্নিবীণা, আর তার কেশদাম হয়েছে প্রদীপ্ত, উচ্ছ্বসিত :

বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্‌বোধিনী বাণী
সে-পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি, তারে জানি।

অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ সূর্যের বিবরণ পেয়েছি। তিনি আরও জানেন যে তাঁর এই প্রাণ সৌরকণিকারই দান :

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী।

কিন্তু কেবল প্রাণই নয়, মন, বুদ্ধি, কবিস্বপ্ন সবই তো সেখান থেকেই—ঐ প্রজ্বলিত গ্যাসীয় রশ্মি-কণিকা থেকেই পাওয়া :

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমারে দিয়েছ যে ভ'রে
কেই বা সে জানে?
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত প্রাণে।

বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান থেকেও কবি আরও খানিকটা এগিয়ে গেছেন। প্রাণবিজ্ঞান অর্থাৎ বায়ো-ফিজিকস্ ও বায়ো-কেমিস্ট্রি এখনও এতদূর পৌঁছায়নি। ভবিষ্যতে পারবে হয়তো বা।

আপেক্ষিক তত্ত্বে নটরাজ-স্মৃতি

আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত দুটি গণনায় পৃথিবী-সূর্য-মহাকাশ বিষয়ে পূর্বেকার বৈজ্ঞানিক ধারণা বদলে দিয়েছেন। এর প্রথমটির নাম বিশিষ্ট আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে)। আপাতভাবে স্থির পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় যা চূড়ান্তসত্য বলে মনে করা হয়, গতিশীল মহাবিশ্বের পক্ষে তা নয়। আমাদের সীমিত পার্থিব বিচারে দেশ ও কাল পৃথক বস্তু। আপেক্ষিকতাবাদে দেশ ও কাল নয়, মিলিত দেশ-কাল। কাল দেশেরই অংশ। দৈর্ঘ্য-বিস্তার-ঘনত্বের সঙ্গে যুক্ত চতুর্থ মাপকাঠি। মহাকাশের কালের বিচার করতে গেলে এখানকার কালের ধারণা ত্যাগ করতেই হবে। একই সঙ্গে তিনি গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে চোখে দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্রতম কণিকাও পর্বতপ্রমাণ শক্তির জন্ম দিতে পারে। অর্থাৎ শক্তি হল—পদার্থের ভরকে আলোর গতি-পরিমাণের বর্গ দিয়ে গুণ করলে যা দাঁড়ায় সেই বিপুলতা। এই বিশেষ আপেক্ষিক-তত্ত্বের আরও দশ বছর পরে আইনস্টাইন উপস্থাপিত করলেন সাধারণ আপেক্ষিকতা। এতে তিনি প্রমাণ করলেন যে নিউটনের মহাকর্ষ-টানের অঙ্কটা ঠিকই আছে, কিন্তু এই মহাকর্ষ ঘটছে দুই পদার্থের অন্তর্নিহিত আকর্ষণে নয়, শূন্যে চলমান মহাবস্তুর কাছের স্পেস অর্থাৎ দেশটা বাঁকা অবস্থায় থাকে বলে। নিউটনীয় মহাকর্ষকে তিনি দেশ ও কালের জ্যামিতির সঙ্গে অন্বিত করে দেখালেন। আইনস্টাইনের গণনার সত্যতা দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা বারংবার পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয়, ফলে আমাদের কল্পনাশীল মহাকবিও এর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেননি।

১৯৩৫ সালে লেখা 'শেষ সপ্তক' কাব্যের কয়েকটি কবিতায় কবির মহাবিশ্ব-দর্শনের মধ্যে আইনস্টাইনের দেশ-কাল-সমীকরণ তত্ত্বের ছোঁয়া লেগেছে দেখা যায়। যেমন একুশ সংখ্যার কবিতা। প্রারম্ভেই কবি 'কাল'কে দেশের সঙ্গে এক ধরে নিয়ে বর্ণনা দিচ্ছেন :

সৃষ্টির আরম্ভে আঁকা হ'ল অসীম আকাশে
কালের সীমানা
আলোর বেড়া দিয়ে।

কালকে মাপতে এখানে বেষ্টনীর বিষয় ব্যবহার করতে হয়েছে। আবার,

সব চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রটি
অযুত নিযুত কোটি কোটি বৎসরের মাপে।

এখানে ক্ষেত্রের আয়তন বোঝাতে 'বৎসরের মাপ' ব্যবহার করা হয়েছে। কালকে আয়তনের সঙ্গে এক করা হয়েছে।

এই ভূমিকা করে কবি নভোবস্তু-বিজ্ঞানের অনুযায়ী নীহারিকা-নক্ষত্রের জীবন ও মৃত্যুর কথা বললেন। জ্যোতিষ্কদের পতঙ্গের রূপক দিলেন, কারণ তাদের সদাচঞ্চল ভ্রাম্যমাণ অবস্থা আর সেই সঙ্গে ক্ষণজীবীত্ব 'পতঙ্গ' বিশেষণেই ভালো বোঝানো যায়। কবিতাটিতে পৃথিবী ও মানুষের নগণ্য ক্ষুদ্রতা ও সীমিত দেশ-কাল পরিস্থিতির বিষয় জানিয়ে এখানকার যুগপরিবর্তন ও ইতিহাসের দীর্ঘ উত্থান-পতনকে মহাকাশ-পরিস্থিতির কাছে নিতান্ত ক্ষণিক দেখিয়ে নির্বিকার মহাকালকে নমস্কার জানিয়েছেন কবি।

মহাকর্ষ বিষয়ে আইনস্টাইনের অভিমত কবি নিজে এইভাবে জানিয়েছেন তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' পুস্তকে :

"পরমাণুদের অন্তরের টানটা বৈদ্যুতিক টান, বাহিরের টানটা মহাকর্ষের ; যেমন মানুষের ঘরের টানটা আত্মীয়তার, বাইরের টানটা সমাজের।

···মহাকর্ষের ক্রিয়া একটুও সময় নেয় না। আকাশ পেরিয়ে আলো আসতে সময় লাগে···বৈদ্যুতিক শক্তিরাও ঢেউ খেলিয়ে আসে আকাশের ভিতর দিয়ে। কিন্তু অনেক পরীক্ষা করেও মহাকর্ষের বেলায় সেরকম সময় নিয়ে চলার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রভাব তাৎক্ষণিক। আরও একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে আলো আর উত্তাপ পথের বাধা মানে, কিন্তু মহাকর্ষ তা মানে না···

অবশেষে আইনস্টাইন দেখিয়ে দিলেন এটা একটা শক্তিই নয়। আমরা এমন একটা জগতে আছি যার আয়তনের স্বভাব অনুসারেই প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তুমাত্র যে আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষে তারই প্রকাশ। এটা সর্বব্যাপী, এটা অপরিবর্তনীয়।"

প্রাণবিজ্ঞান-রহস্য—প্রাণশক্তি

আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রমাণিত সর্বব্যাপী প্রাণতত্ত্বে বিশ্বাসী কবি একদা সবিস্ময়ে অনুভব করেছিলেন

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে ; সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়। (নৈবেদ্য, ১৯০১)

এই প্রাণশক্তির ধারা পৃথিবীর আদি যুগের বৃক্ষ-পর্যায় থেকে আরম্ভ করে আধুনিক মানুষ, বিশেষে মেহনতি মানুষ পর্যন্ত কীভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে তার বিচিত্র অনুভব কবিকে গদ্য-পদ্য বহু রচনায় প্রবর্তিত করেছে। দেহমধ্যে প্রাণের বিচিত্র লীলায় বিমুগ্ধ কবি গেয়ে উঠেছেন :

তার অন্ত নাই গো যে-আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ ॥...
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে
যুগ-যুগান্তরের স্তন্য...

গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ রুক্ষ মাটিতে বর্ষণের ছোঁয়ায় যে অপূর্ব শ্যামলিমা জাগল তার ছবি কবিকে উদ্‌বোধিত করেছে মরু-বিজয়ের মহিমায় প্রাণের দানে। কবি গেয়েছেন :

মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে।...
ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।

বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষ্যেও :

মরু-বিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে, হে প্রবল প্রাণ।

শান্তিনিকেতনের শালবীথি আম্রবনের সঙ্গে রবীন্দ্রের নাড়ীর টান কবিচরিত্র সম্পর্কে একটি ইতিবৃত্ত। যৌবনের একটি লেখায় কবি জানিয়েছিলেন—দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর। সে হল কালিদাসের কাব্যপাঠে উদ্দীপিত প্রকৃতিপ্রীতির মুহূর্ত। তারপর যা ছিল ভাবনায়, তার সত্যতা যখন পেলেন বিজ্ঞানের পরীক্ষায় তখন কবির নিসর্গপ্রীতি ও সেই সঙ্গে প্রাণের বিজয়-গৌরব-ঘোষণার আর শেষ রইল না। বৃক্ষ-লতা-ফুল কবির কাছে এখন কেবল সৌন্দর্যে আকর্ষণীয় হল না, তার মধ্যে পেলেন সংগ্রাম ও বিজয়ের বার্তা, সহোদর প্রাণীর জন্য আত্ম-উৎসর্গের ইতিহাস :

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ আদিপ্রাণ,
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ 'পরে।

আবার বসন্তের প্রগল্‌ভ পুষ্পোচ্ছ্বাসে স্পষ্ট অনুভব করলেন পুরাতনকে ভেঙে ফেলার বিদ্রোহী প্রবণতা :

বাঁধন ছেড়ার সাধন তাহার
সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মত ভেঙে চুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।

প্রাণের এই-যে তেজস্বী মূর্তি, এই-যে বাধাবন্ধ ছিন্ন করার অদম্য উৎসাহ, এর মূলে কি সৌররশ্মির ও আদি জ্যোতির স্পর্শ ও প্রেরণা নেই? কবি বিচার করে বলছেন—অবশ্যই আছে। বৃক্ষ-প্রাণী-নির্বিশেষে জীবকোষের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম সূত্রে এর লীলা।

জীবের প্রাণে মনে আদি জ্যোতির প্রেরণা

"বিশেষ একটা যুগে প্রাণমন এল পৃথিবীতে অতি ক্ষুদ্র জীবকোষকে বহন করে। পৃথিবীর সৃষ্টি-ইতিহাসে এদের আবির্ভাব অভাবনীয়। কিন্তু সকল কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন একান্ত আকস্মিক কোনো অভ্যুৎপাতকে আমাদের বুদ্ধি মানতে চায় না। আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত কোনো ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃপদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে যে-সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতির্হীন তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরো সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্য ও মনে।...জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলছে।" (বিশ্বপরিচয়)

কবির এই বৈজ্ঞানিক অনুভব নিয়ে আগেই লেখা হয় পূরবী কাব্যের 'আহ্বান' কবিতা, এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় পঙ্‌ক্তিগুলি হল :

কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে;
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে।

এবং 'সাবিত্রী'—

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী,
আয়ুস্রোতোমুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমারে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে?
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত প্রাণে?

প্রাণ থেকে আরও গভীরে

প্রাণবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বংশানুক্রম ধারায় এবং মনস্তত্ত্বেও ডুব দিয়েছিলেন কবি, সৃষ্টির বিস্ময়কে সামগ্রিকভাবে অধিগত করার তাগিদে। শেষ সপ্তকের কয়েক জায়গায় ধরা পড়ছে মনস্তত্ত্ব বিষয়ে কৌতূহল, ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের অনুসরণে। মন বলে আমরা যাকে জানি তা বোধ-মহাসমুদ্রের ডাঙার উপর ভেসে-থাকা একটা নগণ্য অংশ মাত্র। এর পিছনের অদৃশ্যালোকে রয়েছে 'অবচেতন'-এর বিপুল বিস্তার :

ও যে একটা মহাদেশ,
সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।
ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে
নির্বাক অনতিক্রমণীয়।

এই গুহাহিত মনোলোকের প্রভাব জীবনের গভীরে। ইচ্ছায় ও কর্মের গোপনে অবদমিত বাসনা, অচরিতার্থ সাধনার জটিল কার্যক্রম :

চারদিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ।
সেখান থেকে নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে
চিত্তভূমিতে ;
হাওয়ায় লাগে শীতবসন্তের ছোঁওয়া।

যে-শক্তি যে-সাধনা প্রকাশের রূপ পেল না, যে-সব অবদমিত কালিমাময় বাসনা অস্পষ্ট অবস্থাতেই রয়ে গেল একমাত্র মৃত্যুর মধ্যেই সে-সবের সমাপ্তি অনুভব করেছেন কবি বৈজ্ঞানিক ধারণারই অনুসরণে :

বৃহৎ অগোচরতায় পুঞ্জিত আছে
আত্মবিস্মৃত শক্তি
মূল্য পায়নি এমন মহিমা
অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ মাটির তলায়...
সেখানে নিগূঢ় নিবিড় কালিমা
অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জনা।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ —গীতা

অবরুদ্ধ কামনা-বাসনার বৈজ্ঞানিক পরিচয়কে যদিও কবি স্বীকৃতি দিলেন, বংশপরম্পরায় বাহিত জীন্‌-এর জৈবস্বভাবের অনুগামী হতে প্রবলভাবে অস্বীকার করলেন এই কারণে যে—মানুষের ধর্মই হল এগিয়ে চলা, স্থূল বাসনা-কামনাকে একান্ত স্বার্থলিপ্সাকে পায়ে দলে ব্যাপ্তির মধ্যে মহামানবসম্মিলনের চরিতার্থতার পথে পদক্ষেপ করা। অভিযাত্রী সে। অভিব্যক্তির ধারাই দেখিয়ে দেয় যে, আরণ্য-বর্বর মানুষ জ্ঞান বুদ্ধি কর্মশক্তির সাহায্যে সংগ্রাম করতে করতে এত বিজ্ঞান, এত দর্শন, এত কাব্য সৃষ্টি করেছে। তার জড়তা ও

ভেদবুদ্ধি সমূলে বিনষ্ট করার জন্য যুগে যুগে এসেছেন খ্রিস্ট বুদ্ধ মহম্মদ শ্রীচৈতন্যের মতো মহাপুরুষ। আদিম ক্ষুধা নিয়েই মানুষ চলছে এবং চলবে—জীববিজ্ঞানের এই বংশানুক্রম-তত্ত্বের মৌল বিষয় মনে রেখেও কবি প্রতিবাদ জানালেন :

শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে
ঐ একটা অনেক কালের বুড়ো,
আমাতে মিশিয়ে আছে এক হয়ে...
ও এসেছে কতলক্ষ পূর্বপুরুষের
রক্তের প্রবাহ বেয়ে
কত যুগের ক্ষুধা ওর, কত তৃষ্ণা...
ও থাক ঐখানে দ্বারের বাহিরে,
ঐ বৃদ্ধ, ঐ বুভুক্ষু।...
মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি...
আমার কোনো কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা। (শেষ সপ্তক)

কবির বিজ্ঞান-দীক্ষার ফলিত প্রকাশ

সপ্ততি বৎসর পূর্তির কিছু আগে কবি শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ও শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। কবি লক্ষ করেছিলেন বনকর্তনের ফলে কেবল সৌন্দর্যশ্যামলিমাই দূর হচ্ছে তা নয়, প্রাণধারণও বিঘ্নিত হচ্ছে—"সূর্যতেজ থেকে অরণ্য অগ্নিকে বহন করছে, তাকে দান করছে মানুষের ব্যবহারে। আজও সভ্যতা অগ্নিকে নিয়েই অগ্রসর হয়ে চলেছে।" সুতরাং আমরা যা নিচ্ছি তা ফিরিয়ে দেওয়া কর্তব্য বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে। তাই—"অতিথি বালক তরুদল, আয় আমাদের অঙ্গনে।"

আমাদের দেশের শিক্ষিতের মন কৃষি ও কৃষকের প্রতি বিমুখ, এ এক বিপরীত ঘটনা, আত্মহননের এক অভিশাপ। এ দূর করার জন্যই তিনি নিজ হাতে লাঙল ধরে হলকর্ষণের গুরুত্বের দিকে আমাদের আকৃষ্ট করার প্রয়াস করেন। আর ভাষণে বলেন—

"হলকর্ষণে আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য, শস্যের জন্য ; আমাদের নিজের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। ধরণীর প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য, তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন। কামনা করি, এই অনুষ্ঠানের ফলে চারিদিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক, ফলে শস্যে এই প্রতিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।"

কৃষিকাজে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের আমন্ত্রণ

"আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে।"

"বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে।"

কবির স্থায়ী মৃত্তিকাপ্রীতি, বৃক্ষপ্রীতি কেবল কাব্যের সূত্রেই নয়, বিজ্ঞানের প্রেরণাতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। কবির বিখ্যাত স্বাদেশিকতার মূল দেশের বাস্তব মাটিতেই

নিবদ্ধ। কী গভীর আশা নিয়েই না কবি শিক্ষিতদের মনকে মাটির দিকে ফেরাতে চেয়েছিলেন—

"সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্তদগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে উর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলছে, তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা -কিছু জ্ঞানের সঞ্চয়, ও তো আমারই জন্যে, আমাকে দাও, আমাকে দাও। সমস্ত নেবার জন্য আমাকে প্রস্তুত করো। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে।"

রবীন্দ্রনাথ নিজে মাটিকে সেই সহায়তাটুকু দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন শিলাইদহ-পতিসরে এবং শ্রীনিকেতনে। পুত্র-জামাতাকে কৃষি বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন, ল্যাবরেটরি বসিয়েছিলেন, ঐকত্রিক চাষের সুবিধার জন্য ট্রাক্টর আনিয়েছিলেন, সমবায়-নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। এসব উদ্‌যোগ পরাধীন ভারতে সেই প্রথম। কবি হয়েও তিনি বিজ্ঞান-দীক্ষিত মহাকৃষক! এজন্য দেশের পক্ষে যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি সেই ফসল ফলানোর বিষয়ে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করার আহ্বান বারংবার জানিয়েছেন কবি।

আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা

কবিকণ্ঠে এ বাণী বিস্ময়জনক হলেও সত্য। কারণ, তিনি শুধু কবিই নন, পথের দিশারি মহাপুরুষ এবং প্রবলভাবে স্বাদেশিক। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া পরিদর্শনে গিয়ে এবং স্বল্প সময়ে সেখানে শিক্ষার সঙ্গে বিভিন্ন সমাজ-উদ্যোগের আশ্চর্য উন্নতি লক্ষ করে হতভাগ্য স্বদেশের জন্য আক্ষেপ করেছেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বলশেভিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। কবির সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সেখানকার বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষার আয়োজন। বিজ্ঞান তাদের আগেকার দিনের অন্ধ সংস্কার দূর করেছে, নবীন জীবনের নব নব উৎসাহে দীক্ষিত করে তুলেছে। ফলে স্বদেশের বিদ্যালয়গুলিতেও তিনি বিজ্ঞান শেখানোর গুরুতর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জোর দিয়ে বলেছেন—

"শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। একটুখানি ছিটেফোঁটা শেখানো না—গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার। বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান।"

কিন্তু হায়! আজও দেশের লোক ভাষা নিয়েই কলহ করে। দেশে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে উঠুক, বিজ্ঞান দেশের অন্নবস্ত্র সমস্যা সহজ করে আনুক, আচার-প্রথার অন্ধ আনুগত্য দূর হোক, বিকশিত হোক বিভেদহীন সামূহিক সমাজবোধ—এ কামনা শতকরা কজনের?

আশি বৎসরের কবির বিজ্ঞান-নির্ভর নিজ জীবন-সমীক্ষা

জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে
এ বিস্ময় মনে আজ জাগে—
লক্ষকোটি নক্ষত্রের
অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে,
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।

এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়া ছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি ;
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবসরাত্রি অবসানে
মন্থর গমনে এল মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে ;...

পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা,
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।
সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্ত্যনিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদক্ষিণ—
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।

রবীন্দ্রচিন্তায় আমাদের সমাজশক্তি ও সভ্যতার সংকট

হরপ্রসাদ মিত্র

প্রাচীন ভারতে মধ্যযুগেও আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেয়ে সমাজশক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছি—এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে দেখিয়ে গেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, অন্তরের বিকাশ, আত্মকর্তৃত্বের সাধনাই মানুষের যথার্থ লক্ষ্য হওয়া চাই। লোভ প্রভৃতি রিপুর আক্রমণের ক্ষেত্রে এই আদর্শটি বারবার স্মরণীয়। 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই দিকটির ওপর বিশেষ জোর দেন। তিনি 'ভয়'-কেই মনের নাস্তিকতা এবং 'ধর্ম'-কেই আস্তিকতা বলেন। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের সমালোচনায় তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ। সমগ্র দেশ যে সমগ্র দেশবাসীর সৃষ্টি, এই সত্যটি অনুধাবন করতে হবে। 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধেই তিনি জানান—"দেশ আমারই আত্মা, এই জন্যই দেশ আমার প্রিয়—এ কথা যখন জানি তখন দেশের সৃষ্টিকার্যে পরের মুখাপেক্ষা করা সহ্যই হয় না।" ১৯০৫-এর আন্দোলনপর্বেই তিনি জানান—"আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক্ থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।" 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধগুলির অনেক আগেই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তিনি দেশকে কীভাবে 'আমার নিজের', এই বোধে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তা আলোচনা করেন। তাঁর 'আত্মশক্তি ও সমূহ' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত 'স্বদেশী সমাজ' (ভাদ্র, ১৩১১) এবং 'স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট' (আশ্বিন, ১৩১১) প্রবন্ধ দুটিতে তো বটেই, তাছাড়া 'রাজাপ্রজা', 'ভারতবর্ষ ও স্বদেশ' প্রভৃতি বইয়েও এই চিন্তা বারবার ব্যক্ত হয়েছে। বিলেতের 'স্টেট' আর আমাদের 'সমাজ'—এই দুটির কর্তব্যভেদ ও প্রকৃতিভেদ সম্বন্ধে সেই ১৯০৫-এর পূর্বেই 'স্বদেশী সমাজ'-এ তিনি বিশদ আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতে—এখন যাকে স্টেট বা সরকার বলা হয়, তা ছিল রাজশক্তির আকারে, কিন্তু বিলেতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ এইখানে যে বিলেতে দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার সমর্পিত হয়েছিল স্টেটের ওপরেই, আমাদের ভারতবর্ষে তা ঘটেছিল আংশিকভাবে—অর্থাৎ প্রত্যেক গৃহীর সমাজধর্মের মধ্যেই তা বহুপরিমাণে অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাঁরা গুরুস্থানীয় ব্যক্তি তাঁরা দেশকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন,—জনসাধারণের স্বার্থসংযম, আত্মত্যাগচর্চা ইত্যাদি ছিল ধর্মাচরণের মধ্যে গণ্য। এই সব লক্ষণ দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানান—"ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিক রূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এই জন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়।"

১৯৩৭-এ রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত এই পনেরোটি প্রবন্ধ এতে সংকলিত হয়—'বিবেচনা ও অবিবেচনা' (বৈশাখ, ১৩২১), 'লোকহিত' (ভাদ্র, ১৩২১), 'লড়াইয়ের মূল' (পৌষ, ১৩২১), 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (ভাদ্র, ১৩২৪), 'ছোটো ও বড়ো' (অগ্রহায়ণ, ১৩২৪), 'বাতায়নিকের পত্র' (আষাঢ়, ১৩২৬), 'শক্তিপূজা' (কার্তিক, ১৩২৬), 'সত্যের আহ্বান' (কার্তিক, ১৩২৬), 'হিন্দু মুসলমান' (শ্রাবণ, ১৩২৯), 'সমস্যা' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), 'সমাধান' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), 'শূদ্রধর্ম' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩২), 'বৃহত্তর ভারত' (শ্রাবণ, ১৩৩৪), 'কালান্তর' (শ্রাবণ, ১৩৪০), এবং 'নারী' (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩)।

১৯৪১-এ তাঁর মহাপ্রয়াণের প্রায় আট বছর পরে বাংলা ১৩৫৫ সালের পৌষে 'কালান্তর'-এর যে পরিবর্ধিত সংস্করণ বেরোয়, তাতে পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলির সঙ্গে যুক্ত হয় 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' (মাঘ, ১৩২৪), 'শিক্ষার মিলন' (ভাদ্র, ১৩২৮), 'চরকা' (ভাদ্র, ১৩৩২), 'স্বরাজসাধন' (আশ্বিন, ১৩৩২), 'রায়তের কথা' (আষাঢ়, ১৩৩৩), 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' (মাঘ, ১৩৩৩),—'হিন্দু মুসলমান' নামে দ্বিতীয় রচনা (শ্রাবণ, ১৩৩৮), 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' নামে সেই প্রবন্ধটি যাতে শচীন্দ্রনাথ সেনের ইংরেজি বই 'পোলিটিকাল ফিলসফি অফ রবীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে তাঁর নিজের মতামত পাওয়া যায় এবং যেটির প্রকাশকাল ছিল অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬,—তারপর শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি—যার নাম 'কন্‌গ্রেস' (আষাঢ়, ১৩৪৬), 'আরোগ্য' (মাঘ, ১৩৪৭) এবং 'সভ্যতার সংকট' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮)। অর্থাৎ আরও এই এগারোটি প্রবন্ধ যুক্ত হয়ে ১৩৫৫ সালের পরিবর্ধিত 'কালান্তর' বইটির মোট প্রবন্ধ সংখ্যা হয় ছাব্বিশ।

'কালান্তর' প্রবন্ধটির মধ্যেই তিনি আমাদের দেশের মধ্যযুগের সংকীর্ণতার উল্লেখ করে লেখেন—"বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু সে মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্য সংগঠন করেছে, কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এই জন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল—কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের।" বিশদভাবে এই দিকটি বোঝাতে গিয়ে তিনি জানান যে, মুসলমান আমলে আমাদের দেশে—'দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা'—পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। ফলে, সেকালে—'পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর।' এবং—'তার পরে এল ইংরেজ, কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে।' তাঁর কথায়—'য়ুরোপীয় চিত্তের জঙগমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল।' ইউরোপীয় মনের 'সত্যসন্ধানের সততা'-র প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হন তিনি। অনেক উপমা, বিচিত্র উদাহরণ ইত্যাদি দেখিয়ে, এদেশে ইংরেজ শাসনের প্রথম লক্ষণীয় গুণের দিকটি সত্তরোত্তর রবীন্দ্রনাথ এইভাবে প্রকাশ করেন যে, সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আমলেই ইংলন্ডের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য ছিল উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। ব্যাপক অর্থেই মানবিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য ছিল তাঁর।—"রিফর্মেশন যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন যুগে য়ুরোপ যে মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়নি। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে।

ম্যাটসিনি গারিবলডির বাণীতে কীর্তিতে সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত, সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্ল্যাড্‌স্টোনের বজ্রস্বর। আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। এই প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর-এক দিকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা।"

এই বিশেষ মানবমূল্য সম্পর্কিত চেতনা—মনুষ্যত্বের এই স্বীকৃতির লক্ষণ দেখে,—ইংরেজ, ইংরেজি—তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে,—ইউরোপের মোহহীন বিজ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠা সম্বন্ধে—প্রত্যেকের সমানাধিকারের আদর্শে অনুপ্রাণিত আমাদের মন যেন মধ্যযুগের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে হঠাৎ আধুনিকতার উজ্জ্বল যুগান্তরে প্রবেশ করে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—"তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত, যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ, সেইখানেই আমাদের পরাভব।"

ইংরেজ শাসনের পর্বে ইতিমধ্যে ইতিহাস আরও এগিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন সভ্য ইউরোপের 'সর্দারপোড়ো' জাপানের জাগরণ ঘটেছে। বিশ্বজাতিসঙ্ঘের মধ্যে জাপানের জায়গা মেনে নিতে হয়েছে ইউরোপকে। প্রাচ্য জাতিরই অন্যতম প্রতিনিধি সেই জাপান। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা এইসূত্রেই—"অনেক দিন আশা করেছিলুম, বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে,"—আমরাও আমাদের দেশের সার্বিক কল্যাণের গতি দেখতে পাব, কিন্তু—"অনেকদিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ শাসনের প্রধান গর্ব ল এবং অর্ডর, বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর; দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন উৎপাদনের সুযোগ সাধন কিছুই নেই।...য়ুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠ দানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে য়ুরোপেরই সংস্রবে।" চীন, পারস্য, আফ্রিকা,—আমেরিকার নিগ্রোরা দলিত হয়েছে য়ুরোপের অমার্জনীয় ঔদ্ধত্যে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে।"

'নীতিবন্ধন-অসহিষ্ণু অধর্মসাহসিকতার ঔদ্ধত্য'—তাঁরই নিজস্ব ভাষায় বলা যায়, এই ছিল মধ্যযুগীয় প্রতাপ বা প্রভুত্ব বা গৌরবের লক্ষণ। আবার—সেই 'মুসলমান আমলের বাংলা সাহিত্যে'—'অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্যের লক্ষণ, এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেছে তখনকার দেবচরিত্র-কল্পনাকে।' এই ব্যাপারটি সুস্পষ্ট করবার জন্যেই তিনি এদেশে সেকালের জনবিশ্বাস—'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' উল্লেখ করে আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে যে 'ভূদেব' বলা হয়েছে শূদ্রের প্রতি অধর্মাচরণের অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছে তাঁদের, এই ব্যাপারটিরও সূত্র ধরে তার সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতা যে আমরা ইংরেজ-শাসনেই পেয়েছি—অর্থাৎ ইংরেজ যে আমাদের 'ন্যায়-আদর্শের সর্বভূমিকতা' শিখিয়েছে, সেই স্মরণীয় নতুন উপলব্ধির কথা তোলেন। যখন এই বিশেষ 'কালান্তর' প্রবন্ধটি লেখা হয় সেই আধুনিক কালেও আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর মনের স্ববিরোধ দেখান তিনি এইভাবে—"আজও আমাদের দেশে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহু লোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদের [illegible] দোহাই দিয়ে

নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে ; এ কথা ভুলে যায় যে, ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবল শক্তি।" ইউরোপের সংস্রবেই মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের ধ্যানে বেরিয়ে আসবার সুযোগ ঘটেছিল আমাদের। সেই নতুন কাজের মূল তত্ত্বটি হল ব্যক্তি-জাতি-সম্প্রদায় নির্বিশেষে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতায় আস্থা। কিন্তু শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধ এসে ইউরোপের সেই মহিমা ঘুচিয়ে দিয়েছে।—একদা যে ইংরেজের সংস্রব ছিল শুচিতার উদ্‌বোধক, সেই সংস্রবের স্বাদ গেছে বদলে। সেই ইউরোপই হয়ে উঠল নিষ্ঠুরতার চরম উদাহরণ। সভ্যতার সেই সংকটের তীব্রতা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

'সভ্যতার সংকট' নিবন্ধে আশি বছর উত্তীর্ণ হয়ে কতকটা স্মৃতিচারণার মেজাজেই ইংরেজের সংস্পর্শে এসে 'বৃহৎ মানববিশ্বের' সঙ্গে কীভাবে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে সেকথা উত্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—'তখন আমরা স্বাজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস।' অল্প বয়সে ইংলন্ডে গিয়ে জন ব্রাইটের পার্লামেন্টের ভাষণ শুনেছেন তিনি। তাতে হৃদয়ের ব্যাপ্তির স্বাদ পেয়েছেন। বার্কের বাগ্মিতা, মেকলের ভাষাপ্রবাহ, শেকসপিয়রের নাটক, বাইরনের কাব্য ইত্যাদি সেকালে বাঙালির তথা ভারতীয় মনের উৎসাহ বাড়িয়েছে ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে। সেকালে—'অত্যাচার প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলন্ডে।' এইসব স্মৃতির উদ্দীপনা ছিল তাঁর মনে। ইংরেজি 'সিভিলিজেশন' শব্দের প্রতিশব্দ খুঁজেছেন বাংলায়। তিনি অনুভব করেছেন যে সেরকম প্রতিশব্দ পাওয়া সহজ নয়। আবার তাঁকে জানাতে হয়েছে—"এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলশাস্ত্রের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃষদ্‌বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার।" অর্থাৎ, বিশেষ লোকাচার ছিল আমাদের,—সিভিলিজেশন ছিল না।—"এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম।" ইংরেজের প্রতি আমাদের সে আমলেব জাতীয় কৃতজ্ঞতার উল্লেখ করে এবং ইংরেজ ভারতের ঐশ্বর্যে কতো যে পুষ্ট হয়েছে তা-ও দেখিয়ে,—ইংরেজ আমাদের উত্তরোত্তর কত অবহেলা করেছে, তারও আলোচনা করেন। জাপানের যন্ত্রশক্তির মহিমা, রাশিয়ার সুবিপুল শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন এবং সেখানে মুসলমান ও অমুসলমানের রাষ্ট্র-অধিকারের বিরোধহীন ভাগবাঁটোয়ারাতে 'শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা',—পারস্যের নবজাগৃতির ফলে ইংরেজের অত্যাচার থেকে সে-দেশের মুক্তির যুগান্তর,—আবার ইংরেজের আফিমে জর্জর প্রাচীন সভ্য চীনের দুর্দশা ও পাশ্চাত্য যন্ত্রশক্তির চর্চায় উদ্ধত জাপান কর্তৃক চীনের উত্তর ভাগ গলাধঃকরণ ইত্যাদি দেখে ইউরোপের বর্বরতা সম্বন্ধে তাঁর ভর্ৎসনা তীব্র হয়ে ওঠে। কিন্তু সব সত্ত্বেও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো-কে 'পাপ' বলেছেন তিনি। আমাদের নিজেদের সমাজশক্তিকেই বৃহৎ, ব্যাপক, অকৃপণ ও আধুনিকভাবে জাগিয়ে তোলবার পরামর্শ দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ।

'অরণ্যসমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব' ও 'সভ্যতার বজ্র'

দেবীপদ ভট্টাচার্য

১৩০৯ সালে ১ বৈশাখ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ 'নববর্ষ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি এশিয়া ও আফ্রিকায় বণিকতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তি-মদমত্তরাষ্ট্রগুলির শোষণ ও শাসনের কঠোর নিন্দা করেছেন—

'কোথা হইতে বণিকের কামান প্রাচীন চীনের কণ্ঠে অহিফেনের পিণ্ড বর্ষণ করিতে থাকে ও আফ্রিকার অরণ্যসমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব সভ্যতার বজ্রে বিদীর্ণ হইয়া আর্তস্বরে প্রাণত্যাগ করে।'

কালো আফ্রিকার এই 'প্রাণত্যাগে'র ইতিহাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় মনে হয় ১৮৭৯ সালের পূর্বে ঘটেনি। ১৮৭৮ সালে ২০ সেপ্টেম্বর 'পুণা' জাহাজে চড়ে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সতেরো বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে বিলেতে রওনা হন। তিনি কয়েক ব্যক্তির সঙ্গে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমনস্-এ প্রথম যান ১৮৭৯ সালে ২৩ মে। তারপরে আবার যান বৃহস্পতিবার ১২ জুন তারিখে। ২৩ মে তারিখে ও'ডোনেল (O'donnell) নামে একজন আইরিশ এম. পি. ভারতে ১৮৭৮ সালে লর্ড লীটন কর্তৃক প্রচলিত 'ভার্নাক্যুলার প্রেস অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। আর ১২ জুন তারিখের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করলেন—

O'donnell নামে একজন আইরিশ মেম্বার উঠে জিজ্ঞাসা করলেন যে Echo এবং আরো দুই-একটি খবরের কাগজে জুলুদের প্রতি ইংরাজ সৈন্যদের অত্যাচারের যে বিবরণ বেরিয়েছে সে বিষয়ে গভর্নমেন্ট কি কোনো সংবাদ পেয়েছেন? আর সে সকল অত্যাচার কি খ্রিস্টানদের অনুচিত নয়? (য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, ৪র্থ)

তখন বক্তাকে অনেক বিদ্রূপ ও বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসিত ও শোষিত আয়র্ল্যান্ডের প্রতিনিধি ও'ডোনেল স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমালোচক ছিলেন। তিনি সহানুভূতি বোধ করেছিলেন ভারতবাসী ও আফ্রিকার নিপীড়িত মানুষের প্রতি। 'জুলু' যুদ্ধের যে-ঘটনার উল্লেখ ও বিবরণ ও'ডোনেল দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'জুলু' শব্দের রূঢ়ি অর্থ 'আকাশ', সেই 'আকাশ' নামবাহী জাতি বার বার বিদ্রোহ করেছে শ্বেতাঙ্গ চাতুরি ও শিকলের বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্ধন-শৃঙ্খলভার তাকে মেনে নিতে হয়েছিল ১৯০৬-১৯০৮-এর ইঙ্গ-জুলু যুদ্ধের পর। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'কাফির' বা 'কাফ্রি' যুদ্ধ নামে খ্যাত। আরবরা এদের বলত 'কাফির', তার থেকে পোর্তুগীজরা করেছিল 'কাফ্রে', বাংলায় আমরা করে নিয়েছি 'কাফ্রি'। অর্থের ব্যাপ্তিতে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জাতি সবাই 'কাফ্রি' নামে পরিচিত হল ভাগ্যের পরিহাসে।

সেদিনকার 'হাউস অব কমনস্'-এ ও'ডোনেল বলেন—

'ডেলি ক্রনিকল' পত্রিকার (৩ জুন ১৮৭৯) সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে 'কাম্বুলা' (Kambula) যুদ্ধে পরাজিত শত শত জুলু সৈন্য শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারীদের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছিল তখন তাদের গুলি করে, ছোরা মেরে, তরবারি চালিয়ে হত্যা করা হয়। যারা রক্তাক্ত দেহে তখনও প্রাণে বেঁচে ছিল, ব্যাকুলভাবে আবেদন করছিল, তাদেরও নির্মমভাবে মেরে ফেলা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লিখেছেন এই সংবাদ প্রথম 'টাইবারটন্ গেজেটে' ২৭ মে তারিখে বার হয়। সেখান থেকে সংবাদটিকে অবিকলভাবে নিয়ে Echo (ইকো) পত্রিকা ৩ জুন (১৮৭৯) প্রকাশ করে।

ও'ডোনেল জানান 'ইকো' পত্রিকায় প্রকাশিত একজন ব্রিটিশ সৈন্যের রণক্ষেত্র থেকে লিখিত চিঠির কথা। সেই চিঠির অংশবিশেষ তিনি পড়ে শোনান—

"On March the 30th, the day after the battle about eight miles from the camp, we found about five hundred wounded, most of them mortally and begging us for mercy's sake not to kill them; but they got no chance after what they had done to our comrades at Isandula."

তারপর মন্তব্য করেন ব্রিটিশ সৈন্যেরা দক্ষিণ আফ্রিকায় এই যে নির্মম অভিযান চালাচ্ছে সে কি কোনো সভ্য সমাজের আচরণবিধিসম্মত?

আইসানডুলার যুদ্ধের কথা (প্রকৃত শব্দ হল Isandlwhana) পূর্বোক্ত ব্রিটিশ সৈন্যটি জানিয়েছে। জুলুদের রাজ্যের অর্থাৎ জুলুল্যান্ডের অনেক অংশ প্রথমে হল্যান্ড থেকে আগত বুয়রেরা ও পরে ব্রিটিশেরা দখল করে নেয় ছলে-বলে-কৌশলে (১৮৩৮-৪৩)। যুদ্ধ বাধে যখন জুলুদের রাজা সেচওয়াইও (Cetshwayso) রাজি হলেন না তাঁর অধীনস্থ জুলু সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিতে এবং নিজেকে ব্রিটিশ আধিপত্যের কাছে পুরোপুরি সমর্পণ করতে। ১৮৭২-১৮৭৯ কালপর্বে তিনি জুলুভূমির অধিপতি ছিলেন। ১৮৭৮ সালে তিনি যখন ব্রিটিশ-প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করলেন তখনই যুদ্ধ বেধে গেল। আইসানডুলার যুদ্ধে (২২ জানুয়ারি ১৮৭৯) ব্রিটিশ সৈন্যের বিপর্যয় ঘটে, কিছু শ্বেতাঙ্গ সৈন্য হতাহত হয়। কিন্তু পরে যে যুদ্ধ চলে তাতে ১৮৭৯ সালে সাবেককালের অস্ত্রধারী জুলুদের পরাজয় হয় আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে। পরাজয়ের পর সেচওয়াইওকে নির্বাসনে পাঠানো হয় (১৮৭৯)। তিনি নিহত হন ১৮৮৪ সালে, তখন তাঁর ছেলে ডিনুজুলুর বয়স মাত্র ১৪ বছর। ১৯০৬-১৯০৮ সালের জুলুযুদ্ধে তাঁর পরাজয়ে জুলুল্যান্ডের শেষ রশ্মি নির্বাপিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন ও'ডোনেলের অভিযোগ শুনছিলেন তখন ১৮৭৯-র জুলুযুদ্ধ শেষ হবার মুখে। ও'ডোনেলের বক্তব্যের সমর্থনে আইরিশ হোমরুল আন্দোলনের নেতা স্টুয়ার্ট পার্নেল বলেছিলেন—

And this is the example which is to be set to our troops!
They pursue the flying enemy and massacre the wounded!
When you make a war against a savage nation, it follows
that you soldiers will also become more or less savage!

১৮৭৯ সালে জুলুরাজের পরাজয় ও নির্বাসনের পর জুলুল্যান্ডের ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্যর গার্নেট উলস্‌লি ঐ রাজ্যকে তেরজন ব্রিটিশ অনুগত গোষ্ঠীপতির (Chieftain) মধ্যে বণ্টন করে দেন।

এ-সব ঘটনা ঘটবার কয়েকমাস পরে রবীন্দ্রনাথ 'য়ুনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন'-এ তিন মাসের জন্য ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাশে ভর্তি হন (নভেম্বর ১৮৭৯-জানুয়ারি ১৮৮০)। কিন্তু তিনি ফেব্রুয়ারির গোড়ায় দেশে ফিরে আসেন। ১৮৮১ সালে রচনা করেন 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও অভিনয়ে 'বাল্মীকি'-র ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এই ১৮৮১ সালে তাঁর লেখা একটি ছোটো প্রবন্ধ 'দয়ালু মাংসাশী'-র প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ব্রিটিশদের আফগান যুদ্ধ ও সমকালীন আফ্রিকায় জুলুযুদ্ধের উল্লেখ করে তিনি তীব্র বিদ্রূপের ভাষায় লিখেছেন—

"উদ্ভিদভোজী ভারতবর্ষকে ইংরাজ শ্বাপদেরা দিব্যহজম করিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু পাকযন্ত্রের প্রতি অন্ধবিশ্বাস থাকাতে মাংসাশী কান্দাহার গ্রাস করিলেন, ভালো হজম হইল না ; পেটের মধ্যে বিষম গোলযোগ বাধাইয়া দিল। মাংসাশী জুলুভূমি ও ট্রানস্‌ভাল পেটে মূলেই সহিল না, আহার করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া মাঝের হইতে বলহানি হইল, রোগ হইবার উপক্রম হইল।"

(বিবিধ প্রসঙ্গ, অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড, পৃ ৩৫৯)

এখানে লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ 'ইংরাজ শ্বাপদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আফগান যুদ্ধ ব্রিটিশের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধের ব্যয়ভার অন্যায়ভাবে ভারতবাসীর উপর চাপানো হয়েছিল। আর ১৮৭১ সালে কিম্‌বার্লিতে হীরার খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় 'সভ্যের বর্বর লোভ' উদগ্র হয়ে উঠল। ইংরেজ ভাগ্যান্বেষী যুবক সেসিল রোডস্ (১৮৫৩-১৯০২) কিম্‌বার্লির হীরার খনির একচ্ছত্র মালিক হয়ে যান। বুয়রদের হাত থেকে নাটাল ব্রিটিশের অধীনে চলে গিয়েছিল প্রথমে ১৮৪২ সালে। তখন বুয়রেরা ট্রানস্‌ভালে বসতি গড়ে তুলেছিল। ১৮৭৭ সালে ব্রিটিশ সৈন্য ট্রানস্‌ভাল অধিকার করে নেয়। ১৮৭৮ সালে পল ক্রুগার ইংলন্ডে যান আলাপ-আলোচনার জন্য। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ১৮৮১ সালে ব্রিটেন শ্বেতাঙ্গ বুয়রদের ট্রানস্‌ভাল সরকারকে মোটামুটিভাবে মেনে নিয়েছে। বুয়রেরা গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা নয়। তারাও কৃষ্ণাঙ্গদের রাজ্য গ্রাসে তৎপর, সাম্রাজ্যিক স্বার্থে যুদ্ধরত। ১৮৮০ সালে ক্রুগারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহে 'মাইউবা হিল' বা 'মাজুবা পাহাড়'-র সংঘর্ষে ব্রিটিশ সৈন্য বিপর্যস্ত হয়। আর জুলুরা আইসানডুলা-র যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে ভীষণভাবে নাস্তানাবুদ করেছিল। সেজন্যই রবীন্দ্রনাথ উদ্‌ধৃত অংশে লিখেছেন—'মাংসাশী জুলুভূমি ও ট্রানস্‌ভাল পেটে মূলেই সহিল না'। বিংশ বর্ষীয় রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকার সমকালীন ইতিহাস ঠিকই বুঝেছিলেন।

এর কয়েক বছর পরে ১৮৯৩ সালে রবীন্দ্রনাথ একটি অসাধারণ প্রবন্ধ লেখেন 'রাজনীতির দ্বিধা'। তার থেকে অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত করি—

"সভ্য খ্রিস্টান আমেরিকায় কিরূপ প্রলয় ব্যাপার এবং অস্ট্রেলিয়ায় কিরূপ নিদারুণ লোকসংহার উপস্থিত করিয়াছিল সেই অপেক্ষাকৃত পুরাতন কথা পাড়িবার আবশ্যক দেখি না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাটাবিলি যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই অখ্রিস্টানের গালে খ্রিস্টান চড় কাহাকে বলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়..."

এই প্রবন্ধে 'ম্যাটাবিলি'[মাটাবেলে]দের রাজা 'আফ্রিকার বীর নেতা' জুলুরাজ 'লবেঙ্গুলার অপমৃত্যু'-র জন্য তিনি ব্রিটিশদের নিন্দা করেছেন। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে 'মাটাবেলে' ও 'লবেঙ্গুলা'-র প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি।

১৮৮৪ সালে লন্ডন-সম্মেলনে বুয়রদের অধিকৃত ট্রানস্‌ভালের স্বাধিকার স্বীকৃত হয়। মাটাবেলেদের রাজা ছিলেন ম্‌জিলিকাজি (Mzilikazi), তাঁর মৃত্যুর পর লবেঙ্গুলা সিংহাসনে বসেন। ১৮৮৭ সালে পিটার গ্রোবলার (Pieter Grobler) প্রিটোরিয়া থেকে রওনা হলেন বুলাওয়াও অঞ্চলে এন্‌ডেবেলে (Ndebele) জাতিগোষ্ঠীর সম্মানিত রাজা (এরাও জুলুগোষ্ঠী) লবেঙ্গুলার কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে যে তাঁর রাজসভায় বুয়রদের একজন প্রতিনিধি থাকবে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে সন্ধির শর্তরূপে। এই সন্ধির প্রকৃত অভিসন্ধি সরলপ্রাণ বীর নেতা ধরতে পারেননি। তিনি সন্ধিপত্রে সই করলেন।

এই সংবাদ শুনে সেসিল রোডস অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবিনসনকে বললেন আর দেরি করা চলে না। একদা আফ্রিকায় মিশনারি জন মোফাত (John Moffat) যিনি আবিষ্কারক মিশনারি লিভিংস্টোনের জামাতা, যাঁকে মিশনারি হিসাবে মাটাবেলে জাতিগোষ্ঠী বিশ্বাস করত, তিনি তখন মিশনারিত্ব ছেড়েছুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক কর্মচারীরূপে বেচুয়ানাল্যান্ডের সহকারী কমিশনার। তিনি 'মাটাবেলে-ল্যান্ড' পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক স্বার্থের কথা ভেবে। তাঁকে খবর পাঠানো হল যেন তিনি অবিলম্বে লবেঙ্গুলাকে বলেন যে বুয়র-জুলু চুক্তি বাতিল করতে হবে, ব্রিটিশ সরকার ঐ চুক্তিকে মানবে না। ১৮৮৮ সালে লবেঙ্গুলা তাঁর পুরাতন বন্ধু একদা মিশনারি জন্‌ মোফাতের কথায় বিশ্বাস করলেন, তিনি নতুন চুক্তি করলেন ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে, ঘোষণা করলেন মহারানী ভিক্টোরিয়ার সরকারের বিনানুমতিতে তিনি অন্য কোনো 'শক্তি'-র সঙ্গে সমঝোতায় যাবেন না। তবে শ্বেতাঙ্গদের মতিগতি সম্বন্ধে তাঁর পুরোনো বিশ্বাস আর রইল না।

লবেঙ্গুলা চেয়েছিলেন বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিকশক্তিগুলি তাঁর ক্ষমতার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করুক, বিশ্বাস রাখুক। তিনিও প্রতিদানে তাদের উপর আস্থা রাখবেন। বুয়র ও ব্রিটিশ উভয়ের লোভী মতলব সম্পর্কে পূর্বেই তিনি ওয়াকেফ্‌হাল ছিলেন। তিনি স্থির করেছিলেন শ্বেতাঙ্গদের কিছু 'খননকার্যের সুবিধা' (mining concession) দেবেন কিন্তু ভূমির স্বত্ব বা অধিকার ছাড়বেন না। তিনি ভাবছিলেন কোন্‌ পন্থায় তিনি 'মাটাবেলেল্যান্ড' ও 'মাশোয়ানাল্যান্ড'-কে রক্ষা করবেন এই শ্বেতাঙ্গ লোভীদের করাল গ্রাস থেকে? কেননা ১৮৬৭ সালে 'মাটাবেলে-মাশোনা' এলাকায় 'টাটি' নামক জায়গায় সোনার খনির সন্ধান মিলেছিল।

ব্রিটিশ কোম্পানি প্রদত্ত 'খননকার্যের সুবিধা' বা 'খননের অধিকার'-পত্রে লবেঙ্গুলা স্বাক্ষর করলেন, হস্তীমূর্তিচিহ্নিত নিজের রাজকীয় সিলমোহর বসালেন। এর পরিবর্তে তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা পাবেন প্রতি মাসে একশো পাউন্ড এবং এক হাজার ব্রিচ্‌লোডিং রাইফেল এবং কয়েক হাজার বন্দুকের গুলি। এমন কথাও হয়েছিল যে নগদ মুদ্রার বিকল্প স্বরূপ জাম্বেসি নদীর উপর পাহারাদারী 'স্টিম বোট'ও তিনি পেতে পারবেন। কিন্তু তার বিনিময়ে রোডস্‌-এর পাওনা হল লবেঙ্গুলার শাসনাধীন অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ সকলপ্রকার ধাতু ও খনিজবস্তুর উপর সম্পূর্ণ অধিকার এবং

রোডস্‌দের সম্মতি ছাড়া অন্য কোনো বণিকগোষ্ঠীকে খননের অধিকার দেওয়া চলবে না। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিকদের মতে সেদিন লবেঙ্গুলা নিজের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা নিজেই সই করলেন।

ইতিমধ্যে গ্লাডস্টোনের লিবারেল সরকারের বদলে ১৮৮৯ সালের মার্চ মাসে রক্ষণশীল দলের স্যালিস্‌বেরির সরকার কায়েম হল। স্যালিস্‌বেরি স্যর উইলিয়ম ম্যাক্‌কিনন-এর 'ইম্পিরিয়াল ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকা কোম্পানি'-কে এক 'চার্টার' মঞ্জুর করলেন (২৯ অক্টোবর ১৮৮৯) যার বলে তাঁরা পারবেন 'চুক্তি সম্পাদন ও আইন জারি এবং শান্তিরক্ষা করতে পুলিশ বাহিনীর সাহায্য নিতে। নতুন নতুন খনন-সুবিধা তারা গ্রহণ করতে পারবেন'। একই তারিখে সেসিল রোডস্‌ প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানি' মহারানীর প্রদত্ত 'চার্টার' লাভ করে। তারাও একই অধিকার লাভ করল।

এর ফলে ১৮৯০-এর জানুয়ারিতে 'রয়াল হর্স গার্ড'-এর কিছু পূর্ণ সজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য মহারানী ভিক্টোরিয়ার একখানি পত্র লবেঙ্গুলার হাতে দিল। এই পত্রে মহারানী তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন তিনি যেন উক্ত 'চার্টার্ড কোম্পানি'-র সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করেন। লবেঙ্গুলা সবই বুঝলেন, দেখলেন ব্রিটিশ সরকার অনুমোদিত 'পায়োনিয়ার ফোর্স' দলে দলে নানা অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে, সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ শুরু করেছে। তিনি বিচলিত হলেন, তখন এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ সেনাপতি জেমসন্‌ (Jameson) বুলাওয়ায়োনতে এলেন লবেঙ্গুলাকে বোঝাতে 'পায়োনিয়ার ফোর্স'-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। তাঁকে ক্রোধ চেপে রাজি হতে হল সোনা-শিকারিদের পথ করে দিতে। কিন্তু সোনা-শিকারিরা চায় মাশোয়ানাল্যান্ডে সোনার খোঁজে জমি খুঁড়তে, যে অঞ্চলকে লবেঙ্গুলা মনে করেন 'এন্‌ডেবেলে' জাতিগোষ্ঠীর (জুলুদের) অধিকারভুক্ত। তিনি মুখোমুখি যুদ্ধকে এড়িয়ে গেলেন—কিন্তু ব্রিটিশের সৈন্য তো প্রতিষ্ঠা করল সেই মাটিতে 'ফোর্ট ভিক্টোরিয়া', 'ফোর্ট স্যালিসবেরি'—উড়িয়ে দিল 'ইউনিয়ন জ্যাক'। ১৮৯১ সালে মাশোয়ানাল্যান্ড সম্পর্কে একটা বোঝাপড়া হল কিন্তু ব্রিটিশস্বার্থই প্রাধান্য পেল।

লবেঙ্গুলা মাশোয়ানাল্যান্ডে ব্রিটিশ 'পায়োনিয়ার ফোর্স'-এর কাজকর্ম সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। 'চার্টার্ড কোম্পানি'র সঙ্গে শক্তি-সাম্য বজায় রাখার জন্য তিনি জোহানেসবার্গের ব্যবসায়ী এডওয়ার্ড লিপার্ট (Edward Lippert)-এর সঙ্গে এক চুক্তি করলেন জমির সুবিধাদান করে—

I hereby grant to Edward Lippert the sole right...to lay out... farms and townships now are or may hereafter be occupied by British South Africa Company.

কিন্তু লবেঙ্গুলা রাজনৈতিক দাবাখেলায় হেরে গেলেন সেসিল রোডস-এর এক চালে। কেননা রোডস বহু আগেই লিপার্টের সঙ্গে এমন এক চুক্তি করে রেখেছিলেন যাতে সকল 'কনসেশন' রোডস-এর হাতে গিয়ে পড়বে। এই মাশোয়ানাল্যান্ড নিয়ে ১৮৯৩ সালের জুন মাসে অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ফোর্ট ভিক্টোরিয়ার ৫০০ গজ তার কাটা ও চুরি করার অপরাধে কোম্পানির পুলিশ ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের বহু গো-মহিষ-ভেড়া আটক করে। লবেঙ্গুলা আপত্তি করলে জেমসন সেগুলি সব ফিরিয়ে দিলেন কিন্তু অপরাধীদের শাস্তি দেবেন বলে জানালেন।

এই সব ব্যাপার নিয়ে শত্রুতা শুরু করলেন জেমসন। কিন্তু ওদিকে ইংলন্ডের শেয়ারের বাজারে কোম্পানির শেয়ার ক্রমশ মূল্য হারাচ্ছিল, এই আর্থিক ক্ষতি পূরণ করার অর্থাৎ শেয়ারের দাম চড়াবার একমাত্র উপায় যুদ্ধ বাধিয়ে লবেঙ্গুলাকে পরাজিত করা ও মূল্যবান ধাতুগর্ভ জমি দখল করা। যদিও মহারানী ভিক্টোরিয়া ব্রিটিশ হাই-কমিশনারের মারফত জানালেন—

'আপনি রাজাকে জানাতে পারেন যে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।' (আগস্ট ১৮৯০)—কিন্তু সত্যিই কি তা ঘটেছিল?

পরের মাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে তাঁর মাসিক প্রাপ্য সোনার কিস্তি ও অস্ত্রশস্ত্র লবেঙ্গুলা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন ব্রিটিশ সরকারকে, তাঁর অসন্তোষকে সুস্পষ্টভাবে জানাবার জন্য। রোডস্ দ্রুত সমস্ত সমরসম্ভার স্থলপথে পাঠিয়ে, নিজে গোপনে জাহাজে করে পৌঁছে গেলেন মাশোয়ানাল্যান্ডে, ব্রিটিশ হাই-কমিশনারের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে। অথবা হয়ত সবটাই শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।

১৮৯৩-এর অক্টোবরের মাঝামাঝি 'ফোর্ট ভিক্টোরিয়া' ও 'ফোর্ট স্যালিসবেরি' থেকে দলে দলে সৈন্য বেরিয়ে এল। 'এন্‌ডেবেলে' সৈন্য সংখ্যা পাঁচ হাজার, কিন্তু আধুনিকতম আগ্নেয়াস্ত্রসজ্জিত শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে নিদারুণ মার খেল। পরের যুদ্ধ ইম্‌বেম্‌বিজিতে (Imbembezi) একই দশা। শ্বেতাঙ্গ প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, লবেঙ্গুলার লোকেরা কোনো শ্বেতাঙ্গ রমণী, বৃদ্ধ বা শিশুদের হত্যা করেনি, তাদের কোনো সম্পত্তি লুঠ করেনি। অথচ এদেরই বলা হয় 'অসভ্য'। লবেঙ্গুলা বহু অনুচরসহ পালিয়ে গেলেন উত্তরে জাম্বেসি নদীর দিকে।

লন্ডনের বাজারে শেয়ারের দাম ঊর্ধ্বগতি লাভ করল।

লবেঙ্গুলাকে ধরবার জন্য মেজর ফর্বস্, মেজর অ্যালান উইলসনকে সঙ্গে নিয়ে ১৪২ জন সৈন্যসহ পিছু ধাওয়া করলেন। কিন্তু লবেঙ্গুলার অনুগত বাহিনীর হাতে সকলে নিহত হলেন। খবর পাঠাবার মতো একজনও বেঁচে ছিল না। কিন্তু মাটাবেলেল্যান্ডের বুলাওয়াওতে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। রাজাহীন, নেতৃত্বহীন গোষ্ঠীপতিরা একে একে ব্রিটিশের আনুগত্য ঘোষণা করে গেল। ক্রমে ক্রমে রাজার মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল। এইভাবে জুলুযুদ্ধে লবেঙ্গুলার, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আফ্রিকার বীর নেতা' তাঁর জীবন শেষ হল ১৮৯৪ সালে জাম্বেসি নদীর তীরে, যে নদী তিনি পার হতে পারলেন না।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্রুপ করে লিখেছিলেন 'আফ্রিকার অরণ্যসমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব সভ্যতার বজ্রে বিদীর্ণ হইয়া আর্তস্বরে প্রাণত্যাগ করে।' অন্যত্র লিখেছেন 'অসভ্য জাতিকে সভ্য করিবার ছলে'। আমরা লক্ষ করি তিনি 'ছলে' কথাটি প্রয়োগ করেছেন এবং এই 'সভ্যতা'র দোহাই তাঁর কাছে অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়েছিল। 'নৈবেদ্য' কাব্যে সংকলিত বিখ্যাত কবিতা 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে অস্ত গেল' সকলেরই জানা। সেখানে তিনি এই ছলনাকে ধিক্কার দিয়ে লিখেছেন—

দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিলফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে। (৬৪)

ইতিহাস কখনো ভুলতে পারে না ১৮৮৪-৮৫ সালে আফ্রিকা নিয়ে বিসমার্কের উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত বার্লিন সম্মেলনে ব্রিটিশ লিবারেল গোষ্ঠীর নেতা প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোনের (১৮০৯-৯৮) ছলনাময়ী ঘোষণা—

She (Germany) becomes our ally and partner in the execution of the great purposes of Providence for the advancement of mankind.

ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী স্যর থিওফিলাস্ শেপস্টোন ১৮৯২ সালে 'নাটাল মার্কারি' (Natal Mercury) পত্রিকার ২৯ জানুয়ারি সংখ্যায় লেখেন যে, লবেঙ্গুলার বংশ হল 'সভ্যতা বিস্তারের প্রতিবন্ধক' ('a hindrance in the way of civilisation')। তাই সভ্যতা বিস্তারের নামে 'দস্যুপায়ের কাঁটামারা জুতোর তলায় বীভৎস কাদার পিণ্ড' সৃষ্টি হল কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার মানুষের জীবনে এবং 'অশুচি কদর্য সেই চিরচিহ্ন দিয়ে গেছে তোমার অপমানিত ইতিহাসে'। আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই বিষাক্ত অজগর-রূপকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন তাঁর একটি প্রবন্ধে—

"বিলাতে ইম্পীরিয়ালিজমের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীনদেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সেদেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন।...সেসিল রোডস্ একজন ইম্পীরিয়ল বায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন।"

.(ইম্পীরিয়লিজম, ১৩১২, ১৯০৫)

'রূপমদোদ্ধত ইয়ুরোপ
দস্যুবেশে গিয়েছিল দীপহীন তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার বক্ষের 'পরে চালায়েছে রথ'—

সমগ্র কৃষ্ণ-আফ্রিকা সম্পর্কে কবির এ চরণগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। 'অসভ্য জাতিকে সভ্য করিবার ছলে' যে 'অজগরবৃত্তি' শ্বেতাঙ্গ বণিকতন্ত্র তথা রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে উদগ্র হয়ে উঠেছিল, কবি অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীদের অনেকে তার মৌতাত যুগিয়েছিলেন, মদত দিয়েছিলেন। অক্সফোর্ডে এক বক্তৃতায় জন রাসকিন বললেন—

"She (Britain) must form colonies abroad as far and fast as she is able."

পলমল গেজেটের (Pall Mall Gazette) সম্পাদক ডবলিউ. টি. স্টিড (W. T. Stead) এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন যে, ইংরেজের সংস্পর্শে 'peoples of waste and savage continents with men of our speech and lineage' ক্রমশ 'সভ্য' হয়ে উঠবে। এই সভ্যতা বিস্তারের আর এক বঞ্চনার ইতিহাস কৃষ্ণ-আফ্রিকার মধ্যাঞ্চলের কঙ্গো প্রদেশ।

রবীন্দ্রনাথ যে-কঙ্গো দখলের ও অন্যায় অবিচারের কথা বলেছেন সে হল বেলজিয়ান কঙ্গো, বেলজিয়ামের দ্বিতীয় লিওপোল্ড (Leopold II) দিয়ে যার নিষ্ঠুর অধ্যায় শুরু। রবীন্দ্রনাথ জেনেছেন 'কলিযুগের সিংহাসনটা পাতা হয়েছে লোভের উপর' সেখানে আজ প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি লুপ্ত—

"তাই ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য আজ বিধ্বস্ত, চীন বিষে জীর্ণ, পারস্য পদদলিত ; তাই কঙ্গোয় য়ুরোপীয় বণিকের দানবলীলা এবং পিকিনে বক্সার যুদ্ধে য়ুরোপীয়দের বীভৎস নিদারুণতা দেখিয়াছি।" (স্বাধিকারপ্রমত্তঃ, মাঘ ১৩২৪, জানুয়ারি ১৯১৮)

অপিচ

"ওদিকে আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশে ইউরোপীয় শাসন যে কী রকম বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা।" ('কালান্তর', ১৩৪০, ১৯৩৩)

কঙ্গো যদিচ ফরাসি ও বেলজিয়ান উভয় ইউরোপীয় শক্তির প্রভুত্বের তিক্ত স্বাদগ্রহণ করেছে, রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলি মুখ্যত বেলজিয়মের শাসনের বিরুদ্ধে উচ্চারিত।

রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতাটি রচনার পিছনে তাৎক্ষণিকতার অর্থাৎ ফ্যাসিস্ত ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) আগ্রাসী আক্রমণের আঘাত আছে সত্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ-বিংশ শতকে বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তিগোষ্ঠীর তথা আরবদের দ্বারা পরিচালিত ক্রীতদাস-ব্যবসার নগ্ন রূপকে তিনি ধরে দিয়েছেন—

এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।

তেমনি ব্রিটেন, পোর্তুগিজ, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, হল্যান্ড ও বেলজিয়ম—কেউই বিন্দুমাত্র কসুর করেনি এই কৃষ্ণ মহাদেশের মাটির তলায় স্তরে স্তরে সঞ্চিত কয়লা, তামা, লোহা, সোনা, হীরের ভাগ নিতে, আফ্রিকার কালো মানুষের রক্তে তাদের নদীর জল রাঙা করে দিতে। এই সামগ্রিক লুণ্ঠনের প্রতীকী ইতিহাস ধরা পড়েছে নিচের পংক্তিগুলিতে—

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে...
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।

আবিষ্কারক স্ট্যানলি নিছক সুদূরের পিয়াসী হয়ে মধ্য-আফ্রিকার গভীরে কঙ্গো নদীর হদিশ খুঁজতে যাননি (১৮৭৪-৭৭), গিয়েছিলেন শ্বেতাঙ্গ-স্বার্থ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লিভিংস্টোনের মতো। স্ট্যানলির এই আবিষ্কারকে কাজে লাগালেন বেলজিয়মের দ্বিতীয় লিওপোল্ড কঙ্গোয় কোম্পানি খুলে নিজের সর্বাত্মক আধিপত্য বিস্তারে। সে আধিপত্য 'মধুরের স্বপ্নাবেশে' ঘটানো হয়নি, সেখানেও 'সভ্যের বর্বর লোভ' প্রাধান্য পেয়েছিল। 'কাটাঙ্গা' দ্বিতীয় লিওপোল্ডের করায়ত্ত হল ১৮৯১ সালে। বেলজিয়ান সৈন্যবাহিনী পরিচালিত হয়েছিল একজন ইংরেজ সেনাপতির দ্বারা, তাঁর নাম ক্যাপটেন স্টেয়ার্স। কাটাঙ্গায় বেলজিয়ান পতাকা উড়ল, এর ফলে ঐ অঞ্চলে পূর্বোক্ত 'ব্রিটিশ চার্টার্ড কোম্পানি' তথা ব্রিটেন ক্ষতিগ্রস্ত হল, কেননা কাটাঙ্গা তাম্রসম্পদে ধনী।

১৮৮৪-৮৫তে বার্লিন সম্মেলনে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারার বিলি-ব্যবস্থা একরকম পাকা হয়ে যায়। দ্বিতীয় লিওপোল্ড কেপ অঞ্চলের সেসিল রোডসের মতো বিরাট কোম্পানি খুলেছিলেন। 'অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট'-এর মতো তিনিও গড়ে তোলেন 'কঙ্গো ফ্রি স্টেট'। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৮ অবধি কঙ্গো রাজ্য দ্বিতীয় লিওপোল্ডের ব্যক্তিগত

মালিকানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের উপর চরম অত্যাচার চালিয়ে বাণিজ্যিক স্বার্থকে উর্ধ্বে তোলা তাঁর কাজ। ১৯০৮ সালের পর কঙ্গো আর তাঁর ব্যক্তিগত এক্তিয়ারে থাকে না, মূল বেলজিয়ম রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়। কিন্তু তার ফলে কৃষ্ণাঙ্গের পিঠের দহন ও পেটের জ্বালা যে কিছুমাত্র কমেনি ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বেলজিয়ান কঙ্গোর শাসনযন্ত্রকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

১৯৩৫ সালের শুরুতে যখন ফ্যাসিস্ত ইতালি বেনিতো মুসোলিনির নির্দেশে আবিসিনিয়াকে আক্রমণ করল রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করেছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে তিনি 'আফ্রিকা' কবিতাটি রচনা করেন। এর আরও তিনটি 'পাঠ' আছে। ১৯৩৭ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি এই কবিতাটি রচিত হয়। আবিসিনিয়া আক্রমণকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে 'ছায়াচ্ছন্ন' আফ্রিকার সকল বঞ্চনা-লাঞ্ছনার রক্তাক্ত ইতিহাসকে রূপ দিয়ে গেলেন। বড়ো বেদনায় বড়ো মমতায় এক লাঞ্ছিতা কৃষ্ণা মানবীর রূপকে এই মহৎ কবি গড়লেন আফ্রিকাকে—

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস
যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল—
এসো যুগান্তের কবি
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে
বলো 'ক্ষমা করো'
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

কবিতাটির অন্য 'পাঠে' আছে—

দাঁড়াও ওই চিরনিপীড়িতা মানবীর কাছে
ওই অবমানিতার দ্বারে
ক্ষমাভিক্ষা করো

আমার মনে হয় এই 'পাঠে' বক্তব্য যেন বেশি জোরালো, বেশি তীক্ষ্ণ। ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের অংশবিশেষ তুলে ধরার বিনীত প্রয়াস করা হল। বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ অবশ্যই রয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ ও মানবধর্ম

অরবিন্দ পোদ্দার

শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, "তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে ;
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।"

উপনিষদের সুপ্রাচীন বাণীকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে প্রণাম জানিয়েছেন। সেই বাণীর মর্মার্থ অবলম্বন করে বর্তমান আলোচনার সীমা ঈষৎ চিহ্নিত করে নেওয়া যাক। উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তি থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, জাগতিক বিবর্তনের যে কাহিনী বিজ্ঞান আমাদের গোচরে এনেছে, অথবা মানুষের আবির্ভাব, ক্রমবিকাশ ইত্যাদির পশ্চাতে জৈবিক বিবর্তনের যে বিচিত্র ইতিহাস বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, রবীন্দ্রনাথের মানবিক উপলব্ধি সে সত্য আশ্রয় করে গঠিত বা বিকশিত হয়নি। অথবা, আধুনিক কালের দর্শনচিন্তা মানুষকে তার সমগ্র কর্মের কর্তা, তার সমগ্র অস্তিত্বের নিয়ামকরূপে নির্ধারণ করে তাকে যে মর্যাদা দান করেছে, রবীন্দ্রমানস সে ভাবনা দ্বারাও প্রভাবিত হয়নি। তাঁর উপলব্ধিতে মানবিক ঐশ্বর্যের স্বরূপ অন্যপ্রকার।

তাঁর সুগভীর বিশ্বাস ছিল যে, "আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব।" এই সত্যের আলোকে মানুষের অস্তিত্বের বস্তুগত বোধ, বস্তু-পৃথিবীতে তাঁর সৃষ্টিশীল বিহার ইত্যাদি অন্য এক আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সমাপ্তি মানুষের মধ্যে নয়, তার পরিণতি তাতে নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "উনি এর পরম গতি, উনি এর পরম সম্পদ, উনি এর পরম আশ্রয়, উনি এর পরম আনন্দ। অর্থাৎ, এর পরিপূর্ণতা তাঁর মধ্যে। উৎকর্ষের পথে এ চলেছে সেই বৃহতের দিকে, এর ঐশ্বর্য সেইখানেই, এর প্রতিষ্ঠা তাঁর মধ্যেই, এর শাশ্বত আনন্দের ধন যা কিছু তা তাতেই।" অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন, মানুষের বাস যে দেশে, সে দেশ প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক নয়, মানসিক। মানসিক বলেই পূর্বোক্ত পূর্ণ-পুরুষকে 'ব্যক্ত করার প্রত্যাশা নিয়ত চলেছে ভবিষ্যতের পথে' মানুষের কর্মকে আশ্রয় করে। সেই পূর্ণ পুরুষকে চিরন্তন মানবই বলি আর সর্বজনীন মানবই বলি, তাঁকে প্রকাশ করতে হবে সকল কালের সকল মানুষের হয়ে। সেই মানবই চিরন্তন সত্য, মৃত্যুর অতীত।

এই যুক্তিপরম্পরাকে ভিত্তি করেই তিনি লিখেছেন, "সমস্ত মানুষকে নিয়ে আছে একটি বৃহৎ ও গভীর ঐক্য। সেই ইন্দ্রিয়বোধাতীত ঐক্য সাংখ্যিক সমষ্টিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে

অতিক্রম করে। সেই হচ্ছে সমস্তের এক গূঢ় আত্মা, একধৈবানুদ্রষ্টব্যঃ, কিন্তু বহুধাশক্তিযোগে তার প্রকাশ। সেই ঐক্য বা মানবব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হোক বা না হোক, তিনি অবিভাজ্য, তাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র সত্তায় বিভক্ত করা যায় না। দেশ কালের সীমায় সীমিত যে খণ্ড খণ্ড মানবসত্তা বা ব্যক্তি-সত্তা, বাইরের পরিচয়ে তাদের মধ্যে প্রভেদ যতই বিচিত্র বা গভীর হোক না কেন, আত্মিক সত্যতায় তারা এক ; কারণ, তারা ঐ পরম একে আশ্রিত।" এ থেকে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে, "এক আত্মলোকে সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সত্য ; এই সত্যের আদর্শেই বিচার করতে হবে মানুষের সভ্যতা, মানুষের সমস্ত অনুষ্ঠান, তার রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র—এর থেকে যে পরিমাণে সে ভ্রষ্ট সেই পরিমাণে বর্বর।"

এ থেকে যে প্রশ্ন অপরিহার্য হয়ে ওঠে তা হল, মানবব্রহ্ম যদি এক এবং অবিভাজ্য হয়ে থাকে, তা হলে একই ঐতিহাসিক কালে দেশে দেশে মানুযে মানুষে অর্থাৎ সেই আত্মারই বিবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে এই বিরোধ, এত বিচ্ছেদ হানাহানি এত আত্মা-বিধ্বংসী সংগ্রাম কেন? রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে বলেন, "সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয়নি।" তাই, অতি সহজেই মনের মানুষকে সে হারিয়ে ফেলে, আর সেজন্যই মানুষের যত দুর্গতি, যত দীনতা। তখন, মানুষ আত্মিক সত্যতায় আপনকে উপলব্ধি করে না। "আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। মানুষের মানবসত্তা সম্পর্কে এ ধরনের বিকৃত বোধই জাতিতে জাতিতে শত্রুতা, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘাত, শোষণ অত্যাচার ইত্যাদি যাবতীয় জাগতিক সমস্যার মূলে।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবধর্ম সংক্রান্ত রচনায় এই বিশ্বাসই ব্যক্ত করেছেন।

এ থেকে আরও যে জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়, তা হল—মানুষের আত্মিক পরিচয়ই যদি রবীন্দ্রচিন্তায় মুখ্য স্থান অধিকার করে থেকে থাকে, তাহলে বস্তু-সম্পর্কের মধ্যে মানবধর্মের স্বীকৃতি কতদূর কার্যকর বা মূল্যবান? এ সম্পর্কে সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভাব অথবা আইডিয়ারও নিজস্ব একটি জীবন ও গতি আছে, সামাজিক ভাব-পরিমণ্ডলে তা-ও আবর্তের সৃষ্টি করে এবং বস্তুর বস্তুগত এবং গুণগত রূপান্তরে তারও অনস্বীকার্য প্রভাব। সেজন্যই সমাজ-পরিবেশে উচ্চারিত কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভাব কখনও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী তত্ত্ব মানুষকে তার স্বীয় পৃথিবীতে পার্থিব সম্পর্কের মধ্যে পূর্ণ মর্যাদায় স্বীকৃতি দান করেনি সত্য, কিন্তু সমস্ত মানুষকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করার যে ব্যাকুল আগ্রহ ও আর্তি তাঁর কাব্যকে মহিমান্বিত করেছে, তা তাঁকে কখনও পরিত্যাগ করেনি ; বরং বিশ্বমানবের কল্যাণচিন্তায় তাঁকে অনেক সময় উদ্‌ভ্রান্ত হতে দেখেছি। 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তাহলে মানুষ হলুম কেন?' তিনি তাঁর সুবিশাল বোধ দিয়ে আমাদের ভৌগোলিক গণ্ডীর বন্ধন ছিন্ন করেছেন এবং সে পথে আমরা বিশ্বাসী হয়েছি ; ভাবের ঐশ্বর্য দিয়ে তিনি আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করেছেন ; বিশ্বগত পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মুক্তির চিন্তায় আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। তাঁর আদর্শের এই অবদান কোনো অর্থেই উপেক্ষণীয় নয়।

মানুষের যেসব চিন্তা-কর্ম-ভাবনা মানবিক মূল্যের প্রকাশে সরস, তাতেই ছিল রবীন্দ্রনাথের সহজ আনন্দ ; তেমনি, যা এর অভাবে ক্ষুণ্ণ ও বিরস, তাতে তাঁর ছিল স্বাভাবিক বীতশ্রদ্ধা ও ক্ষোভ। মনুষ্যত্বের বোধহীন দীনতা তিনি কখনও সহ্য করতে পারতেন না ;

সে জন্য তাঁর মর্মবেদনার অবধি ছিল না। কারণ, দীনতা সমগ্র মানবিক সত্তার দীনতা। তাই তিনি বলেছেন, "আপনাকে যে খর্ব করে সে যে কেবল নিজেকেই কমিয়ে রাখে তা নয়, মোটের উপর সমস্ত মানুষের মূল্য সে হ্রাস করে। কেন না, যেখানেই মানুষকে আমরা বড় দেখি সেখানেই আপনাকে বড় বলে চিনতে পারি—এই পরিচয় যত সত্য হয় নিজেকে বড় রাখবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে তত সহজ হয়।" এই কথা উজ্জ্বল ঐশ্বর্যের কথা। এই প্রত্যয়ে আশ্রয়ী থেকে তিনি সারা জীবন ভারতবর্ষের ছোটো মানুষকে বড়ো মানুষ করার স্বপ্ন দেখে এসেছেন, তাদের আত্মশক্তিতে বলিষ্ঠ করার প্রত্যক্ষ কর্মোদ্যম গ্রহণ করেছেন। যদিও তিনি স্বয়ং আক্ষেপ করে বলেছেন তাঁর কবিতা বিচিত্রগামী হলেও সর্বত্রগামী হয়নি, তথাপি সব মানুষের সমৃদ্ধ উজ্জ্বল জীবনের পরিচয়ে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভারতবর্ষই যে তাঁর ধ্যানের, তাঁর ভালোবাসার ভারতবর্ষ, এ কথারও কোনো প্রতিবাদ চলে না।

শুধু ভারতবর্ষই বা বলি কেন, তাঁর মানবিক বোধ ভূগোলের সীমারেখায় খণ্ডিত বা সীমিত নয়; সীমা উত্তীর্ণ হয়ে তা বিশ্বের বিপুল বিস্তারে স্থিত। সমগ্র বিশ্বের মূক, অত্যাচারিত, শোষিত, জাতিহীন, গোত্রহীন, পঙ্‌ক্তিহীন মানুষ যারা তথাকথিত সভ্য সমাজের অনাদৃত এবং নিরাশ্রয়, সেইসব অপাঙ্‌ক্তেয়দের সঙ্গে বারংবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মীয়তা ঘোষণা করেছেন। 'পত্রপুট'-এর একটি কবিতায় অতি আকর্ষকভাবে তা বিধৃত রয়েছে—

দলের উপেক্ষিত আমি,
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।......
মানুষকে গণ্ডীর মধ্যে হারিয়েছি,
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি হাত জোড় করে—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের-তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

এই যে উপলব্ধি, তা মানব-ঐক্যের গভীর এক সত্যের স্বীকৃতিতে উদ্‌ভাসিত ; ঘৃণা, অবজ্ঞা আর ভেদচিহ্নের অন্ধকার পার হয়ে আলোকের পথে অমৃতলোকে তার উত্তরণ। এই উত্তরণ ভাববাদী চিন্তা-ভাবনায় সমৃদ্ধ ও বিবৃত হলেও এই বস্তু-পৃথিবীতে তা সৃজন করা সম্ভব ; অবশ্য বলা বাহুল্য, তার জন্য শোষণ-অত্যাচারভিত্তিক সমাজব্যবস্থার আমূল রূপান্তর অবশ্যই কাম্য। আর কাম্য, বিশ্বব্যাপী সর্ববিধ বন্ধন থেকে সমস্ত মানুষের মুক্তি। সেই মুক্ত সমাজে ভালোবাসার আলোক হৃদয় ভরে দেবে, প্রেমে ও ঐক্যে শক্তিশালী মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে নানান সৃষ্টিশীল উদ্যমে এবং মানব-অভিজ্ঞতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। রবীন্দ্রমানসের এই পরিচয়ই নিত্যকালের সত্যতায় ভাস্বর।

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের একটি চমৎকার উক্তির কথা স্মরণে আসছে। তিনি বলেছিলেন, একটা শব্দকে অত্যন্ত বাড়িয়ে ও চড়িয়ে দিয়ে যে জিনিসটা পাওয়া যায় সেটা হুংকার, আর সেই শব্দকেই সুর দিয়ে লয় দিয়ে সংযত সম্পূর্ণতা দিলে যে বস্তু লাভ করা যায় সেটা হল সংগীত। হুংকারটা হল শক্তি, আর সংগীতটা অমৃত ; অমৃতকে অঙ্ক দিয়ে অথবা হাতে-বহরে কোনোভাবে মাপবার কোনো উপায় নেই। এই উক্তির প্রয়োগক্ষেত্র প্রসারিত করে বলা যায়, মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনেও এর গুরুত্ব স্বীকার্য। মানুষ যেখানে ব্যক্তিগত বা প্রাদেশিক বা রাষ্ট্রিক বা দেশগত স্বার্থের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ, যেখানে সে শক্তির অধীন—তখন জীবন পরস্পর কোলাহল, বিবাদ আর হানাহানিতে বিদীর্ণ। আর, যখন সে সকলের সঙ্গে ঐক্যের অনুভবে উদার, তখনই তার জীবনে এবং অন্য সকলের জীবনে সংগীতের তথা অমৃতের আস্বাদন লাভ হয়। বস্তু-পৃথিবীর সীমার মধ্যে, প্রচলিত সামাজিক-রাষ্ট্রিক সংগঠনের বিধিনিষেধ ইত্যাদি রূপান্তরিত করে, মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ বাস্তবের মধ্যে এই অমৃতলোকের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা একান্তই সম্ভবপর।

রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবী এবং মানবিক অস্তিত্বের অন্তরালে যে একটি অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতে অভ্যস্ত ছিলেন, সেজন্যই তিনি এ কথা স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হননি। 'প্রকৃতি তাহার রূপ রস বর্ণ গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি-মন, তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া' এক অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রতি ধাবিত বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু, এই অধ্যাত্ম চেতনা সত্ত্বেও এক বিস্ময়কর বোধ তাঁকে বস্তু-পৃথিবীর আকর্ষণে রোমাঞ্চিত করেছিল। সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায় এই বোধকে আমরা ইহলোকমুখীনতা বলে আখ্যাত করতে পারি। সেজন্যই তিনি এ কথা স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হননি, "সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।" পুনশ্চ, "এই জগৎ তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় আশ্চর্য।" পৃথিবীর প্রতি তাঁর এই যাত্রা, এই ভালোবাসা ইত্যাদি সব মিলিয়েই তিনি·ধন্য প্রাণের সম্মানে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠে আমরা এই পৃথিবীকে এবং তার চিরকালের সংগ্রামরত সন্তান—মানুষকে—নতুনভাবে আবিষ্কার করি।

যুদ্ধ : কবির যন্ত্রণা

অমিতাভ চৌধুরি

'আমাদের যুদ্ধ, নহে কেহ ক্রুদ্ধ'। এমন নিরামিষ লড়াই কেবল তাসের দেশেই সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে যুদ্ধ 'তাসের দেশ' রচয়িতাকে পর্যন্ত সারা জীবন ক্রুদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে দুটি মহাযুদ্ধের বিভীষিকায় যন্ত্রণাকাতর হয়েছেন এবং জাপানের চীন আক্রমণ, ইতালির আবিসিনিয়ায় আক্রমণ, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, সোভিয়েত রাশিয়ার ফিনল্যান্ড আক্রমণ তাঁকে পীড়িত করেছে। অন্য দশজনের মতো তিনি নন, তাঁর মনের কথা স্পষ্টভাষায় বলেছেন, যাকে ধিক্কার দেবার তাকে ঠিকই দিয়েছেন, 'আমি কবি' সুতরাং 'কবিতা লেখা ছাড়া আমার আর করণীয় নেই' বলে চুপ করে থাকেননি, দেশের ও বিশ্বের সংকটে। এমনকী একালের বুদ্ধিজীবীর মতো সংবাদপত্রের বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়ে দায়িত্বমোচন করেননি। তাঁর অনন্যতা এইখানে। এই প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা ভালো যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের প্রাথমিক অগ্রগতি তাঁর অসুস্থ শরীরে এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছিল যে, অনেকের সন্দেহ যুদ্ধের নানা ঘটনা তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তিপ্পান্ন, তখন প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বাজে। নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন আগের বছর, দেশেবিদেশে তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত কবি। রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন নাটক রচনা শেষ। সবুজপত্র সবে বেরিয়েছে, এমন সময় ইউরোপে হুংকার। তারও আগে বেশ কিছু যুদ্ধ হয়ে গেছে। বুয়র যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ, বলকান দেশগুলির সঙ্গে তুর্কিদের যুদ্ধ। কিন্তু ওসব যুদ্ধ সীমিত ছিল বিশেষ বিশেষ স্থানে। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে যে যুদ্ধের শুরু, তা আরও ব্যাপক আরও ভয়ংকর। এই প্রবন্ধে আমার আলোচনা বিষয় প্রধান প্রধান যুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং এই সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য। প্রধানত তাঁর কথা দিয়েই তাঁকে উপস্থিত করব। তাতে রবীন্দ্রনাথ নামক মানবতাবাদী মানুষটিকে বোঝা সহজ হবে।

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। যুদ্ধ ঘোষণার পরের দিন মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় তিনি ক্ষুব্ধকণ্ঠে প্রার্থনা করলেন বিশ্ববিধাতার কাছে এইভাবে—"স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে রিপুর আঘাতে আহত হয়ে মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে। বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে, সেই বিশ্বপাপকে দূর করো। বিনাশ থেকে রক্ষা করো।" ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "সমস্ত ইউরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল? অনেক দিন থেকে। আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে।" তবে তিনি কয়েক দিন পরেই ওই মন্দিরের উপাসনাতেই বলেন, "আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"

এই প্রথম মহাযুদ্ধ কবির মনকে নানাভাবে নাড়া দিয়েছে, কিছু কবিতারও জন্ম দিয়েছে। জার্মানির বিরুদ্ধে বেলজিয়ামের মরণপণ লড়াই যখন চলছে, তখন তাঁর অবচেতন মনকে বেলজিয়ানদের বীরত্ব নাড়া দিয়েছে এবং জার্মানদের অগ্রগতি রোধ করার ঘটনা মনে রেখেই ওই সময় লেখেন—

বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে।
লুট করা ধন করে জড়ো,
কে হতে চাস সবার বড়ো—
এক নিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে,
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে।

এই যুদ্ধের সময়ই রবীন্দ্রনাথ লেখেন বলাকা, স্যর উপাধি পান, পরে ছাড়েনও এবং জাপান হয়ে আমেরিকা যান। আমেরিকা অবশ্য তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি।

১৯৩৫ সালে ইতালি আফ্রিকার সুপ্রাচীন দেশ আবিসিনিয়া—বর্তমান ইথিওপিয়া আক্রমণ করে। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই মুখর। শুধু বিবৃতি দিয়েই তিনি তৃপ্ত থাকতেন না, প্রতিবাদ জানিয়েই বিরত থাকতেন না, অন্তরে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতেন এবং তার প্রকাশ ঘটত রচনায়। তবে একই সঙ্গে মনে করতেন পরাধীন একটি দেশের নাগরিক হিসেবে তাঁর ধিক্কার তাঁর প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত নিরর্থক হয়ে ওঠে। শ্রীনেপাল মজুমদার তাঁর ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এই বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

ইথিওপিয়া আক্রমণ নিয়ে তাঁর মর্মবেদনার কথা ১৯৩৫ সালে প্রথম তিনি জানান এনড্রুজকে। এনড্রুজ তখন ইংল্যান্ডের পথে। এনড্রুজ কবির লেখা চিঠি প্রকাশ করেন ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে। সেই চিঠিতে কবি বলছেন—

I keenly feel the absurdity of raising my voice against an act of unscrupulous and virulent imperialism of this kind when it is pitiably feeble against all cases that vitally concern ourselves....

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে ড. অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে আর একটি চিঠিতে লেখেন—

"দিশি এমন একটা কাগজও নেই যাতে আবিসিনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ প্রকাশ করেনি। রাষ্ট্রনৈতিক শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই যে এটা করা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে বর্ণভেদমূলক উত্তেজনা আছে। ... বাইরের কর্মক্ষেত্রে আমাদের নিরুপায় অক্ষমতা সুদীর্ঘকাল করতে বাধ্য হয়েছি। তার বিরুদ্ধে কণ্ঠচালনা করে সান্ত্বনাচেষ্টারও অন্ত নেই। ক্ষীণ কলরবের ব্যর্থ প্রতিধ্বনি নিজের কাছে ফিরে এসে আমাদের পরিহাস করে। তবুও এই পথে অনেকদিন স্বরসাধনা করতে ছাড়িনি। এখন দিন শেষ হয়ে এল, বহির্মুখী চেষ্টাগুলোকে প্রতিসংহার করার সময় এসেছে। প্রবলের বাহুবল প্রয়োগের যুদ্ধপর্বটা আমাদের কাছে স্পষ্ট আকারে দেখা দেয়। তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের অর্থ বুঝতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু যুদ্ধের চেয়ে দারুণতর অভিঘাত আনা তার লাল রংটা চোখে পড়ে না বলে, সে সম্বন্ধে ইন্টারন্যাশনাল দরদ জাগাবার সম্ভাবনা নেই। তারই সাংঘাতিকতা দুর্বল জাতির পক্ষে সবচেয়ে মর্মান্তিক। আমাদের মতো দুর্বল যখন মার খায় তখন স্বীকার করে নিতে হয় সেটা অনিবার্য।"

ইথিওপিয়ার উপর ফ্যাসিবাদের উৎপাতে মর্মাহত হয়েই রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে আফ্রিকা কবিতাটি লেখেন এবং ইংল্যান্ডে নির্বাসিত সম্রাট হাইলেসেলাসিকে কবিতাটি ইংরেজিতে তর্জমা করে দেওয়া হয়। তারপর একই কবিতা উগান্ডার প্রিন্স নিয়াবোঙ্গোর উদ্যোগে সোহেলি ও বান্টু ভাষায় অনুবাদ করে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিলি করা হয়। ছায়াবৃতা আফ্রিকার প্রতি কবির হাহাকার পূর্ব আফ্রিকার ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছয় এবং কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁরাও বলেন—

সভ্যতার বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে
বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি
তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে।

জেনারেল ফ্রাংকো ১৯৩৬ সালে যখন স্পেনের গণতন্ত্র ধ্বংস করলেন, তখনও কবি নীরব থাকেননি, এক বিবৃতিতে তিনি বলেন—

In this hour of the supreme trial and suffering of the Spanish people, I appeal to the conscience of humanity. Help the People's Front in Spain, help the Government of the people, cry in million voices, halt to reaction, come in your millions to the aid of democracy, to the success of civilization and culture.

১৯৩৭ সালে লেখা 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থে 'চলতি ছবি' বলে একটা কবিতা আছে। তাতে স্পেনের গৃহযুদ্ধ এসে গেছে—

যুদ্ধ লাগল স্পেনে
চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।

এই সময়েই 'লীগ এগেনস্ট ফ্যাসিজম অ্যান্ড ওআর' নামে একটি সংঘ হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জওহরলাল, জয়প্রকাশ, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, ডাঙ্গে, এন জি রঙ্গ প্রমুখ।

তিরিশের দশকে জাপান চীনকে আক্রমণ করলে কবি একইভাবে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হন। তখনকার চীনা রাষ্ট্রপ্রধান চিয়াং কাইশেককে চিঠিতে লেখেন—

Your neighbouring nation (Japan) which is largely indebted to you for the gift of your cultural wealth and therefore should naturally cultivate your comradeship for its own ultimate benefit, has suddenly developed a virulent infection of imperialistic rapacity imported from the West and turned the great chance of building the bulwark of a noble destiny in the East into a dismal disaster, ...Japan has cynically refused its own great possibility, its noble heritage of 'bushido' and has offered a most painful disillusionment to us in an unholy adventure through which even some apparent success of her is sure to bend down to the dust, loaded with a total burden of failure.

এই চীন-জাপান যুদ্ধ নিয়েই রবীন্দ্রনাথকে জাপানি কবি নোগুচির সঙ্গে এক বিরক্তিকর বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয়। নোগুচি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী, শান্তিনিকেতনেও এসেছেন। চিয়াং কাইশেককে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি পড়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখা এক খোলা চিঠিতে এই যুদ্ধের জন্যে চিয়াং কাইশেককে দায়ী করেন। ওই পত্রের এক জায়গায় তিনি বলেন—

Believe me, it is war of 'Asia for Asia'. With a crusader's determination and with a sense of sacrifice that belongs to a martyr, our young soldiers go to the front......I do not know why we cannot be praised by your countrymen. But we are terribly blamed by them, as it seems, for our heroism and aim.

১৯৩৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে নোগুচির চিঠির কড়া জবাব দেন। তিনি বলেন, নোগুচির ওই 'এশিয়া ফর এশিয়া' কথাটা আসলে 'এন ইনস্ট্রুমেন্ট অফ পলিটিক্যাল ব্ল্যাকমেল'। তিনি চীনে জাপানি অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে স্পষ্ট ভাষায় বলেন,—

You are building your conception of an Asia which would be raised on a tower of skulls.

চীনের প্রতি কবির দরদ বরাবরের। তাই তিনি ওই চিঠিতে মুক্তকণ্ঠে বলেন—

China is unconquerable, her civilization is displaying marvellous resources.

নোগুচি আবার সেই চিঠির উত্তর দেন। রবীন্দ্রনাথও চীনের সমর্থনে নোগুচিকে পত্রাঘাত করেন। নোগুচি তাঁকে মধ্যস্থ হবার অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

I have no power to save that moral persuation, which you have so eloquently ridiculed.

কবি জাপানকে ভালোবেসেও তার রাজ্যলিপ্সাকে ক্ষমা করতে পারেননি। তাই শুভেচ্ছার বদলে দেন অভিশাপ। তিনি বলেন,

Wishing your people, whom I love, not success, but remorse.

কবির এই অভিশাপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সত্য হয়, জাপানকে চলতে হয় আমেরিকার কঠোর নির্দেশে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জাপানপ্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানের চীন আক্রমণ সমর্থন করে বিবৃতি দেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রচুর নিন্দাবাদ করেন। তাঁর এই ভূমিকা অবশ্যই নিন্দনীয়। ইচ্ছে করলেই তিনি সাম্রাজ্যবাদী আশ্রয়দাতার প্রকাশ্য সমর্থনে না এসে নীরব থাকতে পারতেন।

সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ঘৃণা আজীবন। কংগ্রেসের এক দলের বক্তব্য নিয়ে কবি ড. অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন, "ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদী গড়ে উঠেছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবার পাইনি, যখন মহাত্মাজিকে তাঁর ভক্তরা মুসোলিনী ও হিটলারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন?" ঠিক একইভাবে জাপানের হিটলারি আদবকায়দা কবি বরদাস্ত করতে পারেননি। মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীকে একদিন বলেন—চীনদেশের কাহিনী আর শুনতে পারিনে। ইচ্ছে করে না খবরের কাগজ খুলি, ইচ্ছে করে না রেডিওর খবর শুনি। কিন্তু না শুনেও তো পারিনে।

চোখ বুজে তো বেদনার অন্ত করা যায় না। এ অত্যাচারের ইতিহাস অসহ্য হয়ে উঠল। বাঁচতে ইচ্ছে করে না আর। এ পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। ···এ নৃশংসতা আর কত দেখব।

যেখানে যুদ্ধ যেখানে পররাজ্য গ্রাসের চেষ্টা, রবীন্দ্রনাথ সেখানে খড়্গহস্ত হয়েছেন, তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এমনকী এই ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়াকেও তিনি রেয়াত করেননি।

১৯৩৯ সালের ৩০ নভেম্বর রাশিয়া ফিনল্যান্ড আক্রমণ করে। কবি মর্মাহত হন। সোভিয়েত সম্পর্কে তাঁর এত উচ্চ ধারণা যে, এই ঘটনা তাঁকে অবশ্যই পীড়িত করতে পারে। ফিনল্যান্ডের এই দুর্দিনে তিনি ফিনল্যান্ডের পক্ষ অবলম্বন করেন। হেলসিংকিতে বোমা বর্ষণ তিনি কখনও সমর্থন করতে পারেননি, কোনো ব্যাখ্যাই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তিনি 'অলকা' কাগজে এক প্রবন্ধে বলছেন, "যুদ্ধের শেষ ফল কী হবে জানা নেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরা এক অতিকায় দানবকে হিমসিম খাইয়ে দিচ্ছে। রাশিয়া এই অসমকক্ষ দ্বন্দ্বে জিতলেও তার লজ্জা ঘুচবে না।" আর এক জায়গায় বলছেন, "প্রতিদিন তীব্র ঔৎসুক্যের সঙ্গে খবরের কাগজ খুলে দেখি দানবিকতার শল্য মানব-ইতিহাসের মর্মস্থলে কত দূর পর্যন্ত পৌঁছল।" এই মন্তব্য প্রবাসী পত্রিকার একটি বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি করেন ১৩৪৬ সনের মাঘ সংখ্যায়।

শান্তিচুক্তিতে সব মিটমাট হয়ে গেলেও কবি এই ঘটনার কথা ভুলতে পারেননি, বিশেষ করে তাঁর প্রিয় দেশ সোভিয়েত রাশিয়া এই আগ্রাসনের সঙ্গে জড়িত। সেই কারণেই সানাই কাব্যগ্রন্থে 'অপঘাত' নামে একটি কবিতা লেখেন, যাতে তাঁর মনোবেদনা প্রকাশ পায়। তিনি কবিতাটি শুরু করেন এইভাবে—

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিনল্যান্ড চূর্ণ হল
সোভিয়েত বোমার বর্ষণে।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরেই শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। হিটলারের জার্মানি দখল করে চেকোস্লোভাকিয়া, আক্রমণ করে পোল্যান্ড। তারপর একে একে ইউরোপের প্রায় সব রাষ্ট্রই হয় তাঁর করতলগত। হিটলারের সঙ্গে ইউরোপে হাত মেলায় ইতালির মুসোলিনি, এশিয়ায় জাপানের তোজো। কিন্তু যুদ্ধের সূচনায় হিটলারের সঙ্গে স্তালিনের মিতালি এবং পোল্যান্ডকে দু-দেশেরই যুগপৎ আক্রমণ অন্য আরও দশজনের মতো রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করে। তিনি এক বিবৃতিতে সর্বাগ্রে স্বাক্ষর করে বলেন, "ভারতবর্ষের সমবেদনা পোল্যান্ডের পক্ষে।"

১৯৩৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর অমিয় চক্রবর্তীকে লিখছেন, "মানুষের জগৎ দেখতে দেখতে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরে। ভুলে গিয়েছিলুম সভ্যতার অর্থ ক্রমশই দাঁড়িয়েছে বস্তুব্যবহারের আশ্চর্য নৈপুণ্যে। তার পিছনে অনেকদিন ধরে যে রিপু বীভৎস হয়ে উঠেছিল তার সম্বন্ধে লজ্জাভয় হয়েছে অনভ্যস্ত। এই রক্তপিপাসু বসে আছে পুলপিটের পিছনেই, কলেজক্লাসের আঙিনায়। ···আজ ব্যাবেল-এর স্তম্ভ পড়ছে ভেঙেচুরে। এর কোনো প্রতিকার আছে বলে ভেবে পাইনে। সারের পর সার আবর্তিত হল, থামবে কোথায়?"

আর একটি চিঠিতে লিখছেন, "দেখলুম দ্বারে বসে ব্যথিতচিত্তে, মহাসাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাওয়া।...দেখলুম ঐ স্পর্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকারচিত্তে এবিসিনিয়াকে ইটালির হাঁ-করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জর্মনির বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোস্লোভাকিয়াকে, দেখলুম নন-ইন্টারভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দিতে, দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে।...এই যুদ্ধে ইংলন্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্তমনে এই কামনা করি। কেননা মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না।"

মহাযুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে দেখে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সিভিল লিবার্টিজ নামে একটি সঙ্ঘ হয়। তার প্রেসিডেন্ট এইচ. ডব্লু. নেভিনসনকে কবি লেখেন—

I join with you in your crusade for the liberty of the human spirit and share your hope that the Western civilization will yet triumph over the ordeal that it has set for itself.

কবি এই সঙ্ঘের সহ-সভাপতি পদ নিতে রাজি হয়েছিলেন। প্রায় ওই সময়ই অর্থাৎ ১৯৪০ সালে কবি কালিম্পং থেকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে এক টেলিগ্রাম পাঠান। তিনি তাতে এই যুদ্ধকে 'ইউনিভার্সাল ডিজাস্টার' রূপে উল্লেখ করে বলেন—

Today, we stand in awe before the fearfully destructive force that has so suddenly swept the world.

এই সময়কার বহু কবিতায় কবির মনোযন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে। ১৯৪০ সালের ২৪ ডিসেম্বর 'প্রচ্ছন্ন পশু' নামক কবিতায় বলেন—

সংগ্রামমদিরাপানে আপনা বিস্মৃত
দিকে দিকে হত্যা যারা প্রসারিত করে
মরণলোকের তারা যন্ত্রমাত্র শুধু,
তারা তো দয়ার পাত্র মনুষ্যত্বহারা।

কবি নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের নির্দেশে চলতেন। এক্ষেত্রেও চলেছেন। তাই একটি বিবৃতিতে জার্মানির শাসনকর্তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অন্যায় আচরণের নিন্দা করেন এবং বলেন, "তবে আমার আশা এই যে, এই নরমেধযজ্ঞের রক্তগঙ্গায় অবগাহন করিয়া ধরণী পুনরায় শুচিস্নাতা হইবে। ধরণীর বুকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির অক্ষয়ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে এবং মানবতার জয় হইবে।"

রোগশয্যায় শুয়ে কবি যুদ্ধের খবর রাখতেন। রানী মহলানবিশ জানাচ্ছেন—যেদিন দেখেন জার্মানদের অগ্রগতিতে একটু বাধা পড়েছে, সেদিন মুখের কাছে কাগজখানা ধরে প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত খুঁটিয়ে পড়তেন। আর যেদিন বড়ো বড়ো হেডলাইনে লেখা থাকে জার্মান সৈন্য আজ এত মাইল সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছে, সেদিন কাগজখানা হাতে নিয়ে ওই হেডলাইনটা পড়া হলেই ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেন—'হয়ে গেছে নিয়ে যাও।' সেদিন অনেকক্ষণ মুখখানা ভার থাকে।

রানী মহলানবিশ 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে আর এক জায়গায় লিখছেন তাঁর কালান্তক অপারেশনের দিনের কথা। ৩০ জুলাই ১৯৪১ সাল। তখন সোভিয়েট বাহিনী হিটলারের সৈন্যদলকে প্রতিহত করতে শুরু করেছে। কবি খুব খুশি। বললেন—পারবে পারবে, ওরাই পারবে। ভারি অহংকার হয়েছে হিটলারের। গোয়েরিং গোয়েরিং, এখন দেখুক গোয়েরিং কী হয়। দুশমনরা।

এই হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এই উক্তি অপারেশন থিয়েটারে ওঠার ঠিক আগে।

যুদ্ধের খবর শুনে এবং হিটলারবাহিনীর অগ্রগতির সংবাদে রবীন্দ্রনাথ কত ব্যথিত হতেন, তার আর একটি বিবরণ দিয়েছেন মৈত্রেয়ী দেবী—

মনে পড়ে প্রত্যেক দিন রেডিওতে যুদ্ধের খবর শুনে, খবরের কাগজ হাতে নিয়ে মানুষের এই হিংস্রতার এই কলঙ্কে কী বেদনা তিনি পেতেন।...আমাদের কাছে দূর দেশের যুদ্ধ অনেকটা পরিমাণেই যুদ্ধের গল্প ছিল। কিন্তু সকল দেশ সকল মানুষ যাঁর আপন, তাঁর কাছে আর্ত মানুষের দুঃখ প্রতিদিন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে পৌঁছত। এতকষ্ট পেতেন যে, ইচ্ছে করত না তাঁকে খবর শোনাই। কিন্তু উপায় ছিল না। তাই গভীর বেদনা নিয়েই তিনি লিখেছিলেন 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী', আহ্বান করেছিলেন অনন্ত পুণ্যের আবির্ভাব। আবার সেই বেদনাপূর্ণ হৃদয়েই বিদ্রূপ করে লিখেছেন—

ঐ শোনা যায় রেডিওতে
বোঁচা গোঁফের হুমকি,
দেশ বিদেশে শহর গ্রামে
গলাকাটার ধুম কি!
গোঁ গোঁ করে রেডিওটা
কে জানে কার জিত,
মেশিনগানে গুঁড়িয়ে দিল
সভ্য বিধির ভিত।

চিরবিদায়ের অল্পদিন পূর্বে মানুষের এই কলঙ্কিত ইতিহাস তাঁকে তীব্র বেদনা দিয়েছিল।

শুধু তাই নয়, অসুস্থ শরীরে এই মর্মবেদনা তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল বলে আমার ধারণা। তবে শেষ পর্যন্ত মনুষ্যত্বের প্রতি হতাশা প্রাধান্য পায়নি। দুর্বল ও নিপীড়িত জাতির সমর্থনে এগিয়ে এসে তিনি জয়ধ্বনি দিয়েছেন মানবতাবাদের। তাঁর শেষ ভাষণ সভ্যতার সংকটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা এবং ভারতবর্ষের পরাধীনতা প্রধান হয়ে উঠলেও উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।

আজ যুদ্ধাভিলাষী কিছু রাষ্ট্রের হুংকার শুনে যতই ক্রুদ্ধ হই না কেন, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করে আজও আমরা বলতে চাই—'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।'

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

১

রবীন্দ্রনাথের নিজের শিক্ষা চিরাচরিত পথে চলেনি। বাল্যকালে তাঁর লেখাপড়ায় বারবার বিঘ্ন ঘটেছে। হয়ত-বা সে-কারণেই পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বাংলা নিবন্ধগুলি স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে ১৯০৫ থেকে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত নিবন্ধসমূহ—(১) ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, ১৯০৫ ; (২) শিক্ষা-সংস্কার, ১৯০৬ ; (৩) শিক্ষা-সমস্যা, ১৯০৬ ; (৪) জাতীয় বিদ্যালয়, ১৯০৬ ; (৫) আবরণ, ১৯০৬ ; (৬) তপোবন, ১৯০৯ ; (৭) ধর্মশিক্ষা ১৯১১ ; (৮) শিক্ষাবিধি, ১৯১২ ; (৯) লক্ষ্য ও শিক্ষা, ১৯১২ ; (১০) স্ত্রী-শিক্ষা, ১৯১৫ ; (১১) শিক্ষার বাহন, ১৯১৫ ; (১২) ছাত্র-শাসনতন্ত্র, ১৯১৫।

দ্বিতীয় ভাগে পড়ে ১৯১৯ থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত নিবন্ধসমূহ—(১) অসন্তোষের কারণ, ১৯১৯ ; (২) বিদ্যার যাচাই, ১৯১৯ ; (৩) বিদ্যা-সমবায়, ১৯১৯ ; (৪) শিক্ষার মিলন, ১৯২১ ; (৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, ১৯৩২ ; (৬) শিক্ষার বিকিরণ, ১৯৩৩ ; (৭) শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ১৯৩৫ ; (৮) শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ১৯৩৬ ; (৯) আশ্রমের শিক্ষা, ১৯৩৬ ; (১০) ছাত্র-সম্ভাষণ, ১৯৩৬।

স্বীকার্য, 'শিক্ষা'-গ্রন্থভুক্ত এই বাইশটি নিবন্ধ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, ইংরেজিতে ও বাংলায়।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে ব্রিটিশ রাজের উদ্যোগে যে-সব শিক্ষানীতি ও সংস্কার করা হয়েছিল সেগুলি ১৯০৪ থেকে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সঙ্ঘঠিত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের (১৯০১) সময় থেকে জীবনের শেষ দশক পর্যন্ত (১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা নিয়ে ভেবেছেন ও হাতে-কলমে কাজ করেছেন। এই সময়সীমার মধ্যে ভারতে শাসনকর্তৃপক্ষের উদ্যোগে যে-সব শিক্ষা-সংস্কার সাধিত হয়েছিল, তাদের নাম—বড়লাট কার্জন কর্তৃক নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও তার প্রতিবেদন (১৯০৪), কার্জন-ঘোষিত শিক্ষানীতি, ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে গোখলে আনীত প্রাথমিক শিক্ষা বিল (১৯১২)-এর প্রত্যাখ্যান, ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষানীতির ঘোষণা (১৯১২), স্যাডলার কমিশন নিয়োগ (১৯১৭) ও দুবছর বাদে প্রকাশিত প্রতিবেদন (১৯১৯), পঁচিশ বছরে (১৯২০-৪৪) ভারতের সবকটি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ, ভারতে সর্বপ্রথম বঙ্গ প্রদেশে শহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষানীতির প্রয়োগমূলক আইন প্রণয়ন (১৯১৯), বেঙ্গল রুর‍্যাল প্রাইমারি এডুকেশন আইন প্রণয়ন (১৯৩০), বিশ বছরে (১৯২৪-৪৪) বঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহনরূপে প্রয়োগ। ১৯৪০ নাগাত ভারতের

সর্বত্র এই নীতির প্রয়োগ, দশ বছরে (১৯৩৪-৪৪) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে অন্যান্য নীতির প্রয়োগ—যেমন, পলিটেকনিক, বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচি, বৃত্তিমুখী শিক্ষা এবং সর্বোপরি সার্জেন্ট প্ল্যান (১৯৪৪), যা ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামো নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছিল, যদিও তার সুপারিশগুলি কাজে পরিণত হবার পূর্বেই ভারত স্বাধীন হয়ে যায় (১৯৪৭) এবং শিক্ষানীতি রূপায়ণে ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। স্মর্তব্য, গান্ধিজীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় (১৯৩৮) বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থার একটা ছক প্রণীত হয়েছিল।

এই কালে বেসরকারি স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে-সব প্রধান ঘটনা ঘটেছিল এখানে সেগুলিকে স্মরণ করা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ব্রিটিশ সরকার-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব-মুক্ত শিক্ষাসূত্র গড়ে উঠেছিল। যেমন—লাহোরে দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক কলেজ, কাশীতে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ, লাল মুনশিরাম ওরফে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হরিদ্বারে গুরুকুল এবং বঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারের দিনে (১৯০৫-০৮) ব্রিটিশ সরকারের তথা বড়লাট কার্জনের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইতিবাচক গঠনমূলক রূপ নেয়। শিক্ষাগত অভিযোগগুলি স্বদেশী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়, বাংলার জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল স্থাপিত হয়। এর মূলে ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ শিক্ষাবিদ। অতি অল্প সময়ে লাখ লাখ টাকা চাঁদা ওঠে, জাতীয় শিক্ষানীতির অনুপুঙ্খ খসড়া প্রণীত হয়। কলকাতায় স্থাপিত হয় ন্যাশনাল কলেজ, অরবিন্দ ঘোষ তার অধ্যক্ষ হন। কারিগরি শিক্ষার জন্য একটি কারিগরি স্কুল স্থাপিত হয়। বঙ্গের সর্বত্র জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের এটাই সূচনা। স্বীকার্য, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের গুরুকুল ও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম (বোলপুর) এই আন্দোলনের অগ্রগামী দূত। এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মাতৃভাষা বা ভার্নাকুলার জাতীয় শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা জাতীয় বিদ্যালয়গুলি ছেড়ে সরকারি বিদ্যালয়ে ফিরে যায়। কেবল টিকে থাকে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, যার পরবর্তী রূপ যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং (স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়)। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ যেমন দ্রুত এসেছিল তেমন দ্রুত নেমে যায়, কিন্তু রেখে যায় কিছু ভাল ফল, যেমন—এই আন্দোলনের ফলে জনগণের শিক্ষা, বিশেষত বয়স্কশিক্ষা বিশেষ সমর্থন লাভ করে। গ্রামে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে স্থাপিত হয় অনেক নৈশ বিদ্যালয়। রাজনৈতিক কর্মীরা নৈশ বিদ্যালয়ে পড়ানোকে রাজনৈতিক কর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা দেখা দেয়। এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার কিছুই করেননি, অন্যদিকে গোখলে-আনীত প্রাথমিক শিক্ষাবিল ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পরাস্ত হয়।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত ভারত সরকারের শিক্ষানীতি এবং ১৯১৭-তে নিযুক্ত ও ১৯১৯-এ প্রকাশিত স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও সারা ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন কিছু উন্নতি ঘটেনি। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র স্যার হারকুর্ট বাটলার ঘোষণা করেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক ঘোষণার প্রশ্ন ওঠে না। দেড়শ বছর ইংরেজ শাসনের পরও ভারতে সাক্ষর লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫ থেকে ৬। স্যাডলার কমিশনের অন্যতম সদস্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কমিশন-প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বেই কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক-উত্তর বিভাগ প্রবর্তন করেন (১৯১৭)। আশুতোষের এই কাজ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৪। সে সময় উচ্চতর শিক্ষায় ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৭৬ হাজার,তাদের মধ্যে ১৬ হাজার ছাত্রী। এর অর্ধেকের বেশি সংখ্যাই ছিল ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী, ৮২ হাজার ফার্স্ট ডিগ্রি শ্রেণীর, মাত্র ৮ হাজার এম.এ., এম.এস-সি.-র ছাত্র। তখন ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩০ কোটি।

২

খ্রি ১৯০৫ থেকে ১৯১৭-র মধ্যে প্রকাশিত বারোটি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। জাতীয় শিক্ষার চরিত্র, লক্ষ্য ও পদ্ধতি, শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের উপযোগিতা বা ব্যর্থতা, মাতৃভাষা মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতির ত্রুটি, জাতীয় বিদ্যালয়ের আদর্শ, ধর্মশিক্ষার আবশ্যকতা, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে বিদ্যাদানের আদর্শ, নারীশিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা—এইসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এই বারোটি নিবন্ধে পাই।

'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৯০৫) নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন—কী করলে বিদেশী-চালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করে শিক্ষাকার্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। তিনি শিক্ষাকে ও শিক্ষার্থীকে পুঁথির গণ্ডির বাইরে আনতে চেয়েছিলেন। বিদেশী-চালিত কলেজি শিক্ষায় আমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মায়নি, কেবলই কতকগুলো মুখস্থ বিদ্যার চর্চা হয়েছে। কলেজি শিক্ষার এই ব্যর্থতা ঘোচাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে সংস্রব ব্যতীত সবই যথাসাধ্য রক্ষা করা জরুরি বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন। আর এই কাজে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে ডাক দিয়েছেন, কারণ বাংলার ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, এই পরিষদের আলোচ্য বিষয়। পরিষদ ছাত্রদেরকে তাদের কর্মযজ্ঞে আহ্বান করুক, এটাই রবীন্দ্রনাথ চান, তাহলে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হয়ে উঠবে। বাংলার উপভাষা, ব্যাকরণের বিচিত্র উপাদান, প্রাকৃত জনসম্প্রদায়ের নানা ধর্মাচার, লোকাচার, সামাজিক রীতিনীতি,—এক কথায় বঙ্গদেশের ঘরের কথা জানবার পথে তিনি ছাত্রদের আহ্বান করেছেন। স্বীকার্য, এখানে রবীন্দ্রনাথ বস্তুসম্পর্করহিত কল্পনা ও ভাবনা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ বস্তুজ্ঞানের উপর জোর দিয়েছেন। চারপাশের জীবন্ত সমাজ ও গ্রামকে বাদ দিয়ে শিক্ষা নয়, এ কথাটা এখানে তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন।

স্বদেশী আমলেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'শিক্ষা-সংস্কার' নিবন্ধ (১৯০৬)। ঊনবিংশ শতাব্দে ব্রিটিশ সরকার-নিয়ন্ত্রিত আয়ারল্যান্ডে শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, সেই স্যাকসন (ব্রিটিশ) শিক্ষাপদ্ধতি আয়ারল্যান্ডের কোনো উপকার করেনি, ক্ষতিই করেছে, কারণ 'ন্যাশনাল স্কুল' ওরফে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে জোর করে স্যাকসন (ব্রিটিশ) পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল, মাতৃভাষা (আইরিশ) বাদ দিয়ে স্যাকসন ভাষা (ইংরেজি) শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছিল, আর আইরিশ ভূ-বৃত্তান্ত ইতিহাস সমাজকথার চর্চা বন্ধ করা হয়েছিল। আয়ারল্যান্ডের শিক্ষাসংকটের সঙ্গে আমাদের দেশের

শিক্ষাসংকটের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করতে ও সেই ভাষায় বিদ্যাচর্চা করতে গিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীর মন জখম হয়ে যায়। ১৩-১৪ বছর থেকে ১৯-২০ বছর বয়স পর্যন্ত এই ব্যর্থ প্রয়াসেই আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এই বয়সটাই শিক্ষার সবচেয়ে অনুকূল সময়, কারণ এই কাঁচা বয়সে মন অজ্ঞাতসারে আপনার খাদ্য শোষণ করতে পারে, তখনি সে জ্ঞান ও ভাবকে আপনার রক্তমাংসের সঙ্গে পুরোপুরি মেশাতে পারে। আইরিশকে স্যাকসন করবার চেষ্টায় তার শিক্ষাকেই মাটি করা হয়েছে, তেমনি আমাদেরকে ইংরেজ করবার চেষ্টায় আমাদের শিক্ষাকে মাটি করা হচ্ছে। জার-শাসিত রাশিয়ায় এভাবেই মানুষের মন মরে যাচ্ছে, তা টলস্টয় দেখিয়েছেন। ডিসিপ্লিনের নামে পরের হুকুম মেনে চলার ও পরের মতের প্রতিবাদ না করার যে শিক্ষাবিধান তাকে আমরা কোনোমতে মেনে নিতে পারি না, এটাই রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

১৯০৬-এ স্বদেশী আন্দোলনকালে ও জাতীয় বিদ্যালয় গঠনকালে রবীন্দ্রনাথ আরও তিনটি নিবন্ধ লেখেন—'শিক্ষা সমস্যা', 'জাতীয় বিদ্যালয়' ও 'আবরণ'। এইসব নিবন্ধ থেকে অনুধাবন করা যায় রবীন্দ্রনাথ সেদিনকার স্বদেশী ও শিক্ষা-আন্দোলনের সঙ্গে কত গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, বেঙ্গল) অনুরোধে তিনি পরিষদের স্কুল বিভাগের একটি গঠনপত্রিকা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, ইউরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাব এমন নয়।

'শিক্ষাসমস্যা' নিবন্ধে তাই তিনি জাতীয় চরিত্র অনুযায়ী শিক্ষানীতি উদ্ভাবনের উপর জোর দিয়েছিলেন। ইউরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থেকে মানুষ হয়, স্কুল তার কথঞ্চিৎ সাহায্য করে। সেখানে শিক্ষার্থী যে বিদ্যা লাভ করে সে বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড়ো বাধা এই যে, শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ নেই। আমরা ইংরেজি স্কুলে পড়ি, তার সঙ্গে সমাজ, দেশ ও মনের যোগ বিচ্ছিন্ন। আমরা ইংরেজি বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সমাজকে, অর্থাৎ সেই বিদ্যা ও বিদ্যালয়কে, তার যথাস্থানে দেখতে পাই না। আমরা একে সজীব লোকালয়ের সঙ্গে মিশ্রিত করতে জানি না। এখানেই আমাদের শিক্ষার গলদ।

বিদ্যালয়ের (ইংরেজি স্কুলের) এদেশী প্রতি রূপটিকে কেমন করে আমাদের জীবনের সঙ্গে মেলাতে হবে তা-ই জানি না, অথচ এই জানাই সবচেয়ে জরুরি। এখানেই আমরা ব্যর্থ।

প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের এই বিচ্ছেদ ছিল না। অধ্যয়নকালে গুরুগৃহে বাস ও ব্রহ্মচর্যপালনের যে পদ্ধতি ছিল তাতে জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। চিরকাল উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থেকেই ভারতবর্ষের মন গড়ে উঠেছে। ইংরেজ আমলে শহরের স্কুলে আমরা সেভাবে মনকে গড়ে তুলতে পারছি না। এখানেই আমরা ব্যর্থ।

রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলেছেন, খোলা আকাশ, খোলা বাতাস, গাছপালা মানবসন্তানের শরীর-মনের সুপরিণতির জন্য অত্যন্ত দরকার। একদিন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় তার স্বীকৃতি ছিল। ব্রিটিশ আমলে তা নেই। তাই আমাদের শিক্ষাপ্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, আজও আমাদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন বন আর গুরুগৃহ। একালে বন আমাদের

সজীব বাসস্থান, গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। শহরের স্কুলে দুইয়ের কোনোটাই পাই না। শিক্ষার জন্য চাই উদার মুক্ত পরিবেশ, খোলামেলা আকাশ বাতাস। মনের বর্ধনকালে চাই বৃহৎ অবকাশ। চাই ইংরেজি মতের ডিসিপ্লিন নয়, স্বভাবের নিয়ম। তাই তাঁর প্রস্তাব—স্কুলের সঙ্গে অবশ্যই চাই খানিকটা খোলা জমি, চাই না বেঞ্চি-টেবিল। গাছের ছায়ায় খোলা হাওয়ায় তরুণ মন বিকাশলাভের অনুকূল পরিবেশ পায়। আমাদের সাহেবিয়ানার পরিবেশে তা পায় না। চাই আশ্রম। অর্থাৎ অবকাশ, প্রকৃতির সান্নিধ্য। ডিসিপ্লিনের নামে তরুণ মনকে চেপে রাখলে তা বাড়তে পারে না। বিদ্যালাভ চাকরির জন্য নয়, মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য। একথা যদি সত্য হয়, তবে চাই বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান। বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত। চাই তারই অনুকূল পরিবেশ।

জাতীয় বিদ্যালয় (১৯০৬) প্রতিষ্ঠার পরই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'জাতীয় বিদ্যালয়' নিবন্ধ। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য তিনি বিচার করে বলেছেন, এই কাজ আমাদের আত্মনির্ভরতা জাগিয়ে তুলেছে। এতদিন আমরা ভেবে বসেছিলাম দেশের সব মঙ্গলবিধানের দায়িত্ব গবর্নমেন্টের। এমন দায়িত্ববিহীন পরনির্ভরতায় পৌরুষের ক্ষতি করে। জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে আমরা তার থেকে রক্ষা পেলাম। স্বদেশ যে আমাদেরই কর্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তার সর্বপ্রধান কর্মী, তখনই আমরা এর সার্থকতা পাব। জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তারই সূচনা। আমরা আত্মশক্তির উদ্‌বোধন ঘটাতে পেরেছি, আমাদের ইচ্ছাই আমাদের প্রধান সম্বল তা জেনেছি, তার ফলে গবর্নমেন্টের উপর নির্ভরতা ঘুচবে। অনেকদিন পরে বাঙালি যাথার্থভাবে একটা-কিছু পেল। এটার প্রয়োজন ছিল। এটা আমাদের শক্তি। দেশের ও দশের জন্য আমরা যে ত্যাগ স্বীকার করতে পারি তা এখানে প্রমাণিত হল। এর ফলে আমাদের দেশে শক্তির অনাসৃষ্টি থেকে রক্ষা পেলাম। জাতীয় বিদ্যালয় এল আমাদের নিশ্চেষ্টতা জাড্য আত্মশ্রদ্ধাহীনতার দিনে। আমাদের বিধিদত্ত শক্তিসঞ্চয়ের একটি উপায়স্বরূপে আবির্ভূত হল জাতীয় বিদ্যালয়। আজ তা মঙ্গলের মূর্তি পরিগ্রহ করে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আশা করেছেন, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কেটে ফেলে শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হব।

বিশ্বজগৎ ও আমাদের স্বাধীন শক্তির মাঝখানে আমরা সুবিধার প্রলোভনে অনেকগুলো বেড়া তুলে দিয়েছি। এইরূপে সংস্কার ও অভ্যাসক্রমে সেই কৃত্রিম আশ্রয়গুলোকেই আমরা সুবিধা, ও নিজের স্বাভাবিক শক্তিগুলিকেই অসুবিধা বলে জেনেছি। শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা এই ধরনের বাধার বেড়া তুলে দিয়েছি। 'আবরণ' নিবন্ধে একথাই রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য।

মাটি জল বাতাস আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তেমনি মনের শিক্ষাও পূর্ণতা পায় না। আমরা সভ্যতা ভদ্রতার নাম করে শরীরকে কাপড় জুতো মোজা দিয়ে ঢেকে রাখি। তেমনি বই দিয়ে মনটাকে পুরোপুরি ঢেকে রাখি। মাস্টারমশায় শিশুকাল থেকেই আমাদের বই মুখস্থ করাতে থাকেন। অথচ বইয়ের ভিতর থেকে জ্ঞানসঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নয়। প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখেশুনে সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজে আমাদের মননশক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান। রবীন্দ্রনাথ সেই বিধানকে মান্য করতে চান। বইয়ের আবরণের বাইরে এসে নিজ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের মুক্তি দিতে চান।

বুলি ও পুঁথির বিবরের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের মধ্যে নিরানন্দ দেখা দিয়েছে। আর ছোটোরা বইয়ের মধ্যে মনটাকে বেঁধে রেখেছে। অবস্থাটা এই—জ্ঞান আনন্দের জন্য নয়, প্রাণের দায়ে, কতকটা মানের দায়ে। এর থেকে মুক্তি চাই। এটা সত্যকারের শিক্ষা নয়।

শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে অল্প হলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা। যা শিক্ষা নাম ধরে তার মনকে আচ্ছন্ন করে দেয় তাকে পড়ানো বলা যায়, কিন্তু তা শেখানো নয়। এর থেকে শিশুমনকে মুক্তি দিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ তীব্র ধিক্কার দিয়ে 'আবরণ' নিবন্ধে লিখেছেন :

"বিদ্যা জিনিসটা যেন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, শিশুর মন হইতে সেটাকে যেন তফাত করিয়া দেখিতে হয় ; সেটা যেন বইয়ের পাতা এবং অক্ষরের সংখ্যা ; তাহাতে ছাত্রের মন যদি পিষিয়া যায়, সে যদি পুঁথির গোলাম হয়, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি যদি অভিভূত হইয়া পড়ে—সে যদি নিজের প্রাকৃতিক ক্ষমতাগুলি চালনা করিয়া জ্ঞান অধিকার করিবার শক্তি অনভ্যাস ও উৎপীড়নবশত চিরকালের মতো হারায়—তবু ইহা বিদ্যা, কারণ, ইহা এতটুকু ইতিহাসের অংশ, এতগুলি ভূগোলের পাতা, এতক'টা অঙ্ক এবং এতটা পরিমাণ বি-এল-এ ব্লে, সি-এল-এ ক্লে!"

'ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত স্পষ্ট করে বলেছেন 'তপোবন' নিবন্ধে। ইউরোপ এই শিক্ষা বলতে যা বোঝে, ভারতবর্ষ তা বোঝে না। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে তিনি 'ন্যাশনাল শিক্ষা' বলে গণ্য করেন না। তাঁর মতে, জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করিনে, এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা।

আর একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গে তাঁর মত এখানে ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে নিতান্ত কলেজি শিক্ষা বলে কখনই বিবেচনা করেননি। তাঁর মতে, শিক্ষা জীবনের সম্যক সামগ্রিক উপলব্ধি আর ভারতের সাধনা হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে বলে তিনি মনে করেন। অর্থাৎ, কেবল কারখানায় দক্ষতা শিক্ষা নয় ; স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা নয় ; আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

'তপোবন' নিবন্ধে (১৯০৯) রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে বোধের শিক্ষালাভের উপর জোর দিয়েছেন, সে প্রসঙ্গে এসেছিল ধর্মশিক্ষার কথা। বোধের যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এখানেই উদারতম ধর্মবোধের ইঙ্গিত পাই। পরবর্তী নিবন্ধে—'ধর্মশিক্ষা'য়—তিনি এ কথাকে বিশদ করেছেন। টেকনিক্যাল এডুকেশন জীবনের একমাত্র সাধ্য নয়, একথা তিনি বলেছেন 'তপোবন' নিবন্ধে। 'ধর্মশিক্ষা' নিবন্ধে তিনি জোর দিয়েছেন স্বাভাবিক ধর্মশিক্ষার উপর। ধর্ম যেখানে পরিব্যাপ্ত

ধর্মশিক্ষা সেখানেই স্বাভাবিক বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। 'ধর্মশিক্ষা' নিবন্ধ লেখা হয় ১৯১১ সালে। সেদিনকার ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এখানে ব্যক্ত। বুদ্ধি ও ইচ্ছার টান বাহিরের দিকে এত বেশি যে অন্তরের দিকে কেবলই রিক্ততা। বেশির ভাগ আধুনিক সমাজের এই দশা। ব্রাহ্মসমাজে একই দশা, নিদারুণ অসামঞ্জস্য ঘরে বাহিরে। ভোগের উন্মত্ততায় বাহিরে প্রবল বেগে ছুটে চলার মত্ততা ঘরের শান্তিকে স্থৈর্যকে ধর্মীয় তপস্যাকে বিনষ্ট করছে। এর ফলে অন্যান্য আধুনিক সমাজের মতো ব্রাহ্মসমাজেও ভোগের তাণ্ডব, ধর্মচর্চা সেখানে উপেক্ষিত।

স্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথের এই সমাজ-বিশ্লেষণ নির্ভুল। তাঁর মতে পুরানো পৃথিবীতে সর্বত্রই শিক্ষা ব্যাপারটা ধর্মাচার্যদের হাতে ছিল, এখন তা রাষ্ট্রকর্তা সমাজপিতাদের হাতে। আজ পাশ্চাত্য দেশে সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথ এ-সব কথা লিখেছেন ১৯১১ সালে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, আমাদের দেশেও এই বিচ্ছেদ ঘটছে। বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাই ধর্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়ছে। তাই আজ জিজ্ঞাসা, বিদ্যাশিক্ষার মাঝখানে ধর্মশিক্ষাকে স্থান দেওয়া যায় কী করে। রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্রাহ্মসমাজে ধর্মশিক্ষা দানের সমস্যার আলোচনা করেছেন। আসলে তা আধুনিক ভারতীয় সমাজেরও সমস্যা।

আমরা মানুষের মনকে বাঁধব কী দিয়ে? তাকে ব্যাপৃত করব কী রূপে? তাকে আকর্ষণ করব কী উপায়ে? আমরা কি মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধর্মের বেড়াজালে বেঁধে রাখব? ব্যাপকার্থে, কোনো আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ নয়, কোনো ধর্মবিদ্যালয়ের টেক্স্ট-বুক কমিটির সংকলিত সামগ্রী নয়, তা জীবনের সামগ্রী, তা ভক্তের জীবনাশ্রয়ী। তা যদি হয়, তবে দেখতে হয়, কোনো আধুনিক সম্প্রদায়ের ভাবাত্মক লক্ষণটি কী? ব্রাহ্মধর্মের ক্ষেত্রে এই ভাবাত্মক লক্ষণটি কী? অবশ্যই তা অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনন্তের রসবোধ। তার একমাত্র পথ—ব্রহ্মের বোধ, মুক্ত সত্যের চর্চা। এটাই সত্যকারের ধর্ম। এই ধর্মশিক্ষা স্কুলে কলেজে হবে কীভাবে? তা হতে পারে একটা আশ্রয়ে। সে আশ্রয় পাই আশ্রমে অর্থাৎ যেকানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হয়ে একটি যোগাসন রচনা করেছে এমন আশ্রম।

রবীন্দ্রনাথ এই নিবন্ধে দাবি করেছেন, তিনি শান্তিনিকেতনে সেই আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, যা দিতে পারে প্রকৃত ধর্মশিক্ষা। স্মর্তব্য, ১৯১১ সালে তিনি এই দাবি করেছেন। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হয়েছিল ১৯০১ সালে আর ১৯২১ সালে স্থাপিত হয়েছিল বিশ্বভারতী, যার 'মটো' 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। এ কথাই 'ধর্মশিক্ষা' নিবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমরাই তো জগৎপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া চিত্তের বোধকে সর্বানুভু, ধর্মের সাধনাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিব, সেই জন্যেই এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

বিলেতে বসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'শিক্ষাবিধি' নিবন্ধটি (১৯১২)। বিদেশে যাবার আগে তাঁর যে সংকল্প ছিল তা নিবন্ধের সূচনায় ব্যক্ত—রবীন্দ্রনাথের সংকল্প ছিল, এখানকার (বিলাতি) বিদ্যালয়গুলিকে ভালো করে দেখে শুনে বুঝে নেবেন, শিক্ষা সম্বন্ধে বিদেশের কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কিনা তা দেখে যাবেন।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন দুই ধরনের শিক্ষাবিধির মধ্যে লড়াই। এক দলের মতে, চোখে-কানে ভাবে-আভাসে শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করে নেবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। অন্য দলের মতে, সচেষ্টভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করে সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করে নেওয়াই যথার্থ ফলদায়ক। রবীন্দ্রনাথের মতে, এ দুয়ের মধ্যে লড়াই কোনোদিন মিটবে না, কারণ মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এই লড়াই। শাসন না হলে চলে না, স্বাধীনতা না হলেও তার রক্ষা নেই; একদিকে তার পড়ে-পাওয়া জিনিসের প্রবেশদ্বার খোলা, আর-এক দিকে তার খেটে-আনা জিনিসের আনাগোনার দরজা খোলা। এ দুয়ের সামঞ্জস্য সাধনই মানুষের পক্ষে সৎশিক্ষা।

কিন্তু তা হবে কী উপায়ে? রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ, চিত্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করতে হয়। কিন্তু যেহেতু গতি বিচিত্র ও দুর্লক্ষ্য সে-কারণে তাকে নির্দিষ্ট করা কঠিন। এ অবস্থায় সকল জাতির পক্ষে আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।

কিন্তু আমাদের দেশে সবই সৃষ্টিছাড়া। সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য, অথচ সে ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করে রাখার চেষ্টা অহরহ চলছে এ দেশে। সুতরাং আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা দিচ্ছে না, দু-চার হাজার বছর আগেকার শিক্ষা বন্ধ। আমাদের সামাজিক বিদ্যালয় ও রাজকীয় বিদ্যালয়—দুটোই প্রকাণ্ড ছাঁচে-ঢালা ব্যাপার। প্রথমটার পুরনো শিকল আর দ্বিতীয়টার নতুন শিকল আমাদের মনকে যে পরিমাণে বাঁধে সে পরিমাণে মুক্তি দেয় না। এটাই আমাদের একমাত্র সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ চান, যেমন করেই হোক আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করতেই হবে। স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেদের নিতে হবে। দেশের কাজে যাঁরা আত্মসমর্পণ করতে চান এটাই তাঁদের সবচেয়ে বড়ো কাজ বলে তিনি মনে করেন।

বিলেতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'শিক্ষাবিধি' (১৯১২) নিবন্ধটি, সেই সঙ্গে 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' (১৯১২)। পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় সমাজের জাড্য নিশ্চেষ্টতা লক্ষ্যহীনতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। কাছের থেকে দেখার চেয়ে অনেক সময় দূর থেকে দেখলে প্রকৃত অবস্থাটা ধরা পড়ে, এই নিবন্ধ তার প্রমাণ। আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে (১৯১২ সালে) সাংঘাতিক অবস্থাটা কী? রবীন্দ্রনাথের মতে, আমাদের জীবনে কোনো সুস্পষ্টতা নেই। এটাই বিপজ্জনক। অথচ পাশ্চাত্য দেশে লক্ষ্যভেদের আহ্বান সবাই শুনছে তাদের জীবনে আছে স্পষ্ট লক্ষ্য। আমাদের এই শোচনীয় অবস্থাকে কাটাতে হলে চাই লক্ষ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্টতা। রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে লিখেছেন, "তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুনসেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে—এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।"

এই লক্ষ্য, উচ্চাদর্শ, স্পষ্টতা হোক আমাদের শিক্ষায় কাম্য।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন 'স্ত্রীশিক্ষা' নিবন্ধে (১৯১৫)। শ্রীমতী লীলা মিত্রের একটি পত্র নিবন্ধটির উপলক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রের মূল বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন—যা-কিছু জানবার যোগ্য তাই বিদ্যা, তা পুরুষকেও জানতে হবে, মেয়েকে জানতে হবে—শুধু কাজে খাটাবার জন্য যে তা নয়, জানবার জন্যই।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের পুরুষশাসিত সমাজের বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, মানুষকে পুরো পরিমাণে মানুষ করব একথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। মেয়েদের শিক্ষা দিলে ঝাঁটা বঁটি শিলনোড়ার কাজটা কে করবে—এই যুক্তিতে শিক্ষালাভ থেকে অনেকে মেয়েদের বঞ্চিত করতে চান। রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাবকে ধিক্কার দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, মেয়েরা যদি-বা কান্ট-হেগেলও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করবে, পুরুষদের দুর-ছাই করবে না। সুতরাং শিক্ষা থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করা উচিত নয়। তাই বলে তিনি মনে করেন না যে, শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে-পুরুষে কোনো ভেদ থাকবে না। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে—বিশুদ্ধ জ্ঞানের ও ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষে পার্থক্য নেই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। এই সত্যটা মেনে নিয়েই স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। মেয়েদের স্বভাবকে রক্ষা করেই স্ত্রীশিক্ষার নানা আয়োজন হতে পারে। স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব ; দাসী হওয়া নয়। এই সত্য মনে রেখে মেয়েদের সুখে-দুঃখে পুরুষের সহচরী করে নেওয়া উচিত বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন।

'শিক্ষার বাহন' নিবন্ধ (১৯১৫) বহুপঠিত। ইংরেজি, না বাংলা—শিক্ষার বাহন হবে কোন ভাষা, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট মতামত এখানে ব্যক্ত। স্মর্তব্য, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে গোখলে-আনীত প্রাথমিক শিক্ষা বিল প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' নিবন্ধ প্রকাশের দুবছর পরে (১৯১৭) স্যাডলার কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল, আরও দুবছর বাদে তার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল (১৯১৯)। প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক ঘোষণার দায়িত্ব অস্বীকার করেছিলেন তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র স্যার হারকুর্ট বাটলার। তখন ভারতে সাক্ষর লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫ থেকে ৬। স্যাডলার কমিশনের সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কমিশনের সুপারিশ প্রকাশের পূর্বেই স্নাতক ও স্নাতক-উত্তর পর্যায়ে কিছু প্রগতিশীল ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তার উল্লেখ করে লিখেছেন, "দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি পেটাপেটি করিতে হয়, সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুজ্জে মশায় ওরই মধ্যে এক জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন। তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই, বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না।"

শিক্ষাক্ষেত্রে আশুতোষের কীর্তির এই রবীন্দ্র-স্বীকৃতিটুকু মূল্যবান। এর পর রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন—যারা বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাবে না? এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ : বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর-বাড়িতে যেমন ইংরেজি ভাষাবাহননির্ভরতা চলছে তা চলুক, বাহির-বাড়িতে বাংলাভাষাবাহনের উপর নির্ভর করা হোক। রবীন্দ্রনাথ এই পরামর্শ দিয়েছিলেন ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। আজও আমরা মাতৃভাষার উপর নির্ভর করেই সর্বস্তরে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি।

বিদ্যালয় পরিচালনায় অর্জিত নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই রবীন্দ্রনাথ এই নিবন্ধ লিখেছেন ; লক্ষ করেছেন, একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করতে না পেরে যদি-বা তারা কোনমতে এন্‌ট্রেন্সের দেউড়িটা তরে যায়, উপরের সিঁড়ি ভাঙবার বেলাতেই চিত হয়ে পড়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে বহুসংখ্যক বসে-যাওয়ার (ড্রপ-আউট) অন্যতম কারণ এই ভাষাবাহন সমস্যা। যে বাঙালি ছেলে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করতে পারল না, আমরা কেন তাদের বিদ্যামন্দির থেকে যাবজ্জীবন আন্দামানে চালান দেব? এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বার বার তিনি দাবি করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার পথ খুলে দাও, মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা পেতে দাও। রবীন্দ্রনাথ ইতোমধ্যে দেখে এসেছেন জার্মানি ফ্রান্স জাপান আমেরিকায় আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কীভাবে দেশের চিত্তকে মানুষ করে তোলা হচ্ছে। তার অন্যতম উপায় মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ। রবীন্দ্রনাথ এ দেশে তা-ই চেয়েছেন।

৩

দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষা-নিবন্ধগুলি ১৯১৯ থেকে ১৯৩৬-র মধ্যে রচিত। এগুলিতে যে-সব সমস্যা আলোচিত তার মধ্যে প্রধান মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দানের সমস্যা। প্রথম বিশ্বসমরোত্তর ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংকটের চরিত্র বিচার করে তিনি সংকট-মুক্তির পথনির্দেশ করেছেন। তৎনির্দেশিত অনেক পথ আজও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। প্রধান নিবন্ধগুলির বক্তব্য পর্যালোচনায় তা অনুধাবন করা যায়।

'বিদ্যাসমবায়' নিবন্ধে (১৯১৯) রবীন্দ্রনাথ ভারতে শিক্ষাদানের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। ভারত-ইতিহাস ও ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানপরিচয় এখানে পাই।

তিনি দেখিয়েছেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা কীভাবে বিদ্যাকে কিছু লোকের একচেটিয়া অধিকারে পরিণত করেছিলেন। তিনি ঠাট্টা করে বলেছেন, আর-সব দেশের বিদ্যা মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভ্রম কাটিয়ে বেড়ে উঠছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ঋষিদের একচেটিয়া। দীর্ঘকাল আমরা বিদ্যাকে একঘরে করে রেখেছিলাম—অতি সম্মানের দ্বারা। এ-পথ আত্মঘাতী পথ। এখনকার দুনিয়ায় জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করবার দিন আজ আর নেই বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাঁর মতে, আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ এসেছে। তাঁর দাবি—এ দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান-প্রদানও তুলনা হবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রেখে বিচার করতে হবে। আর তাই করতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করে জানা চাই।

সন্দেহ নেই, সেদিন (১৯১৯) এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দুঃসাহসিকভাবে আধুনিক। তুলনামূলক বিদ্যাচর্চার দাবি এখানে জোরের সঙ্গে প্রকাশিত। ইতিহাসদৃষ্টি থেকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যার নদী আমাদের দেশে চারশাখায় প্রবাহিত—বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন। এর উদ্‌ভব ভারতচিত্ত-গঙ্গোত্রীতে। স্বীকার্য, ভারতের বিদ্যার স্রোতে বাহির থেকে এসেছে স্রোত। মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার স্রোতের সঙ্গে এসেছে ইউরোপীয় বিদ্যার স্রোত, তা যুক্ত হয়েছে ঐ চার স্রোতের সঙ্গে। তাই রবীন্দ্রনাথের দাবি, আমাদের বিদ্যায়তনে এই ছয়

স্রোতকে স্থান দিতে হবে। ১৯১৯-এ তিনি একথা লিখেছেন, বিশ্বভারতীতে (১৯২১) তাকে ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন।

১৯২১-এ লিখেছেন 'শিক্ষার মিলন' নিবন্ধ। আজকের দুনিয়ায় পশ্চিমী দুনিয়ার লোক জয়ী হয়েছে। একথা অবশ্যমান্য। এর কারণ রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, এই অধিকার ও জয় তারা পেয়েছে বিশেষ একটা সত্যের জোরে। পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে তাকে অবজ্ঞা করা যায় না। বিদ্যা-ই সত্য। সেই সত্যের জোরে পশ্চিমী দুনিয়া বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথ ছুটে চলে। বিশ্বঘটনার উপর কর্তৃত্ব করে বিজ্ঞানের সাধনার জোরে। তারা জাদু নয়, বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস-যুক্তিকে আয়ত্ত করেছে। বিশ্বশক্তি হচ্ছে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ। পশ্চিমী দুনিয়া তা অধিকার করেছে। এখানেই তাদের জোর।

পশ্চিম দেশ দুটি বিষয় সত্য বলে জেনেছে: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও এতটুকু ত্রুটি থাকতে পারে না ; রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে। শেষোক্তের ফলে পশ্চিম দেশে পলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ শুরু হয়েছে।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে না আছে বিশ্বনিয়মে আস্থা, না আছে ব্যক্তিবিশেষ ও পলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যে আস্থা। আমরা নিজেদের বুদ্ধিবিভাগে কর্তাভজা। এখানেই আমাদের যথার্থ পরাধীনতা বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন।

এর থেকে পরিত্রাণের পথনির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ পথে সাহায্য করতে পারে শিক্ষা। তাঁর মতে, বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি হওয়া চাই। স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা বলে তিনি মনে করেন। আগামী দিনের ইতিহাসে সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ হবে বলে তিনি মনে করেন। এই আশা রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন আজ থেকে প্রায় আট দশক পূর্বে, একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এ প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন ১৯১৯-এ, যখন প্রথম বিশ্বসমরক্লান্ত ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'লীগ অফ নেশনস্'। আরও একটি বিশ্বসমর ও বহু রক্তাক্ত সংঘর্ষ পেরিয়ে আমরা আজও মানবজাতির মিলনতীর্থে পৌঁছতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথ এখানে আশা ব্যক্ত করেছেন, শিক্ষাই সব দেশের জাতের মানুষকে মেলাতে পারে। তাই তিনি চেয়েছেন, আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। শিক্ষাক্ষেত্রই সব দেশের অতিথিশালা যেখানে প্রতি দেশ বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে ধন্য হবে। দুঃখের কথা, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের যত কিছু সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা তার পনেরো আনাই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা। এখানে বিশ্বের আতিথ্যের ব্যবস্থা নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব ভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধন-সম্পদ নেই, কিন্তু সাধন-সম্পদ আছে। তার জোরেই ভারত সত্যসাধনার মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করুক।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' নিবন্ধটি (১৯৩২) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ। ইউনিভার্সিটির উদ্‌ভব ইউরোপে। ভারতের মাটি থেকে তার উদ্‌ভব হয়নি। অথচ এদের পূর্বেই তক্ষশিলা-নালন্দা-বিক্রমশিলা বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা। সেগুলি ইউনিভার্সিটির প্রথম প্রতিরূপ। এ দুয়ের কোনো নিবিড় যোগ নেই। ঐসব বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বিদ্যার সঞ্চয় মাত্র নয়, বিদ্যার গৌরব ছিল প্রতিষ্ঠিত। সেখানকার আচার্যদের যশ ছিল বহুদূরব্যাপী ;

তাঁদের কাছে আসত সারা দুনিয়ার ছাত্ররা। ঐসব স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ প্রাণ-উৎস ছিল আপন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রতি সর্বজনের উদার শ্রদ্ধা যা প্রভূত ত্যাগস্বীকারে অকুণ্ঠিত। তার সঙ্গে আজকের ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো তুলনাই চলে না। ইউরোপীয় ইউনিভার্সিটির উদ্‌ভব ছিল মধ্যযুগে ইউরোপে ধর্মের পরিবেশে। এখনকার পাশ্চাত্য ইউনিভার্সিটি আধুনিক বিদ্যাচর্চায় প্রবৃত্ত। তার সঙ্গেও দেশের চিত্তের যোগ আছে। আমাদের দেশে তা হয়নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকদিন ধরে (১৮৫৭-১৯১৭) ইংরেজি ভাষার অপ্রতিহত শাসন চলছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেখানে মাতৃভাষার জন্যে স্থান করে দিলেন আঙিনায়, স্থাপন করলেন গবেষণা বিভাগ। কেবল বিদ্যার ফসল জমানো নয়, ফসল ফলানোর বিভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মশ্রদ্ধার প্রবর্তন হয়েছে এখানেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক পদে সেদিন কবিকে বৃত করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, স্বদেশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলন-সেতুরূপেই তাঁকে এই আসন দেওয়া হয়েছে।

'শিক্ষার বিকিরণ' নিবন্ধে (১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথ ভারতে জনশিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। পূর্বেকার জনশিক্ষাব্যবস্থা ছিল দেশের মাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। পূর্বেকার জনশিক্ষাব্যবস্থাগুলি ছিল চিত্তাকর্ষী। পালাগান কথকতা কীর্তনের মধ্য দিয়েই সারা দেশ জ্ঞানলাভ করেছে, রসভোগ করেছে। ব্রিটিশ আমলে তার জোগান বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু তার বদলে কিছু এল না। তার ফলে দেশের চিত্তক্ষেত্র শুকিয়ে গেল। শহরের লোকেরা পেল ইংরেজি শিক্ষা। ফলে দেশের মানুষে মানুষে ঘটল বিচ্ছেদ। নগরী হল সুজলা সুফলা। গ্রাম হল শুষ্ক নিরানন্দ প্রাণহীন। জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি ব্রিটিশ আমলে বিনষ্ট হয়ে দেশের সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, তা মরুভূমি হয়ে গেছে, জল নেই, পাঁক আছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় যদি গ্রামদেশের মানুষের চিত্তকে সঞ্জীবিত করতে পারে তবেই সত্যকার উপকার করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে গ্রামের মানুষের উপকার করতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তার পরামর্শ দিয়েছেন। অনেকটা আজকের 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা'র কথাই তিনি বলেছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ তিনি এখানে করেছেন।

'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' নিবন্ধে (১৯৩৫) রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় মানবিক গুণসমূহ চর্চার উপর জোর দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতে জীবনচর্যায় তিনি এর সমর্থন পেয়েছেন। অন্তরের পূর্ণতা সাধনই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন, সেক্ষেত্রে সংস্কৃতির চর্চা জরুরি। বাহিরে কর্মকুশলতা, অন্তরে সম্মানবোধ—এ দুটিই তাঁর লক্ষ্য। একদা বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এটাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। চাই আত্মবিশ্বাস। 'আমি সব পারি, সব পারব'—আজ এই বাণী সমস্ত ইউরোপের। রবীন্দ্রনাথ এটাই চান। 'আমি সব জানব, সব পারব', এর চেয়ে বড় মন্ত্র আর কিছু নেই। তাঁর মতে এটি আত্মার প্রবল শক্তি। এরই জোরে মানুষ জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাণকে তুচ্ছ করে, কিছুতে ভয় করে না, ব্যাধিকে স্বীকার করে না, বিপদকে গ্রাহ্য করে না। বিখ্যাত সুইডিস পর্যটক স্বেন হেডিনের অভিযানে এই প্রবল শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন সংস্কৃতি-চর্চা। সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে করে অন্তঃকরণে শান্তি আসে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে,

আত্মসংযম আসে এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' নিবন্ধে (১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে তাতে বাধা পড়ে। মাতৃভাষায় ভাবপ্রকাশের সুযোগ ও অধিকার পেলে তা জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়। আপন বিদ্যাচর্চার সূচনাপর্বের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, তাই কচি বয়সে রচনা করা ও (ইংরেজি ভাষার সঙ্গে) কুস্তি করাকে এক করে তুলতে হয়নি। "নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না ; ইংরেজির অতি প্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাবধানে সেলাই করে কাঁথা বুনতে হয় না।"

রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকৃতি অশেষ মূল্যবান। জীবন-সায়াহ্নে এই বক্তব্যে শিক্ষার বাহন সম্পর্কে তাঁর অভিমত চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। এই নিবন্ধে শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালি (তথা ভারতীয়) ছাত্রদের দুর্গতির চরিত্র ও কারণসমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে। 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ', এ কথার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলুম ; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব।" 'শিক্ষায় ঐক্য-সাধন ন্যাশনাল ঐক্য-সাধনের মূলে'—একথা তিনি এখানে জোর দিয়ে বলেছেন। সার্বজনিক অবশ্যশিক্ষা প্রবর্তনে গোখলের প্রয়াস একদা (১৯১২) ব্রিটিশ শাসকের কাছে বাধা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এখানে জানিয়েছেন, গোখলেকে বাধা দিয়েছিলেন বাংলা প্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোক। এ নিবন্ধেই তিনি জানিয়েছেন, "শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়, সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর জাদুমন্ত্র দিয়েছেন।"

'ইংরেজি-ভাষায়-পেটাই-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় ভার' বহন করাকে আমাদের ভাগ্য বলে মেনে নিতে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছেন। "ভালো করে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো করে ইংরেজি শেখার সহায়তা হতে পারে", তিনি সাহস করে একথা বলতে চেয়েছেন। "উচ্চশিক্ষাকে চিরকাল অথবা অতি দীর্ঘকাল পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে থাকতেই হবে, কেননা এ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নেই", এই কঠিন তর্ককে রবীন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন ভারতেরই সেদিনকার এক নবীন বিশ্ববিদ্যালয় হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ দিয়ে। সেখানে উচ্চশিক্ষার সর্বস্তরে উর্দু শিক্ষাবাহনরূপে গৃহীত হয়েছিল। স্যার আকবর হায়দরিকে এই সাহসের জন্য তিনি তারিফ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার এই পর্যালোচনা থেকে আমরা তাঁর শিক্ষাবিষয়ক ভাবনায় সাহসিকতা, আধুনিকতা ও উদারতার পরিচয় পাই। স্বীকার্য, তাঁর চিন্তা পুঁথিগত নয়, বস্তুগত, জীবন থেকে আহরিত।

গণমুক্তির স্বপ্ন, তার বাস্তবরূপ এবং রবীন্দ্রনাথ

জ্যোতির্ময় ঘোষ

"আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্যসভ্যতার ঐ প্রাচীন ভূমির (ভারতবর্ষের) সব মানুষ শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবেন। আমার বহুদিনের স্বপ্ন, যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণমানসমুক্তির স্বপ্নের বাস্তবরূপ দেখতে আমায় যাঁরা সাহায্য করলেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।"

শিক্ষা, সাম্য ও গণমুক্তির আদর্শের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ নিয়ে তর্কের কোনো অবকাশ নেই। ১৯৩০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মস্কোতে ট্রেড ইউনিয়ন ভবনের জলসায় তাঁর আদর্শের কথা একেবারে ঘোষণাবাক্যের মতো উচ্চারণ করেছিলেন তিনি। 'সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের (পৃষ্ঠা ৬৯) সংশ্লিষ্ট উদ্‌ধৃত অংশটি থেকেই তা সুস্পষ্ট।

সোভিয়েতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষা, সাম্য ও গণমুক্তির স্বপ্নের বাস্তবরূপ দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দেখে মুগ্ধ-অভিভূত হয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন তাঁর সোভিয়েত পরিক্রমার ব্যবস্থাপকদের।

তবে কি রবীন্দ্রনাথ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকেই জীবনের পরিণত পর্বে পৌঁছে সমর্থন করেছিলেন? কেন না, অগণিত দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষের দেশ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের করতলগত একটি উপনিবেশ থেকে গিয়ে সোভিয়েত পরিক্রমার অভিজ্ঞতায় আকস্মিকভাবে মুগ্ধ-অভিভূত রবীন্দ্রনাথ তাৎক্ষণিক মোহাবেশ থেকেই সোভিয়েত ব্যবস্থার মাহাত্ম্যকীর্তনে সোচ্চার হয়েছিলেন? বলতে পারেন কেউ-কেউ।

হতে পারতেন। কিন্তু তা যে এক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে হয়নি, সেই সত্যটি অনুভব করাও কঠিন হয় না, যদি আমরা রবীন্দ্রজীবন, সাহিত্য ও কর্মের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত জেনে-শুনে তার সামগ্রিক ও পরিণত রূপটিকে সুচিহ্নিত করতে পারি।

সোভিয়েত-পরিক্রমার আমন্ত্রণ পেলেন, সোভিয়েতে গেলেন এবং মাত্র তেরো বছরে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার যাবতীয় বিধি-বন্দোবস্ত ও উন্নয়ন দেখে মুগ্ধ হলেন আর সেই মুগ্ধতাবশে সোভিয়েতের সমাজব্যবস্থাকে তাৎক্ষণিকভাবে সমর্থন করে বসলেন রবীন্দ্রনাথ—ঘটনা সে-রকম নয়।

গত শতাব্দীর চৈত্রমেলায় পঠিত 'চতুর্দশবর্ষীয় বালকের স্বদেশানুরাগদীপ্ত' কবিতাটি থেকেই আমাদের যাত্রারম্ভ করতে হয়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এবং 'চীনে মরণের ব্যবসায়' যুগপৎ মনে রাখতে হয়। জাতীয় জীবনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মনুষ্যত্বধ্বংসকারী নির্মম কারাগার রচনার বিরুদ্ধে যেমন কৈশোরতারুণ্যের কালেই অভিযান শুরু করেছিলেন ('ভাঙ্-ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্'—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ), তেমনি কুড়ি বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক পটভূমিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির জান্তব শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর ক্ষমাহীন দুঃসহ ক্রোধ ও ঘৃণার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন (চীনে মরণের ব্যবসায়, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮)।

পরবর্তীকালেও কোনোদিন তাঁকে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনায় নিছক নীরব সাক্ষীর ভূমিকায় দেখা যায়নি। পক্ষান্তরে, প্রত্যেকটি ঘটনা প্রসঙ্গে মানুষ ও মনুষ্যত্বের স্বপক্ষে ইতিবাচক ও অগ্রণী ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন তিনি।

পরাধীন ও লাঞ্ছিত স্বদেশ প্রসঙ্গে তো রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিয়ত সজাগ ও সচেতন। শুধু তাই নয়, স্বদেশকে তিনি কখনোই আন্তর্জাতিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। সেইজন্যই তাঁর দৃষ্টি এত সমগ্র, বিচার এত স্বচ্ছ, বিশ্লেষণ এত বেশি গভীর ও সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যতের পক্ষে তাৎপর্যবহ।

আমরা দেখেছি, অতঃপর তিনি গ্রামবাংলার মর্মকেন্দ্রে তাঁর স্বদেশসাধনার আসনটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যথার্থ দেশ-দেখা-চোখ তিনি পেলেন এই সময়েই। কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অতন্দ্র সাধনা ও সিদ্ধির কালেই অন্তঃসলিলা ফল্‌গুর মতো যা ছিল সক্রিয় তা হল প্রধানত শিক্ষাচিন্তা আর পল্লীভাবনা। বস্তুত, তাঁর অপূর্ব রোমান্টিক কবি-কল্পনার প্রকাশরূপের পাশাপাশি তাঁর স্বদেশসাধনার দিকটিও ছিল সর্বতোভাবে বিদ্যমান। এ সব কথাই আমি একাধিক গ্রন্থে ও অনেক প্রবন্ধে বহুবার তথ্যসহ উপস্থাপিত করেছি।

স্বভাবতই, তিনি যে-সিদ্ধান্তে তখনই, অর্থাৎ গত শতাব্দীর শেষ দশকেই পৌঁছেছিলেন তা হল—'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা'। পল্লীবাসীকে, দরিদ্র ও নিরক্ষর জনসাধারণকে চেতনা দিতে হবে। তাদের সক্রিয়, স্ব-নির্ভর করে তুলতে হবে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আর সমবায় প্রণালীর কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হাতে-কলমে কাজেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। লিখেছিলেন—

"···আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।"

"···এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে।···"

গান্ধিজী প্রমুখ কোনো রাজনৈতিক নেতা নন, আধুনিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চায়েত ও সমবায়প্রণালী আনুষ্ঠানিকভাবে অবলম্বনের প্রস্তাব উত্থাপনে রবীন্দ্রনাথই পথিকৃৎ। ভারতবর্ষীয় সমাজ-কাঠামোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা ও সমবায়-প্রণালীর অপরিহার্যতা রবীন্দ্রনাথই প্রথম বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দেশের মানুষকে।

'···আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে' অংশটি ১৩১২ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে প্রকাশিত 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত, যদিও এই প্রবন্ধেরই পরবর্তী অংশে 'কো-অপারেটিভ স্টোর'-এর উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তথাপি, সমবায়-প্রণালীর উপযোগিতা ও প্রবর্তন প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট রবীন্দ্রভাবনা উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত 'সমবায়' প্রবন্ধটি থেকেই উদ্‌ধৃতি ব্যবহার শ্রেয় বিবেচনা করেছি আমি।

১৩১২ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে প্রকাশিত 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধটিরও মূল ও পূর্বসূত্রগুলি অবশ্য ঠিক এক বছর আগে ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'স্বদেশী

সমাজ' প্রবন্ধেই (এবং তৎসহ এক মাস পরে প্রকাশিত প্রবন্ধটির পরিশিষ্ট অংশে) পাওয়া যায়।

আর সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশভাবনা ও রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ক রচনাবলীতে পরবর্তী সময়ে বহুবার ১৯০৫ সালে লেখা এই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটির উল্লেখ করে গেছেন অক্লান্তভাবে। যেমন, কার্তিক ১৩২৮ বঙ্গাব্দে লিখেছিলেন—

"১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, 'আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।' বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি, তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এই জন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।

"যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আমার আপন করে তুলতে হবে, বহুকাল পূর্বে 'স্বদেশী সমাজ'-নামক প্রবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেই আলোচনাতে যে-কোনো ত্রুটি থাকুক এই কথাটি জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয়—নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে ঔদাসীন্য থেকে। দেশের যে-কোনো উন্নতিসাধনের জন্যে যে উপলক্ষ্যে আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের দ্বারস্থ হয়েছি সেই উপলক্ষ্যেই আমাদের নৈষ্কর্ম্যকে নিবিড়তর করে তুলেছি মাত্র। কারণ ইংরেজ-রাজসরকারের কীর্তি আমাদের কীর্তি নয়, এইজন্য বাহিরের দিক থেকে সেই কীর্তিতে আমাদের যতই উপকার হোক, ভিতরের দিক থেকে তার দ্বারা আমাদের দেশকে আমরা হারাই ···।"

চার বছর পরে চৈত্র ১৩৩২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় 'স্বদেশী সমাজ' পর্বে তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার এই বৈশিষ্ট্যের দিকেই দেশের মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিলেন—

"··· সেদিন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বারবার বলেছিলাম যে, নিজের শক্তিতে নিজের অভাব দূর করবার ভার যদি আমরা না নিলাম তা হলে দেশকে পাওয়াই হল না। এই কারণে সেদিন যখন জলের জন্য, অন্নের জন্য, জ্ঞান বিস্তারের জন্য, অস্বাস্থ্য নিবারণের জন্য, আমাদের লোকেরা রাজদ্বারে সম্মিলিত কণ্ঠে ভিক্ষা করবার উদ্দেশে সভায়-সভায় সং বাদপত্রে কখনো বা মিনতি, কখনো বা অভিমান, কখনো বা ক্রোধের তাড়নায় রাজভাষা আলোড়িত করে তুলেছিলেন ··· আমি সেই আবেদনের পুনঃপুন পুনরাবর্তনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছি। তার কারণ কেবল এই অত্যন্ত বাহুল্য কথা নয় যে, দেশের হিতসাধনের চেষ্টায় দেশের অভাব ও দুঃখ দূর হতে পারে ··· তার আর-একটি গুরুতর কারণ এই যে, দেশের রাজশক্তির সঙ্গে যদি ব্যবহার করতে হয় তবে সেটা ভিক্ষুকের মতো করলে চলে না।"

রবীন্দ্রভাবনার লিপিবদ্ধ সেই সব রূপের কোনো-কোনো অংশ আজ শুধু পাঠকের, গবেষকের অস্বস্তিই জাগায় না, ত্রুটিপূর্ণ বলেও মনে হয়। মাত্র সতেরো বছরের ব্যবধানেই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছিলেন ··· 'সেই আলোচনাতে ('স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে) যে-কোনো ত্রুটি থাকুক' ··· ইত্যাদি। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার তাৎক্ষণিক মূল্যায়নে অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি, এমন-

কী ভুলও থাকতেই পারে। সেগুলি অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে কিন্তু রবীন্দ্রভাবনার সেই অংশবিশেষকেই মুখ্য বা সমগ্ররূপে গণ্য করাটাও আদৌ বস্তুনিষ্ঠ হবে না।

ব্রিটিশ রাজশক্তির দাক্ষিণ্য ভিক্ষার পরিবর্তে তখন রবীন্দ্রনাথ জাতির আত্মশক্তির উদ্বোধনই কাঙ্ক্ষিত মনে করেছিলেন। ১৯০৫ সালের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রভাবনার বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব অনুভব করতে হবে, অনুভব করতে হবে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও—"আত্মশক্তিদ্বারা দেশকে যে পরিমাণে আয়ত্ত করতে পারব সেই পরিমাণেই রাজশক্তির সঙ্গে সমকক্ষভাবে আমাদের ব্যবহার চলতে পারবে। এক পক্ষে কেবল প্রার্থনা, অন্য পক্ষে কেবল দাক্ষিণ্য, এর মাঝখানে যে ফাঁক সেটা অসীম। সে আমাদের আত্মাবমাননার প্রকাণ্ড গহ্বর। তখনকার কালের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি দুই অসমানের মিলনের সেতু নির্মাণ করতে লেগেছিল। আমি তখন বলেছিলাম—অসাম্যের মিলন অসম্মানের মিলন।

আমি বলেছিলাম ভিক্ষা নেব না, নিজের শক্তিকে উদ্‌বোধিত করার দ্বারাই নিজের দেশকে অধিকার করব।"

পরিকল্পিত স্বদেশী সমাজ ও পল্লীসমাজ এবং উভয় সমাজ সম্পর্কে প্রস্তাবিত সংবিধান দুটি পর্যালোচনা করলে এ-বিষয়ে আর কোনো সংশয় থাকে না যে, পল্লীপঞ্চায়েত এবং সমবায় পদ্ধতির মূল কথাগুলি এই সময়েই রবীন্দ্র-ভাবনায় দানা বেঁধে উঠেছিল। আর যদি তারও আগে সূত্র অন্বেষণ করি, তা হলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালেই ১৮৬৭ সালে যে চৈত্রমেলার সূচনা হয়েছিল, সেই চৈত্রমেলার উদ্দেশ্য ও আদর্শের মধ্যেই স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রভাবনার বীজ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং সমবায় পদ্ধতি—দুটির মধ্যেই পল্লীপ্রধান ভারতীয় সমাজের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার ঠিকানা নিহিত দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সমবায় পদ্ধতির উপর রবীন্দ্রনাথ কেন এত জোর দিয়েছিলেন, কেনই বা মনে করেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের করতলগত ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের করুণার প্রত্যাশী হয়ে তাদের মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে আমাদের বর্তমান অচল এবং ভবিষ্যতও অন্ধকার অথচ ব্রিটিশ শাসনকে উপেক্ষা করেই আমরা নিজেদের সমাজে নিজেদের সমস্যাগুলির সমাধান নিজেরাই করে নিতে পারি। আর সেটাই তখন আশু করণীয়—তার মূল কথাগুলি 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে যেমন পাই, তেমনি পরবর্তীকালে 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' প্রবন্ধেও (অগ্রহায়ণ ১৩৪৩) পুনরায় তিনি লিখেছিলেন—"আমাদের দেশকে কেউ পুরোপুরি আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে পারে না, কেউ দয়া করে স্বদেশকে আমাদের হাতে তুলে দিতেও পারে না। আমরা আমাদের অধিকার যে-পরিমাণে ত্যাগ করেছি, সেই পরিমাণেই অন্যে অধিকার করেছে আমাদের দেশকে।" লিখেছিলেন,—"এই চিন্তা করেই একদিন আমি স্বদেশী সমাজ নাম দিয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলুম। তার মর্মকথাটা আর এক বার সংক্ষেপে বলবার প্রয়োজন আছে।"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা এত বেশি করে কেন সমাজমুখী, তা স্পষ্ট হবে তাঁর এই চিন্তাসূত্র থেকে—"চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নিচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। ...চীন-ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, তার কারণ সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।"

এই সব কারণেই ১৯০৫ সালের ঐতিহাসিক কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ জাতির আত্মশক্তি উদ্‌বোধনের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সমবায়-প্রণালী প্রবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

মনে রাখতে হবে, সময়কালের কোনো রাজনৈতিক নেতা নন, সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানও নয়, বঙ্গভঙ্গের যুগে, এই শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথমার্ধে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সমবায় প্রণালীর অপরিহার্যতা অনুধাবন করে জাতীয় জীবনে সেগুলি তৎক্ষণাৎ প্রবর্তনের জন্য সুস্পষ্ট উচ্চারণে আহ্বান জানিয়েছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি সেই মুহূর্ত পর্যন্ত প্রধানত কবিরূপেই প্রসিদ্ধ এবং কে না জানতেন, তিনি কলকাতার বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারেই সন্তান, তখন তাঁর বয়সও মাত্র চুয়াল্লিশ।

এ হেন ব্যক্তিকে আমাদের দেশে মহাপুরুষ কিংবা অবতার, ঋষি কিংবা অন্যবিধ লোকোত্তর ক্ষমতাবিশিষ্ট পুরুষরূপে চিহ্নিত করে পূজাঞ্জলি অর্পণই স্বাভাবিক। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণে আকস্মিকতা বা দৈবী অপব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই।

এ কথা ঠিক যে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সংস্কৃতির এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় ঐতিহ্যের সমাবেশ সম্ভবপর হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে নবজাত আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির একটি যুগোপযোগী মেলবন্ধনও ঘটেছিল ঠাকুর পরিবারে।

আধুনিকতার বোধ ও বাস্তব জনজীবন-চেতনা প্রখর না হলে রবীন্দ্রনাথ চরকা প্রসঙ্গে এমন সোজাসুজি এমন নির্ভীক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারতেন না সেই সময়ে, গান্ধিজী যখন ভারতীয় রাজনীতিতে একচ্ছত্র অধিপতির আসনে অধিষ্ঠিত—

"আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই।"

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধিজীর আবির্ভাবের তখনও অনেক দেরি, কংগ্রেস তার সূচনাপর্বে নিছক আবেদন-নিবেদনের স্তরেই তখনও নিতান্ত তাৎপর্যবিহীন, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাত্যহিক বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে জেনেছিলেন, 'আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে'। বহু বছরের ব্যবধানে ৩০ ফাল্গুন ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে লেখা শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি 'সম্ভাষণ' শীর্ষক রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর গত শতাব্দীর শেষ দশকের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন—

"আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখদুঃখের ভেতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায়, তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব-অভিযোগ এবং কত বড়ো অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল।"

এই অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষাটি লাভ করেছিলেন, তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে—দেশের মানুষের জীবনের ভিত্তিটা যে পল্লীতে, এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন।

এই সত্যের প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে ঘটেছিল তৎক্ষণাৎ। পল্লীবাংলার মানুষের বেদনা ও অসহায়তা তাঁর অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল বলেই 'তখন আমি আমার গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখ-দুঃখ ও বেদনার কথা এঁকে-এঁকে প্রকাশ করেছিলাম।' প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ দাবি করেছেন—"আমি একথা নিশ্চয় করেই বলতে পারি, তার আগে সাহিত্যে কেউ ঐ পল্লীর নিঃসহায় অধিবাসীদের বেদনার কথা, গ্রাম্য জীবনের কথা প্রকাশ করেননি। তার অনেক পরিচয় আপনারা আমার গল্পে ও কবিতায় পেয়ে থাকবেন।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পল্লীবাংলার অভিজ্ঞতাকে, প্রকৃত প্রস্তাবে জনজীবনের অভিজ্ঞতাকে শুধু সাহিত্যের উপকরণরূপেই ব্যবহার করে শৌখিন মজদুরিতেই তাঁর কর্তব্যের অবসান হল বলে ভাবতে পারেননি। তাঁর নিজের ভাষায়—

"সে সময় থেকেই আমার মনে এই চিন্তা হয়েছিল, কেমন করে এই সব অসহায়-অভাগাদের প্রাণে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি। এই-যে এরা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষা হতে বঞ্চিত, এই-যে এরা খাদ্য হতে বঞ্চিত, এই-যে এরা একবিন্দু পানীয় জল হতে বঞ্চিত, এর কি প্রতিকারের কোনো উপায় নেই?"

রবীন্দ্রনাথ বারংবার অক্লান্তভাবে উচ্চারণ করেছেন, তবু অদ্যাবধি দেশের এমন-কী শিক্ষিত অংশের সকলের সে সব কথা কর্ণগোচর হয়নি, তাই পুনশ্চ উদ্‌ধৃত করছি—

"আমি স্বচক্ষে দেখেছি, পল্লীগ্রামের মেয়েরা ঘট কাঁধে করে তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়ে এক ক্রোশ দূরের জলাশয় থেকে জল আনতে ছুটেছে। এই দুঃখদুর্দশার চিত্র আমি প্রত্যহ দেখতাম। এই বেদনা আমার চিত্তকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। কী ভাবে কেমন করে এদের এই মরণদশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায়, সেই ভাবনা ও সেই চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল।"

রবীন্দ্রনাথ এই অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছিলেন, আমরা যদিও ভারতবর্ষকে তথাকথিত ভদ্রলোকদের দেশ হিসেবেই ধরে নিয়েছি, কিন্তু এর চেয়ে বড়ো মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। তাই তাঁর—

"তখন কেবলই মনে হতো, জনকতক ইংরাজি-জানা লোক ভারতবর্ষের উপর—যেখানে এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত হাহাকার ও শিক্ষার অভাব, সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ করবে! পল্লীজীবনকে উপেক্ষা করে এ কী করে সম্ভব হয়, তা ভেবেই উঠতে পারিনি।"

কবি রবীন্দ্রনাথ কেমন করে কর্মী রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন, তার নেপথ্য-ইতিহাস এই কালপর্বেই, গত শতাব্দীর শেষ পর্বেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছিলেন—"আমার অন্তর্নিহিত গ্রাম-সংস্কারের আভাস সে সময় হতেই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। ···সে সময় দিনরাত স্বপ্নের মতো এই অভাব ও অভিযোগ দূর করবার জন্য আগ্রহ ও উত্তেজনা আমার চিত্তকে অধিকার করেছিল, যত বড়ো দায়িত্বই হোক-না কেন, তাই গ্রহণ করব, এই আনন্দেই অভিভূত হয়েছিলাম।"

পল্লীবাসের অভিজ্ঞতাই অল্পকাল পরে রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশী সমাজ তথা পল্লীসমাজের গঠনমূলক পরিকল্পনায় উদ্‌বুদ্ধ করেছিল।

চলতি শতাব্দীর সূচনাকালে রবীন্দ্রনাথ সাময়িকভাবে হলেও হিঁদুয়ানির কবলে পড়েছিলেন। সাময়িকভাবে হলেও আকস্মিকভাবে নয়। অন্যত্র দেখিয়েছি, সমকালীন ভারতবর্ষে তিনি 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি'কর অবস্থা অতিক্রম করার পথের সন্ধানে কোনো বিকল্প উপায় না পেয়ে ক্রমশ প্রাচীন ভারতীয় ভাবকল্পনার জগতকেই বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছিলেন।

তাঁর লক্ষ্য: স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তিসাধন, অর্থাৎ গণমানসমুক্তি। কিন্তু উপায় তাঁর জানা নেই। উপায় খুঁজতে খুঁজতে একবার মনে হয়েছিল, প্রাচীন ভারতীয় কবি কালিদাসের তথা সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবজগতটাই সত্য। সেই ভাবলোককেই আধুনিক ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠাদান সম্ভবপর। সেই অবাস্তব পরিকল্পনায় হাত লাগাতে গিয়েও ভাবের ঘরে চুরি করেননি। এইখানেই তাঁর সততা। গভীর নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গেই তিনি তাঁর আরব্ধ কাজ করেছেন। এই ভাবেই প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সাময়িক ভাবে মাননীয় ও অবশ্যপালনীয় জ্ঞান করেছিলেন।

কিন্তু জিজ্ঞাসা ও সন্ধান যদি সৎ ও আন্তরিক হয়, জিজ্ঞাসু যদি হন চিন্তাশীল ও কর্মীমানুষ, সাময়িক বিভ্রম অপসৃত হতেও বিলম্ব হয় না। রবীন্দ্রনাথের বিভ্রমও কেটে গিয়েছিল। তার জের যে সহজে কেটেছে, তা যে সহজে নির্মূল হয়ে গিয়েছে, এমন নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গতিশীলতা ও সমগ্রতার বোধ তাঁকে কোনোরকম মিথ্যা বা খণ্ড সত্যের মোহবদ্ধ করেও রাখতে পারেনি দীর্ঘকাল।

রবীন্দ্রনাথের এই মানসসংকট ও সংকট-উত্তরণের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি 'গোরা' উপন্যাসের গোরা চরিত্রের বিবর্তনে ও পরিবর্তনে সুস্পষ্ট।

তারপর প্রথম মহাযুদ্ধ। রবীন্দ্রসাহিত্যে বলাকার কাল।

শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রচেষ্টা যে বহুলাংশে নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তা অনুভব করতে আরম্ভ করেছেন। মানুষের সভ্যতায় সাম্রাজ্যবাদের করাল দংষ্ট্রার বিস্তারও তাঁর কাছে স্পষ্টতর হচ্ছে।

রুশ বিপ্লব (১৯১৭)—চকিত বিশ্ব, চকিত রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু অবশিষ্ট বিশ্ব জুড়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা। তাদের চরিত্র হনন। ব্রিটিশ ভারতেরও একই চিত্র। রবীন্দ্রনাথ আশান্বিত। তথাপি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও চরিত্রহননের এই সব অপচেষ্টার ফলে সংশয়গ্রস্তও তিনি।

সোভিয়েত পরিক্রমার আমন্ত্রণ আসে। একবার। দুবার। রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল। কিন্তু তাঁরও আছেন পার্ষদেরা। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে নিরস্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ পেরে ওঠেন না নিজের ইচ্ছার জোর খাটাতে। তথাকথিত প্রিয়জনেরা তাঁর মন্দস্বাস্থ্যের অজুহাতও দেখান।

মার্কিন দেশে যান রবীন্দ্রনাথ। সেখানে বুর্জোয়া সভ্যতার, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সংকট ও নির্দয়তা প্রত্যক্ষ করেন।

এরই মধ্যে বারবুস-প্রেরিত ইশতিহারটি আসে রবীন্দ্রনাথের কাছে। তিনি তাতে স্বাক্ষরও করেন। এই ইশতিহারটি রবীন্দ্রনাথ না পড়ে বা তার বক্তব্য না-বুঝেই স্বাক্ষর করেছিলেন, এতদূর মানতে মন চায় না। অন্তর্লীন প্রমাণও আছে, এই ইশতিহারটি যে তিনি অনুধাবন করেছিলেন, তার। তাঁর সমকালীন প্রবন্ধাবলীই তার প্রমাণ।

ইতিমধ্যে তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনিকেতনের কাজ চলছে। শ্রীনিকেতনে স্থাপন করেছেন শিক্ষাসত্র। জনমুখী ধ্যানধারণাকে তাঁর শিক্ষা-সংস্কার ও পল্লী-উন্নয়নের কর্মক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।

বারবুস-প্রেরিত ইশতিহারটি রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পৌঁছোয় এই সময়েই। কী ছিল এই ইশতিহারে? কেন এর উপর এত গুরুত্ব দানের কথা ভাবছি?

একাধিক নিবন্ধে আমরা এতদূর পর্যন্ত দেখিয়েছি যে, এই শতাব্দীর সূচনায় সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্মের গোঁড়ামিও পেয়ে বসেছিল রবীন্দ্রনাথকে। দেখিয়েছি যে, সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষকে, এমন-কী রবীন্দ্রনাথকেও কী শোচনীয় যান্ত্রিক অভ্যাসের সংকীর্ণতায় বেঁধে ফেলতে পারে।

এই সময়ে, মোটামুটিভাবে চলতি শতাব্দীর প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথ অতীন্দ্রিয়বাদের মোহাবেশে বন্দী হয়ে পড়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই পর্বেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তথা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক তিনি ছিলেন গভীরভাবে প্রভাবিত।

কিন্তু, যে-গতিশীলতাকে রবীন্দ্রপ্রতিভার ধ্রুব বৈশিষ্ট্যরূপে আমরা বারবার বিভিন্ন উপলক্ষ্যে চিহ্নিত করেছি, সেই গতিশীলতাই রবীন্দ্রনাথকে অনির্দিষ্টকাল অচলায়তনের এই সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ থাকতে দেয়নি।

১৯১০ সাল পর্যন্ত গীতাঞ্জলি পর্বেরই আধিপত্য। তারপর ক্রমশ মিস্টিক কবির রূঢ় বাস্তবের ভূমিতে অবতরণ, সাধারণত মিস্টিক কবিদের ক্ষেত্রে যা ঘটে না। হারিয়ে যেতে বসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু হারিয়ে গেলেন না, ফিরে এলেন ক্রমশ। মোহাঞ্জন যে পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ, তা অবশ্য নয়।

কিন্তু, 'বাতাস-আলো গেল মরে এ কী রে দুর্দৈব' প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আভাস পেলেন কবি এই সময়ে, পাশ্চাত্য-পরিক্রমার অভিজ্ঞতায়। শুরু হল বলাকা পর্ব। তীব্রভাবে অনুভব করলেন রবীন্দ্রনাথ—'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোথা অন্য কোনখানে'। কোথায়? তা তখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু সময় বদলাচ্ছে। পৃথিবী, জীবনযাপন, সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তনেরও সূত্রপাত অনুভব করছেন তিনি। বিশ্বযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। কিন্তু কবির প্রশ্ন, 'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা' এ-সবের কি কোনো মূল্য নেই? বিশ্বব্যাপী এই যে মানুষের তপস্যা, আত্মবিসর্জন, এর কি কোনো শুভ পরিণাম নেই? 'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?'

আনুপূর্বিক বিশ্লেষণে অনুধাবন করা যায়, বিশ্বযুদ্ধ কবিকে শুধু ব্যথিত করেনি, আশ্বান্বিতও করেছিল। বিশ্বযুদ্ধ ক্রমশ কবিকে রূঢ় বাস্তবের ভূমিতে যথোচিত চেতনায় উদ্‌বুদ্ধও করেছিল। শুধু বলাকার কবিতাগুলিতে নয়, কবির এই সময়ের সামগ্রিক সাহিত্য-সৃষ্টিতে, গদ্যরচনাগুলিতেও, বিশেষত প্রবন্ধগুলিতে ক্রমশ আমরা তাঁর প্রখর সচেতনতা লক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চেতনার সমৃদ্ধি ও গভীরতাও এই সময়ে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

রাত্রির তপস্যাও ব্যর্থ হল না। যুদ্ধকালে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হল। আবির্ভাব হল বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতের। বিশ্বব্যাপী তার প্রভাব-প্রেরণাও অনুভূত হল। বাংলা সাহিত্যকেও তা স্পর্শ করল।

গভীরভাবে, হৃদয়ে-মননে তা স্পর্শ করল রবীন্দ্রনাথকেও। রবীন্দ্রনাথের লেখায়, বিশেষত প্রবন্ধে তার ছাপ স্পষ্ট। আরও একটি ঘটনা ঘটল—এই সমস্ত কিছুরই শীর্ষে। বিষয়টি আমাদের সকলেরই, শুধু রবীন্দ্রানুরাগীদেরই নয়, রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুদের প্রত্যেকেরই সযত্ন অনুধাবনের যোগ্য। নতুবা, রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের যথার্থ বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন কিছুতেই সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যথেষ্ট তীক্ষ্ণধী ও সচেতন মানুষ। তাঁর অতি তরুণ বয়সের বিবিধ রচনা থেকেই তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। কিন্তু তিনি কী ভাবে শতাব্দীর শেষ ও এই শতাব্দীর প্রথম দশক দুটি জুড়ে দেশের মানুষকে সচেতন করার মহৎ আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখেও কেন কী ধরনের বিভ্রমের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিলেন এবং পুনরায় আসন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে যুদ্ধকাল ও যুদ্ধোত্তরকালে একদিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও অন্যদিকে নিরন্তর আত্মজিজ্ঞাসার অভিঘাতে ক্রমশ রোমাণ্টিক কল্পনা ও মিস্টিক উপলব্ধির তুরীয় মার্গ থেকে অপসৃত হয়ে জীবনের রণ-রঙ্গভূমিতে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, এ-সবই আমরা লক্ষ করেছি। তবে, রবীন্দ্র-রচনায় প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে ক্রমশ চেতনার যে গভীর পরিবর্তন দেখা দিল এবং অতঃপর তাঁকে 'রক্তকরবী' নাটক-রচনার পর্যায়ে পৌঁছে দিয়ে সোভিয়েত-পরিক্রমায় নিয়ে গেল, তার প্রেরণারূপে বিষয়টি স্বতন্ত্র উল্লেখযোগ্যতা ও গভীর বিবেচনা দাবি করে।

মানবতাবাদী কবিরূপে তাঁর সাধারণ ও স্বাভাবিক কল্যাণবোধ ও শুভচেতনা প্রশ্নাতীত কিন্তু শুধু কি তা থেকেই তিনি ক্রমশ পুঁজিবাদের করাল দংষ্ট্রার ভীষণতাকে চিনে নিয়েছিলেন, পুঁজিবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকটকে অনুধাবন করেছিলেন, পুঁজিবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম বিনাশ কামনা করেছিলেন এবং বিকল্পরূপে সোভিয়েতের 'নতুন' সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মৃত্যুশয্যা থেকেই?

বিষয়টি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ও উপস্থাপনা করে চিন্তাশীল পাঠকের বিবেচনার উপরেই উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তর-সন্ধানের দায়িত্ব আমরা অর্পণ করতে পারি।

দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক, ভগ্নস্বাস্থ্য, কবি, সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক ও কঠোর জীবনসংগ্রামী অ্যাঁরি বারবুস ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে ফরাসি পদাতিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও যুদ্ধে অশেষ সাহস ও বীরত্বের জন্য দুবার বিশেষ সম্মানলাভ করেন তিনি। যুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডব ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের রহস্য ও চরিত্র তিনি বুঝতে পারলেন। রণক্ষেত্রে বসেই রচনা করলেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'লে ফা' (১৯১৫, ডিসেম্বর)। চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী এই উপন্যাসের জন্য তিনি 'গঁকুর' পুরস্কার লাভ করেন।

এই উপন্যাস প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছিলেন (আগস্ট, ১৯১৯)—সম্পূর্ণ নিরীহ ও অজ্ঞ সাধারণ মানুষ, সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ও নিতান্তই বিষয়চিন্তায় ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ কীভাবে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বিপ্লবীতে পরিণত হয়, তা-ই অসাধারণ সততা ও প্রতিভার সঙ্গে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

অবশেষে, অসুস্থতার জন্য সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নিলেন তিনি (১৯১৭)। পরের বছরে সেপ্টেম্বর মাসে লিখলেন পূর্ববর্তী উপন্যাসের জের অনুসরণ করে একটি উপন্যাস : 'ক্লার্তে'। একজন পেটি-বুর্জোয়া চরিত্রের মানুষের আন্তর্জাতিক চেতনায় উত্তরণের কাহিনী।

ক্রমশ বারবুস প্রাক্তন সৈন্যদের সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধিজীবী ও লেখক-শিল্পীদের নিয়ে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুললেন। স্ব-রচিত উপন্যাসের নামে গোষ্ঠীর নাম দিলেন : 'ক্লার্তে'। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাই ছিল ক্লার্তের কাজ। সময়টা ১৯২০ সাল।

এই 'ক্লার্তে' ১৫-দফা সংবলিত একটি ইশতিহার রচনা করে বারবুসের নেতৃত্বে। বহু বিশ্ববিশ্রুত লেখক-শিল্পীই ছিলেন এই 'ক্লার্তে'র সদস্য বা সমর্থক। এই ইশতিহারটি বারবুস যথাকালে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন ও স্বাক্ষরের জন্য তাঁর কাছে প্রেরণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ বারবুসের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং ইশতিহারটিতে স্বাক্ষরদান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, আশা করা যায়, ইশতিহারটি মন দিয়েই পড়েছিলেন, তার বক্তব্য ও তাৎপর্য বুঝেছিলেন এবং অবশ্যই তার পরেই তাঁর স্বাক্ষরদান করেছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথকে নিছক মানবতাবাদী অথবা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনারই মানুষ বলে আর চিহ্নিত করা যায় না। অন্যভাবে তাঁকে নিয়ে ভাবনার অবকাশ তৈরি হয়ে যায়। ১৫-দফা ইশতিহারটি নিম্নোক্তরূপ—

১। আমাদের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাটাই ভুল। এই ব্যবস্থার পরিণাম—মুষ্টিমেয় মানুষের সুযোগ-সুবিধালাভ, স্বৈরাচারী অত্যাচার, ধ্বংস ও হত্যা।

২। অধিকাংশ মানুষ প্রচলিত কুসংস্কারের ফলে মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ক্রীতদাসে পর্যবসিত হয়েছে, হয়েছে নিষ্পিষ্ট ও নিহত। শক্তির উৎস অবদমিত, মূঢ়তা হয়েছে প্রবলতর। আধুনিক সমাজের পুরো সৌধটাই অসম্ভাব্যতার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

৩। অন্যায় অন্যায়কেই সৃষ্টি করে, প্রগতিশীলতা প্রগতিশীলতাকে। অর্ধ-অন্যায় আরও মারাত্মক। যতক্ষণ না আমরা সামগ্রিক পরিবর্তন আনতে পারছি, ততক্ষণ প্রকৃত কোনো পরিবর্তনই আনতে পারব না।

৪। সঠিক সমাজ-ব্যবস্থার মূল নীতিগুলো সহজবোধ্য। সব মনীষী, সব বিবেকবান, সব অধ্যাত্মভাবুকরাও এইসব আদর্শ সম্বন্ধে সর্বদা একমত।

৫। শুধু আদর্শ নয়, ক্ষমতাও সকলেরই সাধ্যায়ত্ত হতে হবে। দৈহিক বা মানসিক, শ্রমই একমাত্র সম্মাননীয়। একমাত্র শ্রমই পুরস্কার-যোগ্য। মুনাফাবাজি গরিষ্ঠসংখ্যকের বিরুদ্ধে অপরাধ। উত্তরাধিকার আর চৌর্য অভিন্ন।

৬। সাম্যই সব মানুষকে যথার্থ সমান সামাজিক অধিকার দান করে। শ্রেণী-সংগ্রামের লক্ষ্য শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তি।

৭। নারী-পুরুষভেদে নাগরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যায় না।

৮। জাতীয় উন্নতি যদি পরহিতব্রতী আন্তর্জাতিকতার সোপান হয়, তবে তা কল্যাণকর, নতুবা তা অপরাধ।

৯। যারা যুদ্ধের প্রস্তুতি করে, তারা সব যুদ্ধেরই পথ প্রস্তুত করে। ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সীমারেখা ভুল পথে পদক্ষেপমাত্র।

১০। পৃথিবীতে অসংখ্য ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে, সাধারণ স্বার্থ একটাই। কোথাও কেউ বহিরাগত নয়, কেন না, যুক্তি ও নীতি আন্তর্জাতিক।

১১। আলোড়নসৃষ্টিকারী গতিশীল জনসমষ্টির অভ্যুত্থান খ্রিস্টীয় যুগের তুলনায় শুদ্ধতর ও মহত্তর একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে।

১২। সচেতনতাই সব প্রগতির মূলে। বিশ্বের উন্নয়নে তাই সব চিন্তাশীল মানুষেরই জীবন উৎসর্গ করা কর্তব্য।

১৩। কায়েমি স্বার্থবাদীরা স্থিতাবস্থার প্রচারক।

১৪। রাজনৈতিক ধর্মঘট সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ ধর্মঘট ; বিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যবর্তী শান্তিপূর্ণ বিপ্লব।

১৫। ক্ষমতাসীনরাই বিপ্লবের কারণ। প্রতিবিপ্লবীরাই বিপ্লবকে রক্তাক্ত করে তোলে। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত মানুষরা নন, স্বাধীনতাহরণ ও দমনকারীরাই, শাসকরাই সবরকম যুদ্ধের জন্য দায়ী।

১৯৩০ সেপ্টেম্বর। রবীন্দ্রনাথ এতদিনে গ্রহণ করেছেন সোভিয়েত পরিক্রমার আমন্ত্রণ।

এতদিন পর্যন্ত দেশে গান্ধিজীর নেতৃত্বে যে-স্বদেশী আন্দোলন চলেছে, তার প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন জ্ঞাপন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের অননুমোদন এবং তার হেতু নির্দেশ করেছি বহুস্থানে। এমন-কী সোভিয়েত-ভ্রমণের বছরখানেক আগে ও ১৯২৯-এর ১৯ অক্টোবর লেখা একটি চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজীর চরকানীতির বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন—

"আজ আমরা দেশ-উদ্ধারকল্পে যখন কাজের কথাও ভাবি তখনও চরকার ঊর্ধ্বে মনের সাহস পৌঁছয় না। চরকায় কিছু ভাবার দরকার হয় না, বহুকাল আগে যা উদ্‌ভাবিত হয়ে গেছে, তাকে বিচারহীন অধ্যবসায়হীন মন নিয়ে নিরন্তর চালিয়ে গেলেই হল। কোনো নিরলস বীর্যবান দেশে এমন প্রস্তাব উত্থাপন করাই অসম্ভব হত…"

এই পটভূমিতেই গেলেন সোভিয়েতে। প্রত্যক্ষ করলেন বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতের সর্বতোমুখী গণ-জাগরণ, একটি ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞ।

রবীন্দ্রনাথের সেই 'এ জন্মের তীর্থদর্শন' ('…রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত'—রাশিয়ার চিঠি-৩)-এর সময়টা ছিল ১৯৩০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর। অকটোবর বিপ্লবের তের বছর পরে রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা দেখলেন এবং বুঝলেন, তার 'ব্যক্তিগত জবানবন্দী' ধরা আছে 'রাশিয়ার চিঠি'তে। 'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধতা ও সংশয়ের দোটানাও যেমন আছে, তেমনই আছে সর্বশেষ আশ্চর্য উত্তরণ। সব সংশয়ের নিরসন যে শেষ পর্যন্ত ঘটেছিল, তা-ও অনুভব করা কঠিন নয়। কেননা, 'মস্কোতে ট্রেড ইউনিয়ন ভবনের জলসায় (২৪ সেপ্টেম্বর) রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা, সাম্য ও গণমুক্তির আদর্শের কথাটি ঘোষণা করেছেন' গভীর প্রত্যয় ও বলিষ্ঠ আশাবাদে উদ্দীপ্ত হয়ে। প্রবন্ধের শিরোভাগে উদ্‌ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত আকস্মিক ও তাৎক্ষণিক উচ্চারণ নয় যে, তা সুস্পষ্ট হওয়া উচিত—

"আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্যসভ্যতার ঐ প্রাচীন ভূমির (ভারতবর্ষের) সব মানুষ শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবেন। আমার বহুদিনের স্বপ্ন, যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণমানসমুক্তির স্বপ্নের বাস্তবরূপ দেখতে আমায় যাঁরা সাহায্য করলেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।"

রবীন্দ্রনাথের 'তীর্থদর্শনে'র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিজনিত এই চূড়ান্ত উত্তরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ 'রাশিয়ার চিঠি'র কয়েকটি অংশ নিশ্চয়ই মনে পড়বে আমাদের। কিন্তু সমধিক

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, 'তীর্থদর্শনে'র অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের বাস্তববোধকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছিল।

বার্লিন থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে মগ্ন হওয়ার আনন্দ অনুভব করার অবকাশ আর নেই। ঘনবর্ষার শান্তিনিকেতনের সৌন্দর্যের ছবি কল্পনা করেই এতদিন তিনি আনন্দে উদ্‌বেল হয়ে উঠতেন।

"কিন্তু এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্যের ছবি আমার মন থেকে মুছে গেছে। কেবলই ভাবছি আমাদের দেশজোড়া চাষিদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট পরিচয় হয়েছে। তখন চাষিদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশোনা—ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি, ওদের মতো নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।"

অথচ, এই চিঠিতেই আছে, তখনকার দিনের (পাবনা কনফারেন্সের সময়ের) পলিটিক্যাল নেতারা পল্লীবাসীকে দেশের লোক বলেই অনুভব করতেন না। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চার নিশ্চিত পরিমণ্ডল ত্যাগ করে কেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে গেলেন, তার কারণ নির্দেশ করেছেন এখানেই—

"যখন একথা কাউকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে একথা আমাকে বলতে হল—আচ্ছা, আমিই এ কাজে লাগব।"

১৩৩৭ সালে লেখা চিঠিতে সমবায়নীতির জয়ঘোষণায় রবীন্দ্রনাথ পুনরায় সোচ্চার—"আমাদের দেশে পল্লীতে-পল্লীতে ধন-উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক, এই আমি কামনা করি।"

আরও একটি কথাও এই চিঠিতে আছে, যা মনে রাখা জরুরি। গান্ধিজীর পল্লীচিন্তা ও স্বদেশচিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা ও স্বদেশচিন্তার মৌলিক পার্থক্যটি বুঝে নিতে তাহলে সুবিধা হবে। এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রমানসে নৈতিক-আধ্যাত্মিক প্রেরণার একটি দিক ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে-ধর্মে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তা শিল্পীর ধর্ম, মানুষের ধর্ম। পক্ষান্তরে গান্ধিজী রাজনীতির সঙ্গে ধর্মচিন্তাকে ঘুলিয়ে দেওয়ার ফলে একটি ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হওয়ায় দেশ ও জাতিকে প্রায়শ বিভ্রান্ত ও নিষ্ক্রিয় হতে হয়েছে।

গ্রামীণ সৌন্দর্যকে কাব্যে-সাহিত্যে পরিস্ফুট করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু গ্রাম্যতাকে করেছেন তিরস্কৃত। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য এই প্রসঙ্গে—

"বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে পরিমাণে ব্যাপক হয়নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে, যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।"

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ধনতান্ত্রিক ইংলন্ডের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের সুস্পষ্ট তুলনা করে দেখিয়ে দিয়েছেন—কোন সমাজব্যবস্থা তাঁর অভিপ্রেত। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে

কিছুতেই যাঁদের বহুবিধ সংশয় ও দুর্মর সংস্কারগুলি যেতে চায় না, তাঁদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করি তাঁর বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তাঁর নিজের ভাষাতেই তুলে দেওয়া শ্রেয়—

"ইংলন্ডে একদা কোনো-এক গ্রামে একজন কৃষকের বাড়িতে ছিলুম। দেখলুম, লন্ডনে যাবার জন্যে ঘরের মেয়েগুলির মন চঞ্চল। শহরের সর্ববিধ ঐশ্বর্যের তুলনায় গ্রামের সম্বলের এত দীনতা যে, গ্রামের চিত্তকে স্বভাবতই সর্বদা শহরের দিকে টানছে। দেশের মাঝখানে থেকেও গ্রামগুলির যেন নির্বাসন।"

পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গ্রাম-শহরের সম্পর্ক যা দেখেছেন, ঠিক পরেই তার উল্লেখ করেছেন—

"রাশিয়ায় দেখেছি, গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি ভালো করে সিদ্ধ হয়, তা হলে শহরের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি-নিবারণ হবে। দেশের প্রাণশক্তি চিন্তাশক্তি দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আপন কাজ করতে পারবে।"

এই তুলনামুলক বিচারের পরে সিদ্ধান্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ—

"আমাদের দেশের গ্রামগুলিও শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্‌বৃত্ত-ভোজী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক, এই আমি কামনা করি।"

কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতে শুধু শুভকামনার জোরেই তো কিছু হবে না। হাতে-কলমে কিছু কাজ করতে হবে। শুধু স্বপ্ন দেখলেই হবে না, স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে হবে। কী ভাবে দিতে হবে? ব্রিটিশ উপনিবেশের বাস্তবতায় সেই সময়ে ঠিক কতটা কী করে ওঠা সম্ভবপর? রবীন্দ্রনাথ সমকালের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে ভেবেছিলেন, আমাদের অন্যতম আশু কর্তব্য হচ্ছে—

"একমাত্র সমবায়প্রণালীর দ্বারাই গ্রাম আপন সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে নিমজ্জনদশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বাংলা দেশে সমবায়প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা-উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।"

এর কারণও নির্ণয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সমবায়প্রণালীও কেন ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সমবায়প্রণালীও যে দেশে ঠিকমতো প্রযুক্ত হচ্ছে না—

"তার প্রধান কারণ, যে শাসনতন্ত্রকে আশ্রয় করে আমলা-বাহিনী সমবায়নীতি আমাদের দেশে আবির্ভূত হল, সে যন্ত্র অন্ধ, বধির, উদাসীন।"

সমবায়প্রণালীকেও সার্থকভাবে প্রয়োগ করে তার ইতিবাচক ফলশ্রুতি কী ভাবে লাভ করা সম্ভব? পুনরায়, সোভিয়েত-সমাজের দিকে ভরসা লাভের জন্য হাত বাড়াতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—

"রুশীয় গল্পের বই পড়ে জানা যায়, সেখানকার বহুকাল-নির্যাতিত-পীড়িত কৃষকদেরও এই দশা।"

সোভিয়েত ভ্রমণের পরে বারবার রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, জার-শাসিত রুশ দেশের দুরবস্থাও তো আমাদের তুলনায় কম ছিল না, এমন-কী বেশিই ছিল। কিন্তু এই তো সোভিয়েত দেখছি, তারা সব সমস্যারই সমাধানের পথে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছে, যাচ্ছে, তাহলে আমরা কেন পারি না, আমরা কেন পারব না?

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, 'দুঃসাধ্য বটে' তথাপি ব্রিটিশ ভারতেও তৎক্ষণাৎ স্বদেশী নেতৃত্বে জনগণের 'পরস্পরের শক্তিকে মনকে সম্মিলিত করবার উপলক্ষ্য' সৃষ্টি করা সম্ভব, সম্ভব আমাদের জনসাধারণের চিরাভ্যস্ত 'প্রকৃতিকে শোধন করে' নেওয়া। তিনি বুঝেছিলেন, সমবায়প্রণালীকে সার্থক করতে হলে, তা করতে হবে—

"সমবায়প্রণালীতে ঋণ দিয়ে নয়, একত্র কর্ম করিয়ে পল্লীবাসীর চিত্তকে ঐক্যপ্রবণ করে তুলে তবে আমরা পল্লীকে বাঁচাতে পারব।"

১৯৩৪ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে লিখিত একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের কংগ্রেস নেতাদের ব্যর্থতা লক্ষ করেছিলেন, তার কারণও নির্দেশ করেছিলেন—

"হাসি পায় মনে করলে যখন ভাবি এই সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রনেতারা সমস্ত দেশ জুড়ে বক্তৃতামঞ্চে কংগ্রেসের উত্তেজনা বিস্তার করে বেড়াচ্ছেন, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে কারও মনে কোনো সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু কী স্তূপাকার অবাস্তবতা, কৃত্রিমতা।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের কালে আমাদের দেশের বুর্জোয়া নেতৃত্ব যে-সব জরুরি কাজ শিকেয় তুলে রেখে উত্তেজনা বিস্তার করে বস্তুত আপসমূলক আন্দোলনের পথে দেশের মানুষকে চালিত করতে চেষ্টিত ছিলেন, সেই সব অসম্পন্ন জরুরি কাজগুলির জন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরেও আজ আমরা প্রতিদিন মূল্য দিচ্ছি। সেই সব জরুরি কাজ ফেলে রেখে মাঝে-মাঝে সাময়িক উত্তেজনা বিস্তার এবং নিয়মিত চরকা চালানোর কর্মসূচিকে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই তখন স্পষ্ট ভাষায় ধিক্কৃত করেছিলেন। লিখেছিলেন—

"এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের অনৈক্য কেবল ভাষাগত নয়, স্থানগত নয়, মজ্জাগত। পরস্পরের মানবসম্বন্ধ কেবল যে শিথিল তা নয়, অনেক স্থলেই বিরুদ্ধ। আমরা ভোটের ভাগ-বিভাগ নিয়ে তুমুল তর্ক বাধিয়েছি, যেন অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলেও ভোটের সামঞ্জস্যে এই ফাটল-ধরা দেশের সর্বনাশ নিবারণ করতে পারবে।"

ইংরেজ শাসনের ভণ্ডামি ও নিষ্ঠুরতায়, লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ "আজ পর্যন্ত না মিলল আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা, না জুটল যথেষ্ট পরিমাণে পেটের ভাত, না ঘটল স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। শাসনতন্ত্রের কাঠামো রক্ষা করতেই পুঁজি শেষ হয়ে আসে, প্রজাদের মানুষ করে তুলতে হাতে কিছুই থাকে না। এই ঔদাসীন্য আমাদের শতাব্দী ধরে হাড়ে-মজ্জায় জীর্ণ করে দিলে।"

এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার "নির্মমতা আমাদের সুদূর ভাবীকালকে পর্যন্ত অভিভূত করে রেখেছে। তাই মনে হয়, নিজেদের স্বভাবগত সমাজগত প্রথাগত সকল প্রকার দুর্বলতা সত্ত্বেও, নিজের দেশের ভার যে করেই হোক নিজেকেই নিতে হবে।"

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তখনই রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত প্রত্যয়ে পৌঁছেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিরকাল এ দেশের বুকের উপর বসে শোষণের রথচক্র চালাতে পারবে না, এদেশ ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবেই—তাই আরও বেশি করে প্রয়োজন ইংরেজের উপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করে আত্মনির্ভরতার প্রচেষ্টা চালানো—

"পরের উপর নির্ভর করে থাকলে দুর্বলতাই বেড়ে চলে, তা ছাড়া ইতিহাসের আবর্তমান দশাচক্রে অনন্তকাল ইংরেজের শাসন অচলপ্রতিষ্ঠ থাকতেই পারে না।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ 'নানা ভুলচুক নানা দুঃখকষ্ট-বিপ্লবের মধ্য দিয়েই নিজেদের নিজেরাই নিয়ন্ত্রণের' প্রচেষ্টায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কারণ, এই প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতার শিক্ষাও তো বহু মূল্যবান—'সেই শিক্ষার আরম্ভপথ আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তি-অনুসারেই আমি নিয়েছিলুম।'

আত্মনির্ভরতার শিক্ষার কাজটা শুরু করতে হবে কোথায়, সে-বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের কোনো সংশয় ছিল না—কিঞ্চিৎ পুনরাবৃত্তি হলেও উদ্ধৃতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—

"ইউরোপের মতো আমাদের জনসমূহ নাগরিক নয়—চিরদিনই চীনের মতো ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে ইংরেজ আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে ঐ নীচের দিক দিয়ে।"

সেইজন্যই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন পল্লীবাংলায়। লিখেছেন, কেউ উৎসাহ দেয়নি। না দেশের মানুষ, না সরকার। কিন্তু অবিচলিত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"তবু আঁকড়ে ধরে আছি। দেশকে কোন্ দিক থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার—ওই গ্রামের কাজে।"

এরপরই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, ১৯৩৪ সালের শেষদিকে—"এতদিন পরে মহাত্মাজী হঠাৎ এই কাজে পা বাড়িয়েছেন। তিনি মহাকায় মানুষ, তাঁর পদক্ষেপ খুব সুদীর্ঘ। তবু মনে হয়, অনেক সুযোগ পেরিয়ে গেছেন, অনেক আগে শুরু করা উচিত ছিল—এ কথা আমি বারবার বলেছি।"

দেশকে বাঁচানোর কাজ যে কংগ্রেসের দ্বারা সম্ভব হবে না, এ বিষয়ে তখনই নিঃসংশয় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'কংগ্রেস জাতি সংগঠনের মূলে হাত দিতে অক্ষম।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জনশিক্ষার কাজ আর পল্লী-উন্নয়নের কাজকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। বস্তুত তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তা ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। তাই প্রথমে, এই শতাব্দীর সূচনাতেই তিনি তাঁর শিক্ষাভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে হাত দিয়েছিলেন। প্রায় একই কালে এবং কালক্রমে শিক্ষাদানের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পল্লী-উন্নয়নের কাজ। দুটি কাজের সার্থক মেলবন্ধন যে সম্ভব, সোভিয়েত পরিক্রমার পরে তার বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করে তাঁর আত্মপ্রত্যয় আরো গভীর ও বলিষ্ঠ হতে পেরেছিল।

তাই, রবীন্দ্রজীবনের উত্তরপর্বে তাঁকে আমরা একই সঙ্গে যখন শিল্পস্রষ্টা ও মহান্ কর্মীরূপে প্রত্যক্ষ করছি, তখনও তিনি তাঁর কবিতা-কথাসাহিত্য-নাটক-গান ছবি প্রভৃতি সবকিছুর তুলনায় তাঁর পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টাকেই একান্ত করে, প্রদান কীর্তিরূপে উপস্থাপিত করতে চাইছেন। তাই তিনি শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি 'সম্ভাষণ' জানাতে গিয়ে এতদূর পর্যন্ত বলেছেন, যাতে স্পষ্ট যে, তাঁর স্রষ্টারূপ নিয়ে যাঁর যা ইচ্ছা তিনি তা বলুন, কিন্তু তাঁর কর্মীরূপটিকে যেন কেউ 'ছোটো' করে না দেখেন—

"আজ আপনারা কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়, তার কর্মের অনুষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করুন, দেখে লিখুন, সকলকে জানিয়ে দিন, কত বড়ো দুঃসাধ্য কাজের ভিতর আমাকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।

আমি পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্যের যে চিত্র এঁকেছি, তা শুধু পল্লীপ্রকৃতির বাহিরের সৌন্দর্য, তার ভিতরকার সত্যরূপ যে কী শোচনীয়, কী দুর্দশাগ্রস্ত, তা আজ আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। আমাকে এখানে আপনারা বিচার করবেন কবিরূপে নয়, কর্মীরূপে এবং সে কর্মের পরিচয় আপনারা এখনই দেখতে পাবেন।"

সোভিয়েত পরিক্রমার পরে আরও একটা কথা রবীন্দ্রনাথ বারংবার অনেক বেশি জোরের সঙ্গে একান্ত আকুতিভরে দেশের মানুষের কাছে বলতে চেয়েছেন, এই 'সম্ভাষণ' অংশেই তা অন্যূন তিন তিনবার উচ্চারিত হয়েছে—

"আমি ধনীসন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি না, বুঝতে পারি না,—এ অভিযোগ যে কত বড়ো মিথ্যা তা আপনারা আজ উপলব্ধি করুন।...আমি গদ্যে-পদ্যে-ছন্দে অনেক কিছু লিখেছি, তার কোনোটার মিল আছে, কোনোটার মিল নেই। সে-সব বেঁচে থাক্ বা না থাক্, তার বিচার ভবিষ্যতের হাতে। কিন্তু আমি ধনীর সন্তান, দরিদ্রের অভাব জানিনে, বুঝিনে, পল্লী-উন্নয়নের কোনো সন্ধানই জানিনে, এমন কথা আমি মেনে নিতে রাজি নই।

আমি ধনী নই, আমার যা সাধ্য ছিল, আমার যে সম্পত্তি ছিল, যে সামান্য সম্বল ছিল, আমি এই অপমানিতের জন্য তা দিয়েছি। আমি অভাজন, বক্তৃতা দিয়ে রাষ্ট্রমঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্ব প্রকাশ করবার মতো আমার কিছু নেই। একদিন সেই নদীপথে যেতে যেতে অসহায় গ্রামবাসীদের যে চেহারা দেখেছি, তা আমি ভুলতে পারিনি, তাই আজ এখানে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করেছি।"

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজের কাজের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও তাঁর সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্র সম্পর্কেও তিনি ছিলেন বিশেষ সচেতন। তাই লিখেছেন—'আমার অল্প শক্তিতে আমি বেশি কিছু করতে পারিনি।'

কিন্তু যে কথা তিনি সবিনয়ে অথচ সুদৃঢ়ভাবে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তা হল—

"কিন্তু এই কথা মনে রেখো, পাবনা কনফারেন্স থেকে আমি বরাবর এই নীতিই প্রচার করে এসেছি। আর শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এর সংকল্পের মূল্য আছে—ফলের কথা আজ কে বিচার করবে?"

মৃত্যুর তিনমাস আগে লেখা 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর আয়ুর সীমায় উপনীত হয়ে বুর্জোয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির মরণদশা প্রত্যক্ষ করে, মানুষের সৃষ্টি, সভ্যতা ও মনুষ্যত্বধ্বংসী সেই বুর্জোয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন—তাঁর আজন্মলালিত সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কার তাঁরই ভাষায় 'দেউলিয়া' হয়ে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ হাত বাড়াবেন কোথায়? কোন্‌দিকে?

এরই মধ্যে ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে তামাম বিশ্বকে। দেখছেন রবীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে। ফ্যাসিবাদ ধ্বংস করবে সোভিয়েতকে, সাম্রাজ্যবাদীরা নিশ্চিন্ত ছিল। মদত জুগিয়েছিল হিটলারকে। আপসমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল হিটলার প্রসঙ্গে। আঁতে ঘা লাগতেই ভয় পেয়ে থমকে গেল। রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীনচিত্তে সাম্রাজ্যবাদীদের ফ্যাসিবাদতোষণের নীতিকে তিরস্কৃত করেও বিশ্বের, বিশ্বশান্তির পক্ষে আশু বিপদরূপে চিহ্নিত করলেন ফ্যাসিবাদকেই। সোভিয়েত আক্রান্ত হতেই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিত্তবেগ ছুটে গেছে আক্রান্ত সোভিয়েতেরই সম্পূর্ণ সমর্থনে।

রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী ছিলেন না। আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কসবাদ তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন, তারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং সোভিয়েত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুদৃঢ় ও সুগভীর সমর্থনের ভিত্তিটা কী?

আসলে রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত-পরিক্রমার অভিজ্ঞতা তাঁকে তাঁর বেশ কিছু সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতাজনিত দ্বিধা-সংশয় সত্ত্বেও সোভিয়েতের 'নূতন' সভ্যতা তথা সমাজব্যবস্থা প্রসঙ্গে আগ্রহী ও অনুরাগী করে তুলেছিল। ঘটনাটা একদিনে ঘটেনি। আচমকাও নয়।

আমরা দেখিয়েছি, যথেষ্ট সময় নিয়ে, যথেষ্ট দ্বিধা-সংশয় বহন করতে-করতেই রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ নিজেকে ভেঙে-চুরে, গড়ে-পিটে নিচ্ছিলেন। তা একদিনে হয়নি। কয়েকটিমাত্র বৎসরের কালপর্যায়েও চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়নি। বৎসরের পর বৎসর চলে গেছে। যখনই মনে হয়েছে, এই বুঝি তিনি তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন, তখনই স্বল্প ব্যবধানেই আবার দেখা গিয়েছে পশ্চাদপসারণ। পিছু টান যে কী মারাত্মক, কত বেশি, রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের গবেষককে সেই কঠিন সত্যটি বারবার অনুভব করতেই হয় বাধ্য হয়ে।

ভুলে গেলে চলবে না, ১৮৬১ সালে জাত রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ঊনবিংশ শতকীয় খণ্ডিত ও প্রায়-বিকলাঙ্গ রেনেসাঁসের ভালোমন্দের মিশ্রিত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের আনন্দ ও অভিশাপের বোঝা যুগপৎ বহন করে পথ হাঁটছিলেন।

এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, এদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি তথা সমকালীন বুর্জোয়া ধ্যানধারণার আবির্ভাব ও প্রভাব ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের অবশেষগুলির উপরেই আরোপিত হয়েছিল। সামন্তবাদকে ধ্বংস ও বিলুপ্ত করে পুঁজিবাদের সুষম প্রবর্তনা ও বিকাশ নয়, ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের উপরেই সহসা বহিরাগত পুঁজিবাদ এখানে আরোপিত হওয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশও এদেশে হল অসম। তারই কিম্ভূত জের আজও বহন করে চলেছি আমরা। সুতরাং ঐতিহাসিক কারণেই রবীন্দ্র-চেতনার গতিপথ ঋজু ও স্থির লক্ষ্যাভিমুখী হতেই পারে না। নানা জটিলতা, আঁকাবাঁকা স্রোত এবং টানাপোড়েনের নিষ্ঠুর বাস্তব অস্তিত্ব সত্ত্বেও রবীন্দ্র-মানসের গতিশীলতা আমাদের চমৎকৃত করে।

সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত-প্রীতি তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি অনুরাগ রাতারাতি হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। বস্তুত, বুর্জোয়া সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি চরম বিরুদ্ধতা ও ফলত তাকে পরিবর্জনের এবং তার বিকল্প হিসেবে সোভিয়েতের 'নতুন' সভ্যতা তথা সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বরণের তথা পরিগ্রহণের সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কত কঠিন, সময়সাপেক্ষ এবং দ্বিধাজড়িত ও সংশয়সঙ্কুল ছিল, পরবর্তী প্রজন্মের আমাদের সময়ের রবীন্দ্র-আলোচকদের পক্ষে তা পুরোপুরি উপলব্ধি করাও সহসা সম্ভব হবে না।

রবীন্দ্র-সমকালীন এই বাস্তবতাকে, এই অবশ্যম্ভাবী পরিস্থিতিকে অনুভব করতে না পারলে রবীন্দ্র-মূল্যায়নে সমস্যা, জটিলতা ও বিতর্ক দেখা দিতে বাধ্য। রবীন্দ্র-সমকাল এবং রবীন্দ্র-চেতনার এই দ্বিধা-জটিলতাকে সঠিকভাবে অনুভব করতে না পারলে রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যের টানা-পোড়েনগুলির যুক্তিসহ ব্যাখ্যাও মিলবে না।

এমন-কী, বারবুসের আহ্বানে কেন রবীন্দ্রনাথ সাড়া দিতে পেরেছিলেন এবং তাঁর প্রেরিত ইশতিহারে স্বাক্ষর করতেও পেরেছিলেন, তার ব্যাখ্যাও সমকালে লব্ধ রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার জগতে তল্লাশি চালিয়েই পেতে হবে।

১৯২০-২১ সালে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞাতায় স্পষ্টতই বুঝেছিলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা অর্থাৎ বুর্জোয়া সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা মানুষের ব্যক্তিত্বকে দলিত করছে ও তাকে যন্ত্রে পরিণত করছে। রবীন্দ্রনাথের মন ভাঙছিল, বিশ্বাস খানখান হয়ে যাচ্ছিল। না হলে কেন তখন লিখবেন—

"যখন দেখি জাগতিক লাভের আশায় মানুষের ব্যক্তিত্বকে দলিত করে পশ্চিম দেশ তাকে যন্ত্রে পরিণত করে তুলেছে, তখন মনে গভীর বেদনা বোধ করি।"

শুধু তাই নয়, বুর্জোয়া সভ্যতাভিমানীরা তখনও যে একদিকে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিকে নিছক বর্ণবিদ্বেষ থেকে মধ্যযুগীয় পদ্ধতিতে দমন-পীড়নের মাধ্যমে অস্বীকার করছে এবং সেই সঙ্গেই অন্যদিকে সদ্যোজাত সোভিয়েতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ এই দুইয়ের বিরুদ্ধেই ধিক্কার জানালেন। লিখলেন—

"আইনসংগতভাবে ভোটের অধিকার দাবি করছে বলে নিগ্রোদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। ···রাশিয়ার অবস্থা বিষয়ে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রচার চলছে।"

মার্কিন সভ্যতার সংসর্গের ফলে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার নিষ্ঠুর অমানবিকতা, কুৎসিত লোভ ও শোষণ, শুষ্কতা ও যান্ত্রিকতাকে তখনও সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন—

"আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম। ···মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।"

১৯২৬ সালে ইটালিতে রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনীকে সমর্থন করেছেন ভেবে কম ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ সৃষ্টি হয়নি, বিশ্ব জুড়েই তার প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখনও দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেন যে,

"ফ্যাসিবাদের পক্ষ সমর্থন করা আমার পক্ষে এক ধরনের জৈবিক আত্মহত্যা।"

এরও পরে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েতে গিয়ে চাক্ষুষ করলেন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং বিপ্লবের মাত্র তেরো বছরের মাথায় তার বিস্ময়কর সর্বতোমুখী সাফল্য। স্বভাবতই মুগ্ধ-অভিভূত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

সোভিয়েতের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, সেখানে ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ অবসান, জনশিক্ষার মাধ্যমেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব কি-না, অথবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আদৌ সম্ভব কি-না, এ সব নিয়ে আর প্রসঙ্গত অবশ্যই সোভিয়েতে সংশ্লিষ্ট নানা জনের সঙ্গে, প্রধানত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সংস্থার সভাপতি পেত্রফের সঙ্গে বলশেভিকবাদ তথা মার্কসবাদ, মার্কসীয় অর্থনীতি নিয়েও রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট খোলাখুলি আলোচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি যা মুগ্ধ করেছিল, তা হল বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল না, নিজের দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণ সাধনেই ব্রতী ছিল না, সারা পৃথিবীর মানুষের শোষণমুক্তির জন্য, সুখী ও সমৃদ্ধ বৃহৎ বিশ্বের জন্যই সোভিয়েতের ব্যাকুলতা। বস্তুত, মার্কসবাদের সঙ্গে যাঁদের ন্যূনতম পরিচয়ও আছে, তাঁরাই জানেন, আন্তর্জাতিকতার বোধ ও চেতনাই যার উৎস, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা এই মানবমুক্তির দর্শনের প্রধান লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদের এই ভাবধারণাটুকু নিজের মতো করে উপলব্ধি ও আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন, তার অভ্রান্ত প্রমাণ পাই—পেত্রফকে যখন তিনি বলেন—

"আপনারা যে কেবল নিজেদের সমস্যার সমাধান করেছেন, তা নয়, আপনারা সমগ্রভাবে জগৎসমস্যার কথাই ভাবছেন।"

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত চিঠিতে বিপ্লবকেই কি স্বাগত জানাননি রবীন্দ্রনাথ—

"সভ্যতার এই ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। ...নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে একদিকে যেমন পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের চেহারা ও চরিত্রটা রবীন্দ্রনাথের পুরোপুরি জানা হয়ে গেছে, তেমনই তিনি প্রত্যক্ষ করে এসেছেন রাশিয়ায় গিয়ে, মানুষ ও মানবতার তথা 'গণমানসমুক্তি'র পথ কী, নেতৃত্ব কোথায়? ১৯৩৫-এর ৭ মার্চ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে তাই রবীন্দ্রনাথের উত্তরণ-সংবাদ এতটাই স্পষ্ট—

"সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ কথা মনে আপনি আসে যে, নব্যরাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করছে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে আপনিই জাগে যে তাদের এই সাধনা সফল হোক।"

এই চিঠিরও এক বছর সাড়ে চার মাস পরে (২৮ জুলাই ১৯৩৬) অমিয় চক্রবর্তীকেই লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ—

"সোভিয়েট রাশিয়ার নাম করা এদেশে অপরাধবিশেষ। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে না করেও থাকতে পারিনে। বিশাল রাজ্যের অন্নের সংস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা, রোগ নিবারণ কী অসাধারণ উদ্যম নৈপুণ্য ও যত্নের সঙ্গে সেখানে নির্বাহ করা হচ্ছে তার বিচার করে মনে শ্রদ্ধামিশ্রিত ঈর্ষা না হয়ে থাকতে পারে না। তার প্রধান কারণ সোভিয়েট রাশিয়া একটি অখণ্ড সজীব কলেবর।"

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল। আনুষ্ঠানিক মহাযুদ্ধ ঘোষণার পরেই শুধু নয়, সুদীর্ঘকাল যাবৎ রবীন্দ্রনাথ মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর যখন যেখানে যে-কোনো আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে, তৎক্ষণাৎ তাঁর 'কলম'টিকেই 'কামানে'র মতো ব্যবহার করেছেন নির্দ্বিধায়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' ঘোষণায় তাঁর ভূমিকা ছিল ধারাবাহিক। সেই ভূমিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারাবাহিক ইতিহাস অন্যত্র দুর্লভ নয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চরিত্র নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত ছিল সঠিক। কোন্ পক্ষ তিনি অবলম্বন করবেন, তা নিয়ে তাঁর দ্বিধা কেটেছে এবং কেটে যেত বহু রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের অনেক আগেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গেও তার তথ্যভিত্তিক প্রমাণের অভাব নেই। যুদ্ধ কাদের মধ্যে সেটা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতার (রচনাকাল১৩৪৫) প্রথম স্তবকেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো—
নিম্নে নিবিড় অতিবর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের

নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুঠের ধন।

যুদ্ধটা যে 'ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাত'—এই মৌলিক নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নির্ভুল। আর বুর্জোয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে পুঁজিবাদেরই সন্তান, 'সভ্যনামিক পাতালে যেথায় জমেছে লুঠের ধন' চরণটিতে তা-ও সোচ্চার। পরবর্তী স্তবকটির শেষাংশেও আহত বিশ্বপুঁজিবাদের হিংস্র প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট—

বিদীর্ণ হল ধনভাণ্ডারতল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্তগুহায়
কালীনাগিনীর দল।
দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা।

এই পটভূমিতে যখন ১৪০১ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হল, তখন অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সহজেই কল্পনা করা যায়।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের ধ্বংস তো কামনা করছেনই, বুর্জোয়া সভ্যতার অন্তর্নিহিত হিংস্র নখর-দংষ্ট্রাও ততদিনে রবীন্দ্রনাথ চিনে ফেলেছেন সঠিকভাবেই। কিন্তু শুধু এইসব সত্যোপলব্ধিই শেষ কথা নয়। মানব-সভ্যতার পরিণাম দাঁড়াবে—সর্বাত্মক ধ্বংস বা সর্বশূন্যতা বা কোনরকম নেতি বা নৈরাজ্য, রবীন্দ্রনাথের তা কল্পনাতীত।

সুতরাং, বিকল্প চাই। মানুষের সর্বাত্মক, সর্বতোমুখী মহত্তম উত্তরণই মহান রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন! বস্তুত, ততদিনে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বপ্নের বাস্তবরূপ সম্পর্কেও নিঃসংশয় হয়েছেন। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত, রবীন্দ্রনাথ তা-ও অনুভব করেছেন। তাঁর 'গণমানসমুক্তির স্বপ্নের বাস্তব রূপ' যে-সোভিয়েত, সেই সোভিয়েতই বিকল্প। সোভিয়েতের পরাজয় রবীন্দ্রনাথের কাছে তখন তাঁর আশি বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ স্বপ্ন, সত্য ও প্রত্যয়ের পরাজয় এবং এমন-কী মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিত্রাণ ও বহু বাঞ্ছিত পরিণামের একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্পের অপমৃত্যু।

সভ্যতার সংকট তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর দারুণ শূন্যময় পরিণাম। বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতি তাঁর আজন্মের বিশ্বাস টলে গিয়েছিল। 'দুঃখের আঁধার রাত্রি' কবিতাটি রচনার কমাস আগেই তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

সেই সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে স্পষ্টতই পুনরায় রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া সভ্যতা তথা ধনতান্ত্রিক ইংল্যান্ডের সঙ্গে তুলনায় স্থাপন করেছেন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতকে। সরাসরি তুলনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তিনি—

"ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে।"

পক্ষান্তরে,

"সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির—আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর।"

পাশ্চাত্য সভ্যতারূপে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছেন বুর্জোয়া সভ্যতাকেই। লিখেছেন, "জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল"।

তাহলে কী করবেন রবীন্দ্রনাথ? হতাশ্বাস শূন্যতা রবীন্দ্রজীবনাদর্শ নয়। বিকল্প চাই। বিকল্প কোথায়? রবীন্দ্রনাথ হাত বাড়াবেন কোথায়। কোন দিকে?

নৈরাশ্য বা নৈরাজ্য তিনি মেনে নিতে পারেন না—'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে-বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।'

স্বভাবতই, মৃত্যুশয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত সভ্যতার ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হিটলার তথা ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত বিনাশ কামনা করলেন, সোভিয়েট সভ্যতা রক্ষার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেন। বুর্জোয়া সভ্যতার মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি তিনি শুনেছিলেন। আশা ও বিশ্বাসের আর কোনো হেতু সেখানে খুঁজে পাননি। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতেই মানুষের আশা ও বিশ্বাসের ঐশ্বর্য ও সম্পদকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

গণমানসমুক্তির যে স্বপ্ন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করে এবং প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় যুদ্ধারম্ভ পর্যন্ত তাঁর সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ অবশেষে অবক্ষয়িত বুর্জোয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির চূড়ান্ত বিনাশ ঘোষণা করেছেন ('আফ্রিকা' কবিতার 'সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী' স্মরণীয়) এবং সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী বিজয়-সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি জানিয়ে গেছেন। সমগ্র রচনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নশেষে পাঠক সম্ভবত এই নির্ণয় বিবেচনার অযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করবেন না।

এবং, এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ, আকস্মিকভাবে নয়, ভাববাদী মোহাবিষ্ট অবস্থায় নয়, মিস্টিক তুরীয় মার্গ বেয়ে নয়, তিল-তিল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা, নিদারুণ টানাপোড়েনের মধ্যে দ্বিধা-সংশয়ে আন্দোলিত হতে হতে,অবশেষে, কোনোক্রমে, তীরের নিশানা পেলেন, উত্তরণের ইঙ্গিত পেলেন, তাকে আভাসিত করতে পারলেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কসবাদে তাঁর অনুশীলন ও প্রবেশ সম্ভব হলে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীসংগ্রামের সত্যকে আত্মস্থ করতে পারলে, এত দ্বিধা, এত যন্ত্রণা, এত অনিশ্চয়তা, এত বিরোধ-বিতর্কের মানসিক অশান্তি তাঁকে ভোগ করতে হত না কিন্তু এতদূর পর্যন্ত পথ হাঁটার পরমায়ু বা অবকাশ আর তাঁর ছিল না। গণমানসমুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন, তার বাস্তবরূপও প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েতে গিয়ে, তথাপি গণমানসমুক্তির প্রক্রিয়া যে অবশ্যম্ভাবী রক্তক্ষয়ী বিপ্লব, সেই প্রক্রিয়াটিকেও মাঝে মাঝে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করলেও এ বিষয়ে মনস্থির করতে পারছিলেন না কিছুতেই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা ক্রমশ তাঁর সংশয়মুক্তি ঘটিয়ে নিশ্চিত অবস্থানের দিকে আহ্বান করছিল তাঁকে। কিন্তু এই সময়েই মৃত্যু এল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণাম যদি তিনি দেখে যেতে পারতেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সোভিয়েতের আদর্শে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশের গণমানসমুক্তির বাস্তব দৃশ্য যদি তাঁর অভিজ্ঞতায় যুক্ত হত, তাহলে তাঁর জীবনপথপরিক্রমার অভিজ্ঞতালব্ধ পূর্ণাঙ্গ পরিণতির চিত্রটি স্ফুটতর হতে পারত।

তা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের আজন্মলালিত বদ্ধমূল আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের জগৎ জুড়ে প্রথম থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত প্রচণ্ড ভূমিকম্প ঘটেছে বারবার। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নতুন বিশ্বাসের জগতে তাঁর পদক্ষেপ যখন অনিবার্য, তখন সত্যিই বড়ো বেশি দেরি হয়ে গেছে।

তথাপি, যে-বনস্পতির নাম রবীন্দ্রনাথ, তাঁর উত্তুঙ্গ শির আকাশের সুদূর নীলিমার দিকেই সমুন্নত, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমকালকে আত্মস্থ করে দূর ভবিষ্যতে প্রসারিত করেছেন তিনি নিজেকে, জন্মসূত্রে অবস্থানগত শ্রেণীস্বার্থের থেকে তাঁর মহান উত্তরণপ্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত আছে উত্তরকালের শিক্ষার ক্ষেত্র। আমরা দেখিয়েছি, জনমুখী চিন্তার ক্ষেত্রে সমকালীন সীমাবদ্ধতা থেকে ভাবীকালের বুকে সার্থক তাঁর উত্তরণের দৃষ্টান্তও।

তবে কি রবীন্দ্রনাথ জীবনের পরিণত পর্বে পৌঁছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকেই কাঙ্ক্ষিত মনে করেছিলেন? এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তরই আমাদের এই সমগ্র রচনায় বিধৃত হয়ে রইল। তাঁর ঝোঁকটা, প্রবণতা কোন দিকে, অনতি-উচ্চারিত অভিপ্রায়টি যে কী, অন্তত তা-ই নিয়ে সংশয় প্রকাশের অবকাশ আছে বলে মনে করি না।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যলোক

সাহিত্যসৃষ্টির মুদ্রিত রূপটি ঐ হিমশিলার উপরিভাগটুকুই—এর বৃহত্তর, জটিল, গভীর প্রক্রিয়াটি আমাদের দৃষ্টির অগোচরেই থাকবে।

সংস্কৃত ভাষার বৈচিত্র্যময় সরস প্রাণপ্রবাহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অবগাহন করেছেন বারংবার। প্রথমত, বাল্যে রীতিমতো নিষ্ঠার সঙ্গে ও যত্নসহকারে ব্যাকরণ ও অভিধান গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে তাঁকে সংস্কৃত ভাষার পাঠ নিতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তাঁর পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারায় সংস্কৃতের প্রভাব ছিল ব্যাপক। তৃতীয়ত, পরিণত বয়সে, ব্যক্তিগত পঠন-পাঠনের মাধ্যমে ও বিদ্বজ্জনের সঙ্গে বহুবিধ আলাপ-আলোচনার দ্বারা সংস্কৃতের রত্নভাণ্ডার থেকে বারবার তিনি ঐশ্বর্য আহরণ করে এনেছেন। তাঁর 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা' প্রভৃতি রচনায়—এমনকী, তাঁর জীবনী গ্রন্থগুলিতেও একথার উল্লেখ আছে।

বাল্যের এই শিক্ষার ফলে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করেছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যখন আপাত-দুর্বোধ্য কোনো অনুচ্ছেদে শব্দবিশেষের অর্থ বোধ হত না, তখনও অনায়াসেই তিনি মূল ভাবটি আয়ত্ত করে নিতে পারতেন। অপরিচিত শব্দবন্ধ বা বাক্যবন্ধের অভাবকে তিনি পূরণ করে নিতেন তাঁর কবিসুলভ কল্পনা দিয়ে।[১]

ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশে সেদিন একদিকে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে সামন্ততন্ত্র, অন্যদিকে আবির্ভূত হচ্ছে নতুন এক সংস্কৃতি ; দেশীয় জমিদারসমাজের অধিকাংশই তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে মেতে উঠেছেন। এই সময়ে ঠাকুর-পরিবার গ্রহণ করলেন এক বিশিষ্ট ভূমিকা ; তাঁরা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির সুস্থ, সজীব ও মহত্তর অংশকে পুনরাবিষ্কার করতে, যুগোপযোগী করে পুনঃপ্রবর্তিত করতে ব্রতী হলেন। যখন পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণের বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ, তখন রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব ও ভ্রাতৃবর্গ (অবশ্যই তাঁদের সহযোগী ছিলেন বেশ কিছু মনীষীও) সমকালীন চিন্তাধারায় নানা সমস্যার সমাধান খুঁজে ফিরেছেন ভারতবর্ষের যুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারে। এই অনুসন্ধিৎসারই অন্যতম উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিস্মৃতির, অবহেলার অন্ধকার সরিয়ে তিনিও খুঁজেছেন ভারতীয় মনীষার সৃষ্ট অমূল্য সম্পদ এবং বিশ্বের বিদ্বৎসমাজে তাকে সমাদৃত করে তুলেছেন। নিজের সাহিত্যক্ষেত্রেও কবি প্রাচীন ভারতীয় রচনার ধারাকে নানাভাবে ব্যবহার করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংস্কৃতের প্রভাব বহুধা বিস্তৃত ও বিচিত্রভাবে ব্যাপ্ত। কবির শব্দ-চয়ন, বাক্যবন্ধগঠন, অলংকারের ঝংকার, ভাবের গভীরতা প্রভৃতি বাহ্য উপাদান থেকে শুরু করে তাঁর ধ্যান ও মননের গভীরতায় এবং মূল্যবোধের গৌরবে নানাভাবে সংস্কৃতের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কবির মানসিকতা ছিল গভীর অধ্যাত্মভাবনায় পরিনিষ্ঠিত ; তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃত সাহিত্যের যা কিছু মহৎ সেই সব চিন্তাধারা জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে তাঁক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নিরন্তর ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা আর পরিবর্তনের মধ্যেও তাঁর উদার আধুনিক চিত্তে কয়েকটি প্রাচীন মূল্যবোধ সঞ্চিত হয়েছিল অনপনেয় গভীরতার সঙ্গে। জীবনে যখন সমকালীন জগতে নানা বিষয়ে মতবিরোধ উত্তাল হয়ে উঠেছে তখনও সেই মূল্যবোধই তাঁকে স্থির অবিচল রেখেছে। এই মূল্যবোধ, মানসিকতার এই উত্তরাধিকার বহুলাংশে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই পেয়েছেন। এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, কবির কাব্যপ্রতিভার সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে গেলে তাঁর কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের বিচারও করতে হয়। আঠারো বৎসর বয়সে (১৮৭৮-৮০) কবির প্রথম ইংলন্ড

যাত্রার পূর্বে রচিত বনফুল[২], কবিকাহিনী[৩] ও শৈশবসংগীত[৪] কাব্যের অপরিণত ভাবোচ্ছ্বাস এবং তৎপরবর্তী সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮১), প্রভাতসংগীত (১৮৮২-৮৩) কাব্যের সংহত পরিণততর কাব্য-ভাবনাকে তুলনা করে দেখলেই এই তথ্যটি বোঝা যায়। বয়সের পরিণতিও অবশ্য এর একটি কারণ ; কিন্তু ভিন্ন একটি সভ্যতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর সংবেদনশীল চিত্তে যে বিচিত্র সাড়া জাগিয়েছিল তাকেও অস্বীকার করা যায় না।

প্রথম দিকের কাব্য ও কাব্যনাট্যগুলিতে কবির ভাব লঘু, আবেগবিহ্বল, ভাষার প্রকাশ যেন অপরিণত। কিন্তু পরবর্তী কাব্য দুটিতে তাঁর রচনাভঙ্গি শিল্পসৌকর্যমণ্ডিত। আরও পরে নিজেই বলেন তিনি সন্ধ্যাসংগীতের ভূমিকায়[৫]—"সেই কপিবুক যুগের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল সন্ধ্যাসংগীত। তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে অর্থাৎ তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরেনি তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমায় আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসংগীত-ই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে। সে-সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।"

কয়েক দশকের দূরত্বে এসে কবির পরিণত বোধ এখানে উপলব্ধি করেছে যে এই কবিতাগুলির মধ্যেই তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রথম প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ইংলন্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই এগুলি রচিত হয়েছিল।

ইউরোপে গিয়ে কবির সংবেদনশীল তরুণ চিত্ত নতুনতর কাব্যভাবনার পরিচয় লাভ করে উন্মুখ আগ্রহে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল ; তাঁর কাব্যসৃষ্টি নবতর সম্ভারে ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছিল। কুয়াশার মতো অস্পষ্ট তাঁর অনির্দেশ্য আবেগ যেন এই প্রথম সুস্পষ্ট একটি রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করল। কবির অস্থির চঞ্চল চিত্ত যেন কোনো এক অনির্দিষ্ট ভাবনার শ্বাসরোধী জালে আবদ্ধ, জীবনবিমুখ, এমনকী হয়তো কতকটা পলায়নপরও। সন্ধ্যাসংগীতে সেই বিমুখতার প্রকাশ। আবার প্রভাতসংগীতে বেজে উঠেছে সেই আত্মরত ভাবনার আবরণ মোচনের সুর। তাই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় দেখি—গুহায় আবদ্ধ জলরাশিকে চকিতে স্পর্শ করে যায় প্রভাতের অরুণ কিরণ, মুক্ত বিহঙ্গের কলতান। অন্ধকার গিরিগুহা ছেড়ে মুক্তির আনন্দে জলধারা সহসা উৎসারিত হয়ে আসে বহিঃপ্রকৃতির প্রসারিত অঙ্গনে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক রুদ্ধ একক আবেগের গণ্ডি ছাড়িয়ে কবির ব্যক্তিসত্তা যেভাবে বেরিয়ে এল বহির্বিশ্বের কলরোলে, এ কবিতা সেই আত্মপ্রকাশেরই প্রতীকমাত্র। কবির পরবর্তী কবিতা 'প্রভাত উৎসব'-এও দেখা যায় বৃহত্তর জনজীবনের মধ্যে আত্মোৎসর্গের আনন্দই অনুরণিত হচ্ছে ছত্রে-ছত্রে।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ঊনত্রিশ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার কবির ইউরোপ-ভ্রমণ। অবশ্য ফিরে এলেন দ্রুত। তারপরের রচনা 'সোনার তরী'কে কবির প্রথম পরিণত, যথার্থ শিল্পসম্মত কাব্যসৃষ্টি বলা যায়। যদিও 'মানসী' (১৮৮৮-৯০) গ্রন্থের শেষাংশের কবিতাগুলিতে স্পষ্টতই দেখা যায় গভীর রোম্যান্টিক চিন্তা, কখনও বা উদাসীনতা, কোথাও বিদ্রূপ ও পরিহাসের সংমিশ্রণ, তবু 'সোনার তরী'-তেই প্রথম দেখা গেল কবির ভাব ও ভাষার পূর্ণ পরিণত নৈপুণ্য। রোম্যান্টিক কবির এই কাব্যৈশ্বর্যের প্রকাশ পূর্বতন রচনাগুলিতে দেখা যায়নি।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলি কিন্তু এক বা একাধিক দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি। বহুশত বৎসরের সাহিত্যপ্রবাহে পুষ্ট কবির চিত্তে এসে পড়েছিল প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাব। তাঁর অবচেতনায় চলতে লাগল পাশ্চাত্য সাহিত্যের নির্ধারিত মূল্যমান দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের বিচার। ফলে বাংলা সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব ফসল ফলল। সেই সোনার ফসলেরই প্রথম মঞ্জরী হল 'সোনার তরী' যেখানে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম খুঁজে পেলেন তাঁর নিজস্ব বিশিষ্ট কবিসত্তার প্রকাশকে।

২

সর্বপ্রথম বিচার করা যাক কবির কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের সুস্পষ্ট পদচিহ্নকে অর্থাৎ তাঁর শব্দসম্ভার আর বাক্যবন্ধকে। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন তখন বাংলা সাহিত্য বলতে বোঝাত রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ, মধ্যযুগের কিছু মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী এবং মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখ কয়েকজন সংস্কৃতানুকারী কবির রচনা। তাঁর সমকালে শিক্ষিত বাঙালির মননজীবন ছিল এই সাহিত্যধারাতেই নিষ্ণাত ; এ-ই তাঁর সাহিত্যিক উত্তরাধিকার। সুতরাং এক অর্থে বলা যায়, সাহিত্যরচনায় তাঁর নিজের বিশেষ মুদ্রাটির সন্ধান পাবার আগেই, কবি সংস্কৃত কাব্যধারার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। সে যুগের বাঙালি পাঠক মাত্রেই কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারত পাঠের মাধ্যমে বহু অপরিচিত কঠিন সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতেন। তৎকালীন শিক্ষাই ছিল সংস্কৃতভিত্তিক, সুতরাং শিক্ষিত বাঙালির পক্ষে সংস্কৃত ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি পরিচিত ও সহজবোধ্য ভাষা। সেইভাবেই বারংবার পাঠ শোনার ফলে সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে সংপৃক্ত আপাত-কঠিন শব্দগুলিও কিশোর কবির কাছে ক্রমে-ক্রমে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তারপর সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হলেন সংস্কৃতের ধ্বনিগম্ভীর বর্ণবিচিত্র শব্দসম্ভারের সঙ্গে। তখনও পর্যন্ত বাঙালি কবিরা সেই সম্ভাবনাপূর্ণ শব্দৈশ্বর্যের কাব্যব্যবহার সম্বন্ধে অনেকটাই উদাসীন ছিলেন ; কারণ তাঁদের প্রয়োগ ও প্রয়োজন ছিল অন্যরকম। রচনার প্রয়োজনে তাঁরা কোথাও কোথাও সংস্কৃত শব্দ আক্ষরিকভাবে ঋণ নিয়েছিলেন ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবার তাঁর বিশিষ্ট কাব্যভঙ্গিতে, স্বকীয় ব্যবহারের অনুরূপ করে এর ঝংকার, ঘনসন্নিবেশের গাম্ভীর্য এবং ছন্দের স্পন্দনকে নিজের প্রেরণার অনুকূলে রূপান্তরিত করে নিলেন। তাঁর পূর্বসূরি কবিরা ব্রতী হয়েছিলেন মহাকাব্য রচনায়। রবীন্দ্রনাথ, বুঝি-বা নিজের কাব্যপ্রতিভার স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই, নিজের কবিত্বের সীমান্ত নিরূপণ করলেন প্রধানত গীতিকাব্যের পরিসরেই। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মধ্যযুগীয় কাব্যভাবনায় বা দত্তকবি মধুসূদনের ধ্রুপদী কাব্যধারায় যে শব্দসম্ভার অপাঙ্‌ক্তেয় থেকে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে উদ্ধার করে নিজের সৃষ্টিকর্মে ব্যবহার করলেন।

পরবর্তী জীবনে কবি যখন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনের দায়িত্ব নিয়েছেন তখন কিছু কিছু বিজ্ঞানমূলক রচনার উদ্দেশ্যে পারিভাষিক প্রতিশব্দ খুঁজেছিলেন সংস্কৃত ভাষায়। তাঁর সে প্রচেষ্টা সফলও হয়েছিল এবং এই পথেই এখনও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পরিভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হচ্ছে।

রবীন্দ্রকাব্যের অনুশীলন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, সংস্কৃত শব্দচয়নের চেষ্টায় কবি দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন প্রধানত রামায়ণের অভিমুখে এবং প্রার্থী হয়েছিলেন বাণভট্ট ও কালিদাসের দ্বারে। তাই ১৯৬৪ সালে যখন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকদের সহৃদয়তায় কবির ব্যবহৃত সেই বিশেষ গ্রন্থগুলি দেখার সৌভাগ্য হল তখন বিস্ময়ে আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠলাম, আমার অনুমানের সমর্থনে বেশ কিছু প্রমাণ দেখে। মার্জিনের ধারে-ধারে বহু চিন্তাপ্রসূত সযত্নসাধ্য মন্তব্য করে রেখেছেন কবি। সংস্কৃত থেকে শব্দ আহরণের ও রূপান্তরের স্তরগুলি লিখে রেখেছেন। বর্ণাঢ্য শব্দময় ভাষা সৃষ্টির জন্য সংস্কৃত শব্দের রূপান্তর করেছেন, কখনোই শব্দের আক্ষরিক অনুকরণ করেননি।

কালিদাসের মেঘদূতে পাই—'রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাম্'। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূতে' দেখা যায়—'বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপাদমূলে/উপলব্যথিতগতি'।[৬] 'উপলব্যথিতগতি' শব্দটিতে যে নতুন আবেগের স্পর্শ ও মূলে যা অনুপস্থিত, তা পাশ্চাত্য রোম্যান্টিক সাহিত্যের রসভাক্ কবিচিত্তেরই সংযোজন। এইটুকুতেই বাংলা কাব্য একটি নতুন মাত্রা লাভ করল, যা তখনও পর্যন্ত ছিল না এবং যার ঐশ্বর্য বাংলা সাহিত্যকে নতুন এক পথে প্রবর্তিত করল। বাণভট্ট লিখে গেছেন—'কাতরকপোতিকূজিতানুবন্ধবধিরিতবিশ্বে'।[৭] কবি বলেছেন—'কুলায়ে কাঁদিছে কাতর কপোত।'[৮] এখানে যদিও অনুপ্রাসে এবং শব্দচিত্রে কবি স্পষ্টতই বাণভট্টের কাছে ঋণী, তবু কাঁদিছে শব্দটি সংযোজনে যে আবেশঋদ্ধতা তা তাঁর বিশিষ্ট দান। আবার ময়ূরভট্টের সূর্যশতকে যখন দেখি—'ক্ষোদো নক্ষত্ররাশেরদয়রয়মিলচ্চক্রপিষ্টস্য ধূলিঃ'[৯]—তখন স্বভাবত মনে পড়ে শেষের কবিতার বিখ্যাত স্তবকটি—

> 'কালের যাত্রা ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
> তারি রথ নিত্যই উধাও
> জাগাইছে অন্তরিক্ষে হৃদয়-স্পন্দন
> চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন।'[১০]

দুটি কাব্যাংশেই 'চক্রপিষ্ট' শব্দটি ভাবনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, রাত্রি গাঢ় অসীম অন্ধকারে আকাশের বক্ষে তারার হৃদয়ভেদী কান্না ধ্বনিত হচ্ছে, তখন এ কাব্যে নতুন একটি হাহাকার যেন স্পষ্টতর রূপে ধরা দেয়। সংস্কৃত শ্লোকে যা ছিল নক্ষত্রলোকের বর্ণনা মাত্র, বাঙালি গীতিকবির লেখনীতে সেখানে রূপ পরিগ্রহ করল ভগ্ন হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস। বস্তুত ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ, আবেগজড়িত শব্দসম্ভারই গীতিকাব্যের পক্ষে উপযুক্ত এবং সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে নিজের এই আবেগজাত উপলব্ধিই কবি প্রকাশ করেছেন।

৩

জয়দেব এবং অন্যান্য কোনো কোনো কবির রচনা পাঠ করে অপভ্রংশ ছন্দের নানা রূপবৈচিত্র্যে বাঙালি পাঠক অভ্যস্ত হয়েছিল। এবার সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে রবীন্দ্রনাথ নানা পরিচিত ছন্দকে আহরণ করে স্বচ্ছন্দে বাংলায় সেগুলি ব্যবহার করলেন; আর, আপন প্রতিভার স্পর্শে তাদের করে তুললেন শ্রুতিসুখকর, নতুনতর। কবির এই

ছন্দবৈচিত্র্য পূর্বেই বহু বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ বিষয়ে অনেকেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন। তাই কয়েকটি উদাহরণমাত্র আলোচনা করে ক্ষান্ত হব। জয়দেব বলেন—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মূল সংস্কৃত ছন্দের দুটি অক্ষরের স্থান পরিবর্তন করেন[১১] অথবা মাত্রার ব্যবহার প্রায় যথাযথ রেখেও কিছু পরিবর্তন সাধন করেন।[১২] কারণ পঙ্ক্তির অপেক্ষিত দৈর্ঘ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অন্তিম স্বরধ্বনিকে দীর্ঘায়িত করার যে প্রয়াস সংস্কৃতে আছে, বাঙালির কান তাতে অনভ্যস্ত। এইভাবে কৃত্রিম দীর্ঘায়ত স্বরধ্বনির ব্যবহার কতকটা শ্রুতিকটুও হয়ে পড়ে। এরপরে পেলাম 'মদনভস্মের পরে'। সেখানে পূর্বের অসুবিধা দূর করার জন্য কবি যোগ করলেন আরও কয়েকটি অক্ষর এবং তার দ্বারা ছন্দটি হয়ে উঠল শ্রুতিসুখকর।[১৩] হয়তো ঠাকুর-পরিবারে কাব্যপাঠ ও কাব্য আবৃত্তির একটি সজীব ধারা প্রবর্তিত থাকার ফলে এটি তাঁর পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছিল। অবশ্য প্রধানত তাঁর নিজের ছন্দের অভ্রান্ত বোধই তাঁকে প্রচলিত সংস্কৃত ছন্দকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে বাঙালির শ্রুতির কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করেছিল। যাঁরাই তাঁর ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরাই এটি লক্ষ করেছেন। তিনি নিজেও তাঁর ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনায় এই সূক্ষ্ম বোধের পরিচয় বারেবারেই দিয়েছেন।

জীবন-সায়াহ্নে রচিত 'শেষের কবিতা'তেও দেখি, ছন্দ নিয়ে কবির পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত আছে।[১৪] এখানে যুগ্ম ছত্রগুলিতে তিনি অন্তিম স্বরকে কিছুটা দীর্ঘায়ত করেছেন। অযুগ্ম ছত্রে করেননি। ফলে যে মাত্রাগত ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে তা এক ধরনের আবেদনের মতো কাকুধ্বনির অনুরণন তোলে। প্রতিটি ছন্দবন্ধের সঠিক অনুপাত যিনি অনুধাবন করেছেন, কেবল সেই কবিই পারেন ছন্দগঠনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সার্থকভাবে করতে এবং ভাবের প্রতিধ্বনির মতো করে এমন নিখুঁতভাবে শব্দাবলিকে সাজিয়ে নিতে। কাব্যের নির্মাণে তাঁর অন্যতম উপাদান হল ছন্দ, কিন্তু বাংলা ছন্দ অন্ত্যমিলের প্রত্যাশী। অপভ্রংশ কাব্যের অনুসরণে এই অন্ত্যমিলের প্রবর্তন করে গেছেন স্বয়ং কবি জয়দেব। সংস্কৃত ছন্দের যথাযথ অনুকরণে এই অন্ত্যমিল এক দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। কারণ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র (প্রধানত অন্ত্যযমক) ভিন্ন ধ্রুপদী সংস্কৃতে অন্ত্যমিলের ব্যবহার নেই ; অথচ মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত বাংলায় অন্ত্যমিলের অব্যাহত ব্যবহার। অতিসতর্ক পদক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ ছন্দ প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কখনও তিনি যুক্তাক্ষরের প্রয়োগে পরিহার করলেন শব্দের আপাত অপরিহার্য লঘুতাকে,[১৫] কখনও বা মিলযুক্ত পঙ্ক্তিগুলিকে প্রয়োজনমতো দীর্ঘায়ত বা সংকুচিত করে পরস্পর থেকে কতকটা দূরত্বে স্থাপন করলেন।[১৬] কখনও বা অসম দৈর্ঘ্যের পঙ্ক্তিরচনা করলেন।[১৭] ফলে কবিতার শব্দশরীর হয়ে উঠল বিচিত্র ধ্বনিসৌন্দর্যে মণ্ডিত। বিবিধ প্রাচীন কাব্য, গীতগোবিন্দ প্রভৃতির ছন্দ-ব্যবহার তিনি সযত্নে অনুধাবন করেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের কাব্যরচনার পরিধি আরও বহুদূর প্রসারিত, সেখানে তিনি ধ্রুপদী সংস্কৃত ছন্দের মতোই বর্ণনানুসারী প্রয়োগ দ্বারা ধ্বনির গাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছেন।

জীবনের সায়াহ্নে কবি অভিভূত হয়েছিলেন ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলির অনাড়ম্বর দ্যুতিতে। তখন তিনিও তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে বাহিরের সজ্জা পরিহার করে অন্তর্লীন গৌরবেই গরীয়সী করে তুলতে চেয়েছিলেন। 'পূরবী'র পরবর্তী রচনায় কাব্যের এই নিরলংকার হীরক-কঠিন সমুজ্জ্বল মহিমার আভাস পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রসাহিত্যের রচনাশৈলীতে, বাগ্‌বন্ধে, শব্দচয়নে, ছন্দনিবেশনে, ধ্বনিঝংকারে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেরণা সুস্পষ্ট। কোনো কোনো রচনাতে স্পষ্টত সংস্কৃত বাক্য বা ছন্দ ব্যবহার না করেও কবি সংস্কৃতের মতোই বাতাবরণ রচনায় সার্থক হয়েছেন। কখনও সে কাব্যাংশ যেন সংস্কৃতের অবিকল প্রতিলিপি ; কখনও বা সংস্কৃত রচনার সঙ্গে তার সাদৃশ্য এতই বেশি যে সংস্কৃতের অনুবাদ ভেবে পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন।[১৮] সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে অনুপ্রাসের প্রয়োগ বিশেষ জনপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও আমরা অনুপ্রাসের ধ্বনিমধুর বহুল ব্যবহার দেখি অথচ সংস্কৃত সাহিত্যের অপকৃষ্ট কাব্যগুলির মতো সেখানে অনুপ্রাসের ক্লান্তিকর আধিক্য নেই ;[১৯] তাঁর কাব্য কখনোই অনুপ্রাসের আতিশয্যে শিথিলবন্ধ হয়ে যায়নি। কোথায় অনুপ্রাসের বর্ণাবৃত্তি রুচিপীড়াদায়ক হয় এ সম্বন্ধে তাঁর অভ্রান্ত শ্রুতিবোধ ছিল ; তাই কোথাও যেন একটা কঠিন মেরুদণ্ড থাকায় তাঁর শব্দবিন্যাস কখনও ধ্বনিমাত্র-সার হয়ে ওঠেনি। অর্থকেই অনুসরণ করেছে ধ্বনি এবং এ-অর্থও প্রসাদগুণ হারায়নি। যমক সংস্কৃত কাব্যেও অপকর্ষের দ্যোতক, রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রয়োজনেই শুধু যমক ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ অনুকরণে বিরত ছিলেন। অনুপ্রাস, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি প্রধান অলংকারের ব্যবহার তিনি বহুলভাবেই করেছেন, কিন্তু জটিল এবং কৃত্রিম অলংকার কখনও প্রয়োগ করেননি। বরং বিরূপভাবেই কখনও কখনও তাদের উল্লেখ করেছেন, এমনকী নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি। ফাল্গুনী নাটকে দেখি পণ্ডিত শ্রুতিভূষণ মহারাজকে বলছেন—

'মহারাজ, ব্রাহ্মণী মহারাজকে বলতে বলেছেন তিনি তাঁর সর্বাঙ্গে মহারাজের যশোঝংকার ধ্বনিত করতে চান কিন্তু আভরণের অভাববশত শব্দ বড়োই ক্ষীণ হয়ে বাজছে।'

আমরা লক্ষ করি যে, পাঁচ বা ছয় অক্ষরযুক্ত পঙ্‌ক্তিতে বিভাজ্য ছন্দের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দের দ্বারা প্রভাবিত। আবার, বাণভট্টের গদ্যবন্ধ থেকেও তিনি ছন্দ শিক্ষা করেছেন।[২০] বাণভট্টের গদ্যছন্দের ধ্বনিগত প্রভাব কবির গদ্য ও কবিতা—উভয়ত্রই দেখা যায় ; শুধু এই দীর্ঘ সমাসবহুল গৌড়ী রীতিই তিনি কখনও হুবহু অনুসরণ করেননি। উল্লেখযোগ্য যে, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা ও উপজাতির মতো প্রতি চরণে এগারো (৫ + ৬) অক্ষরের ছন্দ অথবা বারো অক্ষরের ইন্দ্রবংশা বা বংশস্থবিলের মতো ছন্দ সংস্কৃতে বহুল প্রচলিত। আখ্যানকী (৫ + ৬), রথোদ্ধতা (৬ + ৫) ভুজঙ্গপ্রয়াত (৬ + ৬) শিখরিণী (৬ + ৬ + ৫ — ৬ + ৬ + ৪) এগুলিই বারেবারে ব্যবহৃত হয়। পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার বিন্যাস ও যতির স্থূল পরিবর্তনের দ্বারাই ছন্দের চপলতা বা গতি নিরূপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বহুবার এগুলির মাত্রার পুনর্বিন্যাসের দ্বারা নানা নতুন ধ্বনিতরঙ্গ তুলবার প্রয়াস পেয়েছিলেন কিন্তু সর্বদাই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিরূপিত হত বাঙালির কান যে-সব ছন্দে অভ্যস্ত, তার থেকে খুব বেশি দূরে না গিয়ে সাফল্য সৃষ্টি করবার। এক অনুষ্টুপ ছন্দকে কত রকমেই

না ভেঙে গড়েছেন তেমনই পয়ারকেও। এ সাহসের কারণ বাঙালির শ্রবণে এগুলি দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত। ফলে সামান্য ব্যত্যয় বৈচিত্র্যই সৃষ্টি করবে, আঘাত করবে না।

অন্যদিকে, কালিদাসোত্তর যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে যে মাধুর্যহীন কৃত্রিম বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের বিস্তার দেখা যায়, অতি স্বাভাবিকভাবেই কবির সৌন্দর্যপিপাসু সংবেদনশীল মন তার প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করেছিল। বাগর্থবিস্তারের সুকুমারত্বে, প্রসাদগুণ ব্যাহত হয় না এমন সরসমধুর অলংকার নির্বাচনে, সর্বোপরি ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধিতে ও পরিমিতিবোধে রবীন্দ্রনাথের কাছে কালিদাসই ছিলেন কবিত্বের আদর্শস্বরূপ। তাঁর স্পর্শকাতর কবিসত্তা স্বভাবতই অলংকারের আতিশয্যের প্রতি বিমুখ ছিল। উনবিংশ শতকের অপেক্ষাকৃত নিরলংকার ইংরেজি রোম্যান্টিক কাব্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলেও তিনি আড়ম্বরপূর্ণ অলংকারের ঘনঘটার প্রতি বীতস্পৃহ ছিলেন। তাই কালিদাস-পরবর্তী সংস্কৃত কবিদের মধ্যে কাব্যসুষমাবোধের, কাব্যের ভাব ও ভাষার অন্তর্লীন সামঞ্জস্যবোধের যে অভাব পরিলক্ষিত হয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যশিল্প ঠিক সেই অভাবকেই পূর্ণ করেছিল।

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে উপমা, রূপক ইত্যাদি আহরণের ক্ষেত্র ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে আসছিল। কারণ, কৃত্রিম অলংকার[২১] শাস্ত্রসম্মত অলংকারের বোঝা ক্রমেই দুর্বহ হয়ে উঠছিল। অন্যদিকে তাই খ্রিস্টীয় দশম শতকের পর থেকেই কাব্যের স্বচ্ছন্দ সরসপ্রবাহ কথ্য ভাষাগুলিকে অবলম্বন করে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল। অলংকার শাস্ত্রের অতি কঠিন ও সতর্ক শাসন যেন ধীরে ধীরে কাব্যের প্রাণবায়ুকেই রুদ্ধ করছিল। কাব্যসরস্বতীর কমলবন হয়ে উঠেছিল ব্যাকরণবিদ্‌ ও অলংকারবিদ্‌ পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যগর্বের মল্লভূমি ; রাজসভাশ্রিত বিদগ্ধজনের বিনোদনমাত্র। এই যুগের বিপুল কাব্যসাহিত্যে তাই রসের সংস্পর্শ কম, আছে শুধু পণ্ডিতদের শব্দপ্রয়োগের শুষ্ক কৃতিত্ব এবং ক্লান্তিকর বাগ্‌জালের বিস্তার। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে সেই ভারতীয় সাহিত্যে ভগীরথের মতই রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এলেন সজীব প্রাণপ্রবাহ। বিস্তৃততর পটভূমিকা থেকে তিনি নির্বাচন করলেন প্রাণময় নতুন উপমা এবং কিছু সহজ সুস্থ অলংকার। ভারতীয় কাব্যে আঙ্গিকের জটিলতা ও কৃত্রিমতার অবসান ঘটল। রবীন্দ্রনাথের এই কৃতিত্বের পশ্চাতে অবশ্য কার্যকর ছিল ইউরোপীয় রোম্যান্টিক কাব্যের সজীব প্রভাব।

৪

কবির চিত্রকল্প ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায়, পৌরাণিক তত্ত্বজ্ঞানকে তিনি তিনভাবে ব্যবহার করেছেন—প্রথমত সাধারণভাবে উল্লেখ ; দ্বিতীয়ত উপমায় ব্যবহার, তৃতীয়ত প্রতীকরূপে ব্যবহার ও তাতে নতুন ব্যাখ্যার সংযোজন।

অন্যান্য কবিদের মতই রবীন্দ্রনাথও প্রচলিত পুরাকাহিনীর উল্লেখ করেছেন এবং প্রসঙ্গত তার থেকে উদাহরণও দিয়েছেন। বিবক্ষিত বস্তুর ব্যাখ্যার প্রয়োজনে পৌরাণিক দেবদেবীর চরিত্রও এনেছেন কবি, ব্যবহার করেছেন পুরাণের রূপকল্প। অথবা প্রচলিত পুরাণতত্ত্বকে প্রতীকের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন।[২২] পুরাণতত্ত্ব অবলম্বনে কবির এই রূপক কল্পনার সার্থকতম উদাহরণ দেখা যায় তাঁর একটি উক্তিতে (তাসের দেশ গীতিনাট্য) যেখানে তাসবংশোদ্ভবরা সগর্বে ঘোষণা করছে, সৃষ্টিকার্যে নিরত পিতামহ ব্রহ্মার কর্মক্লান্ত মুখের হাই থেকেই তাদের উদ্ভব। এখানে কবি ব্রহ্মার কল্পনাটি নিয়েছেন পুরাণ

থেকে, কিন্তু প্রাণহীন তাসেদের ব্রহ্মার মুখোদ্ভব হবার তত্ত্বটি তাঁর স্বকল্পিত। নানা পুরাণ ও ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, সৃষ্টিকালে সৃষ্টিকর্তার মনোভাব কেমন ছিল তার ওপরই জীববিশেষের স্বভাবধর্ম নির্ভর করে,[২৩] এই তত্ত্বকেই রং ফিরিয়ে পরিবেশন করেছেন কবি। প্রাচীন শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা এই একটি আলোর ঝলকেই বোঝা যায়। বস্তুত এমন অজস্র নিদর্শন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তাঁর রচনায়।

আপাতবিলুপ্ত এক গরিমাময় জগৎ, কোনদিনই হয়ত যার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল না, তবু সংস্কৃত সাহিত্য যাকে পাঠকের কাছে বাস্তবরূপেই উপস্থাপিত করেছিল—কবির প্রাচীন ভারত সম্পর্কিত রূপকল্পনা ক্ষণে ক্ষণে যেন সেই অলৌকিক জগতেরই আভাস নিয়ে আসে। সে এক কল্পলোক, যেখানে রাজপুত্র রাজকন্যা এসে অন্যকে স্বপ্নে দেখেই কামনা করে (যেমন সুবন্ধুর বাসবদত্তায়) ; রাত্রির অন্ধকার-আবরণে চুপি চুপি অভিসারিকা কামনা চলে সংকেতস্থলে, যেখানে বিরহিণী নায়িকা পিঞ্জরের সারিকাকে প্রেমগীতি শেখায়, বীণার তারে গুঞ্জরণ তোলে ; প্রিয়তমের আলেখ্য রচনা করে বিরহবিনোদনের জন্যে আর প্রবাসী প্রিয়ের উদ্দেশে মালা গেঁথে নীরবে চোখের জল ফেলে। সে এক আশ্চর্য জগৎ যেখানে চারদিকে কুঞ্জবন, ফুল্ল-শতদল, চন্দন-সার, বীণাধ্বনি, বিহঙ্গকূজন, চন্দ্রালোক ও মহার্ঘ বসনভূষণের সমারোহ। তাঁর কবিজীবনের একটি বিশেষ যুগে সেই অতীতের স্বপ্নলোক থেকে বহুতর রূপকল্প সযত্নে আহরণ করে কবি তাঁর কবিতাকে সাজিয়েছেন। তাঁর অতিসূক্ষ্ম সংবেদনা দিয়ে রচিত কল্পনাগুলি তাই বুঝি রঙে রসে ছন্দে প্রাণময় হয়ে উঠেছে। সেই রচনাযুগে সেই অতীতের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণই যেন তাঁর কল্পনাকে সজীব করেছে।[২৪]

উপনিষদ, মহাকাব্য, পুরাণ এবং বৌদ্ধ রচনা থেকেও কবি বহু রচনার মূলভাব গ্রহণ করেছেন।[২৫] সংস্কৃত ও পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে কবির প্রবেশ স্বচ্ছন্দ ছিল, ফলে বহু কাব্য নাটকের বস্তু ও ভাব তিনি ঐ উৎস থেকে আহরণ করেছিলেন। 'পুরস্কার' কবিতাটিতে রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ; কিন্তু এতে মহাকাব্য দুটির কাহিনীবিন্যাসে দেখতে পাই, কাহিনীর যে অংশ কবিচিত্তে কোনো বিশিষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ আবেগ সৃষ্টি করে, সেই অংশগুলিই কবিতাটিতে বিশেষ মহিমায় উদ্ভাসিত, নিছক কাহিনী গৌণ। অর্থাৎ মহাকাব্য দুটি কবিমানসে যে ভাবে বিম্বিত, এখানে তারই রূপায়ণ। সংস্কৃতসাহিত্য থেকে আহৃত উপাদানকে আপন কবিত্বশক্তির স্পর্শে নতুন করে সাজিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন 'কাহিনী'।[২৬] ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন কবির কাব্য থেকে কণা কণা সৌন্দর্যের উপাদান সঞ্চয় করে এক অলৌকিক রোম্যান্টিক জগতের নিপুণ ছবি এঁকেছেন। তারই পরিচয় পাই 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটিতে (চিত্রা)।[২৭] এ ছবিটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই তাঁর নিজের কল্পনার সৃষ্টি। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে আমাদের অতি পরিচিত প্রণয়কাব্যের নায়িকাদেরই—দময়ন্তী, শকুন্তলা, মহাশ্বেতা, সুভদ্রা আর পার্বতীর কাহিনী।

কিন্তু প্রত্যেককে ঘিরে কবি রচনা করেছেন মোহময় অপরিচয়ের এক বর্ণাঢ্য কুজ্ঝটিকা। ফলে বর্ণনা যেখানে থেমে যায়, ব্যঞ্জনার তুলে সেখানে নব নব অনুচ্চারিত কাহিনীর ছবি এঁকে যায়। সে ছবি অজর, অক্ষয় হয়ে ওঠে।

এই যে কল্পনার জগৎ তা ইতিহাসে কখনই বাস্তব ছিল না। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রায় সার্ধ সহস্রাব্দের সাহিত্যে যেভাবে প্রতিফলিত কবি সেখান থেকে কল্পনার উপাদান

আহরণ করেছেন। ইউরোপীয় শিল্প সাহিত্য ও সংগীতে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছিল। যখন তিনি অনুরূপ বস্তুর সন্ধান পেলেন না সমসাময়িক কালের ভারতীয় পরিবেশেষ স্বভাবতই তখন তাঁর চিত্ত সৃষ্টি করল অতীত ভারতের পটভূমিতে একটি কল্পলোক, রোম্যান্টিক কবির 'সব-পেয়েছির দেশ'। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য থেকে চয়ন করে যত মনোজ্ঞ কল্পনার ও বর্ণনার সংকলন করতে পারলেন—তাই দিয়ে নির্মাণ করলেন অতীত ভারতের এই অবাস্তব অথচ চিত্তহারী চিত্রটি। কবির সযত্ন নৈপুণ্যে বিরচিত এই জগৎ ত্রিপুরের মতই কল্পনার মহাশূন্য আলম্বিত, কিন্তু কী তার ঐশ্বর্য, কী তার বর্ণাঢ্য সমারোহ!

তরুণ কবির ইংলন্ড ভ্রমণের প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রভাব পড়ল তাঁর সংবেদনশীল সৌন্দর্যপিপাসু অন্তরে ; রূপ পরিগ্রহ করল সাহিত্যিকের লেখনীতে। ইংলন্ড যাত্রার পূর্বের ও পরের কবিতাগুলির তুলনা করলেই বোঝা যায় সে কথা। পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রাণোচ্ছল বাস্তববোধ, কর্মোন্মত্ততা রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধকে আরঞ্জিত করল, এনে দিল নতুন গতি। নিজের অতীতের উত্তরাধিকারকে গ্রহণ না বর্জন করবেন—গ্রহণ করলে কতটা এবং কীভাবে—এই সংশয়ের অস্থির আক্ষেপ প্রকাশিত তাঁর পরবর্তীকালের মহত্তম সৃষ্টিগুলিতে। ইউরোপের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের পর 'ভারতী' পত্রিকার জন্য তরুণ রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করে পাঠান ইংলন্ড থেকে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচলিত মূল্যবোধ বিশ্লেষণ করতে বসে এই রচনাগুলিতে তিনি অতীত-বর্জনের দিকেই পক্ষপাত দেখিয়েছেন। জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে পুনরায় ইউরোপ ভ্রমণ এবং ইউরোপীয় সাহিত্য-অধ্যয়ন, ইউরোপীয় বান্ধব-সংযোগ ইত্যাদির ফলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল নিবিড়তর। এই নিবিড় পরিচয়ের ফলশ্রুতি হল এই যে, মধ্যযুগীয় কবি ভারতচন্দ্র কিংবা ভারতবর্ষ ও ইউরোপের ধ্রুপদী সাহিত্যসেবী মধুসূদনের দৃষ্টির থেকে ভিন্ন এক রূপে ভারতের সংস্কৃতি প্রতিভাত হল রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে। কবির ব্যঞ্জনাধর্মী রূপক নাট্যে এই উপলব্ধিই ব্যক্ত হয়েছে।[২৮]

ভারতীয় সমাজের জীবনপ্রবাহ কেন প্রাণহীন অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে কবি সে-কথা ধীরে ধীরে বহু আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছিলেন। একদিকে যেমন সংহত, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে তিনি এই নির্জীবতাকে বিদ্ধ করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনই তাঁর নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি ঠিকই লক্ষ করেছিল যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার আড়ষ্টতাকে। তাই তিনি রচনা করলেন 'মুক্তধারা' আর 'রক্তকরবী'র মত নাটক। এখানে লক্ষ করে দেখার বিষয় হল উভয় ক্ষেত্রেই কবি দেখিয়েছেন যে, জীবনের জড়তাকে দূর করে মুক্তির জয়গান গাইবে যৌবন। এই যৌবন শুধু দেহের একটি বিশিষ্ট বয়সকে অভিহিত করে না, মনের একটি বিশিষ্ট সুস্থ, সজীব প্রাণপূর্ণতারই দ্যোতনা বহন করে।

স্থবিরত্বকে, প্রাণহীনতাকে জয় করে নবযৌবনের জয়যাত্রার রূপকল্প বারবার দেখা গেছে কবির কবিতাতেও। 'ফাল্গুনী' নাটকে এবং বহু গানে ও কবিতায় শীতকে কবি দেখেছেন মৃত্যুর প্রতীকরূপে, আর বসন্ত তাঁর চোখে দেখা দিয়েছে প্রেমের, আনন্দের, জীবনের, পূর্ণতার প্রতীক হয়ে।

'চিত্রা' গ্রন্থের 'উর্বশী' কবিতার নায়িকা ভারতীয় পুরাণ-কাব্যেরই এক অপ্সরী, কিন্তু কবির রচনাশৈলী সাক্ষ্য দিচ্ছে শেলীর 'Hymn to Intellectual Beauty' কবিতাটির

সঙ্গে অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যের। আবার 'বিজয়িনী'র নায়িকাকে আঁকা হয়েছে 'কাদম্বরী' কথাকাব্যের মহাশ্বেতার সাদৃশ্যে কিন্তু বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যের রোম্যান্টিক নায়িকার প্রভাবে কবি এ বিরহিণীর বেদনাকে সার্বজনীন করে অভিপ্রসারিত করেছেন প্রেমিকের হৃদয়ে।

'চৈতালি' গ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায় কবি অতীতচারণে ব্যাপৃত।[২৯] কিন্তু কয়েকটি অংশ ভিন্ন এই কবিতাগুলির উৎকর্ষ অপেক্ষাকৃত ম্লান। এই কবিতাগুলিতে কবি আপন মনের মাধুরী অনুযায়ী অতীতকে গ্রহণ বর্জন করে, বিশ্লেষণ, নির্বাচন করেই অতীতচারণ করেছেন। অতীতের মোহ-মায়ায় যখন তাঁর চিত্ত আচ্ছন্ন, তখনও কবিতাগুলির শেষাংশ প্রায়ই স্মৃতিভারাচ্ছন্ন, সেই দিনগুলির জন্য এক তীব্র ব্যাকুল আকর্ষণে তিনি অধীর। আবার 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলিতে মাঝে মাঝেই বেজেছে পরিহাসের সুর। যেন লঘু পরিহাসের মধ্যে দিয়েই বিগত দিনের মায়াবন্ধন কবি ছিন্ন করতে চান। তিনি অনুভব করেছেন অতীতের দিনগুলি কেবল ছায়াময় স্মৃতিমাত্র, তাই বর্তমানের প্রতিনিধি হয়ে সজীবতার আনন্দে তিনি বর্তমানেরই জয় ঘোষণা করেন। 'সেকাল' কবিতায় সদম্ভে তিনি ঘোষণা করেন—

'কালিদাস তো নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে।
তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ আমি তো পাই মৃদুমন্দ
আমার কালের কণামাত্র পাননি মহাকবি।'

নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর, বিশ্বাসভঙ্গে আর হতাশায় তিক্ত একটি যুগ অতিক্রম করে তবেই কবি রচনা করেন 'ক্ষণিকা' কাব্য, এ কথা সকলেই জানেন। তাই এই চিত্তাকর্ষক নতুনতর কবিতাগুচ্ছ রচনাকালেও কবির ওষ্ঠাধরে খেলা করছে ব্যঙ্গ হাস্য—আত্মবিদ্রূপের আঘাতে তিনি ফিরিয়ে আনছেন তাঁর আত্মবিশ্বাসকে। কবিতাগুলির ভাবনা আর গঠনসৌকর্যে তাঁর নবতর রোম্যান্স-বিরোধী চিন্তা যেন যোগ করেছিল একটি নতুন মাত্রা।

পরেও দেখা যায় কালিদাসের ঋতুসংহার এবং অন্যান্য বিখ্যাত নিসর্গ বর্ণনার উপর নির্ভর করেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা।[৩০] ক্লান্তিকর কোনো গোপালবালকের দিনলিপির মত দীর্ঘ কবিতা নয়, বসন্ত বা বর্ষার আবির্ভাব-তিরোভাব নিয়েই অধিকাংশ কবিতা গ্রথিত। 'নটরাজ' এবং 'ঋতুসংহার' কবিতা দুটিতে কবি তাঁর নিজস্ব রীতিতে ষড়্ঋতুর আবর্তনকে ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছেন। এখানেও উপাদান হল ঋতুগুলি সম্বন্ধে প্রাচীন কবিদের বোধ এবং তারই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব প্রেরণা। বস্তুত কবির নিসর্গবর্ণনা প্রায়ই রূপকাশ্রিত। শীত আর বসন্তের রূপকে মৃত্যু আর জীবনের ব্যঞ্জনা অনেক কবিই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই রূপক প্রয়োগের উৎস স্পষ্টতই 'কুমারসম্ভব' কাব্যের তৃতীয় সর্গে, যেখানে বিধ্বংসী শক্তির জয় ; আর, পঞ্চম সর্গে, যেখানে প্রেম আর জীবনের পুনরুদ্দীপন। 'তপোভঙ্গ' কবিতাটিতে কবি দীর্ঘ রূপক বর্ণনায় এই প্রতীক কল্পনাকে ব্যাখ্যা করেছেন।[৩১] পার্বতী যখন আপন রূপ-যৌবনে শংকরের প্রতি প্রেমে বিহ্বল—এমন সময় আশ্রমের ধ্যানমগ্ন পরিবেশে সহসা দেখা দিল অকালবসন্ত। কিন্তু এই চপল প্রেমের পরিণতিতে এল হতাশা। তাই শিবের ললাট-বহ্নিতে ভস্মীভূত হলেন মদন, অবলুণ্ঠিত হল পার্বতীর প্রণয়-অর্ঘ্য। বসন্ত অপসৃত হল, নেমে এল বিয়োগবিধুর পরিণতি। পরবর্তী (চতুর্থ) সর্গে

মদনের বিয়োগবিহ্বলা রতির বিলাপ—যেন অসিরিসের জন্য কাঁদছেন আইসিস। অন্যদিকে পঞ্চম সর্গে কঠিন দুশ্চর তপস্যায় নিজের প্রেমকে অগ্নিশুদ্ধ করলেন পার্বতী। পঞ্চম সর্গে তরুণ তাপসবেশী শিব পার্বতীর সম্মুখে এসে শিবনিন্দা করেন। ক্ষুব্ধ বিচলিত পার্বতী তবু প্রেমে একাগ্রচিত্ত। এবার ছদ্মবেশ মোচন করেন শিব, উভয়ের মিলন সংসাধিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের চোখে শিবের এই ছদ্মবেশ ধারণ যেন প্রকৃতিতে অনাদিকাল হতে অনুষ্ঠিত এক চিরন্তন নাটকের প্রতীক হয়ে উঠেছে। আগতপ্রায় বসন্তকে প্রচ্ছন্ন রাখার জন্যই যেন প্রকৃতি শীতের ছদ্মবেশ ধারণ করে। এই কথা কবি বারংবার বলেছেন।[৩২] এ কথা বলেছেন তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটকে, বহু কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, এমন কি চিঠিপত্রেও। আবার লঘু, চপল, দেহবিলাসী প্রণয়কে দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করার এই যে ধারণা—এ-ও তিনি পেয়েছেন প্রধানত কালিদাসের রচনা থেকেই। এই মূল ভাবকেই বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রচার করেছেন কালিদাস তাঁর তিনটি নাটকে, দুটি মহাকাব্যে ও মেঘদূতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনায় দেখি, প্রকৃতির এই ছদ্মবেশ ধারণাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে ষড়ঋতুর চক্র। তাঁর উপলব্ধিতে গ্রীষ্ম[৩৩] আসে এক রুদ্র তপস্বীর রূপে (কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে শিবের মত)। বর্ষা তাঁর কাছে কখনও বিচ্ছেদ (কুমারসম্ভব, চতুর্থ সর্গ), কখনও বা পরিপূর্ণতা (ষষ্ঠ সর্গ)। শরৎ যেন নববধূ। কালিদাসের বর্ণনাতেও কখনও নববধূকে উপমান আর শরৎকে উপমেয় করা হয়েছে ;[৩৪] কখনও আবার নববধূ উপমেয়, শরৎ উপমান।[৩৫] হেমন্তকে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেন পরিপূর্ণা জননীর সঙ্গে—এখানেও ঋতুসংহারের বর্ণনা এবং কীট্‌সের বর্ণনা কবির আপন চিত্তে তৃতীয় একটি রূপ পরিগ্রহ করেছে। শীত আসে ছদ্মবেশী প্রেমিকরূপে আর বসন্ত আসে বরসজ্জায়। এইভাবে রবীন্দ্রকাব্যের ঋতুবর্ণনার প্রতি পদক্ষেপেই যেন আভাসে ধরা পড়ে কালিদাসের কাব্যকৃতির অনুরণন।

৫

সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই প্রাচীন সাহিত্যসম্পদের কেবলমাত্র ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁর অন্তর্নিহিত চিন্তার একটি মূল আদিকল্প তিনি খুঁজে পেয়েছেন। শকুন্তলা, রামায়ণ, কাদম্বরী, কাব্যের উপেক্ষিতা প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি নিজস্ব ধারণাকেই রূপায়িত করেছেন। অথবা আরো নির্দিষ্ট করে বলা যায়, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যপ্রবাহেরই উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথের এ কাব্যধারা। তাই প্রাচীন সাহিত্যের যে অংশগুলি তাঁর নান্দনিক বিচারে রসোত্তীর্ণ, সেগুলিই তিনি পুনর্বিচার করে দেখিয়েছেন। তাঁর এই শিল্পবিচারের নিরিখে কোন জটিল তত্ত্বের বিবেচনা বা বোধ দেখা যায় না। কবিকৃত সমালোচনা এখানে খণ্ডনধর্মী নয়, মণ্ডনধর্মী ; গুণের বিশ্লেষণও প্রশংসারই রূপান্তর, যা পড়ে পাঠক মূল প্রবন্ধ-পাঠে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। সংস্কৃতের অর্বাচীনতর ক্ষয়িষ্ণু যুগে প্রায় সব ক'টি সাহিত্যবিচারের গ্রন্থেই কাব্য অলংকারশাস্ত্রের নিয়মাবলী[৩৬] যথাযথ অনুসরণ করেছে কিনা, সেটাই ছিল কাব্যগুণ বিচারের মানদণ্ড। কিন্তু সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের সার্থক গ্রন্থ ধ্বন্যালোক ও রসগঙ্গাধরে কোনো রচনার কাব্যত্ব নির্ভর করেছে তার রসসৃষ্টির ও ব্যঞ্জনা-সঞ্চারের উৎকর্ষ বিচারেই ; অলংকারের ক্ষমতার সার্থকতাও রসেরই আনুকূল্য বিচারে। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্যেও সেই একই মানদণ্ডের ব্যবহার দেখা যায়। কালজয়ী শিল্পকলাকে বিশ্লেষণ করে তিনিও রসসৃষ্টিরই কলাকৌশল নির্ণয় করেছেন।

৬

প্রাচীন যুগের ছায়া সর্বাধিক ব্যাপকভাবে অর্থবহ অথচ অন্তর্গূঢ় হয়ে মিশে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচেতনায়, তাঁর শিল্প-আদর্শে। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তিগুলির মূলে আছে এই প্রাচীন আদর্শের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির, গ্রহণ ও বর্জনের অন্তর্দ্বন্দ্ব। 'গোরা' উপন্যাসে সমস্যাটিকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়েছেন সংলাপের মাধ্যমে। ঘটনা সংঘাতের বিন্যাসেও সমস্যাটি পরোক্ষ ছায়া ফেলেছে। গৌরবময় অতীতের জন্য কবির সুতীব্র ব্যাকুলতা তাঁর জীবনে একই সঙ্গে জীবনমুখীন ও জীবনবিমুখ প্রভাব। বারংবার তিনি বলেছেন, কোনো জাতির অতীতকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে জাতির স্থায়ী চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না। তাই অতীতকে অনুসরণ করতে তিনি আগ্রহীই ছিলেন। কিন্তু জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সুস্থভাবে গঠন করতে অতীতকে কী মাত্রায় গ্রহণ করা উচিত, সেই প্রশ্নই ছিল সমস্যার মূলে। কবির দেশাত্ববোধই তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল অতীত গৌরবকে তুলে ধরতে এবং অতীতের কোন বস্তু গ্রহণীয়, কোনটি বা বর্জনীয়—তা নিরূপণ করতে। অতীতের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণ তাঁর রচনায় তাই পালা করে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ে কবির প্রবন্ধগুলিতে তাঁর দৃষ্টিকোণের বিশিষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। পূর্বের রচনাগুলিতে তিনি ভারতের অতীতকে আদর্শস্থল রূপে ঘোষণা করেছেন ; ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিপ্রবাহকেই একমাত্র অনুকরণীয় বলে জেনেছেন ; কিন্তু পরবর্তী রচনাগুলিতে তিনি সতর্কভাবে ভুলভ্রান্তির বিচার করেছেন। 'নৈবেদ্য'-এর কোনো কোনো কবিতায় আমরা দেখতে পাই সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ কবিকে হতাশ করে তুলেছে। কারণ তখনও তিনি বিশ্বাস করেন, প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রা-আদর্শ থেকে বিচ্যুতিই বর্তমান ভারতীয় সমাজের দুঃখ-দুর্দশার মূলে। কবির এই অনৈতিহাসিক সিদ্ধান্তকে অবশ্য যুক্তিসহ বলা যায় না ; কারণ ভারতীয় জীবনযাত্রার এই প্রাচীন মূল্যবোধগুলি ছিল কেবলমাত্র কোনো কোনো মহাপুরুষের প্রচারিত তাত্ত্বিক আদর্শ। সমাজের বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই সব আদর্শের যোগাযোগ কতটা ছিল, তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। যে প্রাচীন আর্যরা অগ্নিতে, জলে, বনস্পতিতে, বায়ুতে একই দেবতার অস্তিত্বের অনুভব ঘোষণা করেছেন,[৩৭] তাঁরা মানবিক জগতের কথা আমাদের তেমন করে শোনাননি। তখন মানুষ ছিল একই বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধা, এ-তত্ত্বও কবির রোম্যান্টিক কল্পনা থেকেই উদ্ভূত। তাই অতীতের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তাঁর এই যে বিলাপ এবং বিংশ শতকের ভারতবর্ষের যাবতীয় দুর্দশার মূলে যে সেই আদর্শ-বিচ্যুতি—এ সিদ্ধান্তকে ইতিহাস সমর্থন করবে না। অতীত এবং বর্তমানের তুলনা করে কবি বলেন, 'আমরা কোথায় আছি, কোথায় সুদূরে/দীপহীন জীর্ণভিত্তি অবসাদপুরে/ ভগ্নগৃহে'[৩৮]। আবার প্রসিদ্ধ ঋগ্‌বেদসূক্তের প্রতিধ্বনি করে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন, 'তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি/মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।'[৩৯] কবির চিন্তা তখন এই যে, বৈদিক যুগের সহজ আনন্দের বার্তা বিস্মৃত হয়েছি বলেই আমাদের চতুর্দিকে এই শ্বাসরোধী হতাশা নেমে এসেছে ; অতীতের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমেই আসবে মুক্তির সম্ভাবনা। এইভাবে ঊনবিংশ শতকের বিদায়ক্ষণে উপনীত হয়েও তিনি প্রাচীন আর্য সভ্যতার বাণী প্রচার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী হল না। চরিত্রের অন্তর্নিহিত গতি এবং বোধ ও বিশ্বাসের নিরন্তর বিবর্তনই তাঁকে বারংবার মত ও পথ পরিবর্তনের দিকে চালিত করেছিল।

এ কথা সত্য যে, অতীত মূল্যবোধগুলির পুনর্মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা কবির কাব্যে বারংবার দেখা গেছে।[৪০] আবার যখন কবি বিরুদ্ধমত পোষণ করেছেন তখনও অতীতকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই বিচার করেছেন। 'গোরা' উপন্যাসে তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কারকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তবুও গোরার চরিত্রও সর্বদাই অতীত ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেনি। তার মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরোধ বেধেছে এবং পরিণামে যে সূক্ষ্ম, রুচিসম্পন্ন চিন্তাধারা তার মধ্যেও দেখা গেছে, তা একান্ত ভাবে গোরারই ; প্রাচীন ভারতীয় বোধ-বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি নয়। 'গোরা' উপন্যাসের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে কবিরই অধ্যাত্ম জীবনের অংশবিশেষ, ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা এবং উনিশ শতকের শিক্ষিত মানুষের কিছু বিক্ষিপ্ত ভাবনাচিন্তা। ভাবগম্ভীর অতীত আর সংঘাতমুখর বর্তমান—উভয়ের মধ্যে বহুবিস্তৃত দূরত্বকে দার্শনিক কবি এখানে পরিক্রমণ করেছেন ; এ উপন্যাসে প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই যেন এক একটি বিশিষ্ট চিন্তার ভাবমূর্তি। প্রত্যেককেই যথোচিত মর্যাদা দিয়ে কবি এখানে কিছু কালোচিত মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজস্ব মানবতার মহান আদর্শকে।

'যোগাযোগ', 'চার অধ্যায়', 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ'—সব কটি উপন্যাসই কবির এই পথপরিক্রমার দ্বন্দ্বক্ষতচিহ্ন বহন করে। তাঁর অতৃপ্ত শিল্পীসত্তা তাঁকে কোনো নির্দিষ্ট মতে স্থাণু হতে দেয়নি ; তাঁর স্পর্শকাতর অনুসন্ধানী মন খুঁজে বেড়িয়েছে নতুন হতে নতুনতর চিন্তার উপাদান। এই সংশয়ে দোদুল্যমান, পরস্পরবিরোধী চিন্তায় জর্জরিত অস্থিরতার আততি থেকেই তাঁর লেখনী সৃষ্টি করেছে অমর, রসোত্তীর্ণ সাহিত্য।

ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষানীতির প্রতিবাদস্বরূপ প্রাচীন যুগের আশ্রমের আদর্শে এক বিশ্ববিদ্যালয়—'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা করলেন কবি। প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনধারার অনুসরণ কীভাবে তিনি আধুনিক ভারতবর্ষে করতে চেয়েছিলেন—এ ঘটনা তারই অন্যতম উদাহরণ। শান্তিনিকেতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়,—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, অতীত ও বর্তমান—উভয়ের মধ্যে দোলাচল কবিচিত্ত কীভাবে সংশয়াকুল ছিল। এ কথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধের ভিত্তি ছিল উচ্চ আদর্শবাদে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। তার থেকে তিনি কখনই বিচ্যুত হননি। কিন্তু অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনে প্রচলনের অভ্যাস সম্পর্কে তাঁর অভিমত এবং অতীত সম্পর্ক বিচারে সে-আদর্শ তাঁর প্রায়ই পরিবর্তিত হয়েছে। একাধিক সাহিত্য থেকে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি তাঁর তপোবন-বিদ্যালয়টি গড়ে তুলেছিলেন কিন্তু মুখ্য অনুপ্রেরণা ছিল প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহ, আশ্রম ও তপোবন।

সুসমঞ্জস, মহত্তর মানবিক বোধ ও আদর্শ গঠনের জন্য কবির অস্থির অনুসন্ধান ধরা পড়েছে তাঁর 'শান্তিনিকেতন' শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে, 'আত্মপরিচয়', 'মানুষের ধর্ম' ও 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে। সত্যের জন্য, মূল্যবোধের জন্য কবির এই অনুসন্ধান তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে একটি অর্থবহ খণ্ডকালের সীমা নির্দেশ করেছে। কখনো তিনি প্রাচ্যের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছেন, কখনো বা প্রতীচ্যের দিকে ; কিন্তু সর্বদাই কয়েকটি স্থির বিশ্বাস ও আদর্শ তাঁর জীবনের ধ্রুব প্রত্যয়কে দৃঢ় নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। বৈদিক সাহিত্য, মহাকাব্য, উপনিষদ ও বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে তিনি পেয়েছেন কিছু আদর্শের সন্ধান। তাঁর চিন্তায়, শিল্পে,

কর্মে সে আদর্শ চিরন্তন চিহ্ন রেখে গেছে। ঐ কল্পিত প্রাচীন ভারতের গৌরবময় চিত্র—একদিকে যার আশ্রম ও তপোবন এবং অন্যদিকে সম্ভোগ ও প্রেমের নানা বিচিত্র-সুন্দর সমারোহ—এর সম্বন্ধে মোহমুক্তিও তাঁর ঘটেছিল। 'গোরা'র শেষ সংলাপে নায়ক গোরা প্রাচীন ভারতের হিন্দুত্বের মোহ ত্যাগ করে যখন সর্বমানবের সর্বজাতির তীর্থভূমিরূপে নিজের মাতৃভূমিকে দেখতে পেল তখনই সে সত্য ভারতীয় নাগরিক হয়ে উঠল। অর্থাৎ ঐ প্রাচীনের মোহের মধ্যে যে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছিল তাকে পরিহার করে তবেই সে নিত্যদিনের একটি সহজ সত্যকে স্বীকার করতে পারল ; আর তখনই ভারতবর্ষের প্রতীক আনন্দময়ী তার সত্য জননী হয়ে উঠলেন। প্রাচীনের মিথ্যা মোহ পরিত্যাগ করা সহজ হয়নি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে, কারণ এর পশ্চাতে ছিল তাঁর আবাল্য অভ্যস্ত পারিবারিক সংস্কার এবং আকৈশোর অর্জিত ব্যক্তিগত প্রত্যয়। এই মোহমুক্তির যন্ত্রণা প্রতীকী রূপ পরিগ্রহ করেছে গল্পগুচ্ছের 'দুরাশা' গল্পটিতে, যেখানে বদ্রাওনের নবাবপুত্রী কবির মতই প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্যমহিমার মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হয়ে নিঃশেষিত যৌবনের প্রান্তে এসে তার স্বপ্নের নায়কের মলিন ও ধূসর রূপটি প্রত্যক্ষ করে প্রতিকারহীন ক্ষোভে মুহ্যমান। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিন্তু পথের এই প্রান্তে এসে পুনরায় নির্মোহ দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে দেখে অতীতের পুনর্মূল্যায়ন করতে শুরু করলেন। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে যা পেয়েছিলেন সেই কল্পলোকের মোহ ত্যাগ করে, সুস্থতর উপাদানটুকু গ্রহণ করতে পারলেন। এবার ব্রহ্মচিন্তা, সত্য শিব সুন্দরের ধ্যানের চেয়ে তিনি গ্রহণ করলেন মানুষকে—মহাভারত যার বিষয়ে বলেছে,

'গুহ্যং ব্রহ্ম যদিদং ব্রবীসি ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।'

রবীন্দ্রমানসে উপনিষদের গভীর প্রভাব সর্বজনবিদিত। এ বিষয়ে বহু যোগ্য গবেষক গবেষণা করেছেন ; তবু বিষয়টি এমনই যে এখনও বহুবিধ আলোচনার অবকাশ আছে। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের কাছেও কবি অনেক কাব্যভাবনার ক্ষেত্রে ঋণী। তাঁর 'রাজর্ষি', 'মুকুট' ইত্যাদি গ্রন্থে বৌদ্ধ ভাবনার প্রকাশ আছে।

৭

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের ওপর ঋগ্‌বেদের প্রভাবই সর্বাধিক গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি যে-সংস্কৃতির উত্তরসূরি, সে সংস্কৃতি শত শত বৎসর ধরে ত্যাগের আদর্শকেই সার কথা মেনেছে। শংকরাচার্যের মতে উপনিষদের মূল সূত্রের ব্যাখ্যা এবং বৈদান্তিক ধর্মের সার কথা হল, "শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ/ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। আপাত-প্রত্যক্ষ এই জগৎ মায়ামাত্র ; জীব ও ব্রহ্মের আত্যন্তিক ঐক্য উপলব্ধি করে মোক্ষলাভের চেষ্টাই মানুষমাত্রের অবশ্যকর্তব্য। মোহময় এই তুচ্ছ জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করে মোহজাল ছিন্ন করাই মানুষের উচিত। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর পূর্বসূরি অধিকাংশ ভারতীয় কবি-দার্শনিকরা সার্ধ সহস্রাব্দ ধরে এই মন্ত্রই সাহিত্যে প্রচার করেছেন।

এই মনোভাব পার্থিব জীবনের হাসি-আনন্দকে তুচ্ছ বলে পরিহার করতে শেখায়। নৈবেদ্যের ৩০ সংখ্যক কবিতায় কবি কিন্তু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এক ভিন্ন কথা বলেন—

'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'

যুগান্ত-প্রচলিত আত্মবিলোপ, কৃচ্ছ্রসাধন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং বৈরাগ্যের তত্ত্বের বিরুদ্ধে কবির এক নতুন স্পর্ধিত ঘোষণা এখানে দেখা যায়। আত্মপীড়নের শুষ্ক তত্ত্ব তাঁর কবিসত্তাকে বিচলিত করেছিল, শতাধিক কবিতায় কবি সে-কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি জীবনকে ভালবাসেন, ভালবাসেন প্রকৃতিকে, মানুষকে ; তারা কেউ-ই তাঁর অনাত্মীয় নয়। মাটির পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে কবি গৌরবান্বিত ; তাই পৃথিবীর ধূলিকণাটিও তাঁর কাছে তুচ্ছ নয়। জীবন তাঁর সামনে রূপ-রস গন্ধের সম্ভার মেলে ধরেছে, কবি তাকে উপভোগ করতে চান। এই আকাশ, সূর্য-চন্দ্র-তারা, আলোক-অন্ধকার, পশু-পাখি, নদী, বৃক্ষ, দুঃখ, আনন্দ, আশা, আকাঙ্ক্ষা—এমন কি ব্যর্থতা ও হতাশারও সমন্বয়েই তো জীবন। এই জীবন মাত্র একবারই আসে, তাকে উপভোগ না করাই তো অন্যায়।[৪২]

শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরিরা ছিলেন মায়াবাদী ও বৈদান্তিক। কোনো জীবনবাদী কবির পক্ষে এই মতবাদ অনুসরণ না করাই স্বাভাবিক ; কিন্তু ঘটনাচক্রে দীর্ঘকাল ধরে এদেশের দর্শন ও চিন্তারাজ্যে এই ভাবধারাই প্রচলিত ছিল ; জীবনকে দেখা হত ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখের আকররূপে।

রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এলেন এক নতুন আশার সংগীত ; জীবনের জয়গান গাইলেন, বললেন, মানবজন্ম ধন্য, স্বল্পদিনের এই জীবনের পানপাত্র আকণ্ঠ পান করাই উচিত। প্রকৃতির অনিঃশেষ ঐশ্বর্য, মানবিক সম্পর্কের অকৃত্রিম সম্পদ নিতে হবে কৃতজ্ঞচিত্তে, দুহাত ভরে। জগৎ ও জীবনকে ঠিক এমনই অকৃত্রিম গৌরবের দৃষ্টিতে দেখেছে ঋগ্‌বেদও। বারংবার তাই সেখানে দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা দেখা যায়।[৪৩] পৃথিবীতে জন্মলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়—"আমরা এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে চাই"[৪৪] "এখানেই বাঁচতে চাই!"[৪৫]—এ কথা সেখানে গানের ধ্রুবপদ। ঋগ্‌বেদের মানুষ মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, জীবন থেকে পলায়ন করতে চায় না পারলৌকিক সুখের আশায়। কারণ মানুষ জানে সুখ ইহলোকেই। দীর্ঘ জীবন লাভ ও প্রত্যহ সূর্যোদয় দেখার আশায় মানুষ সোম প্রভৃতি দেবতাকে বন্দনা করেছে।[৪৬] প্রাচীন আর্যদের কাছে উদয়সূর্যকে দেখতে পাওয়াই ছিল নবজীবন লাভের প্রতীকরূপ।[৪৭] মৃত্যু নয়, জীবনই তাঁদের কাছে কাম্য ছিল।[৪৮] অমৃতের জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা বহু ঋগ্‌বেদীয় সূক্তেরই মূল সুর—'আমাকে সেই জ্যোতির্ময় লোকে নিয়ে চলো—যেখানে সূর্য আছে, যেখানে প্রবাহিত হয়—সেই লোকে আমায় অমর করো।'[৪৯] ঐহিক আনন্দ এবং সুখভোগের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার সুচিরকালে অভিপ্রসারণই এই সূক্তে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।[৫০]

প্রথম মণ্ডলের একটি বিখ্যাত সূক্তেও ধ্বনিত হয়েছে একই সুর[৫১]—মানুষ পরিপূর্ণভাবে যেন উপভোগ করে তার জীবনকে। সরল আনন্দগুলিকে অবহেলা করা উচিত নয়। এই পৃথিবীতে, এই মরদেহেই ভোগ করতে হবে দীর্ঘ ও পরিপূর্ণ জীবন। বৈদিক আর্যদের কাছে জীবনের সীমা ছিল এক শতক।[৫২] সেখানে অতি শীঘ্র দেহত্যাগের কোন ইচ্ছাই দেখা যায় না। মধুসূক্তে দেখা যায় জীবনের অতি তুচ্ছতম অথচ সার্থক উপকরণেরও অকুণ্ঠ

প্রশংসা। সেখানে আশীর্বাদে অভিষিক্ত করা হয়েছে জল, বায়ু, আকাশ, বৃক্ষ, নদী, ধেনু, দিবস এবং রাত্রিকে, এমনকি পৃথিবীর ধূলিকেও। এখানে এই মাটির পৃথিবীর জীবনকেই মহিমান্বিত করা হয়েছে, একান্তভাবে আকাঙক্ষা করা হয়েছে।

যুগান্তব্যাপী জীবনসম্পর্কিত নৈরাশ্য ও অবহেলার পরে ভারতের মাটিতে আবার সেই সুর ধ্বনিত হল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। বৈদিক কবিদের সঙ্গে তিনি কণ্ঠ মেলালেন—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে/মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'[৫৩] রসহীন, শুষ্ক, নেতিবাচক বৈদান্তিক জীবনবিরোধিতার বিরুদ্ধে কবি আজীবন প্রতিবাদ করেছেন। মায়াবাদের বিরুদ্ধে তিনি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন রেখেছেন—'বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপ্ন কাহার স্বপ্ন?'[৫৪] 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের এই কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে একটি ধ্রুবপদ—'সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার?' শুষ্ক নৈরাশ্যবাদী বেদান্ত সম্পর্কে এই হল কবির অভিমত। 'শ্যামলী'র বিখ্যাত 'আমি' কবিতাতেও কবি এইভাবে নেতিবাদের বিরোধিতা করেছেন। কারণ, জীবন ও জগতের অস্তিত্বকেই নেতিবাদ অস্বীকার করে। তাহলে এই পর্যায়ের রচনায় দেখি, এতকাল ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের যে অংশটি তাঁকে উপাদান জুগিয়েছে অর্থাৎ ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য—সেখানে আর কবিচিত্ত তৃপ্তি পাচ্ছে না। তাকে বহুদূরে অতিক্রম করে সুদূরতম অতীতের ঋগ্‌বেদেই এখন তাঁর জীবনপিপাসার আদিম প্রকাশ ও পরিতৃপ্তির সন্ধান করেছেন।

গীতবিতানের বিচিত্র পর্যায়ে ৭৭ নং গানে কবি বলেছেন—বহু বহু যুগ পূর্বে নক্ষত্রের দীপ্তলোকে তিনি ছিলেন নিমন্ত্রিত। কিন্তু সেখানে তৃপ্তি না পেয়েই তিনি নেমে এসেছেন ধূলার ধরণীতে। পার্থিব জীবনের প্রতি, নিত্য নব আনন্দের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ অসংখ্য কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে স্বর্গসুখলাভের অথবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আশায় কবি আর লুব্ধ নন। জীবন তাঁর কাছে কখনই ক্লান্তিকর নয়। তার সমস্ত স্ববিরোধী অভিজ্ঞতা, সব তীক্ষ্ণ সংঘাত নিয়েই জীবন তাঁর কাছে আশীর্বাদস্বরূপ, স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল।

ঋগ্‌বেদে আমরা প্রত্যক্ষ করি এক সানন্দ প্রাণচঞ্চল জীবনমুখীন বোধ। নানা রঙে রসে সমুজ্জ্বল এই জীবনবোধ যেন পল-তোলা কাঁচের মধ্যে দিয়ে বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মি—নানা বর্ণের ঐশ্বর্যে তা প্রতিফলিত হচ্ছে। শেষতম অংশ ভিন্ন ঋগ্‌বেদে কোথাও মৃত্যুর বা স্বর্গ-নরকের জন্য দুশ্চিন্তা নেই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও অনুরূপভাবেই কয়েকটি রূপক কল্পনা ছাড়া জন্মান্তর বা পরলোকের চিন্তা অনুপস্থিত। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'[৫৫]—এই-ই কবির শেষতম নির্দেশনা।

সাহিত্যজীবনের মধ্যভাগে যখন তিনি রচনা করেছেন তাঁর প্রসিদ্ধ শিল্পকৃতিগুলি, তখনও তাঁর মন প্রভাবিত ছিল উপনিষদের দ্বারা। অন্যদিকে আবার বৈষ্ণব কাব্য এবং মধ্যযুগীয় ভক্তিগীতির প্রভাবের ফলে এই সময়েও তাঁর কাব্যে নীরসতার অথবা বৈরাগ্যবাদের ছায়া পড়েনি। কিন্তু কবি যতই এগিয়ে গেছেন পরিণতির দিকে, ততই যেন তাঁর কাব্যে লেগেছে ঋগ্‌বেদের আনন্দবাদের, জীবনরসে আপ্লুত হয়ে থাকার সুর। 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' আর 'শেষ লেখা'—তাঁর এই শেষ কাব্যচতুষ্কে তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন জীবনের প্রতি তাঁর অচঞ্চল বিশ্বাস ; তাতে ঋগ্‌বেদেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় স্পষ্টভাবে।[৫৬] ঋগ্‌বেদেরই মধুসূক্তের অনুরূপ সুর নিয়ে রচিত হয়েছে 'আরোগ্য' গ্রন্থের প্রথম কবিতা। এই গ্রন্থেরই তৃতীয় কবিতায় আছে ঋগ্‌বেদের অনুকরণে সূর্যস্তুতি। কবি এখানে বলেছেন—

'আমি শান্ত দৃষ্টি মেলি নিভৃত প্রহরে/পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দনা/সেই সবিতারে যাঁর জ্যোতিরূপে প্রথম মানুষ/মর্ত্যের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ।'

পঞ্চম কবিতাতেও আছে বৈদিক মন্ত্রেরই অনুরণন। 'জন্মদিনে' কাব্যের ত্রয়োদশ কবিতায় কবি যেন সরাসরি বৈদিক ভাষাও ব্যবহার করেছেন।[৫৭] বলেছেন—তাঁর মনে আসছে বৈদিক কবিদের ভাষা (পঞ্চদশ কবিতা)। ত্রয়োবিংশ কবিতার শেষ পাঁচটি পঙ্ক্তি স্পষ্টতই বৈদিক সূক্তেরই ভাবানুবাদ। পঞ্চবিংশ কবিতায় কবি প্রাচীন সামগীতির ধ্বনি শুনতে চেয়েছেন। এমন কী, 'শেষ লেখা'র শেষতম কবিতাতেও তাঁকে দেখি জীবনের জয়গানে দৃঢ়নিষ্ঠ। ঋগ্বেদের ঋজু, নিরলংকার ও বলিষ্ঠ ভাষার গৌরবে তাঁর কাব্য এখানে বিশেষ একটি মহিমা লাভ করেছে।

১। দ্রষ্টব্য, জীবনস্মৃতি, বাল্যশিক্ষার অংশ।
২। রচনাকাল ১৮৭৫-৭৬।
৩। রচনাকাল ১৮৭৭।
৪। রচনাকাল ১৮৭৭-৮০।
৫। সন্ধ্যাসংগীত, 'ভূমিকা', রবীন্দ্ররচনাবলী শতবার্ষিকী সংস্করণ, প্রথম খণ্ড।
৬। 'মেঘদূত' কবিতা।
৭। কাদম্বরী।
৮। 'নববর্ষা', ক্ষণিকা।
৯। শ্লোক সংখ্যা ৬৯।
১০। শেষের কবিতা, শেষ কবিতা।
১১। একদা প্রাতে কুঞ্জতলে অন্ধবালিকা/পত্রপুটে আনিয়া দিল পুষ্পমালিকা।
১২। একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে/মরি মরি অনঙ্গদেবতা।
১৩। পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি, সন্ন্যাসী,/বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
১৪। সুন্দরী তুমি শুকতারা/সুদূর শৈলশিখরান্তে
শর্বরী যবে হবে সারা/দর্শন দিও দিগ্‌ভ্রান্তে।
১৫। যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়/মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দম দুর্বার/দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল/মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল—ভাষা ও ছন্দ।
১৬। দুঃখ পেয়েছি দৈন্য ঘিরেছে অশ্লীল দিনরাতে/দেখেছি কুশ্রীতারে/মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে—সেঁজুতি।
১৭। ঘুম ভাঙানিয়া জ্যোছনা/কোথা থেকে যেন আকাশে কে বলে/একটুকু কাছে বোস না—অস্পষ্ট, নবজাতক।
১৮। স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে/বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে/শশীতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী/কোথা তোরা পুরকামিনী?/কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা/জনপদবধূ তড়িতচকিতনয়না?/মালতীমালিনী কোথা প্রিয় পরিচারিকা?/কোথা তোরা অভিসারিকা?/ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা/ললিতনৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা—বর্ষামঙ্গল, কল্পনা।
১৯। ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,/চলচপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ—/কোথা চম্পক-আভরণ—আবির্ভাব, ক্ষণিকা।
২০। যেমন, কাদম্বরীতে—'জলাবগাহনাগতজরকুঞ্জরকুম্ভ-সিন্দূরসন্ধ্যায়মানসলিলয়োম্মাদ-কলহংকুলকোলাহলমুখরীকৃতকূলয়া বেত্রবত্যা—' ইত্যাদি গদ্যের ছন্দ।

২১। কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধির আধিক্য।

২২। যেমন 'রক্তকরবী'র ভূমিকায়, অথবা 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে রামায়ণের প্রতীকী ব্যাখ্যায়।

২৩। তুলনীয়, 'অন্ধকাসুরের কাহিনী'।

২৪। বিশেষ দ্রষ্টব্য—'সেকাল' ও 'স্বপ্ন'।

২৫। 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'মেঘদূত', 'পুরস্কার', 'নরকবাস' প্রভৃতি কবিতার বিষয়বস্তু সরাসরি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে নেওয়া। 'চিত্রাঙ্গদা', 'কালমৃগয়া', বাল্মীকিপ্রতিভা' প্রভৃতি নাটক মহাকাব্যনির্ভর। 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা', 'অরূপরতন' (রাজা) ও 'শাপমোচনে'র বিষয়বস্তু বৌদ্ধসাহিত্য থেকে সংগৃহীত। 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'পূজারিণী', 'মূল্যপ্রাপ্তি' প্রভৃতির উপাদান তিনি নিয়েছেন 'অবদান শতক' থেকে ; কথা ও কাহিনীর বহু উপাদান ব্রাহ্মণসাহিত্য ও উপনিষৎ থেকে ; 'মস্তকবিক্রয়' ও 'পরিশোধ'-এর উপাদান 'মহাবস্তু' থেকে ; 'দিব্যাবদান' অবলম্বনে লিখেছেন 'সামান্য ক্ষতি' আর 'কল্পদ্রুমাবদান' অবলম্বনে 'নগরলক্ষ্মী'। 'মহাবস্তু'র কুশজাতক থেকে এসেছে 'শাপমোচনে'র কাহিনী।

২৬। 'কল্পনা' কাব্যে বিল্‌হনের কাব্যের প্রভাবে কবি 'চৌরপঞ্চাশিকা' কবিতাটি রচনা করেন। 'মদনভস্মের পূর্বে' আর 'মদনভস্মের পরে' কবিতা দুটির উৎস 'কুমারসম্ভব' কাব্যের তৃতীয় এবং চতুর্থ সর্গ। 'কুমারসম্ভব' দ্বিতীয় তৃতীয় সর্গের প্রভাব পড়েছে 'পূরবী'র 'তপোভঙ্গ' কবিতাটিতেও। 'মানসী' গ্রন্থের 'রাহুর প্রেম', 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' কবিতাগুলিতে মহাকাব্য ও পুরাণের বীজ আছে। আবার 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা', 'মানসসুন্দরী' প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অলস কল্পনাবিলাসী মন দৃষ্টি ফিরিয়েছে অতীতের কাব্যসাহিত্যের দিকে ; যেন নিজস্ব কল্পনাকে অতীতের রঙে-রসে উজ্জীবিত করে কাহিনী রচনা করতে চেয়েছেন কবি। 'সোনার তরী' গ্রন্থের 'বসুন্ধরা' কবিতাটি মনে করিয়ে দেয় 'ভূমিসূক্ত'কে—(অথর্ববেদ, দ্বাদশ অধ্যায়)।

২৭। 'প্রেমের অমরাবতী, প্রদোষ-আলোকে যেথা'—(চিত্রা)।

২৮। তাসের দেশ, অচলায়তন (গুরু) মুক্তধারা, কালের যাত্রা ইত্যাদিতে।

২৯। 'বনে ও রাজ্যে', 'তপোবন', 'প্রাচীন ভারত', 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার', 'কালিদাসের প্রতি' ইত্যাদি।

৩০। নটরাজ, ঋতুরঙ্গশালা, নবীন, শেষবর্ষণ, শ্রাবণগাথা প্রভৃতি কবিতায় সংস্কৃত ঋতুবর্ণনার প্রতিফলন।

৩১। বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা।

৩২। গীতবিতানের প্রকৃতি পর্যায়ের ১৮৩-১৮৭, ১৯০, ২০৮, ২৩৮ সংখ্যক এবং অন্যান্য বহু গান।

৩৩। অথবা, বৈশাখ।

৩৪। ঋতুসংহার, শরৎ—১ম শ্লোক।

৩৫। কুমারসম্ভব সপ্তম সর্গ, পার্বতীর বধূবেশ বর্ণনা।

৩৬। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের এই শর্তগুলি ছিল সংখ্যায় বিপুল এবং প্রায়ই যান্ত্রিকভাবে প্রযুক্ত।

৩৭। নৈবেদ্য ৫৭, ৫৮নং কবিতা।

৩৮। নৈবেদ্য ৫৯নং কবিতা।

৩৯। ঋগ্বেদের 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'-এর প্রতিধ্বনি। নৈবেদ্য, ৬৪ সংখ্যক কবিতা ; প্রায় একই কথা ৬৪-৭১-এ পাওয়া যায়।

৪০। সোনার তরী চৈতালি ও ক্ষণিকার মায়াবাদ, মুক্তি, খেলা, বন্ধন, গতি, অক্ষম, আত্মসমর্পণ, বৈরাগ্য ; পুণ্যের হিসাব, দেবতার বিদায়, কর্মফল।

৪১। 'এবার চলিনু তবে'—কবিতাটি বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগকে মনে করিয়ে দেয়। মহাবস্তু থেকে 'শ্যামা' ও 'শাপমোচন'-এর বিষয়বস্তু পেয়েছেন কবি।

৪২। মায়া, মুক্তি, মোক্ষ ইত্যাদি শব্দকে কবি প্রায় সর্বত্রই কেবলমাত্র বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতেই ব্যবহার করেছেন।

দেখা যাচ্ছে যে, ইতিবৃত্তমূলক ইতিহাস নয়, ভারতবর্ষের নিগূঢ় সেই ঐক্য-সাধনার ইতিহাসটির প্রতিই তিনি নিবদ্ধদৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগ-ভাবনায় ভারতবর্ষীয় সভ্যতার এই বিশিষ্ট সাধনাদর্শের কথাই সিংহভাগ জুড়ে আছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, তিনি স্বয়ং ছিলেন এই সাধনার শ্রেষ্ঠতম উত্তরসাধক। স্বাভাবিক কারণেই ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগ-ভাবনায় অনেকটা সময় কেটেছে মধ্যযুগের বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্লীন আলোকদীপ্ত এই ভারতপথটির আবিষ্কারের আনন্দে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগ-ভাবনা শুধুমাত্র দেশের ভূগোলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন আলোচনাসূত্রে তাঁর মধ্যযুগ-ভাবনা অন্য দেশের মাটিকেও ছুঁয়ে গেছে। 'প্রাচ্য সমাজ' প্রবন্ধে তিনি ইউরোপের মধ্যযুগে নারীনির্যাতনের চিত্রটি তুলে ধরেছেন এবং এ বাবদে প্রাচীন আরব কুপ্রথা দূর করার জন্য মহম্মদ যে প্রয়াস করেছিলেন তার প্রশংসা করেও পরবর্তীকালে সমাজের রক্ষণশীলতার কারণে সেই প্রয়াস কাঙ্ক্ষিত ফলপ্রদানে ব্যর্থ ও বন্ধ্যা হয়েছে বলে দুঃখও প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগ-ভাবনার ভূগোলটি ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এ কথাও স্মরণ রাখতে হয়, রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগ ভাবনা-যতটা কালগত, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবগত। ভারত-ইতিহাসের নির্মাণপর্বের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়রূপেই মধ্যযুগের ইতিহাসকে দেখেছেন তিনি। আর্য-অনার্যের মিলনে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে আর্য সভ্যতা গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগের ইতিহাসে তা আর একটি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হল এবং তা হল মুসলমানদের আগমন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এ দেশে প্রবেশ করিল, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এ দেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।"[১]

লক্ষণীয় যে, আর্যদের মতো মুসলমানদেরও কবি বহিরাগত বলেছেন কিন্তু বিদেশী বলেননি। পক্ষান্তরে তিনি মুসলমানদের ভারতবর্ষের অধিবাসী এবং তাঁর স্বপ্নের 'ভারতবর্ষীয় জাতি'র অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই মেনে নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ দুঃখের সঙ্গেই লক্ষ করেছেন যে, মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মবিরোধ ঘটেছিল এবং তার পরিণামে হিন্দু সমাজে আত্মরক্ষার নামে আত্মক্ষয়ী রক্ষণশীলতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ধর্মের নামে ধর্মতন্ত্র, জাতির নামে বজ্জাতি এবং অর্থহীন ও অসংগত আচার-সংস্কারের লৌহনিগড়ে হিন্দু সমাজ তখন এক অচলায়তনে পরিণত হয়েছিল। সেই অচলায়তন শুধু যে বাইরের ছোঁয়া বাঁচাতে ব্যস্ত ছিল তাই নয়, নিজেদের মধ্যেও ছোঁয়াছুঁয়ির বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। প্রাচীন যুগে যাদের ব্রত ছিল পরকে আপন করা, প্রাণধর্মের অভাবে মধ্যযুগে তাদেরই কাজ হল আপনকে পর করা। হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণের মানুষগুলি যে দলে দলে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল সেটা অকারণে নয়। উচ্চবর্ণের মানুষের ঘৃণা, অসম্মান এবং অবিচারই তাদের ধর্মত্যাগে উৎসাহিত করেছিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ঘৃণা ও ক্রোধের অন্ত নেই এবং হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম ধর্মের সংকীর্ণতার নির্মম সমালোচনায় তাঁর বিন্দুমাত্র বিরক্তি নেই।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনায় একটি রাষ্ট্রিক মহাজাতি সৃষ্টির যে সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল তার অচরিতার্থতায় রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপের অন্ত ছিল না। এর জন্য তিনি হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কেই অভিযুক্ত করলেও হিন্দুর অনুদার আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের মাত্রা বেশি বলেই মনে হয়। কালিদাস নাগের কাছে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে—ধর্ম্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল ; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্ম্মমতে প্রবল।" রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে, দুই সম্প্রদায়ের মিলন-পথে এটাই সবচেয়ে বড়ো বাধা।

তবু রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন যে, ব্যবহারিক প্রয়োজনেই মধ্যযুগে এই দুই সম্প্রদায়, আচার-ধর্মের বিরোধ এবং বিচ্ছেদকে অতিক্রম করে অনেকটা কাছাকাছি এসেছিল। তিনি বলেছেন, "এতদিন সেই গোড়ার দিকে এক রকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাত মেনেও আমরা পরস্পরের কাছাকাছি ছিলুম।"[২] আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গে সেই কাছাকাছি আসার প্রমাণ সুপ্রচুর। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন যে, আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত মুসলমানেরও বটে হিন্দুরও বটে, তাতে উভয় জাতীয় গুণীরই হাত আছে ; যেমন মুসলমান রাজ্যপ্রণালীতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই স্বাধীন ঐক্য ছিল।

"তাহা না হইয়া যায় না। কারণ মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। তাহাদের শিল্পবিলাস ও নীতিপদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই ; এবং মুসলমান যেমন বলের দ্বারা ভারতবর্ষকে আপনার করিয়া লইয়াছিল, ভারতবর্ষও তেমনই স্বভাবের অমোঘ নিয়মে কেবল আপন বিপুলতা আপন নিগূঢ় প্রাণশক্তি দ্বারা মুসলমানকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য নির্মাণ, দন্তকার্য, নৃত্য, গীত এবং রাজকার্য, মুসলমানের আমলে ইহার কোনোটাই একমাত্র মুসলমান বা হিন্দুর দ্বারা হয় নাই ; উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হইয়াছে। তখন ভারতবর্ষের যে একটি বাহ্যাবরণ নির্মিত হইতেছিল, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের ডান হাত ও বাম হাত হইয়া টানা ও পোড়েন বুনিতেছিল।"[৩] রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমানদের সঙ্গে বসন-ভূষণ শিল্প-সাহিত্যে আমাদের এমন ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান হয়ে গেছে যে, তার মধ্যে কতটা কার, তার সীমা নির্ণয় করা কঠিন।

কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ আদান-প্রাদনের তাবৎ প্রমাণ ও পরিচয় যে ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতির বাহ্যাবরণটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এই ঘনিষ্ঠতা যে তার প্রাণকেন্দ্রে নবজীবনের সঞ্চার বা নতুন প্রেরণার জোয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি সে সম্পর্কেও কবি যথেষ্ট সচেতন। আমাদের মধ্যযুগীয় প্রথাবদ্ধ চিরাভ্যস্ত জীবনে বাইরে থেকে প্রথম আঘাত লেগেছিল মুসলমানের, কিন্তু সেই সংঘাত যে আমাদের মানসমুক্তি ঘটাতে সক্ষম হয়নি তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সে মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্য সংঘটন করেছে কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এইজন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল—কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের।......তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে

কিছুই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়নি তা নয় কিন্তু তা সামান্য। বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তারাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চেতিয়ে তোলেনি। তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে। বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাইরের দিকে প্রসারিত করেনি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বন্ধ করে দিলে বাহিরের দিকে দরজা। মাঝে মাঝে সেই দরজা ভাঙাভাঙি চলেছিল কিন্তু এমন কিছু ঘটেনি যাতে বাহিরের বিশ্বে আমাদের পরিচয় বিস্তারিত হতে পারে।"[৪]

মধ্যযুগে ন্যায়নীতির আপেক্ষিক অভাবটুকুও রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের কারণ হয়েছে। সে যুগে ধর্মের নিয়ম মেনে চলার দায় ছিল সাধারণের, সেই নিয়মকে লঙ্ঘন করার দুর্দম অধিকার অসাধারণের। নীতিবন্ধন-অসহিষ্ণু অধর্ম-সাহসিকতার ঔদ্ধত্যকে ঈশ্বরত্বের লক্ষণ বলে স্বীকার করেছিল সেদিনের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ এই মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, "তখনকার দিনে প্রচলিত 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা', এই কথাটার অর্থ এই যে, জগদীশ্বরের জগদীশ্বরতা তাঁর অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণে, ন্যায়পরতার বিধানে নয়, সেই পন্থায় দিল্লীশ্বরও জগদীশ্বরের তুল্য খ্যাতির অধিকারী। তখন ব্রাহ্মণকে বলেছে ভূদেব, তার দেবত্বে মহত্ত্বের অপরিহার্য দায়িত্ব নেই, আছে অকারণ শ্রেষ্ঠতার নিরর্থক দাবি। এই অকারণ শ্রেষ্ঠতা ন্যায়-অন্যায়ের উপরে, তার প্রমাণ দেখি স্মৃতিশাস্ত্রে, শূদ্রের প্রতি অধর্মাচরণ করবার অব্যাহত অধিকারে।"[৫]

পুনরুক্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও একথা বলার প্রয়োজন আছে যে, মধ্যযুগীয় ধর্মীয় সংকীর্ণতা রবীন্দ্রনাথের গভীর ক্ষোভ ও বেদনার কারণ ছিল এবং এ সম্পর্কে কথা বলার সময় তিনি তাঁর সেই ক্ষোভ ও বেদনাকে চাপা দেবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস করেননি।

মধ্যযুগের ধর্মীয় সংকীর্ণতা এবং অর্থহীন ও অসংগত আচারতন্ত্রের নিরঙ্কুশ একাধিপত্যের অন্তরালে যে কয়েকটি আলোকরেখা কবির চিত্তকে নন্দিত এবং দৃষ্টিকে প্রশান্ত করেছিল তার মধ্যে একটি হল আর্থ-সামাজিক, অপরটি একান্তরূপেই মানবিক।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন যে, মুসলমান শাসকের নিকট এ দেশ উপনবেশ ছিল না, স্বদেশ ছিল। মুসলমান রাজত্ব ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাইরে তার মূল ছিল না। ফলে ভারতবর্ষ, ঔপনিবেশিক শোষণের হাত থেকে মুক্ত ছিল এবং আমাদের সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন অব্যাহত ছিল। তিনি বলেছেন, "মুসলমানের আমলে হিন্দু সমাজের যে কোনো ক্ষতি হয় নাই তাহার কারণ, সে আমলে ভারতবর্ষের আর্থিক পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের টাকা ভারতবর্ষেই থাকিত, বাইরের দিকে তাহার টান না পড়াতে আমাদের অন্নের স্বচ্ছলতা ছিল। এই কারণে আমাদের সমাজ-ব্যবহার সহজেই বহু ব্যাপক ছিল।"[৬] রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের মধ্যেও আমাদের সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক কাজকর্মগুলি তখন অনায়াসেই সম্পন্ন হত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মরায়মান বেণুকুঞ্জে, আমাদের আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ পাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লী প্রাঙ্গণ মুখরিত।"[৭] সমাজ সেদিন শুধু যে বাইরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখেনি তাই নয়, বাইরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্টও হয়নি। এই সমাজের শ্রী ও স্বাস্থ্য সেদিন অক্ষুণ্ণ ও অটুট ছিল

বলেই মানুষের মনে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের আগ্রহ ও আকাঙক্ষা ছিল। "এই কারণেই পূর্বে যাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায়-রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবেরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তিলাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন।"[৮]

ব্যক্তিগত ভোগ অপেক্ষা সামাজিক হিতকর্মের অনুষ্ঠানে অর্থব্যয় করাই ধনবানদের আকাঙক্ষা ও আদর্শ ছিল। ব্যক্তিগত ভোগবিলাসিতা অর্থাৎ নবাবি সেদিনও ছিল তবে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে, বৈশ্যযুগের বাবুগিরির তুলনায় তার সংখ্যা নিতান্তই সীমিত ছিল। তখন সমাজে যে ধনের মর্যাদা অধিক ছিল না এবং ধনশালী বৈশ্যগণ যে সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করে ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগ-ভাবনায় এটা সুখ ও স্বস্তির কারণ হয়েছে।

মধ্যযুগের আচারসর্বস্ব ধর্মতন্ত্রের প্রতি একবুক ঘৃণা নিয়েও কবি আনন্দের সঙ্গেই লক্ষ করেছেন যে, সহজ মানবিকতার প্রকাশ-পথটি সেদিন নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায়নি। হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম-বিরোধ, সংঘাত এবং সংঘর্ষের অন্তরালে একটা মিলনের মোহানাও গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল ; নানকপন্থী, কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণব সমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল।"[৯] এ সম্পর্কে উদার মতাবলম্বী সম্রাট আকবরের প্রশংসনীয় প্রয়াসের কথাও উল্লেখ করেছেন কবি এবং বলেছেন, "মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় চাঞ্চল্যের ভিতরে ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্‌বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেই জন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগল সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয় একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়া ছিলেন। এইজন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন।"[১০] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত'কে 'এক ধর্মরাজ্য পাশে' ঐক্যবদ্ধ করার সংকল্প ছিল যাঁর সেই বীর শিবাজীও কবির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন।[১১] বলা বাহুল্য যে, এই ধর্ম হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম বা কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়, একান্তরূপেই মানবধর্ম।

২

মধ্যযুগীয় প্রথাবদ্ধ ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও অনুদারতার অন্তরালে এই যে মানবতার ধারা যা রবীন্দ্রমননে নিত্য-উদ্‌ভাসিত ভারতবর্ষের চিরন্তন ঐক্যানুভূতি ও ঐক্যসাধনার ধারা, স্বাভাবিক কারণেই তার কথা রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগ-ভাবনায় বারবার ধরা পড়েছে। মধ্যযুগে যেখানেই মানুষ প্রথাসিদ্ধ আচার-বিচারের গোঁড়ামি এবং প্রথাবদ্ধ ধর্মতন্ত্রের নোংরামি ছেড়ে উদার মানবতাবাদের পতাকাতলে একত্রিত হবার প্রয়াস করেছে রবীন্দ্রনাথ সেখানে শুধু যে প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করেছেন তাই নয়, নিজের সৃষ্টি-প্রদীপের আলোকে তাঁদের বাণীকে প্রতিফলিত ও পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস করেছেন এবং সর্বশেষে নিজেকে তাঁদেরই সমগোত্রীয় মন্ত্রবর্জিত ব্রাত্য বলে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণাও করেছেন। রবীন্দ্রভাবনায় এই সূত্রেই শ্রীচৈতন্য, মুসলমান জোলা কবীর, চর্মকার রবিদাস, নানক, দাদু, রজ্জব আদি মধ্যযুগীয়

মহাপ্রাণ সাধকদের কথা বারবার উদ্ভাসিত হয়েছে। জাতি-ধর্ম আচার-প্রথা ইত্যাদি তাবৎ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা থেকে আশ্চর্যভাবে মুক্ত এই সব মধ্যযুগীয় সাধকদের প্রশংসায় তাঁর কণ্ঠ যে কদাচ ক্লান্তিবোধ করেনি তার প্রধান কারণ এই যে, তাঁর নিজের আদর্শে এবং এই সব সাধকদের ধর্মাদর্শে "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

মানবপ্রেমের জ্যোতির্ময় শিখারূপেই শ্রীচৈতন্য রবীন্দ্রভাবনায় দেদীপ্যমান। বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্যের জীবনী তিনি অনেক বয়স পর্যন্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গেই আলোচনা করেছেন। প্রথম জীবনের রচনায় তিনি লিখেছেন, "আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘা কাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন।"[১২] আবার স্মরণ করতে হয় যে, 'গোরা'র স্রষ্টার মুখে শ্রীচৈতন্যের এই প্রশস্তি অকারণ নয়। মধ্যযুগীয় জাতিধর্মবর্ণভেদ ভেঙে দিয়ে সব মানুষকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শ্রীচৈতন্য যুক্তিবলে নয়, অসামান্য চরিত্রবলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "গুরু গোবিন্দ, চৈতন্য যখন এই জাতিনিগড়বদ্ধ দেশে জাতিভেদ কথঞ্চিৎ শিথিল করেন, তখন তাহা যুক্তিবলে করেন নাই, চরিত্রবলে করিয়াছিলেন।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন যে, বিচ্ছিন্নতা এবং সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী শক্তির নেতৃত্বদানের উপযুক্ত চরিত্রবল শ্রীচৈতন্যের ছিল এবং ব্যক্তিগত আনুগত্য নয়, আদর্শের প্রতি আনুগত্যই তাঁর প্রিয় ও প্রার্থিত ছিল। তার প্রমাণ একান্ত অনুগত শিষ্য হরিদাসের প্রতি তাঁর কঠোর ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ".....নিজের দলের প্রতি দুর্বল মমতাকে তিনি মনে স্থান দেন নাই।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে, মধ্যযুগে "বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস'। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ রাঢ় বারেন্দ্রর ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়, অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজের মিল ছিল না।"[১৫] এই সর্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ঐক্যানুভূতির প্রথম আহ্বানটি এসেছিল চৈতন্যের কাছ থেকেই। চৈতন্যের জীবন-বীণায় যে মহামিলনের সংগীত বেজে উঠেছিল তার অমোঘ আকর্ষণে 'দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কূল রহিল না,'[১৬] চৈতন্য-সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের সুখ ও স্বস্তির একটা বড়ো কারণ এটাই।

শিক্ষা প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যের কথা স্মরণ করেছেন এবং নিজের শিক্ষাসম্পর্কিত ধারণার অন্যতম প্রবক্তা ও প্রধান সাক্ষীরূপে তাঁকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ একথা বলতে কোনোদিনই ক্লান্তিবোধ করেননি যে, যে-ভাষায় সমস্ত জাতির মানসিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিষ্পন্ন হয়, শিক্ষাকে সেই মাতৃভাষার মধ্যে মিশ্রিত করলে তবেই তা সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করতে পারে, সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সঙ্গে তার যোগসাধন হয়। সেই সূত্রেই তাঁর বক্তব্য 'বুদ্ধ সেইজন্য পালিভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।'[১৭]

রবীন্দ্রনাথ শ্রীচৈতন্যকে এক মানবতাবাদী গণজাগরণের সক্ষম ও সমর্থ নেতারূপেই ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটির প্রতি তাঁর আগ্রহ তো ছিলই না বরং অনীহাই ছিল।[১৮] কিন্তু চৈতন্য-প্রভাবে উদ্দীপিত বাংলাদেশের সমাজ, সাহিত্য এবং সংগীতে যে গণজাগরণ ঘটেছিল তার প্রশংসায় তিনি সর্বদাই সোচ্চার। কীর্তন গানই যে

বাংলার প্রথম গণসংগীত সে কথা স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কীর্তনের আরও একটি বিশিষ্টতা আছে। সেটাও ঐতিহাসিক কারণেই। বাংলায় একদিন বৈষ্ণবভাবের প্রাবল্যে ধর্মসাধনায় বা ধর্মরসভোগে একটা ডিমোক্রাসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠ প্রকাশ পেতে চেয়েছিল।'[১৯] কীর্তন গানে সাহিত্যের সঙ্গে সংগীতের যে পার্বতী-পরমেশ্বর রূপটি প্রতিষ্ঠিত সেটিও কবির প্রীতির কারণ হয়েছিল এবং রবীন্দ্র-সংগীতের প্রাণধর্মের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা স্বীকার করবেন যে এই প্রীতি অন্তরঙ্গ ও আন্তরিক।

আসল কথা এই যে, মধ্যযুগের ধর্ম বা সংগীত যাই হোক না কেন তা যখন নির্দিষ্ট নিয়মতন্ত্রের অনুদার সংকীর্ণতা পরিহার করে সর্বজনীন হবার চেষ্টা করেছে তখনই তা রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রিয় ও প্রশংসনীয় হয়েছে। মধ্যযুগের সন্তদের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ও সুগভীর অনুরাগের মূলকথাটা এখানেই। এই সব সন্ত কোনো আচারনিষ্ঠ ধর্মের অচলায়তনে বসে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বরের পূজা করেননি বলেই রবীন্দ্র-ভাবনায় তাঁরা এতখানি অনুরাগের আসন অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে, 'এই সকল ধর্মসাধকদের প্রায় সকলেরই উৎপত্তি অন্ত্যজ জাতির থেকে। সমাজ তাঁদের বাইরে বসিয়ে রেখেছিল,—সেই অনাদর অবজ্ঞাতেই তাঁদের মুক্তির সহায়তা করেছিল।'[২০] এই দুর্ভাগা দেশের যুগান্তের অপমানবাহী যে অন্ত্যজ সমাজের জন্য রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না মধ্যযুগের সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকারে অসাম্প্রদায়িক আলোকের দীপটি তাঁদের হাতেই প্রজ্বলিত দেখে ও জেনে তাঁর আনন্দের অবধি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, ঐক্যসাধনার ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস এবং মধ্যযুগে সেই ইতিহাসের রচয়িতা ছিলেন এই সন্ত সাধকদের দল। তিনি বলেছেন, "অবশেষে দার্শনিক-জ্ঞানপ্রধান সাধনা যখন ভারতবর্ষের জ্ঞানী-অজ্ঞানী অধিকারী-অনধিকারীকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল তখন চৈতন্য নানক দাদু কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য শাস্ত্রের অনৈক্যকে ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন।··· তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃতির মাঝখানে ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন।"[২১] এঁদের মধ্যে কবীরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ও অনুরাগ ছিল অত্যন্ত তীব্র। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে Evelyn Underhill-এর সহায়তায় তিনি One Hundred Poems of Kabir নামে কবীরের একশতটি দোঁহার ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সমাজের একান্ত আত্ম-সংকোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও তাহার আত্মপ্রসারণের উদ্‌বোধনচেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়াছে, ভারতবর্ষের মধ্যযুগে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। নানক কবীর প্রভৃতি পুরুষগণ সেই চেষ্টাকেই আকার দিয়াছেন। কবীরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্য সাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে। বিপুল বিক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার মধ্যে ভারত যে কোন নিভৃতে সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা যেন ধ্যানযোগে তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন।"[২২] সমস্ত আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-জাতি-বর্ণ-নিরপেক্ষ এক মহান মানবতার ধর্ম প্রচার করেছিলেন কবীর, নানক আদি সন্তের দল এবং সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগ সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনায় এঁদের প্রসঙ্গ এবং প্রশংসা এমন সরব ও

সোচ্চার। 'মানুষের ধর্ম' ব্যাখ্যা করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ কবীর, রজ্জব আদি মধ্যযুগীয় সন্তদের বাণী উদ্‌ধৃত করেছেন তার কারণ সেই বাণীর মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর প্রাণের বার্তা, যে-বার্তা নিখিল বিশ্বমানবের ঐক্যানুভূতির, যার ধর্ম মানবধর্ম।

চৈতন্য বা কবীরপন্থীরা যেমন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মের গন্ডি ছেড়ে মনুষ্যত্বের সাধনায় সর্বমানবের সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস করেছিলেন শিখগুরু নানকও তেমনি প্রথাবদ্ধ ধর্মের অচলায়তন ভেঙে মানুষকে তার হারানো স্বাধীনতা ফিরে দিতে চেয়েছিলেন। এই স্বাধীনতা সর্ববিধ আচার ও সংস্কারের জড়তা থেকে মানসমুক্তির স্বাধীনতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাবা নানক যে স্বাধীনতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে ; যে দেবপূজা কেবল দেশবিশেষের, জাতিবিশেষের কল্পনা ও অভ্যাসের দ্বারা সীমাবদ্ধ, পৃথিবীর সকল মানুষের চিত্ত যাহার মধ্যে অধিকার পায় না। ...এই সকল সংকীর্ণ পৌরাণিক ধর্মের বন্ধন হইতে তাঁহার হৃদয় মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং সেই মুক্তি তিনি সকলের কাছে প্রচার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।'[২৩]

শাস্ত্রের আপ্তবাক্য নয়, অন্তরের সত্যকেই এঁরা বড়ো করে দেখেছিলেন এবং মানুষের ভেদের চেয়ে ঐক্যকে সত্য বলে জেনেছিলেন। কেন না, রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়, 'তাঁরা সকলেই ছিলেন কবি, কেউ পণ্ডিত ছিলেন না। শব্দের জালে তাঁদের মন জড়িয়ে যায়নি, তথ্যের খুঁটিনাটির মধ্যে উঞ্ছবৃত্তি করতে তাঁরা বিরত ছিলেন।'[২৪] এইসব সাধকদের বাণী ও সাধনা রবীন্দ্রনাথের প্রাণে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার শেষতম প্রমাণ 'পত্রপুট' কাব্যের পনেরো-সংখ্যক কবিতাটি, যেখানে তিনি মুক্তকণ্ঠে নিজেকেও 'ব্রাত্য' ও 'মন্ত্রহীন' বলে ঘোষণা করে সমস্ত আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ এবং সংস্কার-পালনের বিরুদ্ধে তাঁর অনাস্থা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

৩

মধ্যযুগের পশ্চিমভারতীয় সন্তসাধকদের রচনা সম্পর্কে যেমন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সম্পর্কেও তেমনি রবীন্দ্রনাথের কিছু সুস্পষ্ট অভিমত আছে। সেই অভিমতগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যেখানেই মানুষের অবমাননা, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সেখানেই তিনি নির্মম সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, আর যেখানে তা হয়নি সেখানে তিনি মুগ্ধ পাঠকের মতো তার রসাস্বাদন করেছেন এবং নিজের রসাস্বাদনের সূত্রে সেই সাহিত্যের অভিনব পাঠোদ্ধার ও অপরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এবং এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যে একান্তরূপেই রাবীন্দ্রিক সে কথা বলাই বাহুল্য।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উচ্চস্তরের সাহিত্য এবং নিম্নস্তরের সাহিত্যের মধ্যে একটা নিবিড় ও গভীর যোগ লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন, "নীচের সহিত উপরের এই যে যোগ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশি দূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। ...কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা সমস্তই গ্রাম্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত।"[২৫] গ্রাম্য ছড়াগুলির সঙ্গে রাজসভার কাব্যগুলির মর্মগত

মিলটুকু রবীন্দ্রনাথের প্রীতির কারণ হলেও মঙ্গলকাব্যগুলি সম্পর্কে তাঁর কণ্ঠে প্রশংসার কথা ক্বচিৎ উচ্চারিত। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্রবিশেষ বা ভারতচন্দ্রের কাব্যের শিল্পচাতুর্য তাঁকে মুগ্ধ করলেও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তিনি স্বৈরাচারী শক্তির অহেতুক জয়গান এবং মানবতার অকারণ অবমাননাকেই প্রত্যক্ষ করে পীড়িত ও বিরক্ত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, "বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আর-এক দেবতার অভ্যুদয়। সহজেই এই কথা মনে হয় যে, দুই দেবতার মধ্যে যদি কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে তাহলে সেটা ধর্মনীতিগত আদর্শেরই তারতম্য নিয়ে। যদি মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে নতুন দেবতা পুরাতন দেবতার চেয়ে বেশি তৃপ্তি দিতে পারেন তা হলেই তাঁকে বরণ করবার সংগত কারণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানে দেখি একেবারেই উলটো। এককালে পুরুষদেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়েদেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পূজো চাই। অর্থাৎ যে-জায়গায় আমার দখল নেই, সে-জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী। গায়ের জোর। কী উপায়ে দখল করবে। যে উপায়েই হোক। তার পরে যে-সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্‌বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই-সকল উপায়েরই জয় হল। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ত দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, কী করব, আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে। এই স্বপ্ন একদিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল।"[২৬] এই স্বপ্ন যে মূলত পরাজিতের ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমের স্বপ্ন, স্বৈরাচারী শক্তির পদলেহন করে আত্মশক্তিহীন অলস এবং অশক্তের অতি-অদ্ভুত হঠাৎ কিছু পাবার স্বপ্ন, রবীন্দ্রনাথ সেকথা বলতেও দ্বিধাবোধ করেননি। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন যে, এই স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে ধনপতি বা চাঁদসদাগর কিছুদূর লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত শক্তির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "যে-আত্মা অভয়, যে-আত্মা অমর, সে আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নেমে এসে ভয়কে মৃত্যুকে দেবতা বলে, আপনার চেয়ে বড়ো বলে মানলে। এইখানেই শক্তির সকলের চেয়ে বীভৎস পরিচয় পাওয়া গেল।"[২৭] মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্‌ভবের এবং সেগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যখন মোগল-পাঠানের বন্যা দেশের উপর ভেঙে পড়ল, তখন সংসারের যে-বাহ্যরূপ মানুষ প্রবল করে দেখতে পেলে সেটা শক্তিরই রূপ। সেখানে ধর্মের হিসাব পাওয়া যায় না, সেখানে শিবের পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।"[২৮] এখানে বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যমীমাংসায় স্রষ্টা সার্বভৌম হলেও মধ্যযুগের সাহিত্যমীমাংসায় তাকে কিন্তু একাধিকবার সমাজতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হতে দেখি। শক্তিপূজা সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত সমসাময়িককালে প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে মত পরিবর্তন করেননি তার প্রমাণ 'শক্তিপূজা' প্রবন্ধটি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটিতে, একদিকে দেবচরিত্রের অহেতুক হিংস্রতা অপরদিকে মানুষের ধর্মবিচারহীন ফল-কামনার অশুভ সংযোগের মধ্যে প্রশংসার যে কিছু নেই সে কথা তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে।

যে কারণে মঙ্গলকাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনীহা ঠিক তার বিপরীত কারণেই বৈষ্ণবকাব্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। বৈষ্ণবকাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগের

কারণ একই সঙ্গে মানবিক এবং সাহিত্যিক। বৈষ্ণবের প্রেমধর্মের মানবিক দিকটি তাঁকে গভীরভাবে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছিল। তিনি বলেছেন, "বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই-সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।"[২৯] বলা বাহুল্য যে, কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের ব্যাখ্যার মতো বৈষ্ণবধর্মের পঞ্চরতির এই ব্যাখ্যাও তাঁর নিজস্ব এবং সর্বাংশে রাবীন্দ্রিক। বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষৎ বিমিশ্রিত হয়ে তাঁর মনের হাওয়া তৈরি করেছিল, এ তাঁর নিজস্ব স্বীকারোক্তি।[৩০] বৈষ্ণবধর্মের মানবিক সংবেদন এবং বৈষ্ণব কাব্যের নান্দনিক আবেদন তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। তিনি শুধু যে বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে পদ রচনা করেছিলেন তাই নয়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় 'পদরত্নাবলী' (১৮৮৫) সংকলনও করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যমূল্য সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, পদাবলীর ভাব, ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে তাঁর অনুরাগমণ্ডিত আলোচনা, বিভিন্ন আলোচনাসূত্রে পদাবলীর উদ্‌ধৃতি ও ব্যাখ্যা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস আদি প্রখ্যাত পদকর্তাদের কাব্যবৈশিষ্ট্য ও কাব্যসৌন্দর্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে পদাবলীর প্রভাব—এ সবই জ্ঞাত তথ্য। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বৈষ্ণব পদাবলী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপেই রবীন্দ্র-ভাবনায় স্বীকৃত এবং সোচ্চার। বৈষ্ণবকাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রবল অনুরাগের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এই যে, বৈষ্ণবের পরকীয়া রতির স্বপক্ষে তিনি শুধু নান্দনিক নয়, একটা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এইরূপ প্রেমগানের প্রচার সাধারণ লোকের পক্ষে বিপজ্জনক এবং সমাজের পক্ষে অহিতকর মনে হতে পারে। "কিন্তু ফলত তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ...আমাদের দেশে যখন বন্ধবিহীন প্রেমের সমাজবিহিত প্রকাশ্য স্থান কোথাও নাই, সদর দরজা যখন তাহার পক্ষে একেবারেই বন্ধ, অথচ তাহাকে শাস্ত্র চাপা দিয়া গোর দিলেও সে যখন ভূত হইয়া মধ্যাহ্নরাত্রে রুদ্ধ দ্বারের ছিদ্রমধ্য দিয়া দ্বিগুণতর বলে লোকালয়ে পর্যটন করিয়া বেড়ায়, তখন বিশেষরূপে আমাদের সমাজেই সেই কুলমানগ্রাসী কলঙ্ক-অঙ্কিত প্রেম স্বাভাবিক নিয়মে গুপ্তভাবে স্থান পাইতে বাধ্য—বৈষ্ণব কবিরা সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসারপথ হইতে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদের সমাজের সেই চিরক্ষুধাতুর প্রেতটাকে পবিত্র গয়ায় পিণ্ডদান করিবার আয়োজন করিয়াছেন।"[৩১]

মধ্যযুগের বাংলাদেশে পার্সির ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও বাংলা কাব্যে পার্সি ভাষা ও সাহিত্য যে আশানুরূপ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয়নি, তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে। তখনকার ভদ্রসমাজে সর্বত্রই প্রচলিত

ছিল পার্সি, তবু বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে এই পার্সি বিদ্যার স্বাক্ষর পড়েনি—একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে মার্জিত ভাষায় ও অস্খলিত ছন্দে যে নাগরিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে পার্সি-পড়া স্মিতপরিহাসপটু বৈদগ্ধ্যের আভাস পাওয়া যায়।"[৩২]

৪

বাংলার লোকসাহিত্যও রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। স্মরণীয় যে, এ শুধু তাঁর আকর্ষণ মাত্র নয়, আবিষ্কারও। আমাদের লোকসাহিত্যচর্চার তিনি স্মরণীয় পথিকৃৎ। লোকসাহিত্যের সহজ সরল জীবনাদর্শ, স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা এবং মানবিক সৌন্দর্যের দিকটি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি শুধু যে লোকসাহিত্যের সংগ্রহ বা সংকলন করার প্রয়োজনীয়তা নিজে উপলব্ধি করেছেন তাই নয়,এ ব্যাপারে সচেষ্ট হতে সকলকে অনুরোধও করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে, লোকায়ত সমাজজীবনের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতাগুলিকেই অতিশয় আন্তরিকতার সঙ্গে ছন্দে-তালে বাজিয়ে তোলা হয়েছে ছড়ায় এবং গাথায়। বাংলা ছড়ার সংগ্রাহক ও সমালোচক উভয়রূপেই রবীন্দ্রনাথ এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।" তিনি লক্ষ করেছেন যে, "প্রায় প্রত্যেক ছড়ায় প্রত্যেক তুচ্ছকথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।"[৩৩] এই ছড়াগুলির শুধু কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, শিশু-প্রকৃতি গঠনে এগুলির মূল্যবান ভূমিকাটির কথাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আকাশের মেঘের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখের এই ছড়াগুলির সাদৃশ্য দেখিয়ে তিনি বলেছেন, "উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছভাসমান, দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক।......অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলি স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে।"[৩৪]

গ্রাম্যসাহিত্য ও গ্রাম্যছাড়ার মধ্যে বিষয়ভেদে দুটি শ্রেণী লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ; এক, হরগৌরী-বিষয়ক ; দুই, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক। হরগৌরীর গান সমাজ-সংসারের গান, দাম্পত্য প্রেমের গান ; রাধাকৃষ্ণের গান সমাজ-বন্ধন লঙ্ঘন করার গান, স্বাধীন প্রেমের গান। একটির ভাব মৃত্তিকা-সংলগ্ন, অপরটির ভাব আকাশচারী। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লক্ষ করেছেন যে, বাংলার লোকসাহিত্যে হরগৌরীর কথা বা রাধাকৃষ্ণ-কথারই একাধিপত্য, রামসীতার কথা অতি অল্প। ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গেই তিনি বলেছেন, "রামায়ণ কথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত।.....সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য।"[৩৫]

রবীন্দ্রনাথের বাউলপ্রীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। মধ্যযুগের বাংলাদেশে এই বাউলগান লোকায়ত সমাজের অতি নিম্নস্তরে প্রবহমান ছিল এবং আজও আছে। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এই গানগুলিকে সংগ্রহ করে শিক্ষিত সমাজের গোচরে আনেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে, মধ্যযুগের পশ্চিমভারতীয় সন্তদের মতো এই বাউলরাও একদিকে কৃত্রিম লোকাচার, বর্ণবৈষম্যের অনুদার-আবিলতা এবং অপরদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মসাধনার জটিলতা ও শাস্ত্রীয় আচার-বিচার-সংস্কারের সংকীর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। বাউল-সাধনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারত-ইতিহাসের মৌল অভিপ্রায়টিকেই সাকার হতে দেখেছেন এবং বাউলগানের কথায় উপনিষদের আর্ষবাণীর অবিকল প্রতিধ্বনি শুনেছেন। ভাষা ও সুরের 'অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস' বাউলগানের কাব্যমূল্যেরও স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি। বৈষ্ণবের কীর্তনগানের সুরের মতো বাউলগানের সুরটিও তাঁর অতিশয় প্রিয় ছিল। The Indian Philosophical Congress-এর প্রথম অধিবেশনে (১৯২৫) Philosophy of Our People সম্পর্কে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি কোনো শাস্ত্রসম্মত ধর্মের কথা না বলে বাউল দর্শনের ব্যাখ্যা করেন এবং অক্সফোর্ডে 'হির্বাট লেকচার' (১৯৩০) দিতে গিয়েও বাউলের বাণী বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। বলা বাহুল্য যে, এসব কিছুই অকারণে নয়।

রবীন্দ্রনাথের একটি অতি প্রিয় বিশ্বাস এই যে, যে-সব উদারচিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হতে পেরেছে, সেইসব চিত্তে সেই ধর্মসংগমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানস-তীর্থ স্থাপিত হয়েছে। এইসব তীর্থেই সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্তা মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে। রামানন্দ, কবীর, দাদু, রবিদাস আদি মধ্যযুগের সাধকদের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সেই মানসতীর্থের সন্ধান খুঁজে পেয়েছিলেন। বাংলার বাউলদের মধ্যেও সেই তীর্থটিকেই প্রত্যক্ষ করে পুলকিত কবি বলেছেন, "আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউলসাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই।......এই মিলনে গান জেগেছে......এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।"[৩৬] পশ্চিমভারতীয় সন্ত, পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব এবং বাউলের ঐক্যসাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে মর্তসীমার মানুষের মহিমাময় রূপটি প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছেন এবং সানন্দে সেই সাধনার উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তিনি শুধু গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, দানও করেছেন যথেষ্ট, তবে সে আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত। শুধু উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার 'মানবব্রহ্ম' বা 'মহামানবের' প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করেছেন বাউলের 'মনের মানুষ'-এর মধ্যে এবং ধনঞ্জয় বৈরাগীকে সৃষ্টি করে তিনি তাঁর বাউলপ্রীতির সাহিত্যিক প্রমাণ চিরন্তন করে রেখেছেন।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ক্লান্ত অপরাহ্নের কবিগানকে রবীন্দ্রনাথ প্রীতির চোখে দেখেননি তবে সেই গানের উদ্ভবের কারণ ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সামাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি বিন্দুমাত্র ভুল করেননি। এই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "পূর্বেকার গানগুলি হয় দেবতার সম্মুখে নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত—সুতরাং স্বতই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। ইংরেজের নতুন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না,

পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।"[৩৭]

বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মধ্যবর্তী এই কবিগানের মধ্যে প্রশংসনীয় কোনো কিছু খুঁজে না পেলেও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন যে। "...এই নষ্টপরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ—এবং ইংরেজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক।"[৩৮]

মধ্যযুগের পথ পরিক্রমা করে রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের কাছে এসে দাঁড়ান তখন তাঁর চোখেমুখে যুগপৎ আনন্দ ও বেদনার ছায়া। বেদনার কারণ মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয়তা, জাতিবর্ণধর্মের সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা; আনন্দের কারণ ধর্মীয় মানবিকতা ও অসাম্প্রদায়িকতা। শেষোক্তটি রবীন্দ্রনাথের স্বস্তির কারণ এবং সেই কারণেই তাঁর মধ্যযুগ-ভাবনায় প্রসঙ্গটির স্থানও বেশি।

১। পূর্ব ও পশ্চিম, সমাজ।
২। হিন্দু-মুসলমান, কালান্তর।
৩। কোর্ট বা চাপকান, সমাজ।
৪। কালান্তর।
৫। কালান্তর।
৬। বিলাসের ফাঁস, সমাজ।
৭। স্বদেশী সমাজ, সমূহ
৮। স্বদেশী সমাজ, সমূহ।
৯। স্বদেশী সমাজ, সমূহ।
১০। স্বাধিকারপ্রমত্তঃ, কালান্তর।
১১। 'শিবাজী-উৎসব' স্মরণীয়।
১২। চিঠিপত্র, ৬।
১৩। সমুদ্রযাত্রা, সমাজ।
১৪। দেশহিত, সমূহ।
১৫। বাংলাভাষা পরিচয়।
১৬। চিঠিপত্র, ৬।
১৭। শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি, শিক্ষা।
১৮। অপ্রমত্ত, নৈবেদ্য স্মরণীয়।
১৯। আলাপ-আলোচনা, সংগীতচিন্তা।
২০। চিঠিপত্র, ৯।
২১। পথ ও পাথেয়, রাজাপ্রজা।
২২। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, ইতিহাস।
২৩। শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ, ইতিহাস।

সময় ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে।” সেদিনকার সাদা-কালো ফটোগ্রাফে ঔজ্জ্বল্যের তারতম্যে রবীন্দ্রনাথের স্নিগ্ধ প্রশান্ত রূপ সুকুমারের ক্যামেরায় সত্যই যেন এক ‘ভিন্ন মূর্তি ধারণ’ করেছিল।

চব্বিশ বছর বয়সে ১৯১১ সালে সুকুমার বিলেতে যান মুদ্রণশিল্পে উচ্চশিক্ষার জন্য। রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে পৌঁছন ১৯১২ সালের ১৬ জুন। সে সময় বিলেতে রয়েছেন অনেক প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ এবং তরুণ বাঙালি। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথলাল সেন রয়েছেন, আর রয়েছেন কবির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ আর কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। এবারে লন্ডন আগমন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সঙ্গে গীতাঞ্জলির অনুবাদের খাতা। ইংরেজি সাহিত্যমহলে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এবং প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হল সেবারে। কয়েকজন সহৃদয় ইংরেজের আনুকূল্যে তা দ্রুত ঘটল। এবারেই লন্ডনে উইলিয়ম পিয়র্সনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটল। সেই পিয়র্সনের বাড়িতে সুকুমার রায় পড়লেন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরেজিতে এক নিবন্ধ। “Mr. Pearson তাঁর বাড়িতে আমায় Bengali Literature সম্বন্ধে একটা paper পড়বার নেমন্তন্ন [করেছেন]। Mr. Pearson কিছু কিছু বাংলা পড়তে পারেন, খুব ভালো মানুষ। সেখানে গিয়ে Mr. & Mrs. Arnold, Mr. & Mrs. Rothenstein; Dr. P. C. Ray, Mr. Sarbadhikary প্রভৃতি অনেকে, তাছাড়া কয়েকজন অচেনা সাহেব মেম সব উপস্থিত। শুধু তাই নয়, ঘরে ঢুকে দেখি রবিবাবু বসে রয়েছেন। ···যা হোক, চোখ কান বুজে পড়ে দিলাম। লেখাটার জন্য খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে। ···তাছাড়া রবিবাবুর কয়েকটা কবিতা (সুদূর, পরশপাথর, সন্ধ্যা, কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ ইত্যাদি) অনুবাদ করেছিলাম। সেগুলো সকলের খুব ভালো লেগেছিল। ···Mr. Cheshire আর Mrs. Crammer Byng (Nortbrook-এর Secretary আর Wisdom of the East Series-এর Editor) খুব খুশি হয়েছেন। Mr. Byng আমাকে ধরেছেন আরও অনুবাদ করে দিতে, তিনি publish করবেন। বলছেন ছুটিতে তাঁর সঙ্গে তাঁর Country House-এ যেতে আর সেখানে বসে লিখতে। ···তারপর Pearson-এর ছাতে গেলাম, সেখান থেকে Hampstead Heath-এর চমৎকার view পাওয়া যায়। Pearson লোকটা একটু ভাবুক গোছের। ···রবিবাবু আমাকে দেখেই বললেন, এখানে এসে তোমার চেহারা improve করেছে।”

রবীন্দ্রনাথ এরই কয়েকদিন পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখছেন, “এখানে আমি সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্যিকদের চক্রের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। আমার কবিতা ও গল্পের ইংরেজি তর্জমা প্রকাশ করিবার জন্য ইঁহারা অকৃত্রিম উৎসাহের সহিত অনুরোধ করিতেছেন। আমার ভালো গল্পগুলির মাঝারি রকমের তর্জমা খাড়া করিয়া দিলে ইঁহারা যত্নপূর্বক মাজিয়া ঘষিয়া লইবার ভার লইতে প্রস্তুত আছেন—এবং ভালো Publishers পাওয়া যাইবে এমন আশা পাওয়া গেছে।”

পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির যাত্রারম্ভে সুকুমারের ভূমিকা এখানেই শেষ নয়। আরেকটি চিঠিতে সুকুমার লিখছেন, “গত সোমবার এখানের একটা ক্লাবে, East West Society-তে ‘The Spirit of Rabindranath’ বলে একটা paper পড়লাম। লোক মন্দ হয়নি। Quest কাগজের editor Mr. Mead (যিনি এখানে রবিবাবুর lecture সব arrange করেছিলেন)—তাঁর প্রবন্ধটা খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি সেটা Quest-এ ছাপাচ্ছেন। ···বিলেতে

রবিবাবুর খুবই নাম হয়েছে। এখানকার বড়ো বড়ো poet-রা রবিবাবুর নাম করতে পাগল। এবার যিনি Poet Laureate হলেন, D. Bridges তিনি তাঁর ছেলেকে রবিবাবুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন।" সুকুমার রায়ের The Spirit of Rabindranath Tagore পাশ্চাত্য শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রথম প্রকাশ্য ভাষণ, এর আগে যদিও আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর Art and Swadeshi গ্রন্থে (১৯১১) Poems of Rabindranath Tagore নামে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছিল। কুমারস্বামীর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার তর্জমা ছিল, তার কয়েকটি রবীন্দ্রনাথ-কৃত, কয়েকটি অজিতকুমার চক্রবর্তীর। কুমারস্বামী-কৃত দুটি কবিতার তর্জমা এই সময়ে মডার্ন রিভিয়ুতে বেরিয়েছিল। পিয়ার্সনের বাড়িতে যে-অনুবাদগুলি পড়েছিলেন তার মধ্যে 'সুদূর'-এর অনুবাদটি তাঁর The Spirit of Rabindranath Tagore প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই কবিতাটির তর্জমা করেছিলেন। সুকুমার রায়ের প্রবন্ধে প্রভাতসংগীত এবং সন্ধ্যাসংগীত-এর দুটি কবিতার ('পুনর্মিলন' এবং 'হৃদয়ের গীতধ্বনি') অংশবিশেষের অনুবাদের সঙ্গে ছিল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' (প্রভাতসংগীত) কবিতার একটি অংশ। কিন্তু পিয়ার্সনের বাড়িতে অন্যান্য যে তর্জমা তিনি পড়েছিলেন সেগুলি আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়নি, যদিও তাঁর অনুবাদ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন Wisdom of the East Series-এর সম্পাদক এবং রটেনস্টাইন। একটি চিঠিতে সুকুমার লিখছেন, "মঙ্গলবার রবিবাবুর ওখানে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন ছিল। Rothenstein-ও সেখানে এসেছিলেন— দুজনেই বললেন, আমি রবিবাবুর কয়েকটা poetry-র যা translation করেছি তা তাঁদের খুব ভালো লেগেছে—সেইগুলো এবং আরও কয়েকটা translate করে publish করবার জন্য বিশেষ করে বললেন। ...এখন অবসর আছে—কাজেই অনেকগুলো poetry translation করেছি। যদি সুবিধা হয় publish করব। দু-তিন জন publisher এখনি নিতে রাজি।" কিন্তু এ তর্জমাগুলিরও হদিশ আমাদের জানা নেই। আমরা রবীন্দ্র-অনুবাদক সুকুমার রায়কে যথাযথভাবে পেলাম না।

সুকুমার রায়ের প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সার্থক বিচারের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে তাঁর কাব্যের উন্নত আদর্শ শুধু যে an effective analysis of present-day problems in India, তাই নয়, তাঁর কাব্যের যাথার্থ্য হল an exposition of the root-problems of life itself। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যসাধনা হল consciously or unconsciously, a crusade against the ever-recurring bondage and tyranny of forms and conventions and sophisticated creeds that hamper the growth of the spirit and deny the self its proper fulfilment in the unfettered attainment of truth।

তখনও আমরা রবীন্দ্রনাথের Religion of Man বা মানুষের ধর্ম শুনিনি। সে অনেক পরের কথা। কিন্তু সুকুমার তখনই সাহস করে বললেন, Rabindranath is not the slave of any particular school of thought, ...he is not the exponent of any particular system of 'ism'...he is, first and foremost, an exponent of the mystery of life and only incidentally a Vaishnavist or Vedantist, an idealist or realist. It fact, the unfettered evolution of his poetry was possible only

through a constant shaking off of the limiting influences of mere tradition and sophisticated life।

সুকুমার রায়ের প্রবন্ধে লক্ষ করা যায় যে তিনি ইতিহাসসিদ্ধ পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের মৌল-ধারাটি অনুসন্ধান করেছেন। তিনি বেদান্ত এবং বৈষ্ণবভাবনার পটভূমিকায় যেমন রবীন্দ্রনাথকে খুঁজেছেন, তেমনি বাংলা সাহিত্যে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বিবর্তনটিকেও তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রভাবনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রভাতসংগীত থেকে গীতাঞ্জলি পর্যন্ত বিবর্তনটিকে তিনি natural inborn process of emancipation, the outflowing of life pursuing the shadow of its own perfection বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সুকুমার রায়ের এই প্রবন্ধে কোনো কোনো স্থলে এক বছর পূর্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত অজিতকুমার চক্রবর্তীর প্রবন্ধের প্রতিধ্বনি থাকতে পারে। কিন্তু ইংরেজিতে রচিত হওয়ার ফলে এ প্রবন্ধ পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথ সেবারে দেশে ফেরার জন্য জাহাজে উঠলেন ১৯১৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। জাহাজে সহযাত্রী ছিলেন সুকুমার রায়। এর কিছুকাল পরেই রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তি। নোবেল পুরস্কারের খবর আসার পর ২৩ নভেম্বর যে স্পেশাল ট্রেনে কলকাতার অনেকে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন কবিকে অভিনন্দন জানাতে সে দলে সুকুমার ছিলেন না। যদিও তার কুড়ি দিনের মধ্যে সুকুমারের বিবাহসভায় যোগ দেবার জন্য কবি বিশেষভাবে কলকাতায় এসেছিলেন।

বিলেত থেকে ফেরবার আগেই মনে হয় সুকুমারের নতুন কর্মক্ষেত্রের আয়োজন করে রেখেছিলেন তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর। ১৯১৩ সালের মে মাসে সন্দেশ পত্রিকার জন্ম হয়। এই সন্দেশকে কেন্দ্র করেই সুকুমারের সাহিত্যপ্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ। সন্দেশ প্রকাশের দুবছরের মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর সুকুমারকে সন্দেশের সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে হয়। তার ফলে সুকুমার ক্রমশই স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এদিকে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ফলে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে পক্ষে এবং বিপক্ষে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার বিপক্ষের দলটি স্বভাবতই স্তিমিত হয়ে পড়ল। রবীন্দ্র-বিরোধিতার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। যদিও তাঁর জীবনের শেষ পর্বে উভয়ের মধ্যে পুরনো সম্পর্ক ফিরে আসার একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে তার পরিণতি অফলবতী রয়ে গেল। তার পরেই এল নোবেল পুরস্কার। যার ফলে এক ভিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রবল আকারে দেখা দিল। রবীন্দ্র-বিরোধিতার কাল থেকেই এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক তরুণ ভক্তগোষ্ঠী রবীন্দ্র-বন্দনায় সামিল হয়েছিলেন। এবারে এঁদের তরুণগোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে সুকুমার এঁদের ঘনিষ্ঠ হলেও তিনি রবীন্দ্র-ভক্তি-প্লাবনে গা ভাসালেন না। বরং ১৯১৪ সালে প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁর নাটক নিয়ে অনেকের মনে সংশয় দেখা দিল। নাটকটির রচনা যদিও মনে হয় সুকুমারের বিলেত যাত্রার পূর্বে। নাটকটির নাম 'ভাবুক-সভা'। এক ভাবুকদাদাকে কেন্দ্র করে নাটক। তাঁর এক অনুচর, লম্বকেশ যার নাম, সে বলে,

> তাইত বটে। আমি বলি এত কি হয় সহ্য?
> সকাল বিকাল এমন ধারা ভাবে আতিশয্য!

এই ভাবের আতিশয্যকে আক্রমণ করেই এই নাটক। এ নাটকের ভাবুকদাদা যে রবীন্দ্রনাথ হতেই পারেন না, তা ভাবুকদাদার সংলাপেই প্রমাণ—

জুতিয়ে সব সিধে করব, বলে রাখছি পষ্ট—
চ্যাঁচামেচি করে ব্যাটা ঘুমটি করলি নষ্ট।

অথবা

অর্থ! অর্থ অনর্থের গোড়া।
ভাবুকের ভাত-মারা সুখ-মোক্ষ-চোরা।
যত সব তালকানা অঘামারা আনাড়ে
'অর্থ অর্থ' করি খুঁজে মরে ভাগাড়ে।
(আরে)
অর্থের শেষ কোথা, কোথা তার জন্ম
অভিধান ঘাঁটা সে কি ভাবুকের কম্ম?
অভিধান ব্যাকরণ আর ঐ পঞ্জিকা
ষোলআনা বুজরুকি আগাগোড়া গঞ্জিকা।

তবে নাটকের শেষে যে 'ভাবের নামতা' আছে তা কবির অন্ধ ভাববাদী ভক্তদের কথা মনে রেখে রচিত হতেও পারে—

ভাবের পিঠে রস তার উপরে শূন্যি
ভাবের নামতা পড় মাণিক বাড়বে কত পুণ্যি
ভাব এক্‌কে ভাব, ভাব দু গুণে ধোঁয়া
তিনভাবে ডিসপেপসিয়া-ঢেকুর উঠবে চোঁয়া
চারভাবে চতুর্ভুজ ভাবের গাছে চড়
পাঁচভাবে পঞ্চত্ব পাও গাছের থেকে পড়।

বিজ্ঞানের সার্থক ছাত্র সুকুমার ভাবরোগে ভুগবেন এটা আশা করা বৃথা। যাঁরা সুকুমারকে চিনতেন তাঁরাও ও নিয়ে সুকুমারকে ভুল বোঝেননি। নইলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে 'ভাবুকদাদা' ছাপতেন না। রবীন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন জাগলেও বিরূপতা জেগেছে এমন প্রমাণ নেই।

আরেকটি কৌতুকনাট্যের ক্ষেত্রেও সুকুমারের লক্ষ্য নিয়ে হয়তো বা সংশয় দেখা দিতে পারে। এটি হল চলচ্চিত্তচঞ্চরি—খুব সম্ভব ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে রচিত, যদিও প্রকাশিত হয় সুকুমারের মৃত্যুর অনেক পরে। ব্রাহ্ম পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠলেও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত অব্রাহ্ম বন্ধুর অভাব ছিল না, এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোনো কোনো ব্যাপারে আতিশয্য তাঁর দৃষ্টি কখনো এড়ায়নি। সুকুমার তখনো সমাজ-সংস্কারের ভূমিকা গ্রহণ করেননি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মানডে ক্লাবের (বা মণ্ডা ক্লাব) জন্যই 'চলচ্চিত্তচঞ্চরি' রচিত। মানডে ক্লাব উঠে যাবার পরেই তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে অগ্রণী ভূমিকা নেবার আগেও তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ নিয়ে

চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ সংবলিত আলোচনা বাদ-প্রতিবাদ সুকুমারের চোখে পড়ে থাকবে। 'চলচ্চিত্তচঞ্চরি'র খণ্ড-সিদ্ধান্ত, অখণ্ড-সিদ্ধান্ত, খণ্ডাখণ্ড-সিদ্ধান্তে এর ছায়া আছে মনে হয়। একদিকে সমীক্ষা চক্রের আবেগমন্থন অপরদিকে শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমের পাঠ্যক্রমে আয়স্কন্ধ পদ্ধতির সঙ্গে একস্ট্রা সাইক্লিক ইকুইলিব্রিয়ম অ্যান্ড দি নেগেটিভ জিরো সাধন আশ্রমের mysticism এবং প্রাচ্য বেদান্ত আর পাশ্চাত্য হেগেলীয় তত্ত্ববিদ্যার সমন্বয়ের প্রতি কটাক্ষ। সুকুমার তৎকালীন ব্রহ্মসমাজের অস্পষ্ট ভাবাবেগ আর তাত্ত্বিক বাদ-প্রতিবাদে একদিকে যেমন কৌতুক অনুভব করেছেন—যার প্রকাশ পেয়েছে চলচ্চিত্তচঞ্চরিতে অপরদিকে তিনি এর সমাধান খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব স্বীকারে। রবীন্দ্রনাথকে ব্রহ্মসমাজের সম্মানিত সদস্যরূপে বরণ করার প্রস্তাবের পিছনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আনুগত্যের চেয়েও ছিল একটি সুস্থ যুক্তিসম্মত ইতিবাচক নেতৃত্বে ব্রাহ্ম আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন। ১৯১৭ সালে প্রবাসীতে প্রকাশিত সুকুমারের একটি প্রবন্ধে (জীবনের হিসাব) তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন—"কেবল কতগুলি মূঢ় সংস্কারের প্রতিবাদের জন্য নয়, কেবল কতগুলি সাময়িক কুব্যবস্থার মোচনের জন্য নয়, জীবনের এই পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগৎকে উজ্জ্বল করিয়া দেখিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের ডাক ··· সর্বোপরি চাই অন্ধ-সংস্কারমুক্ত উদারচিত্ত প্রশান্তপ্রাণ ব্যক্তিমানবকে ··· যে সত্যের জন্য এমন সংস্কার নাই এমন বন্ধন নাই যাহা ছাড়িতে পারে না। চাই বিশ্বমানবের সেই সব প্রতিনিধিকে যাহারা এই জীবনকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানিবে না।" এই 'প্রতিনিধি' যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ হতে পারেন না, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি।

মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মসমাজের বালক-বালিকাদের জন্য ১৯২২ সালে 'অতীতের ছবি' নামে যে বিনামূল্যে পুস্তিকা প্রচার করা হয় সেটিই সুকুমার রায়-রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুকুমারের জীবনাবসান হয়। 'অতীতের ছবি' রচনাকালে তিনি অসুস্থ। এই অসুস্থ অবস্থাতে তিনি যে 'আবোলতাবোল' প্রকাশের আয়োজন করেছিলেন সেখানে কোনো বিষাদের ছায়াপাত ঘটেনি। কিন্তু 'অতীতের ছবি'তে যেখানে তিনি বলছেন,

ছিল এ ভারতে এমন দিন
মানুষের মন ছিল স্বাধীন···
কালচক্রে হায় এমন দেশে
ঘোর দুঃখদিন আসিল শেষে···
ভেদবুদ্ধিময় মানব মন
নব নব ভেদ করে সৃজন।
জাতিরে ভাঙিয়া শতধা করে
তাহার উপরে সমাজ গড়ে,
নানা বর্ণ নানা শ্রেণীবিচার
নানা কূটবিধি হল প্রচার।
ভেদবুদ্ধি কত জীবন মাঝে
অশনে বসনে সকল কাজে

ধর্ম অধিকারে বিচার ভেদ
মানুষে মানুষে করে প্রভেদ।
ভেদ জনে জনে নারী ও নরে
জাতিতে জাতিতে বিচার করে।
মিথ্যা অহংকারে মোহের বশে
জাতির একতা-বাঁধন খসে,
হয়ে আত্মঘাতী ভারতভবে
আপন কল্যাণ ভুলিল সবে।

তখন মনে হয় কবিকে এক চরম নৈরাশ্য ঘিরে ধরেছে তাই চির আশাবাদের হাস্যকৌতুকময় পুরুষ বলে ওঠেন, 'মানুষ না দেখি ভারতভূমে/সবাই মগন গভীর ঘুমে'। যদিও তারপর তিনি রামমোহনের আবির্ভাব থেকে শুরু করে ব্রাহ্ম আন্দোলনের দীপ্ত ইতিহাসের ধারাবাহিক বর্ণনা করে আশা ব্যক্ত করেন—

স্বাধীন মনের এই সমাজ
মুক্ত ধর্মলাভ ইহার কাজ।
হেথায় সকল বিরোধ ঘুচি
রবে নানা মত নানান রুচি
কাহারো রচিত বিধি বিধান
রুধিবে না হেথা কাহারো প্রাণ।

তবু শেষ কয় ছত্রে সেই মৃত্যুপথযাত্রী তরুণ কবি শুধান 'সবার বদন চাহি, কোথাও আশার আলো কি নাহি?' মনে হয় ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবন-আদর্শ অনুযায়ী একটা কিছু গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর আত্মপ্রত্যয় তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে লেখা একটি একান্ত গোপনীয় চিঠিতে এরই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। এই বিষাদের মূল কারণ কলহবিদীর্ণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব স্বীকার করতে না পারার যন্ত্রণা।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুকুমারের অবিচল শ্রদ্ধা ছিল বলেই মণ্ডা ক্লাবের নিমন্ত্রণ পত্রে যখন 'মেঘ বলেছে যাব যাব'র প্যারডি 'কেউ বলেছে খাবো খাবো' বা শান্তিনিকেতন আশ্রমে খেতে খেতে গান রচনা 'এই তো ভালো লেগেছিল আলুর নাচন হাতায় হাতায়'—এসব গানকে কেউ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো বিদ্বেষপ্রসূত প্যারডি বলে মনে করেননি। এমন কী সবুজপত্রের প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী ভাষাকে ব্যঙ্গ করে মানডে ক্লাবে যে 'ক্যাবলের পত্র' পড়েছিলেন তা নিয়েও কোনো বিরূপতা সৃষ্টি হয়নি। সুকুমার বিচিত্রার বৈঠকে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনায় বৈকুণ্ঠের খাতাতে কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। একথা মনে করা যেতে পারে যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সুকুমারকে কেদারের ভূমিকায় যোগ্য অভিনেতা বলে বেছে নিয়েছিলেন। মনে রাখা ভালো যে সুকুমার উপেন্দ্রকিশোরের নাটক ভিন্ন অপরের লেখা নাটকে আর কখনও অভিনয় করেননি—একমাত্র এই বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনায় বৈকুণ্ঠের খাতায় কেদারের ভূমিকায় অভিনয় ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ এই তরুণ

বন্ধুটিকে কী শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা অসংগত হবে না। ১৯৩৫ সালে সুকুমারের মৃত্যুর বারো বছর পরে শান্তিনিকেতনের হৈ হৈ সংঘের জন্য রবীন্দ্রনাথ সুকুমার রায়ের 'গানের গুঁতা' কবিতায় সুর দেন। অন্যের রচনায় সুর দেবার ঘটনা রবীন্দ্রনাথের জীবনে খুব বেশি ঘটেনি—বেদমন্ত্র এবং দুয়েকটি বৈষ্ণব পদ ছাড়া।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় সুকুমার রায়ের অনুল্লেখ অনেকেরই কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। 'খাপছাড়া' (১৯৩৬)-র সূচনায় যে ছয় ছত্রের কবিতাটি আছে তার পিছনে কি সুকুমার রায়ের স্মৃতি জাগ্রত ছিল না? 'যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো'—একথা আবোলতাবোলের পাশে খাপছাড়া রাখলে অনেকটা স্পষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ রাজশেখর বসুকে খাপছাড়া উৎসর্গ করেছিলেন। রাজশেখরও ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র কিন্তু রসের ব্যাপারী। রাজশেখর বসুর মধ্যেই কি রবীন্দ্রনাথ সুকুমার রায়ের স্মৃতির ছায়া অনুভব করেছিলেন? আবোলতাবোলের ভূমিকার সঙ্গে খাপছাড়ার ভূমিকার সাদৃশ্য পাওয়া যাবে সুকুমারের 'আয়রে তবে ভুলের ভবে অসম্ভবের ছন্দেতে'র সঙ্গে জাদুকরের 'ঠিকানা নেই আগুপিছুর কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর ক্ষণকালের ভোজবাজি'র।

১৯৪০ সালে এম. সি. সরকার যখন সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু' প্রকাশ করেন তখন সুপ্রভা রায়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ যে ভূমিকা লিখে দেন সেখানে স্পষ্টতই স্বীকার করেন 'বঙ্গসাহিত্যে… সুকুমারের হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না।' সুকুমার তাঁর নিজের রচনাকে চিত্রসহযোগে সমৃদ্ধ করেছেন বোধহয় এডওয়ার্ড লিয়রের অনুপ্রেরণায়। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে সুকুমারের কোনো প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা ছিল না। ছিল না রবীন্দ্রনাথেরও। তিনিও 'খাপছাড়া' কবিতাকে খানিকটা চিত্রসহযোগে অলংকৃত করছেন, তার পিছনে কি সুকুমার রায়ের চিত্রালংকরণের প্রভাব ছিল? রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা সুকুমার রায় চিত্রিত করেছিলেন তারও দৃষ্টান্ত আছে।

রবীন্দ্রনাথের খাপছাড়া, ছড়ার ছবি, সে বা গল্পসল্প-এর সঙ্গে সুকুমার রায়ের রচনার তুলনা করা নিরর্থক। তবে সাদৃশ্য যে একেবারে নেই তা মনে করার হেতু নেই। এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথই অধমর্ণ সন্দেহ নেই। 'রেডিয়ো'র প্রতিশব্দ 'আকাশবাণী' রবীন্দ্রনাথ কৃত। কিন্তু 'আকাশবাণী' সুকুমার রায় ব্যবহার করেছেন অনেক আগে (দ্রষ্টব্য, আকাশবাণীর কল, সন্দেশ ১৩২৯)।

বয়ঃকনিষ্ঠ এই যুবক বন্ধুটি রবীন্দ্রনাথের ভক্তবৃন্দের মধ্যে কখনই ছিলেন না। তাই যেন তাঁর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরের ভাষণে গতানুগতিক দুঃখপ্রকাশ করে মৃত্যুর অমোঘ বিধানকে সম্মান দেখাননি, বরং মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে যে মানুষ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা অবিচল রেখে যেতে পেরেছে তাঁকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানালেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়—

> মহাত্মা কাকে বলি যিনি সেই ফাঁককে আত্মীয় সম্বন্ধের দ্বারা পূর্ণ করে জানেন, জ্যোতির্বিৎ যেমন করে জানেন যে পৃথিবী ও চন্দ্রে মাঝখানকার শূন্য পরস্পরের আত্মীয়তার আকর্ষণসূত্র বহন করচে। … কেন না পূর্ণ স্বরূপের বিশ্বে আমরা ফাঁক মানতে পারব না। এই কথাটি আজ এত জোরের সঙ্গে আমার মনে বেজে উঠেচে

> তার কারণ, সেদিন সেই যুবকের মৃত্যুশয্যায় দেখলুম সুদীর্ঘকাল দুঃখভোগের পরে জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মতো অত বড়ো বিচ্ছেদকে প্রাণ যাকে পরম শত্রু জানে, তাকেও তিনি পরিপূর্ণ করে দেখতে পেয়েছেন।

এই যুবক বন্ধুটি, যিনি তাঁরই উপন্যাসের চরিত্র থেকে নাম পেয়েছিলেন, তাঁর অকাল প্রয়াণের কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ যেদিন তাঁকে দেখতে গিয়ে তাঁর অনুরোধে গান শুনিয়ে এসেছিলেন সেদিন কেদারেশ্বরের কুটিরে গোবিন্দমাণিক্যের মুমূর্ষু হাসিকে দেখতে যাওয়ার কথা মনে পড়েছিল কিনা জানি না। সেখানে রাজার কোলে হাসির মৃত্যু হয়েছিল, বাস্তবে 'তাতা' রবীন্দ্রনাথের গান কানে নিয়ে চিরবিদায় নিয়েছিল। সেই শেষ সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ সুকুমারের প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়েছেন—এ শ্রদ্ধা তিনি সুকুমারের প্রতি, যাঁকে তিনি বোধহয় কখনও 'তাতা' বলে সম্বোধন করেননি, চিরকাল সম্ভ্রমের সঙ্গে পোষণ করে গেছেন।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

লীলা মজুমদার, সুকুমার রায়

প্রস্তুতি পর্ব : বিশেষ সংখ্যা, সুকুমার রায়

চিঠিপত্র ১২, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিলীপকুমার বিশ্বাস, 'সুকুমার রায় ও ব্রাহ্মসমাজ'

পার্থ বসু, 'রবীন্দ্রনাথের তরুণ বন্ধু'

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব

পবিত্র সরকার

১

যিনি একটা বিশেষ এলাকায় অসামান্য খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তিনি যখন অন্যান্য এলাকায় নিজেকে বিস্তার করেন তখন আমরা একটু অস্বস্তিতে পড়ি। ভাবি, যেখানে মানুষটির নিঃসংশয় অধিকার, সেখানে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেই তো ভাল করতেন, খামোখা অন্যের এলাকায় হাত দিতে যাওয়া কেন? অর্থাৎ এক জায়গায় কারও অসপত্ন অধিকার অন্য জায়গায় তাঁকে অনধিকারী করে তোলে—এই হল স্পেশালাইজেশন বা বিশেষজ্ঞতা-ব্যাধিতে আক্রান্ত আধুনিক সময়ের সংকীর্ণ ধারণা। এ ধারণা সাধারণ মানুষকেই অন্যায়ভাবে কেটেছেঁটে ছোটো করে দেখে—রবীন্দ্রনাথের মাপের বড়ো মানুষদের তো কথাই নেই। যে-রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত তিনি যখন ছবি আঁকা ধরেন তখন যাঁদের 'বিশেষজ্ঞতা' ছাড়া আর কোনো অহংকার নেই তাঁরা ভুরু কুঁচকে ভাবেন, ও বড়োমানুষি শৌখিনতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যখন উইলিয়াম আর্চারের মতো গুণী শিল্প-সমালোচক বলে ওঠেন 'The first modern art to be produced in India was the work of the poet, Rabindranath Tagore.'[১]—তখন আমাদের বিশেষজ্ঞতার আত্মবিশ্বাস একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন আমরা কুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, কবিত্বের থেকে খ্যাতি ধার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পীর খ্যাতি উপার্জন করেন না—তাঁর কাছে অধিকার-অনধিকারের বাঁধা হিসেব আর চলবে না। ভাষাতাত্ত্বিক বা ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে যখন রবীন্দ্রনাথের বিচার করি আমরা, তখনও এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হয়। এখন যে জিনিসটি সকলেই স্বীকার করি তা এই যে, কবিরা ভাষাব্যবসায়ী, কাজেই শব্দবিদ্যার অন্ধিসন্ধি তাঁদের জানা। কিন্তু শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগের ক্ষমতা এক কথা, আর ভাষার রহস্য জানা আর এক কথা। শব্দজ্ঞান আর ভাষাতত্ত্ববোধ দুটি পৃথক ধারণা, ফলে যে-ব্যক্তি চমৎকার কথা বলে, অর্থাৎ গুছিয়ে ঠিক জায়গায় লাগসই কথাটি বলে দিতে পারে—কবিরা একটু ভালভাবে ঠিক এই কাজটিই করেন—সে-ব্যক্তি যে অপিনিহিতি, স্বরভক্তি, কারক-বিভক্তি বা বাক্যরূপান্তর ইত্যাদির নিয়ম জেনে বসে আছে—এমন ঘটনা অবশ্যম্ভাবী নয়। অর্থাৎ ভাষাব্যবহারের দক্ষতাও শিক্ষাসাপেক্ষ—কিন্তু এ-শিক্ষা অনেকটা অভ্যাস ও প্রয়োগসৌকর্যনির্ভর—ভুল করতে করতে তা শুধরে নিয়ে শেখা। আর ভাষার ভিতরকার নিয়মকানুন সম্বন্ধে শিক্ষা হল সচেতন শিক্ষা—কী কী নিয়ম ভাষার মধ্যে খাটছে সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা। ইংরেজিতে প্রথমটাকে acquisition আর দ্বিতীয়টিকে learning বলে আলাদা করে দেখানো যায়।

সুতরাং কবির আর ভাষাতাত্ত্বিক বা বৈয়াকরণের শিক্ষাদীক্ষা ও পেশা আলাদা, এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো কবি যখন 'ভাষার আশ্চর্য রহস্য' নিয়ে চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করেন তখন এ জায়গায় প্রথম প্রথম তাঁকে অ্যামেচার

ভাবতে ইচ্ছে হয়। দু-একবার সংশয় জাগে যখন দেখি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো মহাপণ্ডিত তাঁর ভুবিখ্যাত *The Origin and Development of the Bengali Language* অর্থাৎ *ODBL* গ্রন্থের ভূমিকায় উচ্ছ্বসিতভাবে বলে ওঠেন,...the first Bengali with a scientific insight to attack the problems of language was the poet Rabindranath Tagore; (এই অংশটুকুর সঙ্গে পরবর্তীকালে উইলিয়াম আর্চারের উচ্চারণগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়—প. স) and it is flattering for the votaries of Philology to find in one who is the greatest writer in the language, and a great poet and seer for all time, a keen philologist as well, distinguished alike by assiduous inquiry into the facts of the language, and by a scholarly appreciation of the findings and methods of the modern Western philologist''.[২]

সুনীতিকুমার খুব নির্দ্বিধায় বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব'-এর প্রবন্ধগুলিই বাঙালি ভাষাবিজ্ঞানীকে তাঁর ভাষার নানাবিধ প্রশ্ন সম্বন্ধে 'the proper lines of approaching them' নির্দেশ করে। অন্যত্রও সুনীতিকুমারকে বলতে দেখি, 'বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্বের বা বাঙ্‌লাভাষার ইতিহাসের আলোচকদের মধ্যে একজন পাইওনিয়র বা অগ্রণী পথিকৃৎ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।' অবশ্য কথাটায় কেবল ঐতিহাসিক অবস্থানই বোঝায়, তার চেয়ে *ODBL*-এ সুনীতিকুমারের নির্ধারণ অনেক স্পষ্ট। শতবর্ষের চৌকাঠ-পেরোনো মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র কণ্ঠস্বরও এ বিষয়ে শুনতে পাই আমরা ; তাঁর স্বীকৃতি—"রবীন্দ্রনাথের গবেষণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা বাংলা ভাষার স্বরসাম্যের নিয়ম (Law of Harmonic Sequence or Vocalic Harmony) আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি।"[৪] 'গবেষণা' করছেন কবি? তার দ্বারা 'পরিচালিত' হচ্ছেন পণ্ডিতরা—তার ফলে ভাষার অনুদ্‌ঘাটিত রহস্য আবিষ্কৃত হচ্ছে? সাধারণ মানুষের কাছে এসব কথা একটু অদ্ভুত ঠেকে নিশ্চয়ই।

২

যখন নতুন প্রকাশিত 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'[৫] পড়ি, ভাষাবিজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হিসেবে, তখন এসব কথা অত্যুক্তি মনে হয় না আদৌ। বরং একটু বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে, হয়তো সুনীতিকুমার বা শহীদুল্লাহ্-ও পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞানের বড় জায়গাটায় রবীন্দ্রনাথের যথার্থ স্থান ঠিক নির্ণয় করতে আগ্রহী হননি। বাংলা ভাষার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তাঁর মতামত যে নিছক অ্যামেচারের কৌতূহলোদ্দীপক অনুমানমাত্র নয়—এ অবশ্য তাঁদের তীক্ষ্ণ নজরে ধরা পড়েছে। এবং এ-ও তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ একজন প্রথম দরের গবেষক ছিলেন, ভাষার ক্রিয়াকলাপ ও নিয়মশৃঙ্খল সম্বন্ধে তাঁর অন্তরবলোকন ছিল অসামান্য, সেই সঙ্গে তথ্য-সংগ্রহের সাধারণ মুটে-মজুরের কাজও তিনি করেছেন ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়, কিংবা ক্রিয়াপদের বিপুল তালিকা নির্মাণ করে। অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানের উঁচুদরের গবেষণায় যা-যা দরকার—সংগ্রহ ও সংকলন, বিন্যাস এবং বিশ্লেষণ—এই তিনটি ক্ষেত্রেই তাঁর বিচরণ ঘটেছে।

আগে রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক নানাবিধ রচনার মানচিত্রটি একটু লক্ষ করা যাক। ভাষাবিষয়ক রবীন্দ্রনাথের যে-সমস্ত রচনা, তা মূলত তাঁর চারটি মুদ্রিত বইয়ে বিন্যস্ত।

'বাংলা শব্দতত্ত্ব' (শেষ স্বতন্ত্র সংস্করণ বৈশাখ ১৩৯১), 'শিক্ষা' (১৯০৮, পরে পরিবর্ধিত), 'বাংলাভাষা পরিচয়' (১৯৩৮) এবং 'ছন্দ' (১৯৩৬, শেষ স্বতন্ত্র সংস্করণ ১৯৭৬)। 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' বইটি প্রথমে 'শব্দতত্ত্ব' নামে ১৯০৯ সালে বেরিয়েছিল, পরে ১৩৪২-এ 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামে এর একটি নতুন সংস্করণ হয়। সেটি ছিল ছোটো আকারের, তবে সাম্প্রতিকতম এই নামের বইটি রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক প্রবন্ধ, আলোচনা, পত্রাংশ ইত্যাদি জুড়ে, প্রসঙ্গ-বিস্তার ঘটিয়ে বেশ বড়ো আকারে পাঠকের হাতে পৌঁছেছে। সংগঠনের দিক থেকে 'বাংলাভাষা পরিচয়' আর বাকি বইগুলি থেকে আলাদা। বাকিগুলি বিভিন্ন সময়ের লেখা প্রবন্ধের সংকলন, যেমন 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'-এর প্রথম প্রবন্ধগুলি ১২৯২ সালের তারিখ চিহ্নিত, আর শেষ রচনাগুলি ১৯৩৬ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। কিন্তু 'বাংলাভাষা পরিচয়' আনুপূর্বিক একটি বই; তা গ্রন্থহিসেবেই পরিকল্পিত এবং রচিত। অর্থাৎ তার উপক্রম, আরম্ভ, বিষয়ের ক্রমান্বয়ী বিন্যাস এবং উপসংহার আছে। মনে রাখতে হবে এ বইটি প্রকাশের মাত্র পাঁচ বছর আগে মার্কিনদেশে বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী লেওনার্ড ব্লুমফিল্ড (১৮৮৭-১৯৪৯)-এর সর্বাঙ্গীণ *'Language'* বইটি বেরিয়েছে এবং লন্ডনে সেটি প্রকাশিত হয়েছে পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে। সুনীতিকুমারের মহাগ্রন্থ *ODBL* অবশ্য ১৯২৬-এই প্রকাশ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়[৬]—কিন্তু সেটি মূলত ইতিহাসের দিক থেকে বাংলাভাষার আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের বই মূলত বাংলাভাষার স্বভাব ও স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কারের চেষ্টা এবং এই চেষ্টা তাঁর মতো করে আজ পর্যন্ত কেউ করেননি, সত্যের খাতিরে একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। একদিকে ভাষার সর্বাঙ্গীণ রূপ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীসুলভ সচেতনতা, অন্যদিকে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট প্রকৃতিটি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বোধ—রবীন্দ্রনাথের এ বইটিকে সমস্ত পণ্ডিতি আলোচনা থেকে এক অভিনব স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

এই চারটি বইয়ের মধ্যে ভাষার বা বাংলা ভাষার বিবর্তন, প্রকৃতি, স্বভাব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা মূলত দুটি বইয়ে—'বাংলা শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলাভাষা পরিচয়'। আর ভাষার সঙ্গে জড়িত, কিন্তু অন্য পার্শ্বিক প্রসঙ্গের উপর নির্ভরশীল, বিষয়ের আলোচনা 'ছন্দ' ও 'শিক্ষা'-য়। 'ছন্দ' গ্রন্থে আমাদের মুখের ভাষা নয়, কিন্তু অন্য একটি ডায়ালেক্ট অর্থাৎ কাব্যভাষার সংগঠন-সূত্র নিয়ে তাঁর ভাবনা ; আর 'শিক্ষা'র প্রবন্ধগুলির অধিকাংশে ভাষার সামাজিক ভূমিকা, বিশেষত শিক্ষায় মাতৃভাষা ও বিদেশী ভাষার তুলনামূলক প্রয়োগ-সৌকর্য নিয়ে তাঁর আলোচনা[৭]—ইদানীংকার ভাষায় যাকে applied sociolinguistics বলে, তার ক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছে।[৮]

৩

এবার সমস্ত রচনা ও বইপত্র থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাষাপ্রসঙ্গগুলিকে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্যক্রমে সাজিয়ে নেওয়া যাক :

(ক) **ধ্বনিতত্ত্ব** (phonology) : উচ্চারণ, উচ্চারণের বিবর্তন ও তার কারণ, উচ্চারণ পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন এবং ধ্বনি-প্রতীকতা (sound symbolism), অর্থাৎ বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দাবলি ও তার ব্যবহার।

(খ) **রূপতত্ত্ব** (morphology)—ধাতু, শব্দমূল, বিভক্তি, প্রত্যয়, ক্রিয়ার রূপ, নির্দেশক, বচন, লিঙ্গ ইত্যাদি।

(গ) প্রত্যয়, বিভক্তি বা শব্দবিশেষের অর্থবিবর্তন ও অর্থবিচার (morphosemantics)

(ঘ) **প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞান** (applied linguistics)—ভাষার মানোন্নয়ন বা language standardization সংক্রান্ত আলোচনা—সংগত ও অভিন্ন বানান-নির্ধারণ, পরিভাষা-নির্মাণ, সাহিত্যের গদ্যভাষা নিরূপণ, ইত্যাদি।

(ঙ) **সমাজভাষাবিজ্ঞান** (sociolinguistics)—বিশেষত প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা—কোন ভাষায় শিশুদের প্রথম শিক্ষাদান বাঞ্ছিত, প্রদেশ-বিশেষের সরকারি ভাষা কী হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়।

(চ) **ছন্দ-তত্ত্ব ও বাংলা ছন্দের ভিত্তিসন্ধান** (metrics)

'ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ' বিষয়ের আলোচনা ব্যাপ্ত হয়ে আছে 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলাভাষা পরিচয়' বই দুটিতে। 'ঙ'-বিষয়ের আলোচনা মূলত 'শিক্ষা' গ্রন্থের অন্তর্গত, আর 'চ'-শীর্ষক আলোচনা আছে 'ছন্দ' বইয়ে। আমরা এসব সমস্ত প্রসঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে, সমস্ত আলোচনার সূত্র ধরে ভাষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী ধারণারই একটি পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।

৪

ধ্বনিতত্ত্ব : উচ্চারণ ও ধ্বনি-প্রতীকতা

ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী জানতে পারি, বাংলা ধ্বনির উচ্চারণের রহস্যই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে ভাষার ভিতরকার ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে আগ্রহী করে তোলে। গত শতাব্দীর সাতের দশকে তিনি যখন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সূত্রে লন্ডনে ছিলেন তখন 'একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার সময়'[৯] তাঁর খেয়াল হয়েছিল যে, ইংরেজি বানানের তুলনায় বাংলা বানানকে তিনি যতটা উচ্চারণসংগত বলে মনে করেছিলেন, তা ততটা নয়। বাংলাতেও লেখার সঙ্গে উচ্চারণের প্রচুর তফাত ঘটে যায়। 'বাংলা ভাষায় এইরূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়িল, তখন আমার জানিতে কৌতূহল হইল, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কি না। আমার কাছে তখন খান-দুই বাংলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। যখন আমার খাতায় অনেকগুলি উদাহরণ সঞ্চিত হইল, তখন তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।'[১০]

এখানে যে-সময়টার কথা বলা হচ্ছে সেটা আনুমানিক ১৮৭৮-১৮৮০, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তখন ১৭-১৯ বছরের তরুণ। এই তারিখটা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। কারণ ঠিক এই সময়ে পৃথিবীতে ভাষাতত্ত্বচর্চার যে পটভূমিকা ছিল, তার সঙ্গে তুলনা করেই রবীন্দ্রনাথের অসামান্য মৌলিকত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করতে হবে। উপরিউক্ত কথাগুলির পরেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানাচ্ছেন যে, 'এই-সকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পুরিয়া গিয়াছিল।' দেশে ও কাগজগুলি নিয়েই ফিরেছিলেন, কিন্তু কী করে সে সমস্ত কাগজ নষ্ট ও লুপ্ত হল তার ছদ্ম-করুণ কাহিনীটিও আমাদের শুনিয়েছেন তিনি তার পরে। এ সবের ফলেই বাংলা উচ্চারণ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হল তাঁর মূল গবেষণার প্রায় সাত বছর পরে, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে।

বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর যে-সব প্রবন্ধ, তার মধ্যে পৃথক স্বরধ্বনি, যেমন অ এবং এ-র উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা যেমন আছে, তেমনই একাধিক রূপ বা morph,

রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৪
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত

যেমন টা, টো, টে-র উচ্চারণ-বৈচিত্র্য ও অর্থান্তর সম্বন্ধেও অনুসন্ধান আছে। অ-ধ্বনির রূপান্তর ও রবীন্দ্রনাথের কথায় 'হ্রস্ব-ও'[১১] কোথায় কোথায় ঘটে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' বইয়ের মূলত দুটি প্রবন্ধে—'বাংলা উচ্চারণ' (১২৯২ সাল), 'স্বরবর্ণ অ' (১২৯৯), কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে একই আলোচনায় এসেছেন 'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ' (১৩০৫) প্রবন্ধে। সর্বত্রই অ-এর হ্রস্ব ও হওয়ার কয়েকটি 'সূত্র' (rule) তৈরি করবার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'স্বরবর্ণ এ' (১২৯৯) প্রবন্ধে এ-র যেখানে যেখানে অ্যা উচ্চারণ হয়, তা নির্দেশ করতে গিয়েও একই জিনিস করেছেন তিনি। অ-এর ও হওয়ার ন-টি নিয়মের উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ : (১) পরে যদি ই/ঈ অথবা উ/ঊ থাকে, পূর্ববর্তী অ ও হয়—; (২) পরের ব্যঞ্জনে য-ফলা থাকলেও হয় ; (৩) ক্ষ পরে থাকলেও হয় ; (৪) ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপে অ ও হয় ; (৫) পরে ঋ-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে হয় ; (৬) দ্ব্যক্ষরবিশিষ্ট (অর্থাৎ লেখায় দুটি অক্ষর বা বর্ণ থাকলে) ন/ণ পরে থাকলে অ ও হয়। যেমন বন, মন, ধন, জন ইত্যাদি। ব্যতিক্রম গণ, রণ ; (৭) ক্রিয়ার উ-কার লোপের ফলেও অ ও হয়েছে, যেমন হউন—হোন ; (৮) র-ফলাবিশিষ্ট বর্ণে অ থাকলে তা ও হয়—শ্রবণ, ভ্রম ইত্যাদি। কিন্তু য় পরে থাকলে হয় না। যেমন ক্রয় ; (৯) মন্দ, মন্ত্রণা, নখ, মঙ্গল—এগুলোতেও ম মো হয়। 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধের এই সূত্রগুলি অনেক বেশি স্পষ্ট এবং প্রণালীবদ্ধ, সে তুলনায় পরবর্তী 'স্বরবর্ণ অ' প্রবন্ধটিই বরং সংক্ষিপ্ত। বস্তুতপক্ষে প্রথম প্রবন্ধটি লেখার সাত বছর পরে আবার দ্বিতীয় প্রবন্ধটির লেখার প্রয়োজন ছিল না। 'স্বরবর্ণ এ' প্রবন্ধেও তিনি নিয়ম উল্লেখ করেছেন কয়েকটি, 'নিশ্চিত নিয়ম বাহির করা ··· সহজ নহে', অর্থাৎ অ-এর তুলনায় সহজ নয় বলা সত্ত্বেও। সে নিয়মগুলি হল—(১) পরে ন থাকলে পূর্ব ব্যঞ্জনের এ-কার অ্যা উচ্চারিত হয়। যেমন ফেন, কেন, যেন হেন ; (২) চ-এর আগেও তাই হয়। যেমন ব্যাচা, স্যাঁচা ইত্যাদি।[১২]

যে-ক্রমে রবীন্দ্রনাথ এই নিয়মগুলিকে সাজিয়েছেন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীর মনে সে সম্বন্ধে সংশোধনের ইচ্ছে জাগতে পারে। যেমন ই/ঈ, ক্ষ, জ্ঞ (রবীন্দ্রনাথ জ্ঞ-এর কথা বলেননি), য-ফলা, ঋ-কার ইত্যাদি য্যবতীয় কারণকে একটিই কারণ হিসেবে দেখানো যেতে পারে। সেটি হল, পরে একটি ই-ধ্বনির উপস্থিতি। ক্ষ, জ্ঞ-এর উচ্চারণে ই এসে পড়ত, পূর্ববঙ্গে তার অপিনিহিতি ঘটে—বক্ষ সেখানে 'বোইকখ' যজ্ঞ 'জোইগ্‌গ' ; ঋ-তে ই তো সর্বত্র আছে, ওড়িয়া বা মারাঠি-গুজরাটিতে যেমন আছে উ। আবার ই এবং উ-কে একটি সামগ্রিক নিয়মের অন্তর্গত করা যেতে পারে, বলা যেতে পারে, পরে উর্ধ্বস্বর থাকলে পূর্ববর্তী (অর্থাৎ শব্দের গোড়াকার সিলেব্‌লের) অ ও হয়ে যায়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রায় ছটি নিয়মকে মূলত একটি ব্যাপক ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত নিয়ম হিসেবে দেখানো যেতে পারে। এ ছাড়া অ-এর ও হওয়ার আরেকটি নিয়ম রবীন্দ্রনাথের নজর এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়, সেটি এই : শব্দের গোড়াকার অ অন্য অবস্থানে ও হয়, যেমন 'শ-তিনেক' কথাটিতে শ-এর মধ্যে নিহিত অ, আর 'তিনশো' কথাটিতে শ-এর ও। দল-এ দ-এর মধ্যে অ পাচ্ছি। কিন্তু 'মাদল' কথাটিতে ওই একই ধরনের সিলেব্‌লে দ-এ পাচ্ছি ও ধ্বনি। এর বিস্তৃত পর্যালোচনার স্থান এটা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিয়ম বা সূত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করলে তার কী কী বৈশিষ্ট্য পাই তা দেখা যাক। প্রথমত, কোন ধ্বনি বদলাচ্ছে, তা বদলে কী দাঁড়াচ্ছে—তাই যে তিনি শুধু লক্ষ করছেন তাই নয়, তা কিসের প্রভাবে বদলাচ্ছে তা-ও তিনি আবিষ্কার

করছেন। অর্থাৎ রূপান্তরের বাইরের চেহারা এবং ভিতরকার কারণ দুই-ই তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে। এমন কী কারণের ভিতরকার যে-কারণ, অর্থাৎ উচ্চারণ করতে গিয়ে জিভের 'শর্ট-কাট' নেওয়ার চেষ্টা—তা-ও তাঁর নজর এড়ায়নি। এ-ধ্বনির অ্যা উচ্চারণ প্রসঙ্গে সেটি বলেছেন—"মোটের উপর ইহা বলা যায় যে, এ হইতে একেবারে আ উচ্চারণে যাওয়া রসনার পক্ষে কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য, আ হইতে এ উচ্চারণে গড়াইয়া পড়া সহজ। এইজন্য আমাদের অঞ্চলে আ-কারের পূর্ববর্তী এ-কার প্রায়ই অ্যা নামক সন্ধিস্বরকে আপন আসন ছাড়িয়া দিয়া রসনার শ্রমলাঘব করে।"[৩] রবীন্দ্রনাথ বলতে ভুলে গেছেন যে, অ-এর ও হওয়ার কারণও এই 'রসনার শ্রমলাঘব'। পাঠকদের কাছে জিভের এই শর্টকাট করার বিষয়টি একটি ছকের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করি।

আমাদের মান্য চলিত বাংলায় (Standard Colloquial Bengali) মুখে আমরা মোটে সাতটি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি—অ, আ, অ্যা, এ, ও, ই, উ। বর্ণমালার দীর্ঘ ঈ, ঊ আমাদের উচ্চারণে সাধারণভাবে হ্রস্ব ; ঋ স্বরধ্বনি নয়, বিদ্যাসাগর-বিতাড়িত ৯-ও স্বরধ্বনি নয় ঐ ঔ একখানা নয়, দু-দুখানা করে স্বরের যোগফল বা যৌগিক স্বর (diphthong), তার প্রথমটি পুরো স্বর, দ্বিতীয়টি অর্ধস্বর। কাজেই ওই সাতটি স্বর উচ্চারণ করবার সময় জিভ কখনো উপরে ওঠে, নীচে নামে, মাঝামাঝি থাকে, সামনে এগোয়, পিছনে পেছোয়। জিভের ওঠা-নামা এগোনো-পেছোনোর হিসেব আছে এই ছকে—
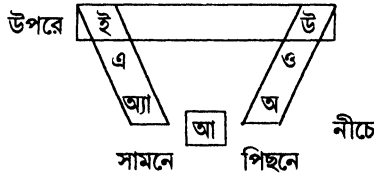
অর্থাৎ ই উ উচ্চারণে জিভ উপরে ওঠে (এগুলি তাই উর্ধ্বস্বর), আ-এর সময় নীচে শুয়ে থাকে, উ ও অ উচ্চারণে পিছনে পেছোয় (এগুলো তাই পশ্চাৎ স্বর), ই এ অ্যা উচ্চারণে সামনে অ-এর পরে ই-উ থাকলে জিভকে বেশ উঠতে হয়। এ জন্য অ-কে ও-করে ফেলতে পারলে জিভের পরিশ্রম কমে, কারণ ও থেকে ই বা উ-তে পৌঁছতে তত আয়াস নেই। আমাদের স্বরসংগতি বা স্বরের উচ্চতাসাম্যের (Vowel Height Assimilation-এর) এই হল আসল কারণ—জিভের কুঁড়েমি ও কাজে ফাঁকি দেবার ইচ্ছে। ইংরেজিতে এরই ভালো নাম the principle of least effort।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বরধ্বনির পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি আদ্যন্ত, কারণসুদ্ধ লক্ষ করেছেন। ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত 'A Grammar of the Bengali Language-এ জন বীম্‌স উচ্চারণের রূপান্তর লক্ষ করেছেন মাত্র, বিশদ কারণ ধরতে পারেননি। আরেকটা কথা স্মরণ করতে হবে যে, এর সবগুলি প্রক্রিয়া ঐতিহাসিক (diachronic) প্রক্রিয়া নয়, এর অনেকগুলিই ভাষা-ব্যবহারে চালু বা synchronic প্রক্রিয়া এ কথার অর্থ কী? এর অর্থ হল যে, কতকগুলি নিয়মে শব্দের আগেকার চেহারা বদলে যায় এবং আগেকার রূপটি ভাষায় বাতিল হয়ে যায়, পরিবর্তিত রূপটিই চালু থাকে। যেমন মুখের কথায় 'জুতা', 'জুতো' হওয়ার পরে মান্য চলিত ভাষায় 'জুতা' বাতিল হয়েছে, 'জুতো'ই এখন স্বীকৃত উচ্চারণ। যে-নিয়মে

এমনটি ঘটেছে তা ঐতিহাসিক নিয়ম। কিন্তু যে নিয়মে একই ব্যুৎপত্তি বা উৎস-জাত দুটি (বা দুয়ের বেশি) শব্দে অপরিবর্তিত রূপ, পরিবর্তিত রূপ পরিবর্তনের কারণসুদ্ধ উপস্থিত থাকে, তা চালু বা synchronic নিয়ম। যেমন 'পড়া'-তে প-এ অ পাচ্ছি, কিন্তু 'পড়ুয়া'-তে ও, কারণ পরের উ ওই অ-কে ও করে দিচ্ছে।

ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে, পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি, যেনি ভাষার চালু নিয়ম কারণসুদ্ধ বিশদ করে বলেছেন। একটি ভাষা মৌখিকভাবে শিখতে গেলে ঐতিহাসিক নিয়ম জানবার দরকার নেই, কারণ যে-ব্যক্তি লোকের মুখে (অর্থাৎ মান্য চলিতভাষী কারও মুখে) বাংলা শিখবে সে 'জুতা' 'ফিতা' শিখবে না, 'জুতো' 'ফিতে'ই শিখবে। কিন্তু চালু নিয়ম তাকে শিখতেই হবে। সে 'প্যাঁচা' বলছে 'অ্যা' দিয়ে, কিন্তু 'পেঁচি' বলছে 'এ' দিয়ে, অথচ শব্দদুটি একই ব্যুৎপত্তির, তখন এই স্বরধ্বনির বিভিন্নতার কারণটি যদি সে জানে, তাহলে সে তাকে অন্যত্র প্রয়োগ করে 'ন্যাকা' থেকে 'নেকি' করতে পারবে, এমন-কী 'ভ্যাব্‌লা' থেকে 'ভেবলি' বা 'ভেড়া' (ভ্যাড়া) থেকে 'ভেড়ি' করতেও কোনো অসুবিধে নেই।

মনে রাখতে হবে, ভাষার চালু নিয়ম বা সিন্‌ক্রনিক নিয়ম সম্বন্ধে প্রথম লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং ভাষার ইতিহাস ও ভাষার চালু অবস্থাকে পৃথক রাখতে বলেন জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানী ফের্দিনান্দ দ সোশ্যুর (Ferdinand de Saussure, ১৮৫৭-১৯১৩), ১৯০৬ থেকে ১৯১১-র মধ্যে সেখানে তাঁর অধ্যাপনাসূত্রে। তার আগে ভাষার ইতিহাস বা বিবর্তনই ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন রুশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বোদুইন দ কুর্ত্‌নে (I. A. Baudouin de Courtenay), তিনি তাঁর ১৮৯৫-এ প্রকাশিত *Versuch einer Theorie Phonetischer Alternationen* নামক গ্রন্থে ভাষার ধ্বনি-পরিবর্তনের চালু নিয়মগুলি দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন বলে জানতে পাই।[১৪] কিন্তু সে বই ভাষাবিজ্ঞানীদেরই নজরে পড়েনি তেমন করে। রবীন্দ্রনাথের সে বিষয়ে খবর রাখবার কথাও নয়। তাঁরা ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন, এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে জার্মানির য়ুং-গ্রামাটিকের বা ছোকরা বৈয়াকরণের দল ধ্বনি-পরিবর্তনের নানাবিধ কারণ বা 'প্রতিবেশ' (context)-ও নির্ধারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লন্ডনের সংক্ষিপ্ত শিক্ষাজীবনে সে-সব বিষয়ে খোঁজখবর রাখতেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি পরে জার্মান ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পণ্ডিতদের, ব্রুগমান প্রভৃতির গ্রন্থাদি অত্যন্ত মন দিয়ে পড়েছেন তা জানতে পারি। আর লন্ডনেও ও সময় তিনি ব্যক্তিগতভাবে লাতিন শিখছিলেন সে খবর পাই।[১৫] আর তাঁর তখনকার প্রিয় সঙ্গী লোকেন্দ্রনাথ পালিত শিখছিলেন লাতিন, ইতালীয় ও ফরাসি[১৬]—কিন্তু ভাষা শিক্ষা এক কথা আর ভাষার তত্ত্ব ও তার ক্রিয়াকর্মের মূল অন্ধি-সন্ধি সম্বন্ধে, শেষতম গবেষণা সম্বন্ধে অবহিত থাকা আরেক কথা। লন্ডনে ওই মাত্র তিন মাসের ছাত্রজীবনে রবীন্দ্রনাথ য়ুংগ্রামাটিকেরদের সিদ্ধান্তাবলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন—এমন সম্ভাবনা বিশ্বাস্য নয়। তাহলে ধরে নিতে হবে, নিছক সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার ফলে, কেবল নিজেরই চর্চা ও অধ্যাবসায়ের সাহায্যে, তিনি বাংলা ভাষার উচ্চারণের কতকগুলি চালু নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সে নিয়মের সংগঠনটিও তিনি যেভাবে খাড়া করেছিলেন—অপরিবর্তিত ধ্বনি, তার পরিবর্তিত রূপ, পরিবর্তনের আপাত কারণ

(অ-এর-র ক্ষেত্রে পরে ই-উ-র উপস্থিতি), গভীরতর বা শারীরিক কারণ ('রসনার শ্রমলাঘব'), ব্যতিক্রম ও ব্যতিক্রমের কারণ—ইত্যাদি সমস্ত কিছু তালিকাবদ্ধ করে—তাও খুব আধুনিক ; কেবল খুব সাম্প্রতিককালেই, ১৯৫৭-র পরে, ধ্বনি-পরিবর্তন-প্রক্রিয়াকে এমন সর্বাঙ্গীণভাবে দেখা হচ্ছে। অর্থাৎ ভাষার চালু প্রক্রিয়াগুলি যে ভাষাবিজ্ঞানীর আলোচনার যোগ্য Baudouin de Courtenay বা দ সোশ্যুরের মুখে একথা উচ্চারিত হওয়ার প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেই রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষার উচ্চারণের বেশ কয়েকটি চালু বা সিন্‌ক্রনিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। শুধু তাই নয়, সেই সূত্র নিয়ম বা প্রক্রিয়াগুলির সামগ্রিক চেহারা কী হওয়া উচিত, কোন ধরনের কারণ বা explanation আমাদের সন্ধান করা উচিত, তাও তিনি নিজের মতো করে নির্ধারণ করেছেন এ সম্বন্ধে গভীর ভাবনাচিন্তা আরম্ভ হওয়ার প্রায় আশি বছর আগে। বলা বাহুল্য, ইদানীংকালে চম্‌স্কি, হালি ইত্যাদি প্রবর্তিত ধ্বনির স্বলক্ষণ (distinctive features), তীর চিহ্ন, নানা ধরনের ব্র্যাকেট, বক্রদাঁড়ি, গ্রিক আলফা-বিটা-গামা ইত্যাদি চিহ্নযুক্ত সূত্র-লিখন পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের বিবৃতিরই গাণিতিক রূপ, এমনকী তাঁর 'রসনার শ্রমলাঘব'—এই কথাটির মধ্যে পরবর্তী ডেভিড স্ট্যাম্প, জে. হুপার প্রভৃতির প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব বা 'natural phonology'-র ধারণারও আভাস আছে। সে ধারণার উৎপত্তি ১৯৬৮ নাগাদ।

এ সবই রবীন্দ্রনাথ করেছেন কেবল নিজের জিজ্ঞাসার দ্বারা প্রবর্তিত হয়ে। একই বিদ্যার বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও চর্চাকারীদের সম্প্রদায় যখন গড়ে ওঠে, তখন পরস্পরের আলাপ-আলোচনায়, প্রকাশিত সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় ও প্রতিবাদে, অনেক নতুন ভাবনা উঠে আসে, অন্তর্দৃষ্টিরও স্ফুরণ ঘটে। এভাবেই ইয়াকব গ্রিমের জার্মান ব্যঞ্জন-রূপান্তরের সূত্রে (গ্রিম্‌স ল) যেগুলি ব্যতিক্রমরূপে চিহ্নিত হয়েছিল সেগুলি এসে ব্যাখ্যা করলেন কার্ল ভের্নের, বললেন শব্দে ঝোঁক বা শ্বাসাঘাতের হেরফের ঘটছে বলেই ব্যঞ্জন রূপান্তরেও ব্যতিক্রম ঘটছে। কিন্তু আঠারো-উনিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ জার্মানির এই দ্বান্দ্বিকতাময় ভাষাবিজ্ঞানচর্চা থেকে অনেক দূরে, একটি ইংরেজ মেয়েকে বাংলা শেখানোর আন্তরিক বাসনাই তাঁকে নিজের ভাষার উচ্চারণের এসব রহস্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। সেই রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই যে পৃথিবীর ভাষা-বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পুরোধা হয়ে উঠেছেন তা তিনি জানতেন না।

সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ভাষাতত্ত্বের বা ভাষার ইতিহাসের একজন 'অগ্রণী পথিকৃৎ' বলে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। আমরা এখন লক্ষ করি যে, এ কথা অতিশয়োক্তি তো নয়ই, বরং উনকথন। রবীন্দ্রনাথের অগ্রণী স্থান শুধু বাংলা ভাষাতত্ত্বের নয়, পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও।

ঐতিহাসিক বা ডায়াক্রনিক ধ্বনি-পরিবর্তনও তাঁর নজরে এসেছে, এবং 'টা টো টে' প্রবন্ধে (১২৯৯) তার চমৎকার আলোচনা করেছেন তিনি। কিন্তু ধ্বনিতত্ত্বের অপর যে-অংশে তাঁর বিশ্লেষণ আবার তাঁকে ভাষাশাস্ত্রের পুরোধা হিসেবে স্থাপন করে, সে হল তাঁর ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশ্লেষণ। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ভাষার phonaesthetics বা sound symbolism-এর অন্তর্গত। 'বাংলা শব্দদ্বৈত', 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' এবং 'ভাষার ইঙ্গিত'—মূলত এই তিনটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার এই ইঙ্গিতবহ শব্দগুলি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। এই বিষয়টি থেকে তাঁর পরবর্তী একটি তত্ত্বের বা সিদ্ধান্তের উদ্ভব

ঘটেছে, সেটি পরেকার 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থের এই স্পষ্ট বিবৃতি—"বাংলাভাষা ভঙ্গি-ওয়ালা ভাষা।"[১৭] অর্থাৎ ভাবপ্রকাশের জন্য বাংলা শুধু ব্যাকরণের নিয়মে ব্যুৎপন্ন আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করে না, তা ধ্বনির সম্ভাব্য এবং কল্পিত অনুকরণে তৈরি অনেক বিচিত্র শব্দকে একোক্ত এবং দ্বিরুক্তরূপে ব্যবহার করে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অনির্বচনীয়কে প্রকাশ"[১৮] করে।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু এইসব ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশাল এবং প্রায় পূর্ণাঙ্গ তালিকা নির্মাণ করেছেন তাই নয়, তিনি এর ব্যঞ্জন ও স্বরের বিভিন্ন সমবায়ের যে বিভিন্ন ব্যঞ্জনা তাও আবিষ্কার ও নির্ধারণ করেছেন। যেমন,

"অবস্থাবিশেষে শব্দের হ্রস্বদীর্ঘতা আছে ; ধপ করিয়া যে-লোক পড়ে, তাহার অপেক্ষা স্থূলকায় লোক ধপাস করিয়া পড়ে। পাতলা জিনিস কচ করিয়া কাটা যায়, কিন্তু মোটা জিনিস কচাৎ করিয়া কাটে।"[১৯]

কিংবা,

"এই শব্দগুলি দুই প্রকারের ধ্বনিব্যঞ্জন করে, একটি অস্ফুট আর-একটি স্ফুট। যখন বলি টুপটাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, তখন এই বুঝায় যে, ছোটো ফোঁটাটি টুপ করিয়া এবং বড়ো ফোঁটাটি টাপ করিয়া পড়িতেছে। ঠুকঠাক শব্দের অর্থ একটা শব্দ ছোটো আর-একটা বড়ো।"[২০]

কিংবা,

"যদি বলি লুচিটুচি তবে লুচির সঙ্গে কচুরি নিমকি প্রভৃতি অনেক উপাদেয় পদার্থ বুঝাইবার আটক নাই, কিন্তু লুচিফুচি বলিলে লুচির সঙ্গে শোভনীয়তার সম্পর্কমাত্র থাকে না।"[২১]

মনে রাখতে হবে, পাশ্চাত্ত্য দেশে এইসব ধ্বন্যাত্মক আলোচনা, অন্তত ইংরেজিভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির আলোচনা, প্রণালীবদ্ধভাবে শুরু করেছেন ইংলণ্ডের ভাষাবিজ্ঞানের পুরোধা জে. আর. ফার্থ (১৮৯০-১৯৬০) তাঁর *Speech* নামক বইয়ে,[২২] যার প্রথম প্রকাশ ১৯৩০ সালে, এবং সে আলোচনা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এমন কিছু উঁচুদরের নয়। তবে 'phonaestheme' বা 'phonaesthetic habit' শব্দ দুটি তাঁর তৈরি, কিন্তু বিস্ময়করভাবে তাঁর নানা কথায় রবীন্দ্রনাথের কথার প্রায় অবিকল প্রতিধ্বনি শুনি। আর ধ্বন্যাত্মক শব্দের উল্লেখ আগে হয়েছে ভাষার উদ্ভবের আলোচনায়। তথাকথিত Bow Wow Theory বা ভাষার উৎপত্তির ভৌ-ভৌ মতবাদ (একে cuckoo theory-ও বলে) এই ধারণা প্রচার করবার চেষ্টা করেছে যে, প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণের চেষ্টা থেকেই মানুষের ভাষার জন্ম। এ মতবাদ গ্রাহ্য হয়নি, এবং এখানে ধ্বন্যাত্মক শব্দকে কেবল ভাষার উৎপত্তিবিষয়ক তত্ত্বনির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে, তাকে আর কোনোভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি। ফলে আমাদের হস্তগত সূত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই এ বিষয়ে আলোচনার প্রথম প্রবর্তক, প্রথম সার্থক ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষক এবং এ বিষয়ে প্রথম ইংরেজিভাষার গবেষণার প্রায় ত্রিশ বছর আগে তাঁর 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধটি (১৩০৭) প্রকাশিত হয়েছে।

ভাবা যায় যে এই ব্যক্তি পরবর্তী 'ভাষার ইঙ্গিত' (১৩১১) প্রবন্ধের শেষে কুণ্ঠিতভাবে বলছেন, 'বৈয়াকরণের যে-সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই, শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণভীরু ;'[২৩]—এবং নিজের এইসব লেখাকে

বলছেন, 'বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টাসকল'? ধ্বনিতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের কাজের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক মূল্য এখন পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্যক স্বীকৃতির অপেক্ষা করছে।

৫

রূপতত্ত্ব, রূপার্থতত্ত্ব

সেই তুলনায় তাঁর রূপতত্ত্বগত অর্থাৎ মরফোলজি-র আলোচনার গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে একটু কম। তার অর্থ এই নয় যে, তাতে বিশ্লেষণের প্রাখর্য কম, বা তথ্যসংগ্রহে ও বিন্যাসে শৈথিল্য আছে। তা আদৌ নয়, এবং এখানেও 'বাংলা বহুবচন', 'সম্বন্ধে কার', 'উপসর্গ সমালোচনা', 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত', 'বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ', 'বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য', 'বাংলা নির্দেশক', 'স্ত্রীলিঙ্গ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা, এবং গবেষণাকর্ম ও পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতায় 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' এবং 'বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা'-টি ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে মহার্ঘ উপাদান। তবে রবীন্দ্রনাথের ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার তুলনায় এই আলোচনাগুলি দুদিক থেকে বিচার্য। প্রথমত, রূপতত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরি ছিলেন। অর্থাৎ এখানে রবীন্দ্রনাথ ভারততত্ত্ববিদ ও অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানীদের, যেমন হ্যর্নলে, বীম্‌স এবং রামমোহন, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির রচনার ও আলোচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভায় তর্ক-বিতর্কের মধ্যে নিজের মতামতকে পরিণতি দেওয়ারও সুযোগ পেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এসব আলোচনা বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ নির্মাণে যত মূল্যবান, ভাষাবিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে এগুলির দান তত বেশি নয়।

কিন্তু লক্ষ করি, শুধু বিভক্তি প্রত্যয় নির্দেশক ইত্যাদি রূপমূল বা morpheme-এর তালিকা নয়, প্রতিটির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাদের ধ্বনিগত বিবর্তন অনুধাবন যেমন করেছেন তেমনই প্রতিটির অর্থ বা প্রয়োগ এমনভাবে নির্দেশ করেছেন যা একমাত্র কবির পক্ষেই সম্ভব। শব্দদ্বৈতের ক্ষেত্রে অর্থের কোথায় কী কী সূক্ষ্ম ভেদ হচ্ছে, কর্তৃপদে তির্যক রূপের ব্যবহারে অর্থের কী বিশিষ্টতা আসে, টি টো টা-এর কোথায় কীভাবে ব্যবহারে কোন অর্থ ফুটে ওঠে, খানি খানা-র প্রয়োগ কোথায় হয় কোথায় হয় না, আ ও ই প্রত্যয়ের অর্থ কী দাঁড়ায়—এমনই অভাবিত সব পর্যবেক্ষণে এই আলোচনাগুলি পরিপূর্ণ। আমরা দেখি যে, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালের ইংলন্ডীয় শব্দার্থবিদদের মতো 'অর্থ' বলতে বুঝেছেন প্রয়োগ-প্রতিবেশ (context of situation)-কে, এবং বলা বাহুল্য, প্রাচীন ও রক্ষণশীলদের মতো অভিধানের শাসনে আবদ্ধ না থেকে জীবন্ত ভাষার জীবন্ত ব্যবহার থেকে তার শব্দ ও শব্দখণ্ডগুলির চলচঞ্চল অর্থকে শরবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। যেমন,

"দেখা যাইতেছে যে-সকল সামগ্রী দীর্ঘ প্রস্থ বেধে সম্পূর্ণ, সাধারণত তাহাদের সম্বন্ধে 'খানা' ব্যবহার হয় না। যে জিনিসকে প্রস্থের প্রসারের দিক হইতেই দেখি, লম্বের বা বেধের দিক হইতে নয়, প্রধানত তাহারই সম্বন্ধে 'খানা' ও 'খানি'-র যোগ। মাঠখানা, ক্ষেতখানা ; কিন্তু পাহাড়খানা নদীখানা নয়। থালখানা, খাতাখানা ; কিন্তু ঘটিখানা বাটিখানা নয়। লুচিখানা, কচুরিখানা ; কিন্তু সন্দেশখানা, মেঠাইখানা নয়। শালপাতাখানা, কলাপাতাখানা ; কিন্তু আমখানা, কাঁঠালখানা নয়।"[২৪]

বলা বাহুল্য, ব্যতিক্রমও লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং 'খানা চিহ্নের ব্যবহার সম্বন্ধে সকলের অভ্যাস সমান নহে' বলে কয়েকটি 'সাধারণ নিয়ম' নির্দেশ করেছেন। যেমন জীবের নামের সঙ্গে 'খানা' জোড়া যায় না, কিছু অরূপ পদার্থের সঙ্গেও যায় না। মাপ্য (আজকের ভাষায় non-countable)পদার্থের সঙ্গেও তার ব্যবহার অসম্ভব। তাই যত্নখানা, বালিখানা হয় না। কিংবা অন্যত্র বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব অর্থে যথাক্রমে আ ও ই প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়েছেন—রশা-রশি, ঘড়া-ঘটি, বড়া-বড়ি ইত্যাদি।[২৫]

এসব আলোচনার তাত্ত্বিক মূল্য ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনার মূল্যের চেয়ে কম বলেছি আমরা, কিন্তু সে কথাটিরও একটি স্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিত দেওয়া দরকার। এগুলির তাত্ত্বিক মূল্য অসামান্য হয়ে ওঠে যখন আমরা বুঝতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, অর্থাৎ autonomous ভাষা হিসেবে দেখছেন, ফলে তার একটি স্বতন্ত্র ও নিজস্ব ব্যাকরণ নির্মাণ করার চেষ্টা করছেন। এ কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে শুরু করে অনেকেই বলেছেন, এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ'[২৬]-এর মধ্যে সর্বপ্রথম একটি সংবদ্ধ রূপ লাভ করলেও, সুনীতিকুমারের আগে যিনি বাংলা ব্যাকরণের একটি সর্বাঙ্গীণ মূর্তিকে ধ্যানে প্রত্যক্ষ করে তার পৃথক পৃথক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্মাণের দ্বারা একটি স্পষ্ট ও ধারণাযোগ্য ব্যাকরণ নির্মাণের কাজে অনেকদূর এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে 'বাংলাভাষা পরিচয়'-এর মধ্যে ভাষার সেই সামগ্রিক রূপটিকে তিনি গেঁথে তুলেছেন। আগে, 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'-এর প্রবন্ধগুলি প্রকাশের সময়, এই কাজ খুব সহজ ছিল না। প্রথমত বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে মূলত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও বৈয়াকরণদের অস্পষ্ট ধারণা ছিল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দুই উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। আর দ্বিতীয়ত, বাংলা লিখিত ভাষার তুলনায় মুখের ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান স্বীকার করতেও এঁরা কুণ্ঠিত ছিলেন, ফলে এঁদের কাছে ব্যাকরণের অর্থ ছিল 'সাধু' ও 'শুদ্ধ' ভাষার ব্যাকরণ, অর্থাৎ normative বা prescriptive ব্যাকরণ। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ যে ধীরে ধীরে, মার্কিনি নৃবিজ্ঞানী-ভাষাতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রায় সমসাময়িকভাবে, ভাষার মৌখিক রূপের মহিমা স্বীকার করে তার বর্ণনা ও বিবৃতি সম্বলিত descriptive ব্যাকরণের একটি ধারণা গড়ে তুলছেন, তা তাঁর সময়কার পণ্ডিতেরা অনেকেই অনুধাবন বা স্বীকার করতে পারেননি। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ১৩০৮-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতী'-তে 'নূতন বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধ লিখে অভিযোগ করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ "এই চলিত কথাগুলা ও তাহার প্রত্যয় সংগ্রহে সহায়তা করিয়া বাংলা ভাষাটিকেই মাটি করিবার চেষ্টায় আছেন"[২৭]। শাস্ত্রী এও বলেছিলেন যে,

"যে-সকল শব্দ লইয়া অভিনব ব্যাকরণ নির্মাণের চেষ্টা হইতেছে উহা একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ঐ-সকল শব্দের বহুল প্রয়োগে ভাষার গুরুত্ব ও মাধুর্য কতদূর রক্ষিত হইবে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।"[২৮]

'গুরুত্ব' ও মাধুর্য'-এর বিবেচনা ওঠে যখন আমরা মনে করি বাংলা ভাষাটা শুধু শিষ্ট ও সৌজন্যমূলক বাগ্‌বিনিময় ও আলোচনার ভাষা—তা কয়েক কোটি মানুষের দৈনন্দিন ও স্বাভাবিক বিচিত্র ব্যবহারের ভাষা নয়। আমাদের ধারণা, চলিত ভাষার যে-ব্যাকরণ রবীন্দ্রনাথের ভাবনার ছিল, সুনীতিকুমারের গ্রন্থও তার সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। এখনও তার প্রতীক্ষা করছি আমরা।

রূপতত্ত্বের একটি ছোট এলাকায় শব্দবিশেষের অর্থ ও অর্থ-বিবর্তনের যে-আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ—তাকে রূপার্থতত্ত্ব—(morphosemantics)-এর এলাকা বলা যেতে পারে। 'নিছনি', 'পঁহু' ইত্যাদি শব্দের অর্থ আলোচনায় এবং 'ন্যাকামি', 'হুজুগ', 'আহ্লাদে' ইত্যাদি শব্দের অর্থ-নির্ধারণে প্রতিক্ষেত্রেই লক্ষ করি, তিনি মূলত প্রয়োগ থেকে অর্থটি তুলে আনতে চান, অর্থাৎ তাঁর কাছে meaning=use। এ তত্ত্ব জীবন্ত ভাষার তত্ত্ব, এবং ভাষাকে একটা সচল, সজীব মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত বাহন হিসেবে যাঁরা দেখেন তাঁরা অভিধানের সুনির্দিষ্ট ও নিশ্চল অর্থের মধ্যে ভাষার শব্দগুলির মৃত সমাধিস্তম্ভগুলিকে অগ্রাহ্য করেন। তাঁর 'প্রদোষ' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে 'শনিবারের চিঠি' যে-সমালোচনা করেছিল (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯), তার উত্তরে বলা এই কথাগুলি বিশেষ স্মরণযোগ্য—

"রাত্রির অল্পান্ধকার উপক্রমকেই বলে প্রদোষ, রাত্রির অল্পান্ধকার পরিশেষের বিশেষ কোনো শব্দ আমার জানা নেই। সেই কারণে প্রয়োজন উপস্থিত হলে ওই শব্দটাকে উভয় অর্থেই ব্যবহার করবার ইচ্ছা হয়। এমনি করেই প্রয়োজনের তাগিদে শব্দের অর্থবিস্তৃতি ভাষায় ঘটে থাকে।"[২৯]

এখানেও দেখি, শুধু শব্দের অর্থবিস্তার ও প্রয়োগস্বাধীনতার অধিকার নয়, কাব্যিক উপভাষার (poetical dialect) 'নিছনি' 'পঁহু' ইত্যাদি শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্ট করার সম্ভ্রান্ত অ্যাকাডেমিক দায়িত্ব যেমন তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন, তেমনই অতিশয় চালু ভাষার সহজ ইডিয়মের পাণ্ডিত্যহীন 'অশিষ্ট' শব্দগুলি ('ন্যাকামি' ইত্যাদি) সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের কোনো শুচিবাই বা উন্নাসিকতা নেই। অর্থাৎ তাঁর কাছে লেখা ভাষা যতটা গুরুত্ব পায়, দৈনন্দিন মুখের ভাষা তার চেয়ে কম গুরুত্ব পায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সময়ে প্রায় সব দেশেই অভিনব ছিল, এবং এর জন্য তাঁকে তৎকালীন পণ্ডিতদের তিরস্কারও যে সহ্য করতে হয়েছে তা আমরা দেখলাম।

৬

প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞান বা applied linguistics-এর বহুবিধ কৃত্য থাকে—শিষ্ট ভাষা নির্মাণ, সেই ভাষার মানোন্নয়ন বা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের জন্য অভিন্ন ও সুবিধাজনক বানানরীতি পরিভাষা ইত্যাদি নির্মাণ। এই ক্ষেত্রে এসে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে যে আলোচনায় যোগ দেন তার লক্ষ্য হল—বাংলা সাহিত্যের ব্যাবহারিক ভাষা (written dialect) কী হবে? বাংলার কোন্ উপভাষার সঙ্গে তার ভিত্তির যোগ থাকবে? আমরা জানি লেখ্য ভাষা সম্বন্ধে ১৯১৪ সালে 'সবুজ পত্র' প্রকাশের পর থেকেই তাঁর মত চলিত ভাষার পক্ষে যোগ দিয়েছে, এবং নিজেও তিনি অল্পস্বল্প দ্বিধার পর চলিত রীতিকেই তাঁর গদ্যের একমাত্র বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৩০] তাঁর 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে মূল বক্তব্য—সাধুভাষার 'কৃত্রিমতার বন্ধ্যদশা'-র মধ্যে সাহিত্য যে মাঝে মাঝে পৌঁছয় তার কারণ 'বিশিষ্টতার বিলাস'—কিন্তু সাহিত্যের 'প্রাণের খোরাক' থাকে 'সাধারণের ভাষার মধ্যে, যেখানে বিশ্বের প্রাণ আপনাকে মুহূর্তে মুহূর্তে প্রকাশ করিতেছে।'[৩১]

এ ভাষা বাংলার কোন অঞ্চলের 'সাধারণের ভাষা'? চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে তিনি স্পষ্টই জানান—'কলকাতা অঞ্চলের চলতি ভাষাই।'[৩২] কারণ বাংলার রাজধানী কলকাতায় নানা উপলক্ষ্যে সমস্ত জেলার লোক এসে একটা স্টাণ্ডার্ড ভাষা গড়ে তুলেছে।

মনে রাখতে হবে, এ ভাষা যে কলকাতার সুনির্দিষ্ট কথ্য ভাষা বা ডায়ালেকট্ নয়, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো সংশয় নেই। সেখানে নিছক মুখের ভাষার কোনো কোনো শব্দকে তার 'অপভাষা' বলে মনে করেন সেগুলি তিনি স্ট্যান্ডার্ডে বর্জন করেন, যেমন 'গুছুতে', 'রেতের বেলা', 'ভেয়ের বে', 'কন্নু', 'দোর' (তিনি 'দুয়োর' পছন্দ করেন), 'ঘুমুতে', 'ওপর', 'ভেতর'।[৩৩] রাজশেখর বসু তাঁর 'চলন্তিকা' অভিধানের ভূমিকায় 'মৌখিক' ও 'চলিত' ভাষার যে পার্থক্য করেছেন[৩৪] তা রবীন্দ্রনাথের এই নির্দেশকে অনুসরণ করেই। ওই 'অপভাষা'র শব্দগুলি নন-স্ট্যান্ডার্ড, অর্থাৎ নিছক কথ্য, কিন্তু 'ভিতর', 'উপর', 'করলুম' ইত্যাদি স্ট্যান্ডার্ড। অন্যদিকে এ ভাষা 'মক্তব মাদ্রাসার বাংলা ভাষা'-ও হবে না, কারণ সাধারণ স্ট্যান্ডার্ড থেকে তার শব্দাবলি খানিকটা আলাদা—বাংলা সাহিত্যের লেখ্য ভাষার ক্ষেত্রে 'সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি'[৩৫] রবীন্দ্রনাথ কাম্য মনে করেন না।

লেখার বা বলার স্ট্যান্ডার্ড ভাষা নির্ধারণের পরে তার উন্নয়নের প্রশ্নটিও উঠে পড়ে। লেখার বা লেখাপড়ার, শিক্ষাদীক্ষার ভাষার উন্নয়নের যে কার্যক্রম, তার সুনির্দিষ্ট নাম ভাষার মানোন্নয়ন বা language standardization। তার অন্যতম অঙ্গ হল সরল এবং বিকল্পহীন ও সুশৃঙ্খল বানান-পদ্ধতি নির্মাণ ; আর-এক অঙ্গ পরিভাষা নির্মাণ। বাংলা বানাননীতির সুনির্ধারণে রবীন্দ্রনাথের কাজ, ধারণা ও সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি,[৩৬] এখানে তার পুনরাবৃত্তি অবাঞ্ছিত। সংক্ষেপে শুধু এই কথা বলা যেতে পারে যে, মূলত তাঁরই প্রস্তাব থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৫-এর বানান সংস্কার সমিতি স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ভাষার ধ্বনিসংগত (অর্থাৎ উচ্চারণানুগ) বানান প্রবর্তনে ঐকান্তিক আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সমিতির সুপারিশ মেনে তৎসম শব্দে সংস্কৃত বানান রক্ষা করতে চেয়েছেন তিনি, কিন্তু যাকে তিনি 'প্রাকৃত বাংলা' বলেন তার ক্ষেত্রে ধ্বনিসংগত বানান লেখার সুপারিশ করেছেন—

"সংস্কৃত শব্দ বাংলায় অনেক আছে, এবং চিরদিন থাকিবেই—সেখানে সংস্কৃতের রূপ ও প্রকৃতি আমাদের মানিতেই হইবে—কিন্তু যেখানে বাংলা শব্দ বাংলাই সেখানেও সংস্কৃতের শাসন যদি টানিয়া আনি, তবে রাস্তায় যে পুলিস আছে ঘরের ব্যবস্থার জন্যও তাহার গুঁতা ডাকিয়া আনার মতো হয়।"[৩৭]

কিংবা

"তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমি নমস্যদের নমস্কার জানাব। কিন্তু তদ্ভব শব্দে অপণ্ডিতদের অধিকারই প্রবল, অতএব এখানে আমার মতো মানুষেরও কথা চলবে —কিছু কিছু চালাচ্ছিও।"[৩৮]

কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথের মনের অনতি-গোপন বাসনাটি ছিল সমস্ত বাংলা বানান ধ্বনি-সংগত করার দিকে। বারবার তিনি বাংলা বানানোর ক্ষেত্রে একজন 'কামাল পাশা'-র আবির্ভাব প্রার্থনা করেছেন, আশা করেছেন "এই দ্বিধাগ্রস্ত মধ্যপথে ব্যাপারটি থামবে না। অচিরে এমন সাহসিকের সমাগম হবে যাঁরা নিঃসংকোচে বানানকে দিয়ে সম্পূর্ণভাবেই উচ্চারণের সত্য রক্ষা করবেন।"[৩৯]

অবশ্য ভাবনার দিক থেকে বিষয়টা যত সহজ, বাংলা বানানরীতির নানা ঐতিহাসিক জটিলতার মধ্য থেকে কাজে ধ্বনিসংগত বানানোর সামগ্রিক স্বীকৃতি যে তত সহজ নয় তা বর্তমান লেখক অন্যত্র[৪০] আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথও শেষ

পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আপসরফা খানিকটা মেনে নিয়েছিলেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত বইগুলিতে অবশ্য কিছু কিছু নিজস্ব বানান লক্ষ করা যায়, যেমন মাত্রাওয়ালা একার (ে) দিয়ে 'আ' ধ্বনি বোঝানো, 'পুনর্‌মুদ্রণ', 'উদ্‌যোগ' ইত্যাদি বিশ্লিষ্ট বানান, বাংলা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে হ্রস্বই-কার বা নি যোগ ইত্যাদি—সেগুলির কিছু কিছু নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনা। বিশেষত 'কি' এবং 'কী'-এর বানান বিভাজনের জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।[৪১]

বানানের সঙ্গে যতিচিহ্ন প্রয়োগ নিয়েও ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ। যতিচিহ্নের অতিব্যবহারের তিনি বিরোধী ছিলেন, নানা আলোচনায় তাঁর এ বিষয়ে অনিচ্ছা অস্পষ্ট থাকে না। জীবনময় রায়কে একটি চিঠিতে লিখছেন, " 'কে হে তুমি' বাক্যটাই নিজের প্রশ্নত্ব হাঁকিয়ে চলেছে তবে কেন ওর পিছনে আবার একটা কুঁজওয়ালা সহিস।"[৪২] এই চিঠিতেই বিস্ময়চিহ্নের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছেন তীব্র ভাষায়, এবং আরেকটি চিঠিতে তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি— 'আমি নিরঞ্জনের উপাসক—চিহ্নের অকারণ উৎপাত সইতে পারি নে।'[৪৩] ক্রিয়ার কাঁধে দু-একটি স্থলে ছাড়া ঊর্ধ্ব কমাও তাঁর অসহ্য। তাঁর সিদ্ধান্ত মোটামুটি এই—'লেখায় দুই জাতের যতিই যথেষ্ট, একটা বড়ো একটা ছোটো।'[৪৪] অর্থাৎ দাঁড়ি, এবং সেই সঙ্গে কমা— এই দুটিই যথেষ্ট। অন্যত্র হাইফেনের প্রতি ঈষৎ আসক্তির কথা বলেছেন।[৪৫] মোট কথা যতিচিহ্নের যথাসম্ভব বিরল ব্যবহারই তাঁর কাম্য, যদিও 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থেই উদ্ধৃতি কমা, ড্যাশ, কোলন, ত্রিবিন্দু (triple dot) ইত্যাদি বেশ ভালোই ব্যবহৃত হয়েছে, এবং এক 'পহুঁ' প্রবন্ধটিতেই (১৭৪-১৭৬) 'কমা' ব্যবহৃত হয়েছে চোদ্দটি, পরের 'পহুঁ প্রসঙ্গ'-তে (১৭৭-১৮২) অন্তত এগারোটি সেমিকোলন আছে. সে তুলনায় এই দুটি প্রবন্ধে প্রশ্ন বা বিস্ময়চিহ্ন একটিও নেই।

স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন বা মানোন্নয়নের আরেকটি উপায় পরিভাষা নির্মাণ। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্থায়ী কীর্তি যেমন কিছু আছে, তেমনই কষ্টকল্পিত এবং বিস্মরণযোগ্য নির্মাণও প্রচুর। বস্তুতপক্ষে এ বইয়ের শেষে সংকলিত শব্দচয়ন ১-৫ অংশে যেসব পরিভাষা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে মনে হয়, গৃহীত বা পরিকল্পিত পরিভাষার পিছনে রবীন্দ্রনাথের বিবেচনার মাত্রাগুলি মূলত এই ছিল—(১) শ্রুতিরঞ্জকতা, (২) অর্থসামীপ্য এবং (৩) ভাবসমুন্নতি। আমরা জানি, 'বাধ্যতামূলক'-এর বদলে 'আবশ্যিক' তিনি চেয়েছিলেন প্রথমটি মূলত শ্রুতিকটু বলেই। হঠাৎ-বানিয়ে-তোলা আক্ষরিক এবং অন্য-অর্থবাহী পরিভাষা তাঁর অপছন্দ ছিল, তাই 'অন্তরীণ', সম্পাদকীয় 'স্তম্ভ' ইত্যাদি পরিভাষায় তিনি আপত্তি করেছেন। আবার 'কৃষ্টি'তে আপত্তি করেছেন তার মধ্যে কর্ষণের ঘামের স্মৃতি লুকিয়ে আছে বলে।[৪৬] শব্দটি 'কুশ্রাব্য' বলেও বটে।[৪৭] কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর নিজের অধিকাংশ পরিভাষা সুশ্রাব্য হলেও অতিরিক্ত সংস্কৃত-নির্ভরতার জন্য প্রায়-অব্যবহার্য। আক্ষরিকতাও অনেকগুলির অন্যতম ত্রুটি, যেমন undermining-এর পরিভাষা 'অধঃখনন' বা unwholesome-এর বাংলা 'অসাত্ম্য' (এ কথাটির পরিভাষা কি দরকার ছিল?') কিংবা wit-এর 'মূর্ধন্য হাসি' রীতিমতো ক্লিষ্ট ও অগ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পরিভাষা, যেমন অভিযোজন (adaptation), আঙ্গিক (technique), উপজাতি (species), ঐচ্ছিক (optional), হনুকরণ (aping), অনীহা (apathy) ইত্যাদি যেমন গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার বাইরে তাঁর অধিকাংশ পরিভাষাই কেবল কৌতূহলের বিষয় হয়ে আছে। 'ড্রপ সীন'-এর বাংলা যখন

'চরম তিরস্করণী' করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তখন বুঝতে হবে সংস্কৃত প্রতিশব্দের দুর্বার সম্মোহন তাঁকে খানিকটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই তাঁর সৃষ্ট অধিকাংশ পরিভাষা যতটা কাব্যিক বা চমকপ্রদ, ততটা ব্যবহার্য হয়ে ওঠেনি। সমস্ত শব্দের পরিভাষা করতেই হবে, শব্দঋণ বা loanword-এর দ্বারা ভাষায় মূল বিদেশী পরিভাষাগুলিকে গ্রহণ করা যাবে না—এমন কুসংস্কার তাঁর ছিল না, তবু যে তিনি অপারিভাষিক ইংরেজি শব্দেরও প্রতিশব্দ নির্মাণ করার অক্লান্ত চেষ্টা করে গেছেন, তার কারণ ভাবলে বিস্ময় জাগে। ··· 'বাংলাকে সংস্কৃত ভাষার দানসত্র ও অন্নসত্র থেকে দূরে নিয়ে এলে তাতে গুরুতর ক্ষতি ঘটবে'[৪৮]—সংস্কৃত কলেজের অভিভাষণে বলা এই সিদ্ধান্ত মৌলিকভাবে ভ্রান্ত নয়, কিন্তু আজকে ইংরেজি, হিন্দি ইত্যাদি ভাষার সঙ্গে বাংলার সংস্পর্শে এর সীমার পুনর্নির্ধারণ করা যে দরকার, সে সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন, তা লক্ষ করি। দিলীপকুমার রায়কে লিখছেন "ভাষায় ম্লেচ্ছ সংস্রবদোষ একদা গর্হিত ছিল। এখন সেদিন নেই, এখন ভাষার অন্নিবাসে ফিরিঙ্গিতে বাঙালিতে ঘেঁসাঘেঁসি বসে।"[৪৯] 'নেশন' ইত্যাদি কথা ইংরেজিতেই রাখার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও তাঁর পরিভাষা তেমন ব্যবহারযোগ্য নির্মিতি লাভ করেনি, সেটাই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

৭

যাকে সমাজভাষাবিজ্ঞান (sociolinguistics) বলা হয়, তারও একটি প্রায়োগিক দিক আছে।[৫০] রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনা তার সীমানার মধ্যে পড়ে। তার মধ্যে প্রধান প্রসঙ্গ শিশুর প্রথম শিক্ষার বাহন কোন ভাষা হবে, তার মাতৃভাষা না অন্য কোনো আরোপিত ভাষা—তার আলোচনা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত ও সিদ্ধান্ত তাঁর 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের অন্তর্গত নয়, মূলত 'শিক্ষা' বইয়ের প্রবন্ধগুলিতেই তিনি এ নিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। আমরা অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষা ও শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার বিস্তৃত বিচার করেছি,[৫১] এখানে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর মূল সিদ্ধান্তগুলিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা চলে। অন্য ভাষায় সাধারণ শিক্ষা আরম্ভ হলে প্রথমে ঘটে শিক্ষার পদ্ধতিগত বিপর্যয়—'ধারণা জন্মিবার পূর্বে মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়।'[৫২] আর শিক্ষার যে বস্তু (content) শিশুকে পরিবেষণ করা হয় প্রায়ই তার অভিজ্ঞতা থেকে দূরবর্তী, যেমন ইংরেজি পাঠ্যে hay-making, snow-ball খেলা ইত্যাদির প্রসঙ্গ। তা ছাড়া, ভাষাশিক্ষা বিষয়-শিক্ষার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই আরোপিত ভাষায় শিক্ষাদানের কুফলও দু-ধরনের ; মনস্তাত্ত্বিক—শিক্ষার্থীর মৌলিক চিন্তা ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা ব্যাহত হয়—'আমাদের শিক্ষাকে আমরা বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম।'[৫৩] সেই সঙ্গে এর একাধিক সামাজিক দুষ্পরিণামও আছে—চাকরিকে জীবনের পঞ্চম পুরুষার্থ করে তোলে, ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে বিষয়জ্ঞানের বিভ্রান্তি ঘটিয়ে ইংরেজিতে দুর্বল ছাত্রদের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রাত্যের চিহ্ন দেগে দেয়—'যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতায় শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজির মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?'[৫৪]—ইত্যাদি প্রশ্ন তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা লক্ষ করেছি, মার্কিন-দেশে কৃষ্ণকায়দের সাদা মধ্যবিত্ত আমেরিকানদের মান্য ভাষা শিখিয়ে 'ভদ্রলোকের' শিক্ষা দেবার চেষ্টায় ব্যর্থতার মধ্যে এই ঔপনিবেশিক সমস্যার অন্য ধরনের প্রতিফলন ঘটেছে, সেখানে ঔপনিবেশিক না

হোক, শ্রেণীগত hegemony বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে।[৫৫] এসব প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের যা উত্তর, তা খুব বিস্ময়করভাবে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের উত্তরের কাছাকাছি। কৌতূহলী পাঠক পল খ্রিস্টোফার্সন রচিত *Second Language Learning : Myth and Reality*[৫৬] নামক চমৎকার পুস্তিকাটি পড়ে দেখতে পারেন। ইয়ুনেস্কোর *The Use of Vernacular Languages in Education* পুস্তিকায় (১৯৫৩) প্রতি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কথাই সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু তার প্রস্তাবক ও আলোচকরা প্রত্যেকে খাঁটি ভাষাবিজ্ঞানী নন বলে সেসব সিদ্ধান্তের সারবত্তায় ইদানীং কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেন। পল খ্রিস্টোফার্সনের বইটি তাঁদের পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। বি বি সি-র তৈরি একটি সাম্প্রতিক ভিডিয়ো টেপ-এও[৫৭] শিশুর ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা-ও রবীন্দ্রনাথের মতকেই শক্তিশালী করে।

কিন্তু যেটা আমাদের অন্যভাবে আলোড়িত করে, তা হল—মাতৃভাষা ও শিক্ষার আলোচনা রবীন্দ্রনাথের কাছে নেহাৎ অ্যাকাডেমিক বিচার-বিবেচনার বিষয় নয়, তা একজন গভীর দেশানুরাগী মানুষের কাছে দেশের শিশুদের জীবন-মরণ সমস্যা যেন। তার সঙ্গে জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুক্ত। এ বিষয়ে আমি পূর্বোল্লেখিত প্রবন্ধে যা লিখেছি তা উদ্ধার করি[৫৮]: এই বিষয়ে লেখা প্রায় সমস্ত প্রবন্ধের ভাষারীতিতে রবীন্দ্রনাথ যুক্তি-বিন্যাসের সঙ্গে এমন একটি ব্যাকুলতা, এমন একটি তীব্র ব্যক্তিগত ব্যগ্রতা ও 'আর্জেনসি'র বোধ সঞ্চার করে দেন, যা তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধে এত বেশি পরিমাণে লক্ষ করা যায় না। যখন তাঁকে বলতে শুনি—

"অতএব আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখনই ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তখনই বাংলা ভাষা অবলম্বন করিতে তাহাদের একটা কাতরতা জন্মে। কিন্তু হায় অভিমানিনী ভাষা, সে কোথায়? সে কি এত দীর্ঘকাল অবহেলার পর মুহূর্তের আহ্বানে অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য, তাহার সমস্ত গৌরব লইয়া একজন শিক্ষাভিমানী গর্বোদ্ধত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে? হে সুশিক্ষিত, হে আর্য, তুমি কি এই সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার মর্যাদা জান? ইহার কটাক্ষে যে উজ্জ্বল হাস্য, যে অশ্রুম্লান করুণা, যে প্রখর তেজ-স্ফুলিঙ্গ, যে স্নেহ প্রীতি ভক্তি স্ফুরিত হয়, তাহার গভীর মর্ম কি কখনো বুঝিয়াছ? হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছ?"[৫৯]

এই rhetoric-এর ভাষার মধ্যে সহজেই উঠে আসে পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর অবমাননার বেদনার্ত মেটাফর। সেখানেই রবীন্দ্রনাথের ভাষা-সংক্রান্ত অন্য সমস্ত আলোচনার তুলনায় তাঁর শিক্ষাও মাতৃভাষার আলোচনা পৃথক হয়ে যায়।

প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আর একটি জায়গায় রবীন্দ্রনাথকে মন্তব্য করতে দেখি, সেটি 'ভাষাবিচ্ছেদ' ('বাংলা শব্দতত্ত্ব') প্রবন্ধে উড়িষ্যা ও আসামে লিখন-পঠনের ভাষা-নির্ধারণের সময়। এখানে তাঁর আনুকূল্য ছিল বাংলাভাষার প্রতি। বলেছেন ওই দুই প্রদেশে লেখাপড়ার ভাষা হিসেবে বাংলা চালু হলে তা শুভদায়ক হবে।

এখানে স্পষ্টতই তাঁর বিচার বিভ্রাট ঘটেছে। তাঁর সময়কার অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালির মতো তিনিও ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্য বা autonomy বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা পোষণ করেছেন, মনে করেছেন ওড়িয়া ও অসমীয়া বাংলা উপভাষারই মতো। তাঁর যুক্তির সমর্থনে তিনি যে স্কট্‌ল্যান্ড, ও ওয়েল্‌সে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেছেন, তা বিশেষ

মারাত্মক—কারণ তা ঔপনিবেশিক যুক্তি—রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির ক্ষেত্রে ঐ ধরনের 'ঐক্যে'র যুক্তির প্রতি নিজেই বহুবার তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। হয়ত তিনি খেয়াল করেননি যে, আজকের রাষ্ট্রনৈতিক জটিলতার যুগে কোনো ভাষা অন্য ভাষার খুব কাছাকাছি—এটা তাদের ঐক্যের পক্ষে কোনো যুক্তিই নয়। ব্যাকরণ ও বিবর্তনের ইতিহাস যাই বলুক না কেন, ভাষা দুটি যারা বলে তারা যদি নিজেদের স্বতন্ত্রভাষী বলে মনে করে এবং রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে উদ্যোগী হয়, তখন সেই স্বাতন্ত্র্যকেই আমাদের স্বীকার ও সম্মান করতে হবে। পরে স্বাধীন আয়ার্ল্যান্ডে আইরিশ ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এখন ওয়েল্‌স অঞ্চলে ওয়েল্‌স ভাষা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে অবশ্যপাঠ্য হয়েছে—এইসব তথ্যের আলোকে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষাবিচ্ছেদ' প্রবন্ধটি কিছুটা বিভ্রান্ত বলেই মনে হয়। এই একটিবার মাত্র তাঁকে অবাস্তব ভবিষ্যতের হিসেব করতে দেখি।

৮

বাংলা ছন্দের মূল ধ্বনিগত ভিত্তি আবিষ্কার ও তার বিপুল বৈচিত্র্য-সাধন কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এক অসমান্য কাজ। বিশেষত প্রবোধচন্দ্র সেন যাকে এখন সরল কলাবৃত্ত (simple moraic) ছন্দ বলেন, তা যে রবীন্দ্রনাথের হাতেই সচেতনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছন্দের মূল ভিত্তি যে উচ্চারণ, লিপি নয়,—সে সত্যও রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই অনুধাবন করেছিলেন। 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন, ... 'যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে' ...[৬০] কিন্তু শব্দারম্ভের যুক্তাক্ষর দু অক্ষর (syllable) নয়, একাক্ষর। কিন্তু বাংলা ছন্দের রচনায় ও ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের যে অবিসংবাদিত কৃতিত্ব, ছন্দের মূল নির্মাণ-সূত্র আবিষ্কারে তার ঠিক প্রতিফলন ঘটেনি। এর একটি কারণ, গানের তাল ও ছন্দের তালকে প্রায়শই পৃথক রাখতে পারেননি তিনি—দুয়ের ন্যায় ও ভিত্তি যে আলাদা তা খেয়াল করেননি। দ্বিতীয়ত, "রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দচিন্তা-প্রকাশে কখনও নির্দিষ্ট বা নির্দিষ্টার্থক পরিভাষার সহায়তা গ্রহণ করেননি। কিন্তু তাঁর চিন্তায় বিবর্তন থাকলেও অনির্দিষ্টতা বা অস্পষ্টতা প্রায় ছিল না বলা যেতে পারে। অথচ সেই নির্দিষ্ট চিন্তাকে তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন পরিভাষায়। সেসব পরিভাষাও আবার সব সময় এক অর্থে ব্যবহৃত হত না।"[৬১]

ফলে ছন্দের মূল ভিত্তি ও গড়ন সম্বন্ধে অন্যদের তুলনায় অনেক গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করেও রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দ-সংস্কার এবং কবিত্বের অনায়াস শব্দশাসন এর মূল তত্ত্ব আবিষ্কারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তা শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলেন প্রবোধচন্দ্র সেন, বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব ও উচ্চারণনীতির ছন্দের মূল সংগঠনের গভীর যোগ বা correspondance প্রতিষ্ঠা করে। বাংলা উচ্চারণের রহস্য যে-মানুষটির কাছে এমন অনায়াসে ধরা দিল ছন্দের তত্ত্ব তাঁর কাছে একটি শেষ অবগুণ্ঠন রক্ষা করে গেল, সেটাই বিস্ময়ের।[৬২]

১। Archer. W. G., 1959, *Indian and Modern Art*. London, (George Allen & Unwin Ltd), P. 49.

২। Chatterji, S. K., 1926, *ODBL*, Vol. I, Calcutta, (University of Calcutta), P. xvi.

৩। 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলাভাষা', পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত। 'রবীন্দ্রায়ণ' ১ম খণ্ড, কলকাতা, (বাক্ সাহিত্য) [১৭৯-১৮৫], ১৮১ পৃ।

৪। 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ', ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত 'ভাষা ও সাহিত্য' ১ম খণ্ড, ১৩৩৮, ঢাকা' (দি ঢাকা লাইব্রেরি), [১০৩-৫], ১০৩ পৃ।

৫। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত ১৩৯১ বৈশাখ সংস্করণ। এ প্রবন্ধে পরে 'বা-শ' রূপে উল্লেখিত।

৬। দুখণ্ডের এই বিশাল গ্রন্থের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র সংশোধন (তৃতীয়) খণ্ড যোগ করে লন্ডনের জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন কম্পানি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন ১৯৭০ সালে। পরে রূপা কম্পানি তার দেশী সংস্করণ প্রচার করেছেন।

৭। দ্র এই লেখকের 'ভাষা দেশ কাল' বইয়ের প্রবন্ধ 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা : রবীন্দ্রচিন্তার মানচিত্র', ১৯৮৫ কলকাতা, জি.এ.ই. পাবলিশার্স, [৩২-৫৮]।

৮। 'বা-শ'-তেও এই প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ আছে—'ভাষাবিচ্ছেদ'। এটি সম্বন্ধে আমরা শেষে মন্তব্য করব। তা ছাড়া 'আত্মশক্তি ও সমূহ' গ্রন্থের 'স্বদেশী সমাজ' এবং 'সফলতার সদুপায়'—এ দুটি প্রবন্ধেও এ বিষয়ে পার্শ্বিক ইঙ্গিত আছে।

৯। 'বা-শ' ১৭ পৃ। 'জীবনস্মৃতি'-র 'লোকেন পালিত' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আমাদের অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বাংলা শব্দতত্ত্বের একটা আলোচনা ছিল। তাহার উৎপত্তির কারণটা এই। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে আমাদের ভাষায় বানানের একটা ধর্মজ্ঞান আছে—পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, ইংরেজি বানানরীতির অসংযম নিতান্তই হাস্যকর ···কিন্তু আমার গর্ব টিকল না। দেখিলাম, বাংলা বানানও বাঁধন মানে না ; তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়মব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম। লোকেন এই বিষয়ে আমাকে যে সাহায্য করিত তাহাতে আমার বিস্ময় বোধ হইত।" 'রবীন্দ্র রচনাবলী' ১৭শ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ৩৭১ পৃ। ১৪-১৫ নং পাদটীকার সূত্রও পরে দ্রষ্টব্য।

১০। 'বা-শ' ১৭-১৮ পৃ।

১১। ঐ ১৮ পৃ।

১২। ঐ ২৩-২৫ পৃ।

১৩। ঐ ২৫ পৃ। পরে স্বরধ্বনির রূপান্তরবিষয়ক আলোচনার জন্য 'বাংলাভাষা পরিচয়'-এর ১২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (র-র শতবার্ষিকী সংস্করণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার), চতুর্দশ খণ্ড, ৪৬৮-৭৮ পৃ।

১৪। দ্র V. M. Zhirmunsky-র *Selected Writing*(1985) গ্রন্থের প্রবন্ধ 'On Synchrony and Diachrony in Linguistics', বিশেষত ২০ পৃষ্ঠা।

১৫। দ্র 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্র রচনাবলী ১৭শ, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ৩৬১ পৃ।

১৬। দ্র দেবীপদ ভট্টাচার্য প্রণীত 'রবীন্দ্র-চর্যা' ১৯৮৫, কলকাতা, জি.এ.ই. পাবলিশার্স, ৩২ পৃ। অধিকন্তু দ্র প্রশান্তকুমার পাল প্রণীত 'রবিজীবনী' ১ম, কলকাতা, (ভূর্জপত্র) ১৩৯১, ৫৩-৫৬ পৃ।

১৭। 'বাংলাভাষা পরিচয়', পূর্বোল্লেখ ৫০১ পৃ।

১৮। 'বা-শ', ১৩৬পৃ।

১৯। ঐ, ৮৬ পৃ।

২০। ঐ, ১২৬ পৃ।

২১। ঐ, ১৩১ পৃ।

২২। দ্র Firth, J. R., 1964, *Tongues of Men & Speech*, London oxford University Press.

২৩। 'বা-শ', ১৩৬ পৃ।

২৪। ঐ, ১৪৮ পৃ।

২৫। ঐ, ১৫৮ পৃ।

২৬। ১৩৩৯, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।

২৭। 'বা-শ', ১০৬ পৃ।

২৮। ঐ, ১১৫ পৃ।

২৯। ঐ, ২০৩ পৃ।

৩০। পরে 'তোতা-কাহিনী' জাতীয় রচনায় কিছুটা ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য থেকে সাধুভাষার আশ্রয় নিয়েছেন।

৩১। 'বা-শ', ১৩ পৃ।

৩২। ঐ, ২৩৫ পৃ।

৩৩। ঐ, ২৩৬ পৃ।

৩৪। 'চলন্তিকা', (ক) পৃ।

৩৫। 'বা-শ', ৩০১-০৮ পৃ।

৩৬। দ্র 'বাংলা বানান ও রবীন্দ্রনাথ', প্রীতীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গ', ১০-১৭ মে, ১৯৮৫, (রবীন্দ্র-সংখ্যা ১৩৯২), ১০২৬-২৮ পৃ।

৩৭। ঐ, ২৫৯ পৃ।

৩৮। ঐ, ২৭৭ পৃ।

৩৯। ঐ, ২৭৩ পৃ।

৪০। দ্র 'তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের বানান', সুরজিৎ ঘোষ সম্পাদিত 'প্রমা', ২৫ (রজত সংখ্যা), ২৮৩-৯১ পৃ। আরো দ্র এই লেখকের 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' (চিরায়ত প্রকাশন), ১৯৮৭।

৪১। 'বা-শ', ২০৯, ২৮৪ পৃ।

৪২। ঐ, ২৮৮ পৃ।

৪৩। ঐ, ২৯০ পৃ।

৪৪। ঐ, ২৮৯ পৃ।

৪৫। ঐ, ২৯২ পৃ।

৪৬। ঐ, ২০৬-০৯ পৃ।

৪৭। 'তাসের দেশ', দ্বিতীয় দৃশ্য।

৪৮। 'বা-শ', ২৪২ পৃ।

৪৯। ঐ, ১৯৬ পৃ।

৫০। বর্তমান লেখকের 'ভাষা দেশ কাল' গ্রন্থের 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' প্রবন্ধটি (১৬২-৭৯) দ্রষ্টব্য।

৫১। ৭-এর উল্লেখ দ্র।

৫২। র-র (শতবার্ষিকী সং) ১১, ৫৪৪ পৃ।

৫৩। ঐ, ৬৫৮ পৃ।

৫৪। ঐ, ৬৪৩ পৃ।

৫৫। 'ভাষা দেশ কাল' গ্রন্থের 'ভাষার ঘাটতি তত্ত্ব বার্নস্টাইনের বিভ্রান্তি' প্রবন্ধটি (১৪৪-৬২ পৃ) দ্রষ্টব্য।

৫৬। Christopherson, Paul, 1973, *Second Language Learning, Myth and Reality* Middlesex, Penguin.

৫৭। Jane Aitchison ভিডিও টেপে ভাষা-মনোবিজ্ঞানী হিসেবে শিশুর মস্তিষ্ক ও তার ভাষাশিক্ষার ক্ষমতা সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেন তা খ্রিস্টোফার্সনকেই সমর্থন করে।

৫৮। 'ভাষা দেশ কাল' ৪০-৪১ পৃ।

৫৯। র-র, (শতবার্ষিকী সং) ১১, ৫৪৪ পৃ।

৬০। প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'ছন্দ' ১৯৭৬, বিশ্বভারতী, ৬ পৃ।

৬১। প্রবোধচন্দ্র সেন ১৩৮৭, 'আধুনিক বাংলা ছন্দ-সাহিত্য', কলকাতা, অণিমা প্রকাশনী, ১৯ পৃ।

৬২। রবীন্দ্রনাথের বাংলা ব্যাকরণ-বিষয়ক বিশদ চিন্তা কী ছিল তার জন্য বর্তমান লেখকের 'পরিচয়' (শারদ ১৩৯৪) পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য-প্রীতি

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি

পরাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণী দেশের বৃহত্তর লোকসমাজ থেকে ক্রমেই দূরে সরে এলেন। জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটলেও দেশ তাদের কাছে অপরিচিতই রয়ে গেল। এত দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতার ফলে দেশের মধ্যে যে ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বৈষম্য দেখা দিল, নিজস্ব সম্পদের প্রতি মমত্ববোধের যে অভাব ও উপেক্ষা দেখা দিল,—রবীন্দ্রনাথই প্রথম সচেতনভাবে তা প্রকাশ করলেন। দেশের ভাষা ও ভাবকে, ব্রাত্যজনের সংস্কৃতিকে অনুধাবন ও শ্রদ্ধা না করে দেশকে জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি ঘটেছিল, কেন না দেশ ও লোকসমাজকে তিনি দূর থেকে দেখেননি, দেখেছেন মর্মমূলে প্রবেশ করে। এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন না ঘটলে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা যে অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়বে, এই বোধ কবির মধ্যে সদা-জাগ্রত ছিল।

এই উপলব্ধি ভাবাবেগ থেকে উৎসারিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বাংলার গ্রামীণ লোক জীবনকে অন্তরঙ্গভাবে জানতেন। কবি কোনো গ্রামসমাজকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন? তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই গ্রামসমাজকে যা দীর্ঘদিন ধরে নিস্তরঙ্গ রয়েছে, যেখানে তরঙ্গা-ভিঘাত আনা প্রায় দুঃসাধ্য। গ্রাম ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে বিভক্ত, জাতিভেদ প্রথা ও অলিখিত ক্রীতদাস প্রথার দ্বারা কলুষিত, স্বয়ংবিকশিত একটি সমাজব্যবস্থাকে গ্রামবাসীরা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এইভাবে আমদানি করেছে প্রকৃতির এমন পূজা যা মানুষকে পশু করে তোলে। প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে পশুরূপী দেবতার অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে। এর সঙ্গে এসে মিশল ঔপনিবেশিক পশুশক্তি। গ্রামের মধ্যে উৎসাহ ও চেষ্টার কোনো লক্ষণ নেই। পরস্পরের বিরুদ্ধে তুচ্ছ কলহে গ্রাম উন্মাদের মতো নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করছে তাকে প্রকৃতিস্থ করবার কেউ নেই।

এই গ্রামসমাজকেই রবীন্দ্রনাথ ভালোবেসেছিলেন, কেন না দেশ অর্থে তিনি বুঝেছিলেন গ্রামীণ ভারতবর্ষকে, আর দেশবাসী বলতে বুঝেছিলেন এই সব নিরক্ষর দৈবনির্ভর অন্নহীন স্বাস্থ্যহীন গ্রামবাসীকে। ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ও মানবিক বেদনাবোধ থেকেই এই ভালবাসা জন্মেছিল। তিনি গ্রামীণ মানুষের অবস্থা-দৈন্যের কথা জানতেন, জানতেন তাদের হাড়ভাঙা মজুরির কথা, মানসিক অপমান ও দুর্ভাগ্যের দাসত্বের কথা। আর সেই সঙ্গে সংবেদনশীল মন দ্বারা অনুভব করেছিলেন তাদের চিত্ত-জলাশয়ের গভীরতার কথা, হাঁফ ছাড়বার বায়ুর কথা। সেটা হল মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত উন্নত লোকসংস্কৃতি, সকল বৈষয়িক দীনতার মধ্যেও লোকসমাজ যাকে বাঁচিয়ে রাখে, আর এই মানবিক সম্পদ উত্তরপুরুষের ঐতিহ্যে মিশিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ গ্রামসমাজকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, ভালোবেসেছেন,—আর সংগত কারণেই সেই গ্রামীণ লোকসমাজের সংস্কৃতিকেও আপন ঐতিহ্যের মধ্যে

গ্রহণ করেছেন। কোনো সমাজের সংস্কৃতিকে ভালো না বাসলে সেই সমাজে অন্তর থেকে গ্রহণ করা অসম্ভব।

আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ-গবেষণা ও চর্চা করেন সাধারণত নাগরিক শিক্ষিত মানুষ। তাঁরা এই কাজকে গবেষণা হিসেবেই শুধু গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম-গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে লোকমানসের পরিচয় পেলেন, তাদের মানসিক সম্পদের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। দেশের মর্মবাণীর সন্ধান পেলেন। যে মানুষগুলির পরিবেশ এমন দুঃখ-দৈন্যে ভরা, যে গ্রাম উপেক্ষার অবিচার সহ্য করে মৃতপ্রায়,—সেখান থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে এমন উন্নত লোকসাহিত্য। কবি তখন এগুলিকে সংগ্রহ করতে ব্রতী হলেন। মনে রাখতে হবে, তিনি শুধু সংগ্রহই করলেন না নিজের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে সেগুলি বিশ্লেষণও করলেন। অথচ এ দেশে তখনও লোকসংস্কৃতি-চর্চার কোনো ধারা ও পদ্ধতিই গড়ে ওঠেনি। জনজীবনের শরিক হয়ে রবীন্দ্রনাথ এই মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত সংস্কৃতির চর্চা করেছিলেন বলেই তাঁর সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে কোনো ফাঁকি ছিল না। তাঁর সংগ্রহে তথ্যানুসন্ধানের কোনো আরোপিত ও উদ্দেশ্যমূলক দীন প্রবণতা ছিল না।

লোকসাহিত্যের ঢিলেঢালা উন্মুক্ত উদার প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ বিচরণ করেছেন। তাঁর বিপুল সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে আমরা লোক-ঐতিহ্যের অসংখ্য উপাদান সংগ্রহ করতে পারি। অনেকে ভাবেন, রবীন্দ্রনাথের উপরে এগুলি লোকসংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব। প্রভাব নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাৎক্ষণিক কোনো প্রভাব নয়, প্রত্যক্ষ প্রভাব তো কোনোভাবেই নয়। মহৎ চিরায়ত সাহিত্য কোনো অবস্থাতেই লোকঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে পারে না। রবীন্দ্রসাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সৃষ্টির যন্ত্রণায় রবীন্দ্রনাথ যখন কোনো মহৎ সাহিত্য রচনা করছেন, তখন সহজ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখনীতে লোকঐতিহ্যের উপাদান এসে উপস্থিত হচ্ছে। এর জন্য কোনো সচেতন প্রয়াস কিংবা তাৎক্ষণিক প্রভাবের প্রয়োজন পড়েনি। কেন না, রবীন্দ্রনাথ আবাল্য লোকায়ত সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেন। তাঁর রক্তে-চিন্তায়-মননে শিশুকাল থেকে লৌকিক ভাবনা সক্রিয় ছিল, পরবর্তীকালে গ্রামীণ মানুষের সাহচর্যে তা আরও ঘনিষ্ঠ হয়। তাই তাঁর কাব্য সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডারের মধ্যে লৌকিক মানসিকতার যে ব্যাপক উপাদান আমরা দেখতে পাই, লোকসাহিত্য-প্রীতির যে নিবিড় পারম্পর্য লক্ষ করি,—তার উৎস অনুসন্ধানের জন্য কবির ছেলেবেলার কল্পনার জগতে আমাদের পৌঁছতে হবে। সেই অসম্ভবের স্বপ্নজগতে ছেলেবেলায় তিনি স্নাত হয়েছিলেন বলেই উত্তরজীবনে লোকায়ত জীবনের রূপসাগরে ডুব দিতে পেরেছিলেন অতি সহজে, আর সন্ধান পেয়েছিলেন অরূপরতনের।

রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথ-হারা

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, লোকসাহিত্যের মতো স্বদেশী জিনিস আর নেই। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২০শে ভাদ্র দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুমার ঝুলি' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—"স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দুলে।··· কোথায় গেল রাজপুত্র··· কোথায় বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, কোথায়—সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মাণিক!" বিদেশের কলে তৈরি বিলাতের রূপকথায় সেদিনের ছেলেদের মন ভরাতে হয়

বলে কবি দুঃখ করেছেন। কেন না তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "আমাদের দেশের রূপকথা বহু যুগের বাঙালি বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। ··· নিখিল বঙ্গদেশের সেই চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।"

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি ঘটেছিল ছেলেবেলায়। তিনি হয়তো বেশি পরিমাণে 'দিদিমা কোম্পানী'কে পাননি, কিন্তু পেয়েছিলেন স্নেহময়ীদের মুখের কথা, দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা। মাতৃদুগ্ধের অফুরন্ত ধারা থেকে বঞ্চিত হননি। ছেলেবেলায় স্মৃতি উজ্জ্বল ছিল বলেই তিনি জানেন, বাঙালির ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন শুধু গল্প শুনেই সে সুখী হয় না, সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুর তার তরুণ-চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে বাংলার রসে উজ্জীবিত করে। লোকসাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ছাড়া এই অনুভব সম্ভব নয়।

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে লেখা 'বালক' কবিতায় সুবৃদ্ধ কবি তাঁর ছেলেবেলার মানসিকতা প্রকাশ করেছেন। লোকসাহিত্যের ভাবনাই এর মধ্যে বিধৃত হয়ে রয়েছে। তখন কাঁচা বয়স, হাল্‌কা দেহখানা পাখির মতো, শুধু ছিল না ডানা, লবকুশের ছড়া শুনে পাঁচালির দলে ভর্তি হওয়ার বাসনা জাগত, হয়তো ছাদের কোল ঘেঁষে মেঘ নেমেচে, অন্ধকারে শোনা যেত রিম্‌ঝিমিনি ধারা, আর রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথ-হারা। শৈশবের সেই সব দিনে মনে যে সব চিত্রকল্প আঁকা হয়ে গিয়েছে, তা কি কখনও ভুলে যাওয়া যায়?

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত-আট বছর। অন্যের মুখে শোনা ছড়া আওড়াতেন, ছড়ার মধ্যে নিজের তৈরি দু-একটি শব্দও জুড়ে দিতেন। তখন তাঁর সময় কাটত চাকরদের মহলে। তোশাখানার দক্ষিণভাগে বড়ো একটা ঘরে মাদুর-পাতা আসরে ছোট্ট রবীন্দ্রনাথ অনেক কল্পকাহিনী শুনেছেন। ঠাকুরমাদের আমলের পালকিখানা তাঁর কল্পনাকে রাঙিয়ে তুলত। গ্রামের পাঠশালায় এক সময়ে যে গুরুগিরি করত সেই ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধ্যেবেলায় শুনতেন কৃত্তিবাসের সাত-কাণ্ড লোকায়ত রামায়ণ। কিশোরী চাটুজ্জের কাছে শুনেছেন রামায়ণের পাঁচালি। রাত হয়ে এলে মাদুর-পাতা বৈঠক যেত ভেঙে। ভূতের ভয় শিরদাঁড়ার ওপর চাপিয়ে চলে যেতেন বাড়ির ভেতরে মায়ের কাছে। মা তখন খুড়িকে নিয়ে তাস খেলছেন। ছেলের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে মা বলতেন, খুড়ি ওদের গল্প শোনাওগে। বাইরের বারান্দায় ঘটির জলে পা ধুয়ে দিদিমাকে টেনে নিয়ে বিছানায় উঠে বসতেন। 'সেখানে শুরু হত দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে আনার পালা।'

বাড়িতে তখন চলেছে নাটকের পালা, ছোটোদের সেখানকার আমোদে ভাগ বসাবার অধিকার ছিল না,—তখন ছেলেরা বিছানায়, পিয়ারী কিংবা শংকরী গল্প শোনাচ্ছে, রূপকথার গল্প। 'সেখানে শুনতে শুনতে শেষ হতে পায় না—রাজপুত্তুর চলেছে তেপান্তর মাঠে....।'

পইতা হবার পরে রবীন্দ্রনাথ গেলেন হিমালয়ে, কয়েক মাস সেখানে থাকবার পরে পিতা অনুচর কিশোরী চাটুজ্জের সঙ্গে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়। জীবনস্মৃতির 'প্রত্যাবর্তন' অংশে তিনি বলেছেন,—"রাত্রে আহার সারিয়া বাহিরের বারান্দায় জল দিয়া পা ধুইয়া একটা মস্ত বিছানায় আমরা তিনজনে শুইয়া পড়িতাম—শংকরী কিম্বা প্যারী কিম্বা

তিনকড়ি আসিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া তেপান্তর-মাঠের উপর দিয়া রাজপুত্রের ভ্রমণের কথা বলিত, সে কাহিনী শেষ হইয়া গেলে শয্যাতল নীরব হইয়া যাইত।"

ছেলেবেলায় এই প্রীতির ছোঁয়া তিনি তাঁর স্মৃতিতে ধরে রেখেছিলেন। কবির চিন্তাগত ঐতিহ্যে এই প্রীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল।

১৩২৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে 'রাজপুত্তুর'-এ লিখলেন,—পৃথিবীতে আর-সকলে টাকা খুঁজছে, নাম খুঁজছে, আরাম খুঁজছে—আর, যে আমাদের রাজপুত্তুর সে দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েছে। তুফান উঠল, নৌকো মিলল না, তবু সে পথ খুঁজছে। এইটেই হচ্ছে মানুষের সব গোড়াকার রূপকথা আর সব-শেষের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেচে দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, আর ছোটো মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করছে—'বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব'।

'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৮০ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলার এই অনুভূতির কথা আবার প্রকাশ করেছেন। জ্যোৎস্নারাতে যখন চরে বেড়ান তখন তিনকড়ি দাসীর কথা তাঁর মনে পড়ে। "ছেলেবেলায় সেই রাত্রে তিনকড়ির এই একটি কথায় আমার মনটা ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—প্রকাণ্ড মাঠ ধু ধু করছে, তারই মধ্যে ধবধবে জ্যোৎস্না হয়েছে, আর রাজপুত্র অনির্দেশ্য কারণে ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণে বেরিয়েছে—শুনে মনটা এমনি উতলা হয়েছিল।"

ছেলেবেলার যে প্রীতি শ্রুতির মাধ্যমে এতদিনে বয়ে এসেছিল, যে প্রীতি শুধু কল্পনার জগৎকেই গড়ে তুলেছিল, সেই প্রীতির বাস্তব প্রকাশ ঘটল রবীন্দ্রনাথের বাইশ বছর বয়সে। ১২৯০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় 'বাউলের গান' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। লোকসাহিত্য সম্পর্কে সচেতনভাবে লেখা রবীন্দ্রনাথের এটিই প্রথম প্রবন্ধ। সন্ধ্যাসংগীত-এর ঠিক পরেই প্রভাতসংগীত রচনাকালে কবি যখন নিজের স্বাতন্ত্র্য ও কাব্যভাষা খুঁজে পেয়েছেন এই লেখাটি সেই সময়ের। এই প্রবন্ধে একটি বিষয়ে কবি যে মন্তব্য করেন তা তাঁর পরবর্তীকালের লোকসাহিত্য সংগ্রহ-প্রীতির পূর্বাভাস বলে মনে হয়,—"বাঙ্গালা ভাব ও ভাবের ভাষা যতই সংগ্রহ করা যাইবে ততই যে আমাদের সাহিত্যের উপকার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিই তাঁকে এই বিশেষ ক্ষেত্রে অমর করে রাখবে।

আমি মানুষ হচ্ছিলুম এই শিলাইদহে

ছেলেবেলার পারিবারিক পরিবেশে কবি যাদের রূপকথা-ছড়া শুনে মনের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছিলেন, এবার সেই মৌখিক সাহিত্যের স্রষ্টাদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলেন। লোকসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মাল। এই পর্বেই আমরা কবির লোকসাহিত্য-প্রীতির দ্বিতীয় প্রভাবের পর্যায় বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই পর্বের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করল।

জাতীয় চেতনা, দেশপ্রেম ও পল্লীপ্রীতি এই সময়ে কবিকে নতুন ভাবনায় উদ্দীপিত করল। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন, তথাকথিত শিক্ষিত নাগরিক ভারতবাসী দেশের অন্তস্থল থেকে চিন্তায় ও কর্মে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, গ্রামীণ সমাজ থেকে এই শ্রেণীর দূরত্ব

বেদনাদায়কভাবে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অথচ দেশের প্রাণকে অর্থাৎ গ্রামসমাজকে উপেক্ষার অন্ধকারে রেখে দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব। এর ফলে জাতীয় জীবনে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে অধিকাংশ জাতীয় নেতাই উদাসীন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থেকেও এই বিষয়ে সোচ্চারে দেশবাসীকে সচেতন হতে আহ্বান জানিয়েছেন। এই আহ্বান আমরা বেশি করে শুনতে পাই এই পর্বে। দেশ রবীন্দ্রনাথের কাছে কোনো বিমূর্ত ভাবালুতা হিসেবে দেখা দেয়নি। ভারতমাতার ধারণা তাঁর চিন্তায় ছিল অন্য রকম, অত্যন্ত বাস্তব। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তরের পরিচয় লাভ করতে হবে, তাদের সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙক্ষা-ক্ষুদ্রতা-নীচতা-সংস্কারের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হতে হবে, কৃষকের জীবনের শরিক হতে হবে, আপামর সাধারণ মানুষের দেশজ সাহিত্যের ভাব ও ভাষার অপরূপ সম্পদকে নিজেদের মহান ঐতিহ্য বলে স্বীকার করতে হবে,—তবেই জানা যাবে প্রকৃত দেশ ও দেশবাসীকে। এই বাস্তব উপলব্ধির কথা তিনি বারবার প্রকাশ করেছেন। দেশমাতা শুধু হিমালয়েই থাকেন না, তিনি থাকেন ম্যালেরিয়াজীর্ণ গ্রামগঞ্জের উপেক্ষিত মৃতপ্রায় রোগীর পাশেও। শিক্ষিত শ্রেণী যে সাহিত্য সেদিন সৃষ্টি করেছিলেন, তার মধ্যে বাঙালিত্বের অভাব, জনমানসের অনুপস্থিতি তাই কবিকে ব্যথিত করে তুলেছিল। এই দেশ-চেতনা প্রতিষ্ঠিত করবার প্রেরণাতেই বাংলাদেশের ভাব ও ভাবের ভাষাকে সংগ্রহ করবার এক তীব্র আকাঙক্ষা কবির হৃদয়ে জাগ্রত হল। মনে রাখতে হবে, দেশের মানুষের প্রতি সত্যিকার অনুরাগ না জন্মালে খাঁটি স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতির উৎসার ঘটা সম্ভব নয়। বিশাল ব্যাপ্ত গ্রামীণ লোকসমাজের মনের গভীরে প্রবেশ করবার আন্তরিক আকাঙক্ষা থেকেই রবীন্দ্রচিন্তায় স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটেছিল এবং প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুবাদে সেই দেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি বিকশিত হয়েছিল। আর এই বোধের পরিণতিতে জন্ম নিল লোকসংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও আন্তরিক প্রীতি। বাইশ বছর বয়সে ১২৯০ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় যখন তিনি লিখলেন,—'যে ব্যক্তি নিজের ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাষায় নিজে কথা কহিতে শিখিয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই।' এই আনন্দের অনুসন্ধানই কবির পরবর্তী জীবনে লোকসংস্কৃতি চর্চার মূল প্রেরণা হিসেবে উৎসারিত হয়েছে। গ্রাম্য গাথা ও প্রচলিত গানগুলি সকলে মিলে সংগ্রহ করলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উপকার হবে, দেশের লোকদের ভালোভাবে চেনাজানা সম্ভব হবে, লোকসমাজের সুখ-দুঃখ-আশা-ভরসা তখন আর অপরিচিত থাকবে না,—এই অনুভব কবিকে লোকসাহিত্য সংগ্রহে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল।

গ্রাম ও গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সত্যিকার পরিপূর্ণ সংবেদনশীল মানুষ হয়ে উঠলেন। আর তাঁকে এই মনুষ্যত্ব অর্জনে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করল পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ গ্রাম।

জমিদারির তদারক করতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায়ই যেতেন শিলাইদহে। একবার সঙ্গে নিলেন বালক রবীন্দ্রনাথকে। তিনি বুঝেছিলেন, বালক রবীন্দ্রনাথের ছিল আকাশে-বাতাসে চড়ে-বেড়ানো মন, সেখান থেকে বালক আপনা হতেই খোরাক পায়। এই গ্রাম দেখা ছিল বালকোচিত কৌতূহলে ঘেরা।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিলাত থেকে কলকাতা ফিরে আসবার পরে কয়েক মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে শিলাইদহ-পতিসর-সাজাদপুরে জমিদারির কার্যভার গ্রহণ করতে হয়। তিনি যাত্রা করলেন পূর্ববঙ্গে। এর আগেও তিনি বহুবার এ সব অঞ্চলে এসেছেন, কিন্তু কার্যভার গ্রহণের পর থেকেই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড়তর হল। গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে গভীরতর বোধ ও লোকসাহিত্য-প্রীতির মূল ভিত্তিভূমি এখানেই রচিত হল।

ঠাকুর পরিবারের হৃদয়ের মধ্যেই ছিল স্বাদেশিকতার প্রেরণা। পারিবারিক ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই কবির মনে স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জেগে উঠেছিল। পিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রবল স্বদেশপ্রেমের প্রভাব পরিবারে সঞ্চারিত হয়ে পড়েছিল। তাঁদের পরিবারে চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা চলে আসছিল। তবু মনে রাখতে হবে, এই স্বাদেশিকতার ভাবনার মূল উৎস ছিল ভাবাবেগ, রবীন্দ্রনাথ সেই সময়কে বলেছেন, 'উন্মত্ততার সময়'। হয়তো সেই প্রাথমিক যুগে এটাই ছিল স্বাভাবিক। উপকরণের বাহুল্য ছিল, প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠ মানসিকতা গড়ে উঠবার আগে এই বাহুল্য স্বাভাবিক। কিন্তু দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগে কোনো খাদ ছিল না। এই ভাবাবেগ, স্বপ্নময় অনুরাগ ও উন্মত্ততা প্রকৃত স্বদেশপ্রেমে-স্বজাতি-প্রীতিতে-গ্রামপ্রীতিতে বিবর্তিত হল শিলাইদহের বাস্তব অভিজ্ঞতায়।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামপ্রীতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলে তাঁর লোকসাহিত্য-প্রীতির উৎসধারাটিরও সন্ধান মিলবে।

এই কখানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ

রবীন্দ্রনাথ মধ্য-যৌবনেই প্রতিভাবান কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। পারিবারিক সূত্রে জমিদার হয়ে গ্রামের বাসিন্দা হয়েছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের দেশের কোনো শিল্পী-সাহিত্যিকই রবীন্দ্রনাথের মতো সমবায় কিংবা গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করেননি, কিংবা তাঁর মতো চিন্তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে এগিয়ে আসেননি। শিল্পী-সাহিত্যিক গ্রামের সমস্যার কথা ভেবেছেন, শিল্পে তাকে রূপ দিয়েছেন, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বাস্তব উন্নয়নের কাজে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেননি। কেন না, বিশেষ সমাজব্যবস্থায় শিল্প ও সাহিত্যের জগৎ আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে।

তা হলে এখানে কি রবীন্দ্রনাথের জমিদার-সত্তাটি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল? জমিদাররা নানা দান-ধ্যান-উন্নয়ন করে আসছেন সুদূর অতীতকাল থেকে। তাঁরা পুকুর কাটান, মন্দির গড়েন, পান্থশালা-ধর্মশালা তৈরি করেন, নদীতে ঘাট বাঁধিয়ে দেন, পাঠশালা-টোল প্রতিষ্ঠা করেন। এ সব আংশিক সত্যি। কিন্তু এই সব কাজের পেছনে কোন্ মানসিকতা সক্রিয় থাকে? এর পিছনে দুটি কারণ রয়েছে। প্রথম হল এক ধরনের ধর্মবোধ। এই ধর্মবোধ কিন্তু ব্যক্তিগত সংকীর্ণ চিন্তাজাত। জীবনে অন্যায় কাজের তো সীমা-পরিসীমা নেই, অন্যকে বঞ্চনা করাই তো পেশা,—তাই এই সব 'পুণ্য' কাজের পিছনে থাকে পরলোকের নরকযন্ত্রণা অপসারণের প্রচেষ্টা। এই সব কাজ করলে জাগতিক অপরাধের স্খলন ঘটবে ও অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে! দ্বিতীয় কারণ হল অহংমন্যতা ও আত্মম্ভরিতা। জমিদার হিসেবে নাম কেনা যাবে, নিজের সম্পদ সম্পর্কে অন্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যাবে। কাজগুলোর মধ্যে এক ধরনের দম্ভ প্রকাশের প্রবণতা থাকে যা মর্যাদাবৃদ্ধির এক সহজ পথ।

অন্যধারে রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে এই সব মানসিকতার সামান্যতম কোনো পরিচয় মিলবে না। গ্রামীণ মানুষের মধ্যে সমষ্টিগত কর্মপ্রচেষ্টা জাগিয়ে তুলে গ্রামকে স্বয়ম্ভর করবার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশেষ করে সমবায় প্রথা ও উন্নত কৃষিব্যবস্থা রূপায়ণে তিনি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাতে তাঁর বৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। তাই অন্য জমিদারের মতো কৃষকদের তিনি 'দরিদ্র নারায়ণ' ভাবেননি, এই অভিধাটিকে তিনি ঘৃণা করতেন। কবির কাছে এদের পরিচয় ছিল উপেক্ষিত মানুষ হিসেবে, এরা জনসাধারণ, লোকসাধারণ। দাক্ষিণ্য প্রদর্শন নয়, মানুষ হিসেবে তাদের স্বীকৃতি জানানো ও সেই বোধ থেকেই তাদের জন্য বাস্তবসম্মত উন্নয়নের কাজ করা। দান-ধ্যানের মানসিকতা তাঁর ছিল না বলেই তিনি কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেছিলেন। আর এর ফলে 'কৃষি ব্যাংক থেকে কর্জ নেবার চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। কালীগ্রাম পরগণার মধ্যে বাইরের মহাজনরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। ...ব্যাংক খোলার পর বহু গরিব প্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণমুক্ত হবার।' অন্যান্য সামন্ত প্রভু জমিদারের সঙ্গে এইখানেই মূল প্রভেদ রবীন্দ্রনাথের। কৃষকের জীবনের বহু আকাঙ্ক্ষিত ঋণমুক্তির স্বপ্ন সফল হল কবির সেই গ্রামে। এই তো দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তকে ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল সেদিনের প্রধানতম কাজ। কবি পথ দেখিয়েছিলেন, তিনি আশা করেছিলেন সেই পথ বেয়ে অসংখ্যা প্রদীপ জ্বলে উঠুক। কিন্তু সেদিন এই দৃষ্টান্তকে ছড়িয়ে দেবার লোকের বড়ো অভাব ছিল।

কোনো গ্রামসমাজকে কবি সেদিন দেখেছিলেন? সেই নিস্তরঙ্গ গ্রামসমাজ যার জীবনে তরঙ্গাভিঘাত আনা ছিল প্রায় দুঃসাধ্য। কিন্তু দেশহিতৈষণার প্রগাঢ় আকাঙক্ষায় কবি সেদিন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেননি। অনড় আচারসর্বস্ব ও হীনম্মন্যতার শিকার বাংলার গ্রামকে কবি কত গভীরভাবে জেনেছিলেন তারও প্রমাণ রয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে,—"গ্রামের কোলে মানুষ বাঁশবনের ছায়ায় কাউকে খুড়ো কাউকে দাদা বলে ডাকলেই যে গ্রামকে সম্পূর্ণ জানা যায় এ কথা সম্পূর্ণ মানতে পারিনে। আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তার পরিমাণ অল্প হতে পারে, কিন্তু তবুও সেটা অভিজ্ঞতা, সুতরাং তার মূল্য বহু পরিমাণ অলস জ্ঞানের চেয়েও বেশি।"

এই অলস জ্ঞান আমাদের সমাজে সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। কোনো রকম উদ্যোগ-আয়োজন নেই। কবি সেই পথে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেননি, করেছিলেন ব্যাপক গভীর অভিজ্ঞতা। নইলে গ্রামের মানুষের উদ্যোগহীনতার এমন চিত্র তিনি আঁকতে পারতেন না,—'গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল, আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে, কেন না দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ।'—রবীন্দ্রনাথ গ্রাম সমাজের মূল অসুখ ধরতে পেরেছিলেন, কেন না তিনি গ্রামকে চিনেছিলেন, ভালোবেসেছিলেন। নিজস্ব সংস্কৃতির অংশীদার হিসেবে গ্রামবাসীকে মনে করতেন বলেই আর্থিক দীনতা ও মানসিক অন্ধকার থেকে তাদের মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন।

লোকজীবন সম্পর্কে কবি শুধু অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেননি। তিনি সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করে গ্রামীণ মানুষের ঐহিক ও মানসিক উন্নয়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি জানতেন যে, এ কাজে প্রয়োজন ধৈর্য, প্রেম ও নিভৃত তপস্যা। দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যারা দুঃখী তাদের দুঃখের ভাগ নিয়ে সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করতে তিনি

জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে কবি পেয়েছিলেন বাধা, অবিশ্বাস দানা বেঁধেছিল তাঁর কাজকর্মকে ঘিরে। তবু তিনি অলস জ্ঞান নিয়ে বসে থাকেননি।

কবি জানতেন, বাইরে থেকে উন্নয়নের প্রচেষ্টা আরোপ করা যায় না, নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে হবে নিজেদেরই। অন্যেরা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারেন। স্বয়ম্ভরতা ও নিজেদের গ্রামের প্রতি বিশ্বাস জাগানোই মূল কথা। এ কাজ করাতে না পারলে স্বরাজ-স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কথাকে পরিহাস বলে মনে হবে,—এই মনোভাব কবিকে চালিত করেছিল।

যে গ্রামীণ লোকসমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, তাদের সংস্কৃতির প্রতিও তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হলেন। সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় লাভ না করলে তাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টাও খণ্ডিত হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতির চর্চার প্রেরণা হিসাবে তাঁর এই স্বাদেশিকতা-গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা-দেশপ্রেম-বাস্তব মানবিকতাবোধ ও পল্লীপ্রীতির প্রেক্ষাপটটি আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলার লোকায়াত সংস্কৃতির স্বরূপ প্রথম আবিষ্কার ও উপলব্ধি করেন, বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করেন এবং সেই হাটবাটের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজের মনন-কল্পনার আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি

এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের মনে-মননে-চিন্তায় লোকসাহিত্য-প্রীতি গড়ে উঠল। এইবার শুরু হল তার বাস্তব অনুশীলন ও সংকলন। গ্রামবাসী কবি শিলাইদহ পর্বে ছেলে-ভুলোবার জন্য যেসব মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত মেয়েলি ছড়া রয়েছে তা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। আর এই সংগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩০১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশ করলেন 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটি। পরে এটি 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এর আগেও বাংলা ভাষায় লোকসাহিত্যের নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই প্রবন্ধটি বাংলার লোকসংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এক দিগন্ত খুলে দিল। এই সময় থেকেই বাংলায় লোকসংস্কৃতিচর্চার সত্যিকার সূত্রপাত হল। কেননা, রবীন্দ্রনাথই প্রথম গবেষক যিনি সংকলিত সম্পদগুলির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হলেন। লোকসাহিত্য শুধু সংগ্রহের সামগ্রী নয়, তার সাহিত্যগত ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও যে সমানভাবে প্রয়োজন তা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন। আর রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা ছিল অসাধারণ বস্তুনিষ্ঠ। শুধু হৃদয়াবেগ ও ভাবালুতা সম্বল করে যে লোকসংস্কৃতিচর্চা তা মূল্যহীন হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথই সংগৃহীত ছড়াগুলির মননশীল ব্যাখ্যা করে লোকসংস্কৃতিচর্চার বৈজ্ঞানিক বিষয়গত শৃঙ্খলার প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট করেন। তাঁর এই উপলব্ধি যে কত গভীর বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল তা আমরা জানতে পারি তাঁরই একটি উক্তি থেকে, "যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না।"

কবি কয়েকবার বলেছেন, ছড়ার মধ্যে যে অপূর্ব আদিমতা, আদিম সৌকুমার্য, অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস যুক্তিসংগতিহীন রস রয়েছে তারই আকর্ষণে তিনি ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

ছড়ার মধ্যে যে সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস রয়েছে সেইটিই কবির কাছে অধিকতর আদরণীয় বোধ হয়েছিল। ছড়া সংগ্রহের পিছনে প্রাথমিক এই তাগিদ থাকলেও পরে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, লোকসাহিত্যের মধ্যে ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে এগুলির বিশেষ মূল্য রয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ। আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী আগে লোকসংস্কৃতির বিশ্লেষণের প্রশ্নে এই ধরনের অনুভব যে কত গভীর মননজাত ও বিজ্ঞাননির্ভর তা বোধহয় ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। অনেক বিষয়ের মতো লোকসংস্কৃতি চর্চা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ।

লোকসমাজের লোকয়াত সংস্কৃতির মহৎ উজ্জ্বল ও কার্যকর ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি দীর্ঘদিন ধরে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। এই চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে উচ্চারিত কিছু মন্তব্যে : বাংলাদেশের সবগুলি উপভাষার তুলনাগত ব্যাকরণ রচিত হবে। বাংলার ব্রত-পার্বণের বিভিন্ন অঞ্চল-ভিত্তিক পাঠগুলি সংগ্রহ করা দরকার, স্থানভেদে সামাজিক প্রথার বিভিন্নতার কারণে সব অঞ্চলের ব্রতকথাই সংগৃহীত হওয়া উচিত। 'নিম্ন শ্রেণীর' লোকের মধ্যে যে-সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাদের বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। ছড়ার কোনো পাঠই বর্জনীয় নয়। এইসব মন্তব্য থেকে কবির লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক প্রগাঢ় মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির সঠিক উপলব্ধিতে ধরা পড়েছিল যে এগুলি 'আমাদের জাতীয় সম্পত্তি'।

লোকসংস্কৃতি-বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গিটি একান্তই নিজস্ব এবং সেটাই স্বাভাবিক। এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতির স্রষ্টাও কবি নিজে। কেন না এক্ষেত্রে তাঁর অন্য কোনো পূর্বসূরি নেই। এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতিটি তাঁকে নিজেই উদ্ভাবন করতে হয়েছে,—আর এক্ষেত্রে এক অননুকরণীয় সাফল্য তিনি অর্জন করেছেন।

লোকসাহিত্য-বিশ্লেষণে তিনি সমালোচনার 'বাঁধি বোল' ও 'বাঁধা ওজন' পরিহার করে নতুন এক পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন। এখানে আত্মকথার বিষয়টি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কেন না, লোকসাহিত্যের রসাস্বাদের সঙ্গে ছেলেবেলাকার স্মৃতিকে কবি কোনোভাবেই বিভক্ত করে দেখতে পারেননি। লোকসাহিত্যের এইসব উপকরণ সাহিত্যের আদর্শের ওপর নির্ভর করলেও কবির বাল্যস্মৃতির মাধুর্যও কম কার্যকর নয়। বাল্যকালে কবির কাছে এইসব ছড়া ছিল মোহমন্ত্রের মতো। তাই, কত মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য-তত্ত্বকথা-নীতিপ্রচার প্রভৃতি প্রতিদিন ব্যর্থ ও বিস্মৃত হচ্ছে, অথচ এইসব 'অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত' হয়ে আসছে। কেন না, কবি জানেন, এর মধ্যে একটি চিরত্ব আছে।

মৌখিক লোকসাহিত্যের স্রষ্টা কোনো একক ব্যক্তি নন। একজন সৃষ্টি করলেও তা সমগ্র গোষ্ঠিসমাজের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। গোষ্ঠিমানুষ সেই সম্পদকে স্বীকৃতি না জানালে তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। তাই লোকসংস্কৃতির গবেষকেরা বলেন, লোকসাহিত্যের বিশেষ কোনো একক স্রষ্টা থাকতে পারেন না। লোকসংস্কৃতিচর্চার সেই আদিকালেই রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বলেছেন, 'কোনোটির কোনোকালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই।' স্বাভাবিক চিরত্বগুণে এরা একই সঙ্গে নতুন ও পুরনো। কেননা, এগুলির সৃষ্টির কোনো সাল-তারিখ থাকে না।

লোকসাহিত্যের মধ্যে অনেক সময় এমন সব রুচি প্রকাশিত হয় যা সকলের প্রীতিকর নাও হতে পারে। আসলে লোকসমাজের মানসিকতা অনুধাবন করতে না পারলে বিষয়টির বিজ্ঞাননির্ভর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথকেও দু-একটি শব্দ বড় বিব্রত করেছিল। তবু তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, কিছু সীমাবদ্ধতা ও রুচিভেদগত অসুবিধা থাকলেও লোকসাহিত্য স্থায়িভাবে সংগ্রহ করে রাখা কর্তব্য। আর এই মৌখিক ঐতিহ্যের সব পাঠই সমান গুরুত্ব দিয়ে সংকলন করা দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, লোকসাহিত্যের বিশুদ্ধ বা আদিম পাঠ বলে কিছু নির্ণয় করবার উপায়ও নেই, প্রয়োজনও নেই। ঐতিহ্যের পথ বেয়ে হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও গ্রামীণ সাহিত্য জড়িত-মিশ্রিত-পরিবর্তিত হয়ে আসছে, এগুলি 'দেশকালপাত্রবিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে।' ভাবতে বিস্ময় লাগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই বিষয়ে ফিনল্যান্ড-গ্রেটব্রিটেন-আমেরিকা-সোভিয়েত ইউনিয়ন-নরওয়ে-ডেনমার্ক-এ লোকসংস্কৃতিবিদেরা পৃথিবীর লোকসাহিত্য সংগ্রহকে ভিত্তি করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই সুদূর কালেই একই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে গিয়েছেন। লোকসংস্কৃতি ও লোকসমাজের মর্মমূলে প্রবেশ করতে না পারলে এমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

মেয়েলি বা ছেলেভুলানো ছড়া কবিসংগীত ও গ্রাম্যসাহিত্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি কবিতানির্ভর সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। এইসব ছড়া-গান-কবিতার চিত্রকল্প ব্যাখ্যার সময় রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্যিক মাধুর্যই প্রকাশ করেননি, লোকসমাজের সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বভিত্তিক সমাজমানসিকতার সন্ধানও করেছেন। তিনি বলেছেন, এইসব ছড়া 'নিয়ত-পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র'। তাই অন্তরের পরিচয়টি যে কবিকে নিতেই হবে। বাংলার গ্রামের সহজ সরল গরিব নিরক্ষর মানুষের সামাজিক মনটি ধরা পড়েছে এইসব ছড়া-গানে। তাদের প্রীতি-স্নেহ-প্রেম-যাতনা-হাহাকার-দুঃখ-আকাঙ্ক্ষা-নীচতা-দীনতা-ঈর্ষা সব-কিছুর সন্ধান পাওয়া যাবে এই লোকসাহিত্যের মধ্যে। শুধু প্রয়োজন বিশ্লেষণী মন। এই মন ছিল রবীন্দ্রনাথের। তাই অসংলগ্ন ছড়া-গানের মধ্যেও তিনি সমাজভাবনাকে খুঁজে পেয়েছেন,—'উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখদুঃখ শতধাবিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ···এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।' নাগরিক সভ্যতার প্রভাবে ছড়াগুলো ক্রমশই বিস্মৃত হয়ে আসছে বলে কবি বুঝতে পেরেছিলেন। সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস এইসব লোকসাহিত্যের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ যখনই উপলব্ধি করলেন তখনই তিনি লিখলেন, 'অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।'

তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে

অতীত ঐতিহ্যের মহান প্রতিনিধি লোকসাহিত্য রবীন্দ্র-সাহিত্যকেও প্রভাবিত ও আন্দোলিত করেছে। যে সাহিত্য চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় তার অন্তরলোকে লোকায়ত সংস্কৃতির ভাব-ভাবনা সর্বদাই অনুরণিত হতে দেখা যায়। কেননা ঐতিহ্য-বিচ্ছিন্ন কোনো শিল্প-সাহিত্যই চিরায়ত সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ বাংলার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার ভাবধারায় আপ্লুত হয়ে নিজের সৃষ্টিশীল সাহিত্য-

ভাবনাকেও অনন্য করে তুললেন। লোক-ঐতিহ্যের সঙ্গে তার মানস-সংযোগের মেলবন্ধনে যে বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্য গড়ে উঠল তার পরিচয় আমরা জানি। বৌদ্ধযুগীয় সিদ্ধাই-যোগী থেকে শুরু করে আউল-বাউল-বৈষ্ণব-বৈরাগী প্রত্যেকের ভাণ্ডার থেকেই তিনি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বিষয়, চিন্তা ও মননের উপাদান সংগ্রহ করে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করলেন। লোকসমাজের বিচিত্র ভাবনা ও উপকরণ তাঁর রচনা, বিশেষ করে কবিতা-গান ও নাটককে বৈচিত্র্যে ও ঐশ্বর্যে ভরে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন সুস্পষ্টভাবে শুরু হল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে, সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশের সময়কালে। এর আগের কবিকাহিনী, বনফুল কিংবা পরবর্তী প্রভাতসংগীত কাব্যগুলির মধ্যে এই লোকায়ত ভাবনার প্রকাশ অতি সামান্য। কিন্তু ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত ছবি ও গান-এর 'রাহুর প্রেম' কবিতাটি থেকেই রবীন্দ্রচিন্তায় লোকসংস্কৃতির ভাবনাচিন্তার প্রবেশ সুস্পষ্ট হতে থাকে। যদিও মনে রাখতে হবে, এসব প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরোক্ষ, কেন না কবির হাতে ঐতিহ্যগুলি নতুন ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেগুলি যে লোকায়ত ভাবনা থেকেই উৎসারিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর বিপুল সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে লোকঐতিহ্যের কোনো কোনো উপাদান রয়েছে তা আজ বহু-আলোচিত বিষয়। কবির রচিত সংগীতে লোকসংগীতের সুর ও ভাবের অঙ্গাঙ্গী বন্ধনের কথাও আজ সুবিদিত।

রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতির ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, স্বদেশের চিত্তের পরিচয় লাভ করেছিলেন লোকায়ত সংস্কৃতির মাধ্যমে, নিজের সাহিত্যসৃষ্টিতে লোকজীবন-ভিত্তিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছিলেন। নিজের প্রাণের মধ্যে যেমন তিনি প্রবেশ করেছিলেন, তেমনি লোকজীবনের প্রাণের মধ্যেও তিনি অনায়াসে বিচরণ করতে পেরেছিলেন। গাছের শিকড়ের সঙ্গে মাটির যে সম্পর্ক, লোকঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল সেই সম্পর্ক।

এই মানসিকতার উত্তরাধিকারী হিসেবে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্রাত্যজনের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরেন। উচ্চতর অহংভাবাপন্ন মানুষের উন্নাসিকতায় প্রথম তিনিই আঘাত হানেন। এই একটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এক স্পর্ধিত ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথ একজন মহৎ শিল্পী, মানবিক শিল্পী। সৃষ্টির যন্ত্রণা তিনি অনুভব করেছেন, সৃষ্টি যে নিজের সন্তানের মতোই প্রিয়তম বস্তু তা স্বাভাবিক কারণেই তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাই এক ব্রাত্য শিল্পীর যন্ত্রণার ছবি এঁকেছেন কবি।

আমাদের দেশে ধর্মাচরণের প্রধানতম মাধ্যম হল মূর্তিপুজা। আদিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পথ অনুসরণ করে এইসব মূর্তি গড়েন আমাদের দেশের ব্রাত্যজনেরা। পুতুল হিসেবে, পাথর ও মাটির শিল্পকর্ম হিসেবে এইসব মূর্তি অনন্য শিল্পসুষমামণ্ডিত। বড়ো মাপের সৃষ্টিশীল মনের অধিকারী না হলে এসব শিল্পকর্ম সম্ভব নয়। আবহমান কাল ধরে শিল্পীরা কাল্পনিক দেবতার প্রতিরূপ তৈরি করে আসছেন, কিন্তু কাল্পনিক প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে মন্দিরে বা মণ্ডপে যখন দেবার্চনা শুরু হয় তখন থেকেই ব্রাত্য শিল্পীদের আর কোনো অধিকার থাকে না তাঁদের সৃষ্ট 'সন্তানের' ওপর। মূর্তিকে কাছে এসে প্রণাম করা তো দূরের কথা, শিল্পীকে মন্দির-চত্বরেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। বিষয়টি এমনই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে আমাদের মনুষ্যত্বহীন সমাজে যে, শিল্পীর সেই সৃষ্টির বেদনাকে আমরা কোনোদিন অনুভব করতে পারিনি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব অসাধারণ মন্দির গড়ে উঠেছে, মন্দিরের

গায়ে ও ভিতরে যে অপরূপ মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার স্রষ্টা যে ব্রাত্যজনেরা একথা আমরা সবাই জানি। অথচ এক অদ্ভুত অমানবিক প্রথার শিকার হয়ে আমরা তাদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দিইনি। এ যে কত বড়ো হৃদয়হীনতা ও ঘৃণ্য অপরাধ তা উপলব্ধি করবার মানসিকতা আমাদের নেই। স্রষ্টার এই যন্ত্রণা, শিল্পীর এই অবমাননা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন লোকসংস্কৃতির-প্রীতির ঐতিহ্য থেকে। ব্রাত্যজনের অনন্য শিল্পের প্রতি রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলেই তিনি লোকশিল্পীর মর্মমূলে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। এ যে শিল্পী রবীন্দ্রনাথেরও অপমান। লোকায়ত জীবনের সঙ্গে একাত্মতাবোধ থেকেই এই অনুভবের জন্ম।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৮ শ্রাবণে লিখিত 'প্রথম পূজা' কবিতায় কবি একজন ব্রাত্য শিল্পীর মহান যন্ত্রণার কথা শুনিয়েছেন। ত্রিলোকেশ্বরের মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে অনেক কিংবদন্তি। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা সঠিক তথ্য জানেন, এ মন্দির কিরাত জাতের গড়া, এ দেবতা কিরাতের। ক্ষত্রিয় শক্তি এই এলাকা জয় করবার পরে দেউলের আঙিনা কিরাত পূজারিদের রক্তে গেল ভেসে। দেবতা রক্ষা পেলেন নতুন নামে, নতুন পূজাবিধির আড়ালে। কিরাত আজ অস্পৃশ্য, এ মন্দিরে তার প্রবেশপথ লুপ্ত। কিরাত থাকে সমাজের বাইরে, নদীর পূর্ব পারে। আজ তার মন্দির নেই, রয়েছে তার গান। নিপুণ তার হাত, অভ্রান্ত তার দৃষ্টি, সে জানে কী করে পাথরের ওপরে পাথর বাঁধে, কী করে পেতলের ওপর রুপোর ফুল তোলা যায়, কৃষ্ণশিলায় মূর্তি গড়বার ছন্দ তার জানা।

একবার কার্তিক পূর্ণিমায় পুজোর উৎসব। শুক্ল ত্রয়োদশীর রাতে উঠল ঘূর্ণিঝড়ের মেঘ, তাণ্ডব বয়ে গেল চতুর্দিকে। মন্দিরের বাইরের প্রাচীর হল ধূলিসাৎ, দেবতার বেদির ওপরের ছাঁদ পড়েছে ভেঙে। পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন, আগামী পূর্ণিমার আগেই মন্দির সংস্কার করতে হবে, নইলে দেবতা পরিহার করবেন তাঁর মূর্তিকে। মন্ত্রী বললেন, ঐ কিরাতরা ছাড়া আর কেউ পাথরের কাজ জানে না, ওদের দৃষ্টিকলুষ থেকে দেবতাকে রক্ষা করতে হবে। কিরাতদলপতি মাধবকে ডেকে আনলেন রাজা। আদেশ দিলেন, চোখ বেঁধে কাজ করতে হবে, দেবমূর্তির ওপর যেন দৃষ্টি না পড়ে। মাধব প্রতিজ্ঞা করল, যতক্ষণ কাজ চলবে চোখ খুলব না।

আবার এল শুক্লপক্ষ। অন্ধ মাধব আঙুলের স্পর্শে কথা কয় পাথরের সঙ্গে। কাজ শেষ, মাধব প্রহরীকে এই সংবাদ জানাতে বলল। মাধব খুলে ফেলল চোখের বাঁধন,—

মুক্ত দ্বার দিয়ে পড়েছে একাদশী চাঁদের আলো
দেবমূর্তির উপরে।
মাধব হাঁটু গেড়ে বসল দুই হাত জোড় করে,
একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে,
দুই চোখে বইল জলের ধারা।
আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা
দেবতার সঙ্গে ভক্তের।

অভ্যাসের নিগড়ে দাসত্ব করতে করতে আমাদের চিন্তা-চেতনাও যে কবে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার বোধহয় কোনো লিখিত ইতিহাস নেই। তাই প্রয়োজনের তাগিদে শিল্প

সৃষ্টি করিয়ে নিয়েছি, তারপরে তাদের ঠেলে দিয়েছি 'নদীর পূর্বপারে সমাজের বাইরে'। আবার প্রয়োজন পড়লেই অস্ত্র ও অর্থের জোরে তাদের ডেকে এনেছি, কেননা মূর্তিশিল্পের ঐ দক্ষতা যে অর্জন করেছে একমাত্র ব্রাত্যজনেরাই। রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা সাহিত্যে লোকায়ত শিল্পীর এই সৃষ্টির যন্ত্রণার বিষয়টি আর কোনো শিল্পী-সাহিত্যিককেই এমনভাবে আন্দোলিত করেনি, পরবর্তীকালেও নয়। এই উপলব্ধি শুধু হৃদয়াবেগ থেকে জন্মায়নি। রবীন্দ্রনাথ লোকজীবনের সঙ্গে আন্তরিকভাবে একাত্ম হয়ে ঐতিহাসিকভাবে এই সত্যে পৌঁছেছিলেন যে, সমাজের তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণীর অবহেলা ও অত্যাচারে ব্রাত্যজনেরা পুঁথির বিদ্যায় বঞ্চিত, বেশে-বাসে-ব্যবহারে সম্মানের চিহ্নবর্জিত, অথচ মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ব্রাত্যজনেরাই বহন করে চলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দেখানো পথে আমরা যদি নিজেদের কর্ম ও চিন্তাকে প্রসারিত করতে পারতাম, তবে কর্মী ও মহৎ কবির পথ চেয়ে প্রদীপখানি জ্বলে উঠত। পূর্বপারের লোকায়ত ও ব্রাত্যজনের সংস্কৃতির প্রতি যদি আমরা এমন সীমাহীন অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রকাশ না করতাম, তবে রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার এমন বদ্ধ জলাশয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ত না। কবির পথ চেয়ে প্রদীপখানি জ্বালাতে পারিনি বলেই ভারতের গ্রামীণ জীবনে ও সংস্কৃতিতে আজও তাই এত হতাশা এত অভিমান ও সুবিপুল উদ্‌যোগহীনতা। ভারতের ব্যাপক জনগণের বাসভূমি, ব্রাত্যজনের জন্মমৃত্যুর স্বদেশভূমি যে অসংখ্য গ্রাম তার চিত্ত জলাশয়ের জল আজ শুকিয়ে উঠেছে, গ্রামের পানাপুকুর বিস্তৃততর হচ্ছে। অথচ আমাদের যে মহান লোকঐতিহ্য রয়েছে তাতে এমন তো হওয়ার কথা ছিল না!

রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

Aesthetics-এর প্রতিশব্দ রূপে রবীন্দ্রনাথ 'নন্দনতত্ত্ব' কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৩৩৯-এর বৈশাখের 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে এজরা পাউন্ডের একটি কবিতার (The Study in Aesthetics : *Lustra)* প্রসঙ্গ উল্লেখকালে রবীন্দ্রনাথ 'নন্দনতত্ত্ব' কথাটি ব্যবহার করে জানালেন—নন্দনতত্ত্ব (aestheties) সম্বন্ধে এজরা পাউন্ডের একটি কবিতা আছে। সেই কবিতায় পাউন্ডের বক্তব্য ছিল, সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখে এবং ব্রেসচিয়ার-এর হাটে বিক্রয়যোগ্য প্রচুর সার্ডিন মাছ ধরতে পেরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করেছিল যে-জেলের-ছেলেরা তাদের আনন্দ ছিল 'নিস্পৃহ', 'বিশুদ্ধ' ও 'নৈর্ব্যক্তিক', এক কথায় aesthetic.

Aesthetic শব্দটি এসেছে গ্রীক Aisthetikos ধাতু থেকে । এই ধাতুটির অর্থ হল 'to perceive' সংস্কৃত 'ঈক্ষ' ধাতুর সঙ্গে গ্রীক Aisthetikos-এর নিকট সম্পর্ক লক্ষ করে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত Aestheties-কে বলেছিলেন 'বীক্ষাশাস্ত্র'। 'ঈক্ষ' ধাতুর দ্বারা, তিনি বলেছিলেন, প্রধানত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে বুঝায় এবং গৌণত যে-কোন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এমন কি মানসিক সংকলন বা সঙ্কল্প পর্যন্ত বুঝাইয়া থাকে (সাহিত্য-পরিচয়, পৃ ৮৭)। ডঃ দাশগুপ্ত এই কারণে ক্রোচের Aesthetics সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধের শিরোনাম দিয়েছিলেন 'ক্রোচের বীক্ষাশাস্ত্র কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেহেতু 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটিই ব্যবহার করেছিলেন, সুতরাং রবীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব বলতে আমার রবীন্দ্রনাথের 'এসথেটিক্‌স' বোঝাব। 'এসথেটিকস' বা নন্দনতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে রূপবান শিল্পসাহিত্যের সমস্ত শাখার সামগ্রিক তত্ত্বালোচনা গৃহীত হয়ে থাকে। শিল্পের জন্মরহস্য থেকে মানব জীবনে শিল্প-সাহিত্যের মুখ্য এবং গৌণভূমিকা সমস্তই নন্দনতত্ত্বের বিষয়। বিভিন্ন শিল্পের অজস্র রূপবৈচিত্র্যের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কয়েক দশক ধরে—প্রবন্ধাকারে, পত্রাকারে, ডায়েরির আকারে এমনকী কবিতার আকারেও তাঁর মৌলিক শিল্প-সাহিত্যসৃষ্টি এবং তত্ত্বালোচনার সমবয়স্ক ১২৮৩-র 'জ্ঞানাঙ্কুর-প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনার প্রকাশ এবং সর্বশেষ রচনা ১৩৪৮-এ। সুতরাং অপরিণত কৈশোর থেকে সফল পূর্ণ প্রবীণ বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বহুপ্রসবিণী সমর্থ লেখনী শিল্প-জগৎ রচনার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বালোচনায় কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সফলকাম শিল্পী-ব্যক্তিত্ব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জীবনের গোধূলি পর্বে উচ্চারণ করেছিলেন, 'প্রত্যেক কলার স্বাতন্ত্র্য আছে, আছে বলেই পরস্পরকে আতিথ্য দেবার পথ তারা কৃপণের মত অবরুদ্ধ করে রাখেনি।' হয়ত এই কারণেই এক সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনার দ্বারা তিনি যাবতীয় শিল্পতত্ত্বের মূল রহস্য স্পর্শ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, উপস্থিত হতে চেয়েছিলেন সৌন্দর্য সৃষ্টি তলহীন গভীরতায়। সন্দেহ নেই, 'সীমা', 'অসীম' প্রভৃতি ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ শব্দ ও উপমা অলংকারের ব্যাপক ব্যবহার তাঁর তত্ত্বালোচনায় মাঝে মাঝে অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রথমত ব্যক্তিক

উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার গভীরতা ও বিস্তার ; দ্বিতীয়ত বিচিত্র শিল্পরূপ রচনায় অনন্যসাধারণ দক্ষতা ; তৃতীয়ত প্রবন্ধ ছাড়াও কবিতা, ডায়েরি, চিঠিপত্র বা অন্য কোনো মাধ্যমের আশ্রয়ে শিল্পের বিভিন্ন শাখার স্বরূপ আলোচনা রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বালোচনায় অতুলনীয় ঐশ্বর্য ও বিস্তার এনে দিয়েছিল। ভালেরি প্রসঙ্গে এলিঅটের উক্তি কিছুতেই তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়—'He reminds us of Narcissus.' এমনকী আলোচনার বিস্তার বা প্রাচুর্যে তাঁর পাশে ঠাঁই পাবেন না ওয়ার্ডস্বার্থ-শেলী-কোল্‌রিজ-পাউন্ড-ভালেরি ; হয়ত কিছুটা পাবেন টি. এস. এলিঅট। তাও ভাবনার ক্রম-পরিণতির স্তর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেভাবে স্পষ্ট হয়, এ রকম অন্য কারো ক্ষেত্রে নয়। তাঁর সৃষ্টিধারাও স্তব্ধ হয়নি বিশেষ এক অধ্যায়ের গণ্ডিতে। সুতরাং তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য কখনও সমর্থন সন্ধান করেছে তাঁর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে, কখনও সৃষ্টি ও তত্ত্বে ঘটেছে আংশিক বিরোধ। এ সবই রবীন্দ্র-নন্দনতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যদ্যোতক। অতএব প্রচলিত তত্ত্বসূত্রের নিরিখে রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের মূল্যায়নের প্রয়াস ভ্রান্ত হতে বাধ্য। তাঁর সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রকাশ যদি ঘটত একটিমাত্র গ্রন্থে তাহলে ঘনীভূত ভাবনার পরিচয় সন্ধান সফল হতে পারত। সাহিত্য বা শিল্পের বিচারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করতে বলেছিলেন 'বাঁধা ওজন' এবং 'বাঁধি বোল'। এলিঅটের কথাও তাঁর মুখে বেমানান হত না যে, একজন যথার্থ সমালোচকের কাজ হবে পাঠককে তাঁর উপলব্ধি ও উপভোগে সহায়তা করা। পূর্বনির্দিষ্ট সূত্র ব্যবহারের দ্বারা সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন, রবীন্দ্রনাথের মতে, অসম্ভব। সুতরাং তাঁর নন্দনতত্ত্ব-ভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণেও সমালোচকের প্রচেষ্টা বিচ্ছিন্ন কতকগুলি তাত্ত্বিক উচ্চারণের সারসংকলনে সীমাবদ্ধ না থাকাই কাম্য। তাঁর চিন্তার বিবর্তন ধারাকে কতকগুলি পর্বে বা পর্যায়ে ভাগ করে নিয়ে যদি তাঁর সমকালীন সৃষ্টির সঙ্গে সেই সব তত্ত্বচিন্তাকে মিলিয়ে নেওয়া যায়, তাহলেই শুধু ধরা যেতে পারে কোনো সিদ্ধান্তের দিকে রবীন্দ্রমননের অগ্রগতি ঘটেছিল এবং তা কীভাবে? একজন রূপদক্ষ যখন সমালোচক বা তাত্ত্বিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তখন তাঁর সৃষ্টি থেকে তত্ত্বভাবনাকে বিযুক্ত করে নিলে চোখে পড়তে পারে বহু আকস্মিকতা বহু অসংগতি। এই রকম কিছু অসংগতিই একদা ক্ষুব্ধ করেছিল 'সাহিত্য' পত্রিকার সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-কে।

রবীন্দ্র-নন্দনতত্ত্বে, যেখানে 'আর্ট' ও 'সাহিত্য' অভিন্নার্থে ব্যবহৃত, শিল্প-সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ গৃহীত হয়েছিল 'রূপ' ও 'রসের' অদ্বৈত মিলনরূপে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, বিভিন্ন শিল্পের সংজ্ঞা ও সার্থকতার ভিন্নতা থাকলেও, সকলেরই সামান্য লক্ষণ 'রসসৃষ্টি' বা আনন্দ দান। কিন্তু 'রূপ' ছাড়া রসের অস্তিত্ব কোথায়? এদের সম্পর্ক 'আধার' ও 'আধেয়'-এর। বিভিন্ন শিল্পের পার্থক্য যতটা বাহ্য আকারগত, ততটা অন্তরঙ্গ নয়। হয়তো সেই কারণে সব 'আর্ট'কেই রবীন্দ্রনাথ এক 'সাহিত্য' শব্দের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছিলেন। 'সাহিত্য' শব্দের যে একটি ব্যাপক সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তার দ্বারাই আমাদের বক্তব্য সমর্থিত হয়।

"সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায় ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে, মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের নিতান্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে।" এখানে 'সাহিত্য' শব্দের পরিবর্তে 'আর্ট' শব্দটির অনায়াস ব্যবহার সম্ভব ছিল। 'আর্ট-এর

বিভিন্ন শাখার মধ্যে ঐক্যের সূত্রটি কোথায়? কী করে এবং কেন এই ঐক্য? রবীন্দ্রনাথ বলছেন, যাবতীয় শিল্পই 'expression of personality' বা ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। এই 'পার্সোন্যালিটি' প্রাত্যহিক ক্ষুৎ-পিপাসার উর্ধ্বস্থ অখণ্ড স্রষ্টা সত্তা, রবীন্দ্রনাথ অন্য প্রসঙ্গে যাকে বলেছেন 'বড়ো আমি'। আর 'ছোট আমি' হচ্ছে 'ইনডিভিডুয়াল'। 'পার্সোন্যালিটিই সৃষ্টি করে, 'ইনডিভিডুয়াল' নয়। সাধারণ মানুষ হিসেবে শিল্পী, ক্ষুদ্রতার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন, কিন্তু 'শিল্পী' তিনি তখনই যখন জাগতিক তুচ্ছতার দ্বারা আন্দোলিত হন না। সেই কারণেই শিল্পীর যথার্থ পরিচয় মিলবে না তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে—'কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে'। কবির ব্যক্তিজীবন তাঁর সৃষ্টির উৎসস্থলের সংকেত দেয় না। শেকসপিয়র-ওয়ার্ডস্বার্থ-ও টেনিসেনের অথবা বাল্মীকি-কালিদাসের ব্যক্তিজীবন ছিল, কিন্তু ব্যক্তিজীবনের ঘটনা থেকে লাভ করা সম্ভব হবে না এঁদের স্রষ্টা-জীবনের ইতিবৃত্ত। সত্য হল, সৃষ্টির সময় শিল্পী নিজের ব্যক্তিজীবনের উর্ধ্বে গমন করেন এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মও আবেগ থেকে রসের জগতে পৌঁছয়। সুখকর বা দুঃখদায়ক আবেষ্টনের উর্ধ্বে উঠে উভয়েরই মূল সত্তার যে আনন্দ বা রস আছে তারই বিগ্রহ রচনা করেন শিল্পী। তাই শিল্পের মহিমা উপলব্ধি করতে হলে পাঠককে ঐহিক সংস্কারের সাহায্যে নিতে হয় না। ক্লাইভ বেল বলছেন,

Art transports us from the world of man's activity to a world of aesthetic exaltation. For a moment we are shut off from the human interests ; our anticipations and memories are arrested, we are lifted above the stream of life (*Art.* p. 25)

শিল্পী সৃষ্টির মুহূর্তে তাঁর ব্যক্তিক তুচ্ছতা থেকে মুক্ত হলে তবেই তিনি পাঠককে তার ব্যক্তিক কামনা ও মোহ থেকে মুক্তি দিতে পারেন এবং দূরের সঙ্গে নিকটের, অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের, একের সঙ্গে অপরের 'ঐক্য' সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু এই ঐক্য বস্তু জগতের ঐক্য নয়, ভাবজগতের ঐক্য, তাই প্রয়োজনের মলিনতা সাহিত্যকে কলঙ্কিত করে না। সোনারতরী কাব্যের 'পুরস্কার' কবিতায় যে-কবি ধনৈশ্বর্যের পরিবর্তে শুধুমাত্র একগাছি মালায় পূর্ণ তৃপ্তি পেয়েছিল, সে-ই তো যথার্থ শিল্পী। লোভের প্রাচীর তার সম্মুখ থেকে আপনিই খসে পড়েছে, যেহেতু সৃষ্টির মুহূর্তে প্রয়োজনের দৈন্য তার নেই। শিল্প হচ্ছে মনের বাগানবাড়ি, শিল্পীর অন্তরের ঐশ্বর্যের প্রকাশ। শিল্পসৃষ্টির মুহূর্তে 'We forget the claims of necessity, the thrift of usefulness, the spires of our temples try to kiss the stars and notes of our music to fathom the depth of the ineffable' (*Personality,* p. 17). শিল্পসৃষ্টির মুহূর্তে প্রয়োজনের তুচ্ছতা থাকে না, থাকে শুধু প্রকাশের তাগিদ, অন্তরের অহেতুক আনন্দকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়ে পর্যাপ্তি দানের বাসনা। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সাহিত্যে সাহিত্যিক লীলাময় ('তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধ) ; বিশ্বস্রষ্টা যেমন তাঁর বিশ্বসৃষ্টিতে। আমরা তাই বলি 'বিশ্বসৃষ্টি', 'বিশ্বনির্মাণ' নয় ; 'সাহিত্য সৃষ্টি', 'সাহিত্যনির্মাণ' নয়। যদিও সাহিত্যের সবটুকুই 'সৃষ্টি' নয়, অনেকটাই নির্মাণ, তথাপি প্রয়োজন-সম্পর্ক-শূন্যতাই সাহিত্যের মূল কথা বলে সাহিত্য 'সৃষ্টি'। সাহিত্যকে জাগতিক প্রয়োজনের তাগিদে গড়া বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেননি। মানুষ এমন প্রাণী যার কোনো কর্মই উদ্দেশ্যহীন নয়, এই মার্কসীয় বস্তুবাদী সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথের কোনো বিশ্বাস ছিল না। একজন ভাববাদী স্রষ্টারূপেই তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং

সাহিত্যের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। এ বিষয়ে কান্ট, শিলার ও স্পেনসর-এর সঙ্গেই তাঁর ভাবৈক্য লক্ষণীয়। 'জাপান যাত্রী'তে 'সৃষ্টি' ও নির্মাণ' শব্দ দুটি যে ভিন্ন অর্থতাৎপর্যে ব্যবহার করেছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

নির্মাণ মানে মাপে তৈরি করা—নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে। আর সৃষ্টি করা অন্য কোনো কিছু মাপের অপেক্ষা করে না, সে হচ্ছে নিজেকে অর্জন করা, নিজেকেই প্রকাশ করা (১৩২৩-র ২০শে বৈশাখ)।

এই কথাই Creative unity গ্রন্থে এইভাবে জানালেন—

The joy of unity within ourselves, seeking expression becomes creative, whereas our desire for the fulfilment of our needs is construcitve.

যে বিশ্বসৃষ্টিকে বলা হয় ঈশ্বরের লীলা তার দুটি দিক আছে। সীমার দিকে আছে রূপে জগৎ, শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের জগৎ, আর অসীমের দিকে আছে রসের জগৎ। শিল্পেরও আছে পরস্পর-নির্ভর এই দুটি দিক—রূপ ও রসের দিক। রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনায় এই দুই-এর মূল্যই সমান স্বীকৃত। 'রূপ' বলতে রবীন্দ্রনাথ যে বাহ্য উপাদান-নির্মিত অবয়ব-কে বুঝিয়েছেন তা নয়। 'রূপ' আছে, ভাষায় ভঙ্গিতে আবাসে ঘটনাবলির নিপুণ নির্বাচনে, 'বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে' ('রূপকার' ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ্য এক কথার 'রূপ' হচ্ছে একটি অখণ্ড সমগ্র মূর্তি। এই রূপের একটি ইহগ্রাহ্য অস্তিত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু শিল্পের 'রূপ' বিশ্লেষ্য নয়। এই রূপ, ক্লাইভ বেল-এর ভাষায় 'Significant form'. রবীন্দ্রনাথ রূপ' বলতে শিল্পের অবিভাজ্য মূর্তিকেই বুঝতেন, তাই সাহিত্যালোচনায় বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি তিনি সহ্য করতে পারেননি। বিশ্লেষণের দ্বারা, তিনি বলেছেন, এক জিনিস 'আর' হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ শিল্পীকে বলেছেন 'রূপকার', 'রূপদক্ষ'। কিন্তু শিল্পে রূপের সার্থকতা কোথায়? রসে। 'রস' হল আনন্দ। পাঠককে 'রস দেওয়া' বা 'আনন্দ দেওয়া'-ই সাহিত্যিকের লক্ষ্য। রূপ থেকে যদি রসের প্রতীতি না জন্মায়,তাহলে 'রূপ' অসার্থক। রূপের প্রতি অতি-আসক্তি এক জাতের দুর্বলতা। যে-'রূপ', 'রস' সৃষ্টি করতে পারে না তা একান্তই বহিরঙ্গ এবং এই ধরনের রূপকার 'Craftsman'. 'artist' নয় ; নির্মাতা, স্রষ্টা নয়। অর্থাৎ শিল্পীর লক্ষ্য রূপের মাধ্যমে রসসৃষ্টি।

সংগীত এবং চিত্র সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য, যেমন প্রযোজ্য সাহিত্য সম্পর্কে। সংগীতে রাগ-রাগিণীর একটি বাহ্য রূপ আছে যার মূল্য অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু যখন তান-বিস্তার বাহ্য রূপচর্চা মাত্র হয়ে দাঁড়ায়, রসসৃষ্টিতে সাহায্যে করে না, তখন তা বর্জিত হওয়া উচিত। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার রায়-এর কাছে এই অভিমত রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার ব্যক্ত করেছেন যে, সুর যদি কথাকে সঙ্গী না করে, সংগীতকে সুরলোকের ইন্দ্র সভায় প্রেরণ না করে এবং কেবলমাত্র কলাকারের কসরতে পরিণত হয় তাহলে সুরসমন্বিত হলেও কোনো রচনা সংগীতের মর্যাদা দাবি করতে পারে না। হিন্দুস্থানী গানের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বীতরাগ ছিলেন না, কিন্তু এই গান তখনই তাঁর কাছে দুঃসহ মনে হত যখন আলাপের আতিশয্য গায়কের বিলাপ বলে মনে হত। কীর্তনগানে কথা ও সুর, বচন ও বচনাতীত তুল্যমূল্য হওয়ার রবীন্দ্রনাথ কীর্তনগানে ছিলেন অনুরক্ত। তাঁর নিজের গানেও কথা ও সুরের ছিল সমগুরুত্ব। সংগীতের মত চিত্তেও রূপ ও রসের অভিন্নত্ব কাম্য। সংগীতে সাহিত্যের মত ভাষা আছে, তদতিরিক্ত আছে সুর এবং চিত্রে রঙ ও রেখাই

রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত। তিনি বলেছেন, সাহিত্যের ধারা অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত, নতুন প্রাণ নতুন রূপ সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু পুরাতনের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সেই প্রাণশক্তি পায় না। অর্থাৎ যাকে বলে 'আধুনিকতা', বলে 'ওরিজিন্যালিটি', তা আকস্মিক নয়,তা পূর্বাপর সংগতিপূর্ণ। লেখক হিসেবে 'ওরিজিন্যাল' হতে গেলে, 'আধুনিক' হতে গেলে যে বিশেষভাবে সমকালের সমস্যাই রূপায়িত করতে হবে, এ তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী নন। 'নূতনত্ব কালের ধর্ম, নবীনত্ব কালের অতীত' (কবির অভিভাষণ, ১৩৩৪ ফাল্গুন)। এজরা পাউন্ডের কাব্য সংকলনের পরিচায়িকা লিখতে গিয়ে অপর কবি (এলিঅট) যিনি নিজেও বিশেষভাবে 'একালের', 'ওরিজিন্যালিটি' সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যেরই সমতুল—'True originality is merely development'. এজরা পাউন্ড যখন সমকালের বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন তখনই তিনি নাকি আকস্মিককে চরম মূল্য দিয়ে ফেলেছেন অথচ প্রভাঁস ও ইতালি প্রাচীনতার গণ্ডি ভেঙে অনেক বেশি সজীবতা পেয়েছে তাঁর কাছে। তাই এলিঅট বিশ্বাস করেন না যে 'চিমনি পট' নিয়ে কবিতা লিখলেই কেউ আধুনিক হন আর প্রাচীন ফ্রান্সের রাজকীয় পতাকা 'ওরিফোম্‌স্‌' নিয়ে লিখলে তিনি হবেন 'অনাধুনিক'। মোট কথা আধুনিক কবিকে বিষয়-নির্বাচনেও আধুনিক কালের দ্বারস্থ হতে হবে, এলিঅট এ কথা বিশ্বাস করতেন না। রবীন্দ্রনাথ ও এলিঅট উভয়ের ধারণা একই যে, বিষয়টাই ঐকান্তিকভাবে কাব্য নয়। বিষয় খোঁজে বিষয়ী লোক। কিন্তু বিষয় তো থাকতেই হবে একটা। এইজন্য লেখককে 'সিলেকসন' বা 'নির্বাচন' করতে হয়। প্রয়োজনের জগতে নিজেকে যা সীমাবদ্ধ করে রেখেছে তা চরম বাস্তব হলেও শিল্পে-সাহিত্যে তার কোনো স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেননি কোনো দিনই। কিন্তু সাহিত্যের দ্বারা জগতের তাৎক্ষণিক লাভ বা ক্ষতি না হলেও যা লাভজনক বা ক্ষতিকর তাকে যদি শিল্পিত করে তোলা যায় তা হলে কেন শিল্প-সাহিত্যের জগতে তার আশ্রয় মিলবে না? এ প্রশ্নের সমাধান সূত্রেই কান্টীয় ভাববাদী সিদ্ধান্তের সঙ্গে মার্কসীয় সিদ্ধান্তের পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতের সমর্থন পেয়েছিলেন কান্টীয় তত্ত্বে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, চালতা ফুল কাব্যের রাজত্বে এখনও এসে পৌঁছয়নি, সজনে ফুলের কাব্যজগতে আবির্ভাব বিলম্বিত হয়েছে, মুরগির সৌন্দর্য সাহিত্যে এখনও স্বীকৃতি লাভ করেনি। 'সাহিত্যতত্ত্ব' (১৩৪০ ভাদ্র) প্রবন্ধে বলেছেন, যে ঘড়াকে দায়ে পড়ে মেনেছিলেম, নিলেম তাকে আপন করে। মানুষের ইতিহাসে আদিম যুগ থেকেই এই চেষ্টা। প্রয়োজনের জিনিসকে সে অপ্রয়োজনের মূল্য দেয়, শিল্পকলার সাহায্যে বস্তুকে পরিণত করে বস্তুর অতীতে। এই কারণে প্রাচীন কালে পাথরের বুকে ভাষা ফুটিয়েছে মানুষ, যুদ্ধাস্ত্রের উপর রেখেছে তার শিল্পবোধের নমুনা। এর দ্বারা প্রয়োজন সাধনে কোন সাহায্য হয়নি বলেই একে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি শিল্পলোকের সামগ্রীরূপে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রয়োজনের জগতে মূল্যবানই শিল্প-সাহিত্যে মূল্যবান নয়। শিল্পের জগতে তাকেই আমরা বরণ করে নিয়েছি যা প্রয়োজনের দায়মুক্ত, বস্তুর ভারমুক্ত। এই সিদ্ধান্ত থেকেই রবীন্দ্রনাথ ইকনমিক্‌সের অধ্যাপক, বায়োলোজির লেকচারার এবং সোশিওলোজির গোল্ডমেডালিস্টদের সাহিত্যরাজ্যে প্রবেশ সমর্থন করেননি।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের পর বিষয় প্রকাশের প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'প্রকাশই কবিত্ব'। কবিতা বা সাহিত্য তথা শিল্পকলার সার্থকতার প্রথম শর্ত হচ্ছে প্রকাশ পাওয়া। কিন্তু

সাহিত্যে কীসের প্রকাশ হয়? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জ্ঞানের কথা নয়, ভাবের কথাই সাহিত্যে প্রকাশ পায়। জ্ঞানের কথা প্রমাণ করতে হয়, কিন্তু ভাবের কথা 'প্রকাশ' ও 'সঞ্চার' করে দিতে হয়। জ্ঞানের কথা একবার জানলেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু ভাবের কথা চিরপুরাতন হলেও নিত্যনবায়মান। দর্শন বা বিজ্ঞান যে কথা জানায় তা সুনিশ্চিত এবং তার প্রকাশও সরাসরি। ছন্দ-অলংকারের পরিপাট্য দর্শনে বা বিজ্ঞানে অবাঞ্ছিত। কিন্তু সাহিত্যে যে-রূপ ফুটিয়ে তোলা হয় তা পাঠকের অন্তরেও সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন, তাই ছন্দ-অলংকার ও আভাস-ইঙ্গিতের আবশ্যিকতা। ছন্দ শুধুই বাইরের শোভা বৃদ্ধি করে না। অলংকারও তাই। ছন্দ-অলংকারের সার্থকতা রসসৃষ্টিতে। ছন্দ-অলংকার-আভাস-ইঙ্গিত নিয়ে গড়ে ওঠা সাহিত্য সমগ্রমূর্তিতে এমনভাবে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন যাতে তা অনায়াসে পাঠকের অন্তরে সঞ্চারিত হতে পারে। আমরা জানি ক্রোচের নন্দনতত্ত্ব-চিন্তায় 'প্রকাশ' বা Expression এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যা Intuition বা সংজ্ঞা-র থেকে অপৃথক। ক্রোচে অভিব্যক্তি বা Expression-কে কোন স্বতন্ত্রক্রিয়া বলে মানেননি, তাই কলাকৌশল বা Technique যার প্রকাশ বাহ্যরূপে তার কোন গুরুত্বই স্বীকার করেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন, এই কলাকৌশল বা সাহিত্যের পূর্তবিভাগও অনেক সময় অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে ওঠে। এই 'টেকনিক'-এর স্বাতন্ত্র্যের জন্যই অখণ্ডমূর্তিতে সাহিত্য পাঠকের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। 'সঞ্চার' বা 'কম্যুনিকেশন'-এর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন তলস্তয়। তবে 'প্রকাশ' ও 'সঞ্চার শব্দ দুটি রবীন্দ্রনাথ যখন ব্যবহার করেছেন তখনও ক্রোচের 'ইস্থেটিক' এবং তল্‌স্তয়ের 'হোআট ইজ আর্ট' প্রকাশ হয়নি। সুতরাং অন্য প্রভাব নিরপেক্ষভাবেই শব্দ দুটি রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রবেশ করেছে। শুধু তাই নয়, 'প্রকাশ' অর্থে রবীন্দ্রনাথ বাহ্য রূপনির্মিতি বুঝতেন ; কেবলমাত্র অন্তরের গভীরে জাত অনুভূতিকেই শিল্পের মর্যাদা দেওয়ার মত absolute idealist তিনি ছিলেন না। ক্রোচের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শগত পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। সঞ্চার শব্দটি রবীন্দ্রনাথ বেশি ব্যবহার করেননি। তলস্তয়ের 'হোআট ইজ আর্ট' (ইংরেজি তর্জমা) রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে। এই বইখানার নানা সিদ্ধান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একমত হতে পারেননি। তাঁর ইচ্ছে ছিল, এই বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করবেন, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। সম্ভবত 'সঞ্চার' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ তলস্তয়ের চেয়ে ভিন্ন তাৎপর্যেই ব্যবহার করতেন।

সাহিত্যে ভাবের প্রকাশ এবং ভাবের কথা সঞ্চারিত হয় এক হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে। এই যাঁর অভিমত তাঁর পক্ষে এই জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণও স্বাভাবিক যে, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয় এবং তার যে রস সে অহেতুক (সাহিত্যতত্ত্ব, ১৩৪০ ভাদ্র)। পাশ্চাত্যের কলাকৈবল্যবাদীরা বিশ্বাস করতেন 'all art is useless'। আমরা জানি গোতিয়ের-এর মাদ্‌ময়াজল দ্য মপ্যাঁ-র ইংরেজি তর্জমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি ঘটেছিল অল্প বয়সে। তা ছাড়া ইংরেজ রোমান্টিক কবি শেলি-কিটস-ওয়ার্ডস্বার্থ-এর সঙ্গে পাঠক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কৈশোর থেকে (বিশেষত কিটস ছিলেন তাঁর প্রিয়তম কবি)। এই সঙ্গে ভিক্টোরীয় টেনিসন-ব্রাউনিং-আর্নল্ডের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন পাঠক রবীন্দ্রনাথ। কিছুটা বেশি বয়সে পরিচয় ঘটে রাস্কিন-তলস্তয় ক্রোচের গদ্য রচনার সঙ্গে এবং এলিওট-য়েটস-পাউন্ডের কবিতার সঙ্গে। সুতরাং বিদেশী কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল গভীর ও ব্যাপক। রোমান্টিক যুগের কবি থেকে ইমেজিস্ট গ্রুপের কবিদের

অনেকের রচনাই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা আস্বাদিত হয়েছিল। সাহিত্যের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছিল এই দীর্ঘ প্রসারিত পর্বে। কেউ হয়ত অ্যারিস্টটলীয় মতাদর্শে অর্থাৎ সাহিত্যের আনন্দদায়ক ক্ষমতায় বিশ্বাসী। কেউ বলেছেন বিশুদ্ধ সাহিত্য জাগতিক প্রয়োজন-শূন্য, কেউ বা প্লেটোর সংকীর্ণতা বর্জন করে নীতিপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অন্বিত করেছিলেন। শিল্প-সাহিত্যের দ্বারা আমাদের জীবনের কোনো উপকার সাধিত হয় কি না এই প্রশ্নের নিঃসংশয় সমাধান সম্ভব নয় কদাপি, যেহেতু বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যসাধনই শিল্পের লক্ষ্য নয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) 'ভারতী' (১ম পর্যায়) পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'অতএব কবিদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তাঁহারা কেবল সৌন্দর্য ফুটাইতে থাকুন' 'কবির কাজ'।

(২) 'সাধনা' পর্বে জানাচ্ছেন—'আমার বোধ হয় আর্ট মাত্রেরই কাজ হচ্ছে বিশ্বের যেটুকু আমাদের মনোহরণ করে সেটুকু সযত্নে তার অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের কাছে অবিমিশ্র উজ্জ্বল করে ধরা' (১৮৯৪, ১৩ জুলাই)।

(৩) এর অনেক পরে ১৩১৩-র আষাঢ় সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লেখেন—'অনেক আর্টই যাহা উদার, যাহা সুন্দর তাহার প্রতি আমাদের ভক্তির বা প্রীতির প্রকাশ। কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, যাহা সাধারণ তাহার প্রতি আমাদের মনের সহজ আনন্দ ইহাও আর্টের বিষয়'।

প্রথম উদ্‌ধৃতিটিতে কবি শুধু সৌন্দর্য প্রকাশই কবির বা শিল্পীর কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় উদ্‌ধৃতিটিতে কবি সুন্দর ও অসুন্দর নির্বিশেষে যা আমাদের সহজ আনন্দ সৃষ্টি করে তাকেই শিল্পের বিষয় বলে উল্লেখ করলেন। সুতরাং সমালোচকদের মতে, রবীন্দ্রনাথ নিজের সিদ্ধান্তে স্থির থাকতে পারেননি। দ্বিতীয় উদ্‌ধৃতিটিতে আবার শুধুই 'মনোহরণ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সুতরাং সমালোচকদের ধারণা হচ্ছে, শিল্পের উদ্দেশ্য সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ বিভ্রান্ত। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের আরও কিছুটা অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। আমরা দেখেছি, 'সাধনা' পর্বেই রবীন্দ্রনাথ আনন্দদানকে শিল্প-সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন এবং পরবর্তী কালেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে ঐ একই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সাহিত্য প্রবন্ধে (১৩১৪ বৈশাখ) তিনি বলেছেন, সাহিত্য আমাদের দুভাবে আনন্দ দেয়, সত্যকে মনোরম করে তুলে এবং সত্যকে প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট প্রকাশ করে। সত্য কী? যা ঘটছে সেই ঘটমানই সাহিত্যের সত্য নয়। এই সত্যের অস্তিত্ব হৃদয়-নির্ভর এবং সুন্দর-অসুন্দর নিরপেক্ষ। রাম ও রাবণ, যুধিষ্ঠির ও শকুনি, ওথেলো ও ইয়াগো সকলেই সত্য। লৌকিক অর্থে রাম ও যুধিষ্ঠির সুন্দর, রাবণ শকুনি ও ইয়াগো অসুন্দর। কিন্তু সাহিত্যের জগতে এরা সকলেই সত্য সকলেই আনন্দদায়ক। কেউ হয়ত বলবেন, দুর্যোধন, শকুনি ও ইয়াগো থেকে যে আনন্দ মেলে তা অবজ্ঞার আনন্দ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এরা সজীব বলেই আনন্দদায়ক। সাহিত্যে এরা সত্য ও প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট। এদেরকে যেন আমরা জানি, বুঝি, এবং ধরতে ছুঁতে পারি। সুতরাং সুন্দর-অসুন্দরের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। শিল্প-সাহিত্যের জগতে দৈহিক রূপ বা সামাজিক মর্যাদা কখনও আনন্দ বা সৌন্দর্য সৃষ্টির কারণ হয় না। শৈল্পিক আনন্দের কারণ সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র। এমন কি লৌকিক সুখদুঃখের সমস্যাও সাহিত্যে গৌণ। লোকজগতে সুখে আনন্দ ও দুঃখে বেদনা পাওয়াই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ট্রাজেডি পাঠে বা দর্শনে আমরা বেদনার পরিবর্তে আনন্দ পাই, কারণ, রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'বেদনার তীব্রতা সেখানে আমাদের প্রোজ্জ্বল অনুভূতির দীপ্ত তেজে সমস্ত চৈতন্যকে উদ্ভাসিত করে তোলে'। লৌকিক অর্থে যা সুন্দর তা যেমন সাহিত্যে আমাদের চৈতন্যকে উদ্ভাসিত করে তোলে তেমনি প্রচলিত অর্থে যা অসুন্দর তা-ও সাহিত্যে আমাদের 'আত্মানুভূতি' জাগিয়ে তোলে অর্থাৎ আপনার সম্বন্ধে স্পষ্টতরভাবে চেতন হবার তাগিদ সৃষ্টি করে। সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞেয় থাকে সম্মুখে, জ্ঞাতা পিছনে। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যে 'জ্ঞাতা' থাকে সম্মুখে এবং 'জ্ঞেয়' পিছনে। তাই সাহিত্যে আমরা বিশেষভাবে নিজেদেরই জানি ও পাই। এই জানা ও পাওয়াতেই আনন্দ। অতএব সুন্দর হোক বা অসুন্দর হোক, সুখকর হোক বা দুঃখদায়ক হোক যাতে আমরা নিজেদের জানি ও পাই সেখানেই আমাদের আনন্দ। আর লৌকিক সংস্কার থাকে না বলেই আমাদের হৃদয়ের অসাড়তা ও অচেতনতাও শিল্প-সাহিত্য আস্বাদনে ঘুচে যায়। 'ভারতী' পত্রিকায় যেখানে ('কবির কাজ') রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কবিদের কাজ সৌন্দর্য প্রকাশ করা, সৌন্দর্য উদ্রেক করা, সেখানেই লিখেছিলেন, সৌন্দর্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছু নয়, 'হৃদয়ের অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীন ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া।' সুতরাং এখানে 'সৌন্দর্য' শব্দটি লৌকিক অর্থে অসৌন্দর্যের বিপরীতার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়নি। 'ভারতী' পত্রিকায় খুবই সংক্ষেপে কবি এই সমস্ত কথা বলেছিলেন, বিশেষ ব্যাখ্যা করেননি, তাই কিছু অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয়েছে। তবে 'বঙ্গদর্শনে' (৩য় উদ্‌ধৃতি) যখন সুন্দর-অসুন্দরের কথা বলেছেন তখন কিন্তু শব্দ দুটো প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন। দ্বিতীয় উদ্‌ধৃতিতে যে 'মনোহরণ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন বা তৃতীয় উদ্‌ধৃতির সহজ 'আনন্দ'-এর বিপরীত কিছু নয়, স্মরণে রাখা দরকার। 'মনোহরণ' বলতে বাহ্য নয়ন-ভুলানো বা সুখশ্রাব্য সুন্দরকে বোঝাননি। মন যাকে আপন করে নিয়েছে এবং যাতে তৃপ্ত হয়েছে তা সুন্দর বা অসুন্দর যাই হোক, তা মনোহারী। সুতরাং এসব থেকে মনে হয়, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্‌ধৃতির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই, বিশ্লেষণের দ্বারা কবি ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছেন এবং আনন্দদানই যে শিল্প-সাহিত্যের মুখ কর্তব্য সেই সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। জীবনের অন্তিমপর্বে একটি চিঠিতে (অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা, ১৩৪৩-এর ৮ই আশ্বিন) সাহিত্যে সুন্দর ও আনন্দের আপেক্ষিক প্রাধান্যের এই-সমস্যা সমাধানকল্পে জানালেন, '...যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্য কী দিয়ে এই সৌন্দর্যের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের'। লৌকিক অর্থে কোন কিছু সুন্দর না হলেও 'যে সত্যকে আমরা হৃদা মনীষা মনসা উপলব্ধি করি তাই সুন্দর।' অতএব কবির মূল বক্তব্য দাঁড়াচ্ছে, তথাকথিত সুন্দর সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে নয়, সত্যকে স্পষ্ট মনোরম ও হৃদ্য করে তুলে আনন্দদানই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। রাস্কিনের মত ধর্মনীতির সৌন্দর্যকেও সৌন্দর্যরূপে স্বীকার করতে সম্মত তিনি (প্রিয়নাথ সেনের কাছে লেখা চিঠি দ্রষ্টব্য, ২০ শে জুন, ১৯০০)। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব বা নীতিকথা সাহিত্যে যাকেই বিষয়ীভূত করুন, শিল্পী যদি পাঠককে আনন্দের কাম্য স্বর্গে পৌঁছিয়ে দিতে না পারেন যে আনন্দ বিশুদ্ধ অর্থাৎ জাগতিক প্রয়োজন-সম্পর্ক-শূন্য, তাহলে শিল্পী নিজের পথ থেকে

ভ্রষ্ট হবেন, রবীন্দ্রনাথ সেই সিদ্ধান্তে সুস্থির। ভারতীয় 'রসবাদী'রাও এই আনন্দের কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন সাহিত্যের আনন্দ ব্রহ্মোপলব্ধির মত অলৌকিক ও অনির্বাচ্য। কিন্তু তাঁরা সাহিত্যে জাগতিক কামনা ও অতৃপ্তির চক্র থেকে মোক্ষের পথ সন্ধান করেছিলেন। শোপেনহাওয়ারও 'উইল' (Will)-এর নিগ্রহ থেকে মুক্তি পেয়ে' 'Will-less knowing'-এর স্তরে উন্নীত হতে চেয়েছিলেন শিল্প-সাহিত্যে। একদা হিরিয়ানার (Hiriyana) কণ্ঠেও অনুরূপ অভিমত শোনা গিয়েছিল যে, শিল্প-সাহিত্যে আমাদের কাছে 'temporary escape from the imperfections of common life'—এর ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ শিল্পে সাহিত্যে এঁরা সন্ধান করেছিলেন বন্ধনমুক্তির আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের জাগতিক সম্পর্ক-শূন্য মুক্তির স্বাদ অন্বেষণ করেননি তাঁর সাহিত্যে। বরং তিনি এই অর্থে রোমান্টিক যে সসীমকে স্বীকার করে নিয়েই নির্বিকল্প আনন্দে আকৃষ্ট। 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে' যে মহানন্দময় মুক্তি তার আস্বাদনেই তিনি লিপ্সু। যদিও 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' এই উক্তিকে চরম বলে তিনি মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই আনন্দে তাঁর আকর্ষণ ছিল না যার জন্ম-কারণ 'imperfections of common life'-থেকে মুক্তি। আবার 'common life'-কে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে তার প্রতিটি বিচ্যুতিকে মানতে হবে, সাহিত্যের সত্যরূপে গণ্য করতে হবে, রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাতেও আস্থাশীল ছিলেন না। পরিণত বয়সে কবি তাঁর তরুণ-সমকালীনদের অতিরিক্ত বস্তুপ্রিয়তার নিন্দা করেছিলেন। বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, এদের 'রিয়ালিজম' হল পাক-দেওয়া শণের দড়ি, কালিদাসের মন্দাক্রান্ত ছন্দের 'মেঘদূত' এদের মন জোগায় না, এরা বিলেতি পাক-শালায় প্রস্তুত 'রিয়ালিটি'র কারি পাউডার আমাদের সাহিত্যের রন্ধনশালায় আমদানি করেছে, এরা সৌন্দর্যের প্রাচীরে ভাঙা কাঁচের টুকরো বসাচ্ছে...ইত্যাদি। সন্দেহ নেই, রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর Critical statements প্রকাশ করেছিলেন নিজের 'Poetic Practice' কে সমর্থন করার জন্যই। অন্যান্য কবি-সমালোচকদের সঙ্গে এ বিষয়ে তার কোনো পার্থক্য ছিল না। তবে আপন সিদ্ধান্তটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন যে দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তির উপর সেখানে পরানুকরণ-প্রিয়তা অথবা পরমত অসহিষ্ণুতার স্থান ছিল না। সস্তা খ্যাতির প্রলোভনে সমকালের কাছে নিঃশেষে আত্মনিবেদন করেননি তিনি, আবার পূর্বনির্দিষ্ট সূত্রের নির্বিচার অনুকরণ-ও করেননি। হয়তো এখানেই রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা।

সাহিত্য-সৃষ্টির মতোই সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রেও প্রাক্-নির্দিষ্ট সূত্রানুসরণ রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না। সাহিত্য বিচার, তাঁর মতে, সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। তিনি মনে করতেন, সমালোচকের কাজ হবে পাঠককে সাহিত্যোপলব্ধিতে সাহায্য করা, ঘরের লোক হিসেবে সাহিত্যিককে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া। কবি নিজেও প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্য বিচারে সহানুভূতিশীল পাঠকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শিল্পবিচারে কোনো রকম 'অ্যানালিটিকাল' পদ্ধতি তা সে 'সাইকো-অ্যানালিসিস' বা অন্য যাই হোক, তাঁর কাছে গ্রহণীয় ছিল না। সাহিত্য যেহেতু অখণ্ড অনুভূতির সামগ্রিক প্রকাশ, তাই সাহিত্যের বিচারও, তাঁর মতে, অখণ্ডভাবেই হওয়া উচিত। টুকরো করতে গেলে এক বস্তু আর হয়ে যায়। সুতরাং পাঠক হিসেবে তার ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার প্রকাশ করাই সমালোচকের কাজ। কেবলমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, সংগীত এবং চিত্রের জগতেও তিনি ঐ অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ সমগ্রতাকে কামনা করেছিলেন। আসলে এই বোধ

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যভাবনারই অঙ্গ ছিল। সৌন্দর্য উপাধিহীন উপলব্ধিমাত্র, সৌন্দর্য রূপহীন-সংজ্ঞাহীন। কিন্তু পাশ্চাত্য 'সাবজেকটিভিস্ট'-দের মতো রবীন্দ্রনাথ চিন্ময়ের সন্ধানে বস্তুকে উপেক্ষা করেননি। সুন্দরের বাস্তব অস্তিত্ব নেই অথবা সুন্দরের প্রতিটি অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই অথবা সুন্দর আপন অস্তিত্বের দ্বারা আনন্দদান করে না, এমন কোনো সুন্দরের ধারণা রবীন্দ্রনাথের কাছে অসত্য। সৌন্দর্যের বোধ, তাঁর মতে, তখনই সার্থক যখন আলম্বনসুন্দর বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহায়তায় ক্রমশ অন্তরে প্রবিষ্ট হয়। বাহ্যেন্দ্রিয়-গোচরতা সুন্দরের সার্থকতা লাভের প্রথম শর্ত হলেও যথার্থ সুন্দর অন্তরিন্দ্রিয়-বেদ্য। তাই সুন্দরকে অখণ্ড ও সমগ্ররূপে বিকশিত হতে হয়। শিল্পে যখন সুন্দরের বিকাশ 'অখণ্ড' ও সমগ্রভাবে ঘটে তখন সৌন্দর্যই হয়ে ওঠে সত্য, মঙ্গলময় এবং আনন্দদায়ক। শিল্পে সৌন্দর্য হচ্ছে আনন্দসৃষ্টির উপায়, 'উপেয়' নয়। পাঠককে এই আনন্দের উপলব্ধিতে সাহায্য করাই আবার শিল্প বিচারকের কর্তব্য।

পল ভালেরি-র বিরুদ্ধে এলিঅটের প্রধান অভিযোগ ছিল যে, তাঁর আলোচনার বিষয়বিস্তার অব্যাপক। অন্তত রবীন্দ্রনাথ যে এই অভিযোগ থেকে মুক্ত সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। জীবনের প্রথমদিকে সংজ্ঞা নিরূপনের চেষ্টার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে তাত্ত্বিক সত্তার জন্ম হয়েছিল, ক্রমে ছবি, গান, সাহিত্য, সৌন্দর্য প্রভৃতির আলোচনায় সেই মন পুষ্ট হয়ে অবশেষে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের মতো তাঁর শিল্পতত্ত্ব-বিশ্লেষণে ব্যাপকতাও বিস্ময়কর। বিভিন্ন পর্বের এই সমস্ত প্রবন্ধগুলিতে তাঁর শিল্পতত্ত্ব-ভাবনা ক্রমে স্পষ্টতা পেয়েছে এবং বার বার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিযুক্ত হওয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে নিজের ধারণাকে তিনি সুদৃঢ় প্রত্যয়-ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এর সুফল যেমন ফলেছে, তেমনি অন্যদিকে কতকগুলি অবাঞ্ছিত ত্রুটি অনিবার্য হয়েছে। প্রথমত আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি অত্যধিক উপমা ব্যবহার করেছেন। লোকেন পালিত একদা রবীন্দ্রনাথকে এইজন্যে অভিযুক্তও করেছিলেন। কারণ ; উপমা তো যুক্তি নয়, উপমা কখনও বিশ্বাস জাগাতে পারে না এবং উপমা দিয়ে উপমা খণ্ডন করলে মূল বক্তব্যটি অস্পষ্ট থেকে যায়। দ্বিতীয়ত একটা উদাহরণের আশ্রয়ে একই বক্তব্য একাধিকবার ব্যক্ত করায় অনেকক্ষেত্রে ক্লান্তিদায়ক পুনরুক্তিদোষ সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয়ত 'অনির্বচনীয়তা', 'লীলা', সমগ্রতা' প্রভৃতি কতকগুলো শব্দের সাহায্যে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। চতুর্থত, অনেক সময় তিনি যা একবার বর্জন করেছিলেন তাকেই পুনরায় আবাহন করেছেন। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'বাংলা সমালোচনা পরিচয়' গ্রন্থে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পঞ্চমত, বিপরীত এবং আপাত বিপরীত বহু ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশ পেয়েছে। সমালোচকদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এবং কোনো সভাসমিতির প্রয়োজন মেটাবার জন্য নিজের সিদ্ধান্ত নিজের অজ্ঞাতেই যে খণ্ডন করেছেন তার প্রমাণও দুর্লভ নয়। সমগ্র দৃষ্টিতে না দেখার ফলে তাঁর অনেক ত্রুটিও সমকালীনেরা ক্ষমা করেননি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম যাঁরা কবির এই ত্রুটির জন্য নির্দয়ভাবে তাঁর উপর খড়গহস্ত হয়েছিলেন। ১৩১৯-এর শ্রাবণ মাসে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় 'অর্চনা' পত্রিকায় লিখেছিলেন 'কাব্যে গন্ধ' প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটির এক জায়গায় তিনি লিখছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে স্বয়ং কাব্য কাহাকে বলে, কাব্যের উদ্দেশ্য কি এবং তাহার অস্পষ্টতার কারণ কি প্রভৃতি বিষয়ে

আমাদিগকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন আমরা আজ সেই সকল উক্তি উদ্‌ধৃত করিয়া তাঁহার আধুনিক মতের অসারতা প্রমাণ করিয়া দিব।' এই প্রবন্ধটি পাঠ করে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অত্যন্ত উল্লসিত মন্তব্য করেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ বোধ করি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, একদিন নবীন লেখক তাঁহারই অস্ত্রে তাঁহাকে জর্জরিত করিবে। ইহাকেই বলে, যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া' (সাহিত্য, ১৩১৯ শ্রাবণ)। কিন্তু এই অভিযোগের গুরুত্ব কী? রবীন্দ্রনাথ তো আভিধানিক অর্থে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাকামী দার্শনিক ছিলেন না। তিনি অপরের চিন্তার দ্বারা যেমন প্রভাবিত হননি, তেমনি অপরকে আপন মতে আনার চেষ্টা কখনও করেছেন মনে হয় না।

রসতীর্থ পথের পথিক রবীন্দ্রনাথ যিনি শিল্পী হিসেবে ছিলেন অসাধারণ রূপবৈচিত্র্যের স্রষ্টা, যাঁর রূপনির্মাণের সাধনার হেতু ছিল রসসৃষ্টির আগ্রহ, বস্তুতন্ত্রের ব্যাপক আধিপত্যের যুগেও যিনি কর্মে ও চিন্তায় ছিলেন রোমান্টিক, ভাববাদী দর্শনে বিশ্বাসী হয়েও জগৎ-বিচ্ছিন্ন ভাববাদ যিনি সমর্থন করেননি, শিল্পতত্ত্বের আলোচনাতেও তিনি আপনিই ছিলেন আপন পথের রচয়িতা। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু কোনো তত্ত্ব দাঁড় করাতে চাননি, ভারতীয় দর্শন থেকে আরম্ভ করে নিওপ্লেটোনিক, হেগেলীয় এবং রোমান্টিক সাহিত্য দর্শন তাঁর ভাবনা-চিন্তার উপর সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করেছে অথচ তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এখানেই সম্ভবত নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের তুলনাহীন স্বাতন্ত্র্য।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পলোক

বাংলা রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাটক

অজিতকুমার ঘোষ

সকল নাট্যকারের মত রবীন্দ্রনাথও নাটক লিখেছিলেন অভিনয়ের উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে কাব্যত্ব অর্থাৎ পাঠ্যগুণ বেশি এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নিছক পাঠের উদ্দেশ্যে তিনি নাটক লেখেননি। পাঠের জন্য তিনি সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমগুলি, অর্থাৎ কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি নাটক লিখলেন তখন যে দৃশ্য অর্থাৎ অভিনেয় দিকটিই প্রধান ছিল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে, মঞ্চ ও প্রয়োগের কোন রূপ তাঁর সামনে উপস্থিত ছিল? যখন তিনি নাটক লেখা শুরু করলেন, তখন গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখরের নেতৃত্বে সাধারণ নাট্যশালার গৌরবময় যুগ চলছে। কিন্তু এই নাট্যশালার সঙ্গে গোড়ার দিকে তাঁর কোনো যোগ ছিল না। যখন তিনি নাটক লেখা শুরু করলেন তখন তিনি তাঁদের পারিবারিক মঞ্চ ও অভিনয়ধারার দ্বারা যেমন নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তেমনি মঞ্চে সুযোগ ও সম্ভাবনা এবং সম্ভাব্য পারিবারিক শিল্পীদের গান ও অভিনয়-ক্ষমতার কথা চিন্তা করে নাটকের বৃত্তগঠন ও চরিত্রসৃষ্টি করেছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখান থেকেই ঠাকুরবাড়ির অভিনয়-অনুরাগী ব্যক্তিদের মধ্যে মঞ্চনির্মাণ ও প্রয়োগরীতি সম্পর্কে জ্ঞান এবং অভিনয় সম্পর্কে আগ্রহ বর্ধিত হচ্ছিল। যখন জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় 'নবনাটকে'র অভিনয় হয়েছিল তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ছয় বছরের শিশুমাত্র। ঠাকুরবাড়িতে অভিনয়ধারার ঐতিহ্য কীভাবে গড়ে উঠেছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় মঞ্চ ও অভিনয়ের অনুরাগী ব্যক্তি এ-দেশে কমই ছিলেন। তিনি চৌরঙ্গী থিয়েটারের এবং পরে সাঁসুসি থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দ্বারকানাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও সংগীত ও বাদ্যে অনুরাগী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ভাই গিরিন্দ্রনাথের পুত্রদ্বয় গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ উভয়েই নাটক ও অভিনয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁর পঞ্চম ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ও সংগীতসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবীর গীতিনাট্য ও নাটকই অভিনীত হয়েছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন এবং যাঁরা পরে শান্তিনিকেতনে অভিনয় করেছিলেন তাঁরা সকলেই দক্ষ শিল্পী ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন অত্যন্ত উঁচুদরের শিল্পী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের নাম করা যেতে পারে।

ঠাকুরবাড়িতে অভিনয় হত তিনতলার ছাদে, প্রাঙ্গণে এবং পরবর্তীকালে বিচিত্রা ভবনে। কোনো কোনো অভিনয় হয়েছে বির্জিতলার বাড়িতে। সংগীতসমাজেও রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়। এরপর সাধারণ নাট্যশালায় তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হয় এবং

বেশ কয়েক জায়গায় খুবই জনপ্রিয় হয়। শান্তিনিকেতনে তাঁর কর্মস্থল স্থানান্তরিত হবার পরে তাঁর নাটকের অভিনয় শুরু হয় শান্তিনিকেতনে খোলা আকাশের নিচে মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে। শান্তিনিকেতনে নাটকের বিষয়, ভাব ও শিল্পরীতির নূতনত্ব দেখা দিল। তেমনি নূতনত্ব দেখা দিল মঞ্চের গঠনে, নাট্যপ্রয়োগে ও অভিনয়-রীতিতে। মাঝে মাঝে কলকাতাতেও অভিনয় হত বিচিত্রা-ভবনে অথবা সাধারণ নাট্যশালায়। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে তাঁর নাটকের অভিনয় সাধারণ দর্শকের কাছে অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠল। বিশেষ করে তাঁর সাংকেতিক নাটকগুলি নানা ধরনের প্রয়োগের মাধ্যমে নাট্যদর্শকদের কাছে অর্থবহ ও আবেদনশীল হয়ে উঠল। বহুরূপী রবীন্দ্রনাটকের বিতর্কিত অথচ জনপ্রিয় প্রয়োগের দ্বারা নাট্যপ্রয়োগ ও রবীন্দ্র-ভাবনা প্রচারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করল। অবশ্য শান্তিনিকেতনী ঐতিহ্য অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাটকের প্রয়োগ ও অভিনয় এখনও চলছে। অপেশাদার ও পেশাদার মঞ্চে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় কোথায় কীভাবে হয়েছে তার বিবরণ নিচে দেওয়া হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভা ১৮৮১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত হয়েছিল। বিদ্বজ্জনসভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে নাটকটির অভিনয় হয়েছিল এবং দর্শকদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি। তেতলার ছাদে পাল খাটিয়ে স্টেজ বেঁধে অভিনয় হয়েছিল। বাল্মীকির ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও সরস্বতীর ভূমিকায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি তাঁর নিজস্ব ভাবপরিকল্পনায় রূপায়িত। অনেকটা নিজস্ব সত্তার প্রতিফলন, রূপসজ্জাতেও তিনি বনবাসী মুনি বাল্মীকির বেশবাস ও রূপসজ্জা গ্রহণ করেননি, তাই বাল্মীকির গায়ে জোব্বা ও পরণে চটিজুতা। বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয় বার বার হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। এখনও অভিনয় হচ্ছে। সম্ভবত গানগুলির জন্যই এই গীতিনাট্যটির এত জনপ্রিয়তা ছিল। রবীন্দ্রনাথ সে-সময় সংগীতপটুতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ১৮৮৬ সালে আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য টাকা তোলার প্রয়োজনে স্টার থিয়েটারে টিকিট বিক্রি করে গীতিনাট্যটির অভিনয় হয়। সাধারণ নাট্যশালায় রবীন্দ্রনাথের সেটা ছিল প্রথম আবির্ভাব। বাল্মীকিরূপে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠনিঃসৃত সংগীতের প্রশংসা করে ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী লিখেছেন (রবীন্দ্রস্মৃতি), "তিনি যখন ঐ সাজে বাল্মীকিরূপে তাঁর সেই সুকণ্ঠে তারসপ্তকে অভিনয়পূর্বক রামপ্রসাদী সুরে গাইতেন, 'শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা' তখন যে সেখানে কি অপরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি হ'ত যারা না দেখেছে না শুনেছে তাদের বোঝানো শক্ত।" পরবর্তীকালের বাল্মীকিপ্রতিভার যখন অভিনয় হয়েছে তখন সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় অভিনয়ের দিকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন কৌতুকরসাত্মক অভিনয়ে অতিশয় পটু, তিনি প্রথম দস্যুর অভিনয়ে যথেষ্ট কৌতুকরস সঞ্চার করেছিলেন। তখন দৃশ্যসজ্জাও যথাসম্ভব বাস্তবধর্মী করে তোলা হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনায় (ঘরোয়া) জানা যায় যে, আয়নার উপর আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হত, টিন বাজিয়ে ও ছাদে দম্বেল গড়িয়ে বজ্রের শব্দ করা হত এবং গাছপালা সাজিয়ে জঙ্গলের দৃশ্য করা হত।

'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যটিও ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্বজ্জনসভার বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে অভিনীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ ও

অভিজ্ঞতা দেবী যথাক্রমে অন্ধমুনি, দশরথ, অন্ধমুনির পুত্র ও অন্ধমুনির কন্যার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটি সখী সমিতির উদ্‌যোগে বেথুন স্কুল বাড়িতে প্রথম অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮২ সালে এই গীতিনাট্যের অভিনয়ে বসন্তের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসটি রাজা বসন্ত রায় নামে নাট্যরূপায়িত হয়ে সাধারণ নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হয়। ভূমিকালিপি এরূপ : বসন্ত রায়—রাধামাধব কর, প্রতাপাদিত্য—মতিলাল সুর, উদয়াদিত্য—মহেন্দ্রলাল বসু, বিভা—সুকুমারী, রামচন্দ্র—নীলমাধব, মঙ্গলা—ক্ষেত্রমণি।

১৮৮৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বির্জিতলার বাড়িতে 'রাজা ও রানী' অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও কাদম্বরি দেবী যথাক্রমে বিক্রমদেব, দেবদত্ত, সুমিত্রা ও নারায়ণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অভিনেতারূপে রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড প্রবৃত্তিময়, বলিষ্ঠ ভাবাভিব্যক্তিমূলক এবং বেগবান ক্রিয়াচঞ্চল অভিনয় এই প্রথম দেখা দিল। শেকসপিয়রীয় নাটকের অভিনয়ে হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের যে উত্তেজনাজনক ক্রিয়া এবং প্রবল ভাবাবেগের যে লীলা বিদেশী রঙ্গমঞ্চে দেখা যেত তার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন (রবীন্দ্রকথা), "এ অভিনয়ের প্রশংসায় কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। বিদেশীয় নাটকীয় ভাবের ও অনুভূতির তীব্রতায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন হরণ করিল।" এমারেল্ড থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা গোপনে বির্জিতলার বাড়িতে এসে অভিনয় দেখে যান এবং কয়েকদিন পরে (১৮৮৯, ৩০ নভেম্বর) তাঁরা এমারেল্ডে 'রাজা ও রানী'র যে অভিনয় করেন তাতে ঠাকুরবাড়ির অভিনয়, বিশেষ করে মেয়েদের অভিনয়ের অনুকরণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জ্ঞানদানন্দিনীর পোষাক পরিচ্ছদ, কণ্ঠস্বর, বলবার ভঙ্গি অবিকল অনুকৃত হয়েছিল। এমারেল্ড থিয়েটারের ভূমিকালিপি এরূপ : বিক্রমদেব—মতিলাল সুর, কুমার সেন—মহেন্দ্রলাল বসু, দেবদত্ত—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, সুমিত্রা—গুলফন্ন হরি। অভিনয়ে সবচেয়ে নাম হয়েছিল মহেন্দ্রলাল বসুর। এই অভিনয়ের পর তাঁকে ট্র্যাজেডিয়ান মহেন্দ্র বসু বলা হত। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিচালিত স্টার থিয়েটারেও 'রাজা ও রানী'র অভিনয় হয়েছিল।

'বিসর্জন' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় সংগীত সমাজে ১৯০০ সালে অভিনীত হয়েছিল। তিনি স্বয়ং রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯০১ সালে বির্জিতলার বাড়িতে ত্রিপুরার মহারাজার আগমন উপলক্ষ্যে 'বিসর্জন' নাটকের পুনরায় অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রঘুপতির ভূমিকায় এবং তাঁর পরিবারস্থ যুবকরা অন্যান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনেকের মতে রঘুপতির ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়। শেকসপিয়রীয় রোমান্টিক অভিনয়ের মত রঘুপতির ভূমিকায় তাঁর অভিনয়েও হৃদয়বৃত্তির প্রচণ্ডতা এবং বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। অনেক বছর পরে বৃদ্ধ বয়সে তিনি জয়সিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 'বিসর্জন' মঞ্চস্থ হয়েছিল এম্পায়ার থিয়েটারে (১৯২৩)। ভূমিকালিপি এরূপ : জয়সিংহ—রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দমাণিক্য—গগনেন্দ্রনাথ, রঘুপতি—দিনেন্দ্রনাথ, নক্ষত্রমাণিক্য—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। নারীভূমিকাগুলিতে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই অভিনয় সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন (সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ), "তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) অঙ্গ

বিন্যাস, স্বরবিন্যাস ও আবৃত্তিকৌশল অমর হয়ে থাকবে আমার স্মৃতির মধ্যে—তিনি ছিলেন একেবারেই অননুকরণীয়। গগনেন্দ্রনাথকে দেখে মনে হয়েছিল সেকালের সত্যকার একজন রাজাকে দেখলুম। রঘুপতির ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথের মর্মভেদী দৃষ্টি ও বিপুল দেহই কেবল মানানসই হয়নি, তাঁর অভিনয়ও বেশ উতরে গিয়েছিল।" ১৯২৬ সালে নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয়ে ছিলেন, রঘুপতি—শিশিরকুমার, জয়সিংহ—রবি রায়, গোবিন্দমাণিক্য—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গুণবতী—চারুশীলা, অপর্ণা—পুতুল। পরে শিশিরকুমার জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আধুনিক কালেও 'বিসর্জন' নাটকের অনেক অভিনয় হয়েছে। বহুরূপীর প্রযোজনায় ও শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'বিসর্জন' অভিনয় উল্লেখযোগ্য। ১৮৮২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর 'চিত্রাঙ্গদা' এমারেল্ড থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দশ বৎসর যুক্ত ছিলেন অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক রূপে। এই সংগীতসমাজের বন্ধুদের উৎসাহে তিনি 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনটি লিখলেন। প্রহসনটি সংগীতসমাজে অভিনীতও হল। এই নাটক রচনার ছত্রিশ বছর পরে ১৯২৭ সালে 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনটি সংশোধন করে 'শেষরক্ষা' নাম দিয়ে সাধারণ নাট্যশালার জন্য লিখে দেন। নাট্যমন্দিরে ১৯২৭ সালে 'শেষরক্ষা' মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে ছিলেন—চন্দ্র—শিশিরকুমার, বিনোদ—রবি রায়, গদাই—শৈলেন চৌধুরী, নিবারণ—যোগেশ চৌধুরী, শিবচরণ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ললিত—রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ক্ষান্তমণি—চারুশীলা, কমলমণি—কৃষ্ণভামিনী, ইন্দুমতী—প্রভা। এই অভিনয় সম্পর্কে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "শেষরক্ষায় চন্দ্রবাবু শিশিরকুমারের এক সৃষ্টি ; এর অভিনয়ের শেষ দৃশ্যে শিশিরকুমার মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলেন।" অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রীত হলেন। শেষরক্ষার গান শিখিয়েছিলেন স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও সংগীতসমাজের উৎসাহে রচিত হয়েছিল। নাটকটি খামখেয়ালি সভায় পড়ে শোনান এবং সকলে মিলে এর অভিনয় করেন। অভিনয়ে ছিলেন , কেদার—রবীন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠ—গগনেন্দ্রনাথ, অবিনাশ—নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, তিনকড়ি—অবনীন্দ্রনাথ। কেদারের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ মুখের বক্ররেখা ও চোখের তির্যকভঙ্গিতে চরিত্রটির কুটিলতা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তিনকড়ির ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথের কৌতুকরসাত্মক অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য।

১৯০৪ সালে 'চোখের বালি' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন গিরিশচন্দ্র এবং ক্লাসিক থিয়েটারে ওই নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে ছিলেন, মহেন্দ্র—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিহারি—মনোমোহন গোস্বামী, বিনোদিনী—কুসুমকুমারি, আশা—ব্ল্যাকী। 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় হয় আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনায় স্টার থিয়েটারে (১৯২৫)। অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, অপরেশ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নীহারবালা যথাক্রমে চন্দ্র, অক্ষয়, রসিক, পূর্ণ ও নীরবালার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অভিনয় হয়েছিল অতি চমৎকার। ওই বছরেই (১৯২৫) স্টার থিয়েটারে 'গৃহপ্রবেশ' নাটকটির অভিনয় হয়। যতীনের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য।

রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র যখন শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত হয় তখন নাটকের রূপরীতি ও ভাবনার মধ্যে যেমন নূতনত্ব দেখা দিল, তেমনি মঞ্চ পরিকল্পনা ও প্রয়োগরীতির মধ্যেও

পরিবর্তন দেখা দিল। এতদিন তিনি রোমান্টিক কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য ও হাস্যরসাত্মক কমেডি রচনা করেছিলেন। এখন লিখতে শুরু করলেন সাংকেতিক নাটক, যেখানে ঘটনা ও চরিত্রের দৃশ্যরূপ অপেক্ষা ব্যঞ্জিত রূপই প্রধান হয়ে উঠল। মঞ্চ সম্পর্কে তাঁর নতুন চিন্তা প্রকাশ পেল রঙ্গমঞ্চ নামক প্রবন্ধটির মধ্যে। তিনি বলেছেন, "বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রী চরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।" শান্তিনিকেতনে দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চ কলাকৌশল প্রয়োগ ব্যয়সাপেক্ষ এবং অসুবিধাজনক ছিল বলেই যে রবীন্দ্রনাথের মঞ্চ পরিকল্পনায় নতুন ভাবনা এসেছিল তা সত্য, আর আশ্রমের বালকদের দিয়ে অভিনয় করাতে হত বলে স্ত্রী-ভূমিকায় পুরুষের অভিনয়ের পক্ষে তিনি দাবি জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যাত্রাভিনয়ের পুনঃপ্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশের যাত্রা আমার এজন্য ভালো লাগে, যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।" শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত পরিবেশে যাত্রীভিনয় রীতিতে তাঁর নাটক রচনা ও প্রয়োগের দিকে প্রবণতা আসা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

শান্তিনিকেতনে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ যে সাংকেতিক নাটকগুলি রচনা করেন সেগুলির অভিনয় হয়েছিল যেমন শান্তিনিকেতনে তেমনি কলকাতাতেও বটে। শান্তিনিকেতনের অভিনয় সম্ভবত অনেকটা যাত্রাধর্মীয় হত এবং সেখানে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ও আশ্রমিক ছাত্রবৃন্দ। কিন্তু কলকাতায় জোড়াসাঁকো বাড়িতে যখন অভিনয় হত তখন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি শিল্পী প্রতীকী মঞ্চ ও দৃশ্য নির্মাণ করতেন এবং ঠাকুর পরিবারের দক্ষ অভিনয়শিল্পীগণ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ দুই জায়গাতেই কখনো নাটকের কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, কখনো বা নির্দেশকরূপে মঞ্চে উপস্থিত থাকতেন। তবে শান্তরসাত্মক এবং সংগীতপ্রধান ভূমিকাতেই তিনি বেশি অবতীর্ণ হতেন।

১৯১৭ সালে বিচিত্রাভবনে 'ডাকঘর' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে ছিলেন : ঠাকুরদা—মাধব—গগনেন্দ্রনাথ, মোড়ল—অবনীন্দ্রনাথ, দইওয়ালা—অসিত হালদার। মহাত্মা গান্ধি, তিলক, মদনমোহন মালব্য, অ্যানি বেশান্ত প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয় সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন (সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ), "বিচিত্রার দ্বিতলে হলঘরের পশ্চিম প্রান্তে বাঁধা হয়েছিল এক রত্তির একটি মঞ্চ, কিন্তু আকারে ছোটো হলে কি হয়—রুচি, সৌন্দর্য, কাব্যশ্রী, দৃশ্যসংস্থান ও পরিকল্পনার দিক দিয়ে তা বড়ো বড়ো সাধারণ রঙ্গালয়ের বহুবিজ্ঞাপিত মঞ্চশিল্পকে অনায়াসেই লজ্জা দিতে পারত—এতটুকু জায়গায় এমন আয়োজন যে করা যায়, এটা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। অভিনয়ের চমৎকারিতাও ভাষায় বর্ণনাতীত।" ১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতনে অভিনীত 'ফাল্গুনী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অন্যান্য যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন, দাদা—জগদানন্দরায়, চন্দ্রহাস—ক্ষিতিমোহন সেন, সর্দার—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ঘরছাড়া নবযৌবনের দলে নামেন দিনেন্দ্রনাথ, সন্তোষ মজুমদার, অসিতকুমার হালদার ইত্যাদি। এর পর একই বছরে

(১৯১৫) 'ফাল্গুনী' নাটকটি জোড়াসাঁকোর বাড়ির উঠানে মঞ্চস্থ হয়। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মিলিত চেষ্টায় যে রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হল তার অপরূপ শিল্প-সৌন্দর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ কবিশেখর ও অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন (রবীন্দ্রজীবনী), "মনে আছে সাজঘরের কাছে তাঁহাকে দেখিয়া চমকিয়া গিয়াছিলাম, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলে দর্শকদের কী জয়োচ্ছ্বাস। ত্রিশ বৎসর পূর্বের যুবক রবীন্দ্রনাথ যেন, নবকলেবরে সেখানে উপস্থিত। সে কী চঞ্চল জীবন্ত মূর্তি। তারপর আসিলেন বৃদ্ধ অন্ধ বাউলের রূপে। তখন সে আবার কী শান্ত সমাহিত মূর্তি। 'ধীরে বন্ধু ধীরে' এই গানটি কবির কণ্ঠে সেদিন যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, আমৃত্যু তাঁহাদের কণ্ঠে সেটি ধ্বনিত হইবে।" গগনেন্দ্রনাথের রাজার ভূমিকায় অভিনয় এবং অবনীন্দ্রনাথের কৌতুকরসাত্মক অভিনয়ও সকলের ভালো লেগেছিল।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫ সালে শেষ অভিনয় করেছিলেন 'শারদোৎসবে'র রাজ সন্ন্যাসী চরিত্রে। ওই বছর নিউ এম্পায়ারে 'অরূপরতন' নাটকে রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই অভিনয় সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন, "কিন্তু পঁচাত্তর বৎসর বয়সে রাজার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের যে বাণী শুনেছিলুম তা ছিল যেমন সবল, তেমনি পরিষ্কৃত ও তেমনি সংগীতময়। কেউ বলে না দিলে বুঝতে পারা অসম্ভব ছিল যে, রাজার ভাষণের জন্ম কোন অতি-প্রাচীনের কণ্ঠের মধ্যে। কেবল রাজা নয়, ঠাকুর্দার ভূমিকাতেও রবীন্দ্রনাথ উপহার দিয়েছিলেন বাক্যময় ভূমিকা।"

'তপতী' নাটকটি ১৯২৯ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিক্রমদেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নাট্যমন্দিরে ওই বছর শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় 'তপতী' নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয়ে ছিলেন, বিক্রমদেব—শিশিরকুমার, নরেশ—জীবন গাঙ্গুলী, দেবদত্ত—যোগেশ চৌধুরী, কুমারসেন ও রত্নেশ্বর—রবি রায়, সুমিত্রা—প্রভা, বিপাশা—কঙ্কাবতী। ১৯৩৮ সালে শিশিরকুমারের পরিচালনায় 'যোগাযোগ' মঞ্চস্থ হয়। ভূমিকালিপি এইরূপ : মধুসূদন—শিশিরকুমার, বিপ্রদাস—শৈলেন চৌধুরী, নবীন—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদিনী—কঙ্কাবতী, শ্যামা—ঊষা, মতির মা—রানীবালা।

বিভিন্ন অপেশাদার নাট্যসংস্থা আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটক অভিনয় করে চলেছে। তাঁর কমেডিগুলির আবেদন চিরন্তন। 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'শেষরক্ষা' ও 'চিরকুমার সভা'র জনপ্রিয়তা একটুও কমেনি। নৃত্যনাট্যগুলি এবং আংশিক নৃত্যসংবলিত নাটক 'নটীর পূজা' ও 'তাসের দেশ'ও বহু-অভিনীত। সাংকেতিক নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়েছে বহুরূপীর দক্ষ প্রয়োগ ও নিখুঁত অভিনয়ের ফলে। বহুরূপী 'রক্তকরবী', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা' ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করেছে। তবে সবচেয়ে আলোড়ন জাগানো প্রয়োগ ও অভিনয় হয়েছে 'রক্তকরবী'র। শম্ভু মিত্রের অনুপম কণ্ঠস্বর, তৃপ্তি মিত্রের প্রাণবন্ত আনন্দচাঞ্চল্য, খল গোঁসাই চরিত্রে কুমার রায়ের অভিনয়দক্ষতা, তাপস সেনের আলো এবং চমকপ্রদ দৃশ্যসজ্জা 'রক্তকরবী'র অভিনয় এত লোকপ্রিয় করেছে। তবে চরিত্রের পোশাকপরিচ্ছদ ও রূপসজ্জা, দৃশ্য ও আলোর জাঁকজমক, গানের দুর্বলতা, সূক্ষ্ম আভাস ইঙ্গিত ব্যঞ্জনার অভাব রবীন্দ্র-ভাব ও পরিকল্পনার বিরোধী।

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চপ্রতিমা

কুমার রায়

১

জোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'-র একশ সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার একটি উদ্‌ধৃতি—"আমি ও রামসর্বস্ব দুইজনেই রবির পড়ার ঘরে বসিয়াই, 'সরোজিনী'-র প্রুফ সংশোধন করিতাম। রামসর্বস্ব খুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবি শুনিতেন, ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া, কোন্ স্থানে কি করিলে ভাল হয়, সেই মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতা-প্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন—এখানে পদ্য-রচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না।...রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্পসময়ের মধ্যেই 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'—এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।"—রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোল।

কবিপ্রতিভা এবং নাট্যপ্রতিভার উন্মেষকাল ১৮৭৫-৭৬ সালকে যদি ধরা হয় তবে তারও আগের কয়েকটা বছরকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, বিশেষ করে তাঁর মঞ্চ ও নাটকের সঙ্গে পরিচয় এবং যোগসূত্র খুঁজতে গিয়ে। কিন্তু তার আগে একবার দেখি তাঁর জীবনের অন্তিম অধ্যায়ের দুটি ঘটনা। ১৯৩৫ সাল। আর ক বছরই বা বাকি তখন। সুধীরচন্দ্র করের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাক—"মৃত্যুর কিছুদিন আগের কথা—'অরূপরতন' অভিনয় হবে। গুরুদেব নেমেছেন অদৃশ্য রাজা ও ঠাকুরদার ভূমিকায়। কলকাতায়ও যাওয়া হবে। সোৎসাহে সব আয়োজন চলছে। কবি পুরোনো এককপি হাতে নিয়ে নতুন করে বইটি লিখতে শুরু করলেন। ···নতুন লেখা অংশ এত যোগ হয়েছে যে পুরোনোটা আর মনে লাগছে না ; আদেশ হল বইটার ২য় সংস্করণ করে ছাপবার। গোটা বইটার প্রুফ আসছে আর গোটা বইটা ব্যাপীই চলছে পরিবর্তন। এরূপে ৬/৭ বার প্রুফ আসার পর তাড়া পড়ল,—একদিনের মধ্যেই চাই ছাপানো বই—গোটাটাই, অন্তত আট-দশ কপি। অভিনেতাদের দিতে হবে, হাতে হাতে কপি না পেলে মহড়া এগোচ্ছে না।" আরও বছর পাঁচেক আগের ঘটনা 'তপতী'-র অভিনয়। জালন্ধররাজ বিক্রমের ভূমিকায় অবতীর্ণ কবি। ১৯২৯ সালে পর পর চারদিন এই অভিনয় হল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। কবির বয়স তখন সত্তর। জসীমউদ্দীনের উদ্বেগ, কেমন করে কবি এই বয়সে সাদা দাড়ি নিয়ে যৌবনে দীপ্ত প্রেমিক রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন! তিনি নাটক পাঠ এবং অভিনয়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন। "দাড়িতে কালো রঙ মাখাইয়া মুখের দুই পাশে গালপাট্টা তুলিয়া দিয়া কবি এক তরুণ-

যুবকের বেশে মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন।" মঞ্চের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, অভিনয়ে নিষ্ঠা, নাটক নিয়ে নিরন্তর পরিবর্তন এবং পরীক্ষার অনুধ্যানের চিহ্ন তাঁর সমগ্র নাট্যজীবনে ছড়িয়ে আছে।

আবার ফিরে যাই তাঁর বাল্যের এবং কৈশোরের দিনগুলিতে। 'ভৃত্যরাজতন্ত্র' তখন চলছে রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রায়। ১৮৬৭ সালে জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনীত হচ্ছে 'নব-নাটক'। রবীন্দ্রনাথের মতো ছোটোদের কোনও অংশ নেই তাতে। কিন্তু সেই আবহাওয়া কি নাট্য এবং মঞ্চের প্রতি অনুরাগের অঙ্কুরোদ্‌গমের সহায়ক হয়নি? রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা'-য় লিখেছেন, "এ বাড়ির বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে থাকতুম, দেখতুম ও বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোকময়। দেউড়ির সামনে বড়ো বড়ো জুড়িগাড়ি এসে জুটেছে। ... নাটকের থেকে কুলীন মেয়ের ফুঁপিয়ে কান্না কখনো কখনো কানে আসে, তার মর্ম বুঝতে পারিনে। বোঝবার ইচ্ছেটা হয় প্রবল।" বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথ দেখতেন এবং শুনতেন। বৈঠকখানা বাড়ির আলো, কনসার্টের আওয়াজ, নাটকের মহলা। এ সেই পর্ব যখন বালক রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করছেন ওই বারান্দায়। তাঁর ভূমিকা গুরুমশায়ের, হাতে বেত আর শাস্তি হচ্ছে বারান্দার রেলিং-এর দণ্ডগুলি। আসল নাটকের চিত্রপট আঁকা হয়েছে নিপুণ চিত্রকর দিয়ে। পঞ্চম দৃশ্যে তো নানাবিধ লতাপাতা এবং জীবন্ত জোনাকি পোকা জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সোমপ্রকাশ পত্রিকায় নবনাটকের সমালোচনায় লেখা হল— "এখানে নাটক অভিনয়ের যে প্রণালী দর্শন করিলাম, তাহা যদি সর্বত্র প্রচলিত হয়, আমাদিগের বিশুদ্ধ আমোদ ভোগের একটি উৎকৃষ্ট উপায় হইয়া উঠে। নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্মিত ও দ্রষ্টব্যগুলি সুন্দর, বিশেষত সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতি মনোহর হইয়াছিল।" অর্থাৎ একটা মঞ্চরীতিও তৈরি হচ্ছিল এই বাড়িতে। এই রীতির প্রভাব আমরা রবীন্দ্রযুগেও দেখতে পাব।

আরও দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই-বারিক' নাটক প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১০/১১ হবে। রবীন্দ্রনাথের দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া একদিন নাটকটি পড়ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন 'অবোধবন্ধু' পত্রিকা থেকে 'পৌল-বর্জিনী'র বাংলা অনুবাদ পড়ে 'প্রবল বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ' অবস্থা। 'জামাই-বারিক'-ও তিনি পড়বেন। আত্মীয়াটি ওই বয়সে পড়ার উপযুক্ত বই নয় বলে বাক্সে বন্ধ করে রাখলেন বইটি। রবীন্দ্রনাথ উত্তেজিত। চাবি চুরি করে বাক্স খুলে নাটকটি পড়ে ফেললেন। আবশ্য এ উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের ওই বয়সে পাঠ্য-অপাঠ্য ভেদ জ্ঞান না করে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই পড়ার অভ্যাসের নিদর্শন। তবু 'জামাই-বারিক' নাটক তো! আর, 'ছেলেবাবুরা থিএটর দেখিতে যান—উহাদিগের টিকিটের মূল্য—দু-দফায় ৮ হিসাবে ১৬ টাকা' দেওয়া হয়েছিল—হিসাবের খাতায় পাওয়া যাচ্ছে। তারিখ অনুযায়ী সে নাটক দুটি 'সধবার একাদশী' এবং 'নবীন তপস্বিনী'। রবীন্দ্রনাথও ছেলের দলে ছিলেন।

আর এই পর্বের হ. চ. হ-র কথা না মনে করে কী করে রবীন্দ্রনাথ ও মঞ্চের সম্পর্ক নির্ণয়ের পটভূমি তৈরি হবে। হরিশচন্দ্র হালদার রবীন্দ্রনাথের স্কুলজীবনের সঙ্গী হিসেবে না জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সূত্রে জোড়াসাঁকোর বাড়ির সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন সে তর্ক অবান্তর। স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদিন অক্ষুণ্ণ ছিল এই সংযোগ। যদিও রবীন্দ্রনাথ কৈশোরপর্বের পর আর এঁর উল্লেখ করেননি। কিন্তু অন্যায় করেছেন। ইনি ম্যাজিশিয়ান,

ইনি নাট্যকার, ইনি মঞ্চসজ্জাকর। রবীন্দ্রনাথকে সেই বয়সে মুগ্ধ করেছে এঁর বহুমুখী প্রতিভা। তাঁর সাহায্যে কুস্তির আখড়ায় বাখারি পুঁতে, কাগজ দিয়ে নানা রঙের ছবি এঁকে, স্টেজ বানিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেরা অভিনয় করবে তার আয়োজন। গুরুজনদের হস্তক্ষেপে সে অভিনয় নাকি সম্পন্ন হয়নি। কিন্তু 'গল্পসল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মুক্তকুন্তলা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে মনে হয় অভিনয় হয়েছিল। অনুমানটি করেছেন 'রবিজীবনী'-র লেখক শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল। হ.চ.হ বা হরিশচন্দ্র হালদার সম্পর্কে আর একটি তথ্যও উদ্‌ধৃত করা যায়। তখন বালক পত্রিকায় (১৮৮৫ খ্রি) রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের লেখার সঙ্গে ইলাসট্রেশন হিসেবে তাঁর ছবি লিথোগ্রাফ করে মুদ্রিত হচ্ছে। ছোটোদের জন্য মঞ্চসজ্জা করে দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই তখন আর ছোটো নন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'-র অভিনয় তখন হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী হিরণ্ময়ী দেবী লিখেছেন, "··· আমরা হরিশবাবুকে ধরিলাম যে আমাদের একটি স্টেজ আঁকিয়া দিতে হইবে। আমাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা বৃথা। রফা হইল যে ৫০্ টাকায় তিনি সে কাজটা করিয়া দিবেন। ··· 'ভারতী'-র মলাটে তখন বীণাপাণির যে ছবি থাকিত, আমাদের স্টেজের শিরোভাগে অঙ্কিত হইয়াছিল সেই ছবি। ড্রপ সিনে—মধ্যে অঙ্কিত রবিমামার মুখ—আর তার চারিদিকে একটি ফুলের মালা—কিন্তু সে ফুল, বাগানের ফুল নয়—নাট্যাভিনেতা ছেলে-মেয়েদের মুখগুলি।" (দ্র রবিজীবনী)।

এ-সবই জোড়াসাঁকো বাড়িকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাট্য ও মঞ্চ জীবন তো পরবর্তীকালে কলকাতার বাইরে শান্তিনিকেতনেও প্রোথিত। শান্তিনিকেতনের বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ছাড়া পেয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের বীজও অঙ্কুরিত। অন্তত সেই বাঁধানো 'লেট্‌স্ ডায়ারি'-তে "তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে রচিত বীররসাত্মক কাব্যই" তো পরে রূপান্তরিত হয়েছিল 'রুদ্রচণ্ড' নাটকে।

আর হিমালয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন তাঁদের ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন কিশোরী চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন পাঁচালি দলের গায়ক। পাঁচালি, কথকতাই তো বাংলা নাট্যাভিনয়ের আদি রূপ। সেই পাঁচালি গায়কের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা গাঢ় ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, "সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত, 'আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম, সে আর কী বলিব।' শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত—পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশ-দেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত।" ডাকঘর নাটকের অমল তো বলেছিল, 'আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করে বেড়াবো।'

২

যখন আমরা বলি কবির ষাট বছরের নাট্যজীবন—তখন কথাটা যে সম্পূর্ণ সত্য নয় সেটা বোধহয় বোঝা গেল। কেন না সূচনা পর্ব, অর্থাৎ 'বাল্মীকিপ্রতিভার' অভিনয় (১৮৮১), তার আগেও আরও বহু বছর বাল্যে, কৈশোরে নাটক এবং মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্কের একটা বাতাবরণ তৈরি হচ্ছিল প্রচলিত ধারায়। অন্তর্নিবিষ্ট নাটক এবং মঞ্চ, পাঠক এবং দর্শক তো তখন

বহুদূরের বস্তু। কিন্তু বহুদূরের—সেই আধুনিক পর্ব, বিশিষ্ট পর্ব তৈরি করতে এ-সব কিছু কি কোনও কাজে আসেনি? ইতিহাসকে তার অন্তস্থলে ধরতে চাইলে বোধহয় এ অনুসন্ধান অসার্থক হবে না। বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন হবে না—পাঠক ধরতে পারবেন ছোটো ছোটো ঘটনাগুলিকে চালচিত্র হিসেবে।

এবারে এই চালচিত্রের সামনে প্রতিমা নির্মাণ। রবীন্দ্রনাথের মঞ্চপ্রতিমা! ১৮৮০ অর্থাৎ 'বাল্মীকি প্রতিভার' আগের বছর 'মানময়ী' নাটক অভিনীত হয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথের প্ররোচনায়, ইন্দিরা দেবীর মতে, লেখা হয় এবং অভিনীতও হয়। দেবদেবীদের মানভঞ্জন নিয়ে লেখা গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ নেমেছিলেন 'মদন' চরিত্রে। কিন্তু তার আগে তো ১৮৭৭ সালে 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে অলীকবাবুর ভূমিকায়—যাকে বলে জ্বালিয়ে দিয়েছেন তিনি। নাটকের নাম পালটে তাঁর অভিনীত চরিত্র অনুযায়ী পরবর্তীকালে 'অলীকবাবু' নামকরণ কি সেই কথাকেই প্রমাণ করে না!

সন তারিখের অনুল্লেখে, এই প্রাথমিক পর্বেই তিনি যে একবার হ.চ.হ-র লেখা নাটকে 'নায়িকার পার্ট' অভিনয় করেছিলেন কিংবা আরও দুর্লভ সংবাদ, ঠাকুরবাড়ির আত্মীয় সাধারণ রঙ্গালয়ের খ্যাতিমান অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির সঙ্গে কোনও মঞ্চে একই সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন, সঠিক কাল নির্ধারণ সম্ভব না হলেও ঘটনা দুটি মনে করে রাখবার মতই। 'রয়েল থিয়েটার'-এর সাহেব চিত্রকর দিয়ে পছন্দসই সিন আঁকানো হয়েছিল সে সময়, এ কথাটাও তো মনে রাখতে হবে।

আঠারোশো একাশি খ্রিস্টাব্দের পর তিনি সমর্থ ইঙ্গিত খুঁজে নিতে চাইলেন নাটক মঞ্চ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে। অন্যের লেখা নাটক নয়, নিজের লেখা নাটক ; অন্যের প্রয়োগনৈপুণ্যের অংশীদার নন,—নিজেই প্রয়োগকার। মঞ্চের ব্যাপারে অবশ্যই হ.চ.হ-র প্রভাব ছিল এই উদ্যোগপর্বে। ক্রমশ সেক্ষেত্রে হাত লাগালেন—অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অসিত হালদার, নন্দলাল প্রমুখরা।

'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনীত হয়েছে বহুবার। অবনীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী তার বর্ণনা দিয়েছেন। হয়তো একই অভিনয়ের নয়, বিভিন্ন অভিনয়ের বিবরণ। মঞ্চকে রিপ্রেজেন্টাশন্যাল করবার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। গাছের ডাল-পালা কেটে বনভূমি, সত্যিকার বৃষ্টির মায়া তৈরি করতে টিনের নল এবং ঝাঁঝরা ব্যবহার, পদ্মবন, শোলার পদ্মফুল। নেট-এর পর্দাও ব্যবহার হয়েছিল। তারই মধ্যে আস্তে আস্তে আলো বাড়িয়ে সরস্বতীর আবির্ভাব। আয়না দিয়ে বিদ্যুৎ খেলান, ডাম্বল গড়িয়ে বজ্রধ্বনি ইত্যাদি। কোনও অভিনয়ে যুক্ত হয়েছে তুলোর তৈরি ক্রৌঞ্চ মিথুন, কচুবনে বন্যবরাহ লুকিয়ে আছে এমন সিন আঁকা হল। অর্থাৎ মঞ্চমায়া তৈরি করবার আয়োজন। দস্যু রত্নাকর হিসেবে কি রবীন্দ্রনাথ দস্যুদের বেশে মঞ্চে নেমেছিলেন? জানি না। আমাদের পরিচিত 'বাল্মীকিপ্রতিভার' রবীন্দ্রনাথের চিত্রটির ভাষ্য করেছেন ইন্দিরা দেবী, 'পিঠের দিকে লম্বা জোব্বা' বিলিতি রাজরাজড়াদের 'ম্যান্টল-এর আদল'। বিলিতি বাস্তবতার অনুকরণ। তারই ওপর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। 'অবশ্য রবিকাকা যাই পরতেন তাই মানাত।' দস্যুসর্দার হিসেবে দস্যুদলকে ডাকবার জন্যে গলায় ঝুলত শঙ্খ। অন্যান্য দস্যুদের প্রথমদিকে কিন্তু খালি গা। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আগে ছিল দস্যুদের খালি গা, বুকে সরু শালুর ফেটি।" আমরা যে ছবি ছাপা দেখি তাতে দস্যুদলের সাজ ইন্দিরা দেবীর বর্ণনা অনুযায়ী—'ইয়া গোঁফ', 'ইয়া পাগড়ি'। 'রঙ্গমঞ্চের উপযুক্ত রঙ চড়িয়ে'

পরানো হত ধুতি, ফতুয়া, মাথায় থাকত ফেটি বাঁধা। ইন্দিরা দেবীর সংশয় দেখা দিয়েছিল কেন এমন কাবুলিওয়ালার বেশ ডাকাতদের? অবনীন্দ্রনাথ সেটি ফাঁস করে দিয়েছেন। লর্ড ল্যান্সডাউন আসবেন সস্ত্রীক 'বাল্মীকিপ্রতিভা' দেখতে। সত্যেন্দ্রনাথ, খালি গায়ে দস্যুদের, লাটপত্নীর সামনে হাজির করাটা পছন্দ করলেন না। তাই কাবুলিওয়ালাদের পোশাক। "দরজি ডাকা হল। ...দরজি এসে আমাদের সাজ করতে লাগল, কাবুলীদের মতো গায়ে সেইরকমের পাঞ্জাবী, পা অবধি কাবুলী পাজামা।" বোঝা যায় এই পর্বে বাইরের অনেক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করছিল নাট্যপ্রয়োগ। এমন কি রবীন্দ্রনাথের পোশাকটাও। বোধকরি একটা স্টাইলের জন্ম নিচ্ছে তখন। শুধু সুন্দর করে নিজেকে প্রজেক্ট করবার জন্য নয় নিশ্চয়ই। পরের বছর 'কালমৃগয়া'-য় অন্ধমুনির ভূমিকায় কী বেশ নিয়েছিলেন? নিশ্চয়ই চরিত্রোপযোগী। 'অলীকবাবু' নাটকে ড্রামাটিক ক্লাবের প্রযোজনায় অলীকবাবু সেজেছেন রবীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন, "রবিকাকার ওই তো সুন্দর চেহারা, মুখে কালিঝুলি মেখে চোখ বসিয়ে দিয়ে একটা অত্যন্ত হতভাগা ছোঁড়ার বেশে স্টেজে তিনি বেরিয়েছিলেন।" শান্তিনিকেতন পর্বে দেখি রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসব' নাটকে সেজেছেন সন্ন্যাসী এবং 'রাজা' নাটকে 'ঠাকুরদা এবং নেপথ্য থেকে 'রাজা'। সীতাদেবী লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং এবারেও তাঁহাকে তাঁহার সাধারণ বেশের বিশেষ কিছু পরিবর্তন করিতে হয় নাই, শুধু মাথায় একটি গেরুয়া রঙের পাগড়ি বাঁধিয়া আসিয়াছেন।" এ সন্ন্যাসী তো ছদ্মবেশী সম্রাট বিজয়াদিত্য। তাই বোধ করি রবীন্দ্রনাথের নিজের ইমেজটাকে ঢাকবার সযত্ন প্রয়াস। 'রাজা'-র ঠাকুরদায় তা প্রয়োজন হয়নি—তাই "সদাসর্বদা যে গেরুয়া রঙের পোশাক পরিতেন, তাহার উপর ফুলের মালা পরিয়া তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরদা যেখানে রাজসেনাপতির বেশে আবির্ভূত হইলেন, সেখানে অবশ্য বেশের পরিবর্তন ঘটিল। সাদা রেশমের পোশাকের উপর চওড়া লাল কোমরবন্ধ পরিয়া তিনি বাহির হইলেন।

বিরজিতলায় সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে 'রাজা ও রানী' মঞ্চস্থ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন বিক্রম-এর ভূমিকায়। রূপসজ্জা বা সাজপোশাকের বিবরণ নেই। শুধু মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদের নূতনত্ব সাধারণ রঙ্গালয়কে প্রভাবিত করেছিল এই সংবাদ ছাড়া। 'বিসর্জন' নাটকও এখানে হয়েছে। পরে শান্তিনিকেতনে এবং বোধকরি সর্বশেষ অভিনয় কলকাতার এম্পায়ার মঞ্চে। দুটি আলোকচিত্র পাওয়া যায় এই দুটি প্রযোজনার আর তারই সূত্র ধরে আমরা প্রযোজনার একটা বিবর্তনের ইঙ্গিতও পেয়ে যাই। শান্তিনিকেতনে 'বিসর্জন' বহুবার অভিনীত হয়েছে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেননি। ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের সামনে বিরজিতলায় অভিনয় হয়। পুরোনো সিন-সিনারি যা ছিল তাই দিয়েই মঞ্চ সাজানো হয়েছিল, এর বেশি তথ্য দেননি অবনীন্দ্রনাথ। আলোকচিত্রে মৃত জয়সিংহরূপী অরুণেন্দ্রনাথ কাৎ হয়ে পড়ে আছেন এবং রঘুপতি সাজে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেহের উপরে ঝুঁকে আছেন। মুখের অভিব্যক্তিতে ব্যাকুলতা। দুজনেরই গায়ে শিথিল চাদর, রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ সেই বাহু আবেগে স্ফীত কব্জি আর জয়সিংহের হাতে স্খলিত একখানি ছুরি। দৃশ্যপট হিসেবে কী দেখতে পাচ্ছি আমরা! পাশে বাঘছালের সঙ্গে বাঘমুণ্ডটি উঁকি মারছে। পিছনের পর্দায় আঁকা কিছু অস্পষ্ট গাছপালার আভাস। রঘুপতির কপালে হয়তো রক্তচন্দনের ত্রিপিটক। কবিপুত্র রথী ঠাকুর বলেছেন, ১৯০২

সালে শান্তিনিকেতনে 'বিসর্জন' নাটক থেকে পরিবর্তন হয়। কিসের পরিবর্তন? অবশ্যই প্রযোজনার শৈলীর। পরে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব। কলকাতার এম্পায়ার মঞ্চে বিসর্জন অভিনয়ে (১৯২৩ খ্রি) রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হলেন জয়সিংহর ভূমিকায়। কবির বয়স তখন বাষট্টি। আলোকচিত্রে দেখছি একটি ধাপে বসে আছেন। উদাসীন, বিষণ্ণ। পরনে পাটকরা ধুতি, গায়ে ফতুয়া, একটি চাদর পাট করে কাঁধে ঝুলছে গলার দু পাশে। কপালে তিলক। কালো চাপ দাড়ি, মাথায় কাপড়ের ফেটি। আর দৃশ্যপট? সেই বাঘছাল বা ব্যাঘ্রমুণ্ড নেই, নেই লতাপাতা। কেবল চৌকো বেদী, দুটি ধাপ, বেদীর ওপর দীপাধার পুষ্পপাত্র।

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চভাবনাকে কেউ কেউ দুটো পর্বে ভাগ করে দেখাতে চান 'ফাল্গুনী' পূর্ববর্তী এবং 'ফাল্গুনী' পরবর্তী। আবার কেউ দেখতে চান কবির সমগ্র নাট্যজীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করে। জোড়াসাঁকো পর্ব, শান্তিনিকেতন পর্ব এবং জোড়াসাঁকো-শান্তিনিকেতন মিলিত পর্ব। বোধকরি এই তিন ভাগে দেখলেই একটা রূপরেখা, পরিবর্তনের পরিবর্জনের এবং সমন্বয়ের, খুঁজে পাওয়া যাবে। কেবলমাত্র মঞ্চসজ্জা নয়, প্রযোজনার সামগ্রিক রূপের পরিবর্তন যা অনেকাংশেই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষায় নিয়ন্ত্রিত ও উদ্ভাবিত। কিন্তু ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায় অভিনয় শিক্ষার ব্যাপারে। সে জোড়াসাঁকো পর্বেই হোক বা শান্তিনিকেতন পর্বেই হোক। অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত নিষ্ঠ, অত্যন্ত কঠোর সেখানে রবীন্দ্রনাথ। বরাবরই মহলায় জোর দিতেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক বাস্তবকে মেনে নেবার মত ঔদার্য। অবশ্যই তার প্রযোজনার, বিশেষ করে মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় বিষয়ে একটা তত্ত্বে পৌঁছুবার আন্তরিক তাগিদটাও অনুভব করেছেন। শান্তিনিকেতন পর্বকে যদি আমরা ১৯০২ থেকে (বিসর্জন প্রযোজনা) ১৯১৫ (ফাল্গুনীতে অন্ধ বাউলের অভিনয়) পর্যন্ত কালখণ্ডকে ধরি তবে দেখতে পাব মূলত শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নিয়েই তাঁর অভিনয়ের আসর। পুরুষ-নির্ভরতা। শারদোৎসব থেকে ফাল্গুনী—এ পর্বের নাটকেও তাই। 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রাজা' রচিত হয়েছে এই পর্বেই, কিন্তু শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয়েছে ছাত্র এবং অধ্যাপকদের দ্বারা এমন কি 'রাজা' ও 'রাজা ও রানী'র (২৩-৪-১৯১২)। ছেলেরাই মেয়ে সাজত। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে অবশ্য স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করবার জন্য প্রয়োজন পড়েনি কোনও পুরুষের। বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ পৌষ সংখ্যায় কবির মঞ্চভাবনা পরিস্ফুট হয়েছে এবং এই রচনাটির সঙ্গে মিলিয়ে 'তপতী'-র ভূমিকাটি পড়লে সমর্থন মেলে দিক পরিবর্তনের। কিন্তু বঙ্গদর্শনে যে তিনি লিখলেন, "বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রী-চরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোক দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এরূপ স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।" মনে রাখতে হবে এই সময়েই শান্তিনিকেতন পর্ব শুরু। মঞ্চভাবনায় বিলাতি বর্জন বোঝা যায় কিন্তু স্ত্রী-চরিত্রে স্ত্রীবর্জন যেন কেমন শোনাচ্ছে। এ কি তবে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় একটা সাময়িক তত্ত্ব! কেননা জোড়াসাঁকো পর্বে এবং শান্তিনিকেতন-জোড়াসাঁকো সম্মিলিতপর্বে স্ত্রী-ভূমিকায় আর তো পুরুষ আসেনি। বাস্তব অবস্থার বিবেচনাটাই বোধকরি এক্ষেত্রে তত্ত্ব তৈরি করেছে। শান্তিনিকেতন পর্বের প্রথম দিকেই তো বঙ্গদর্শনে 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধ (১৩০৯ বঙ্গাব্দ)। তবে এই সময়েই মঞ্চ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নতুন ভাবনার সূত্রপাত এবং কবির ভাবনার তত্ত্বে রূপান্তর।

৩

"কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী, সেইখানেই তার পূর্ণ গৌরব। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাকে খাটো হইতেই হইবে।" নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। "কবি তাহাকে যে হাসিবার অবসর দেন, তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়, কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন, তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে—অভিনেতা তাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না ; তাহা আঁকামাত্র। আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।" অভিনেতার সৃজন-শক্তির ওপর আস্থা কী প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে। মঞ্চে অভিনেতাই তার অভিনয়ক্রিয়া দ্বারা দর্শকের কল্পনাকে উস্‌কে দেবে—এইটাই হল এর সার কথা। রথী ঠাকুর লিখছেন, "চিত্রিত দৃশ্যপট বর্জন করা হল।"

১৩০৯ বঙ্গাব্দের পরও রবীন্দ্রনাথ মঞ্চাভিনয়ের আয়োজন করেছেন একাধিকবার। শান্তিনিকেতনের অভিনয় এবং কলকাতায় আয়োজিত সেই সব অভিনয়ে মঞ্চভাবনা দুভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এও সতর্ক অভিনিবেশে ধরা পড়ে। 'ফাল্গুনী' বা 'ডাকঘর' কিংবা 'রাজা' বা 'বিসর্জন'-এর প্রযোজনার বিবরণ অনুধাবন এই দুই ভিন্ন পরিবেশে ভিন্নতর হয়ে উঠেছে। "প্রাক্‌কুটিরে কিংবা পুরোনো 'নাট্যঘর'-এর অভিনয়ে দৃশ্যপটের বালাই ছিল না। নাট্যঘরের পূর্বদিকের উঁচু মেঝেটাই ছিল আমাদের রঙ্গমঞ্চ। সেখানে দুধারে গাছের ডাল লাগিয়ে, তাতে দেবদারুর পাতা বেঁধে, আমাদের নানা রঙের পটবস্ত্র টাঙিয়ে অতি চমৎকার রুচিসঙ্গত রঙ্গমঞ্চ নিখরচায় হয়ে যেত।" রথী ঠাকুর লিখছেন, "শরৎ ঋতুর সমাগমে আশ্রমের নৈসর্গিক শোভা 'শারদোৎসব' নাটকের যেন মুখ্য চরিত্র। প্রকৃতির পরিবেশের সঙ্গে এমন সংগতি কম নাটকেই দেখা যায়।" অর্থাৎ আজকের পরিভাষায় 'এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার'। পাতায়-ফুলে মঞ্চকে ভরিয়ে তোলা হত। গান আর অভিনয় দিয়ে ভরিয়ে তোলা হত। এরই পাশাপাশি জোড়াসাঁকোর বাড়ির একটি অভিনয়ানুষ্ঠানের উল্লেখ করি, অসিত হালদারের বর্ণনায়—ফাল্গুনীর 'রাজদরবারটা খুব জাঁকালো অজন্তার রাজদরবারের মতো করা হল—রাজমুকুট গহনা সব মিলিয়ে। তার পাশেই গাঢ় নীল কাপড়ের পর্দার মধ্যে লাল শালু গোল করে কেটে তার ভিতর শ্বেতপদ্মের নক্সা সাদা কাপড় কেটে সেলাই করে দেওয়া হল।' এ অভিনয় ১৯১৬ সালের। ভারতী পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই 'ফাল্গুনী'-র মুগ্ধ-বিবরণ তো বহুল ব্যবহৃত। আবার ১৯২৮ সালে শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে 'ফাল্গুনী'র শেষ অভিনয়। খোলা আকাশের নীচে আম্রকুঞ্জে নিশ্চয়ই প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশেই সে অভিনয় হয়েছিল। 'ডাকঘর' কেমনভাবে অভিনীত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে জানা নেই, কিন্তু বিচিত্রা ভবনে ১৯১৭ সালের মঞ্চসজ্জার কথা আমরা সবাই জানি। আলোকচিত্রটিও আমাদের দেখা। রথী ঠাকুর বলেছেন, 'দুঃসাহসিকভাবে নূতন'।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছে করে যে মঞ্চসজ্জা এবং শিল্পরুচিকে তৃপ্ত করাটা নাটক এবং অভিনয়-নিরপেক্ষ নয় এবং বোধহয় স্থান-নিরপেক্ষও নয়। ওটা নাটক, অভিনয়ের আসর এবং অভিনয়ের সংগতিসাপেক্ষ। ছবিটা আলাদা করে দেখিয়ে নয়, কেবল

আলোটাকে সর্বস্ব করে নয়, বরং কোনোটার উপস্থিতি প্রতি মুহূর্তে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়েই একটা সুষম ছন্দ প্রকাশ পাবে যাতে সেই চেষ্টাই রবীন্দ্রনাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এবং সেই চেষ্টাই রবীন্দ্রনাথ করে গেছেন। আমরা একটা ভ্রান্ত ধারণা বহুদিন লালিত করে এসেছি মনে যে, নিরাভরণ করে দেখানটাই বুঝি রবীন্দ্রনাটক মঞ্চস্থ করার উপায়। ভুলে যাই আমরা যে (হ.চ.হ-র কথা অবশ্য ভুলে যাওয়াই ভাল) জোড়াসাঁকো বা শান্তিনিকেতনে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অসিত হালদার, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চশিল্প সুষমায় শ্রীমণ্ডিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সে-সব মঞ্চসজ্জার সঙ্গে থিয়েটারের তথাকথিত সিন-সিনারির কোনও সম্পর্ক ছিল না। একটি নাট্যক্রিয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার জন্যই তাঁরা যত্নবান ছিলেন। ইওরোপ ন্যাচারালিজ্ম-এর ঢেউ-এ মঞ্চে বাস্তব বিভ্রমের সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। আমাদের এখানেও ঐ 'আস্ত গুঁড়ি' মঞ্চে তুলে আনার কসরৎ বা লোভ দুর্বার হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ যে স্বাভাবিকভাবে এগুলিকে 'উপদ্রব' হিসেবে দেখবেন তাতে আশ্চর্য নেই।

পিকিং অপেরার বিখ্যাত শিল্পী 'মেই ল্যাঙ্‌-ফাঙ্‌'-এর স্মৃতিচারণা করেছেন শিল্পীপুত্র Mel Shaowu। ১৯২৪ সালে মে মাসে কবির জন্মদিন পালিত হয় পিকিং-এ (বেজিং)। সেখানে পিকিং অপেরায় মেই লাঙ-ফাঙ প্রযোজিত ও অভিনীত একটি নাটক দেখেন কবি। মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে কবির মনোভাব জানা যাবে এই স্মৃতিকথায়। উদ্ধার করি—

Tagore visited China in May 1924. His friends in Chinese literary and art circles staged his play Chitra in English to celebrate his 64th birthday. The auditorium of the Peking (Beijing) Union Medical College in the eastern part of the city was crowded with wellwishers on that day, May 8......After the performance, he told father that while he was pleased to see his own play staged in China, he was more interested in seeing a Peking Opera performed by Father.

On the evening of May 19, Father staged the Goddess of the River Luo' and Tagore was invited to attend. In a scarlet gown which was the formal dress of Visva-Bharati University, the Indian Poet watched attentively throughout the performance and afterwards thanked father back stage.

The next day at noon, Father and others gave a farewell dinner in Tagore's honour : While commenting on fathers' performance with words of encouragement, Tagore complained that the 'decor' of a mythological drama was too plain, suggesting that hues of red, green, yellow, black and purple should be used on the stage, and the stage should be decorated with fancy rocks, flowers and other plants like a fairyland......Father readily accepted the idea and the decor for this particular scene in the Goddess of the River Luo' who finally designed a new. (Peking Opera and Meilanfeng by Mel Shaowu, P. 63)

আশা করছি এই ঘটনার ওপর কোনও মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। কারণ নাটকের উপযোগী, নাটকের গভীরতা বাড়াবার মত মঞ্চসজ্জা, অযথা বৈভব না দেখিয়েও সম্ভব।

এটা ঠিক রবীন্দ্রনাথ নাট্যাভিনয়কে জীবনচর্চার অঙ্গীভূত করে নিতে চেয়েছিলেন। নাট্যাভিনয়কে শুধু অবসরযাপনের, চিত্তবিনোদনের খেলা তো ভাবেননি রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতন আশ্রমে যখনই কোনও সংকট বা শৃঙ্খলার অভাব ঘটেছে তখন রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। জগদানন্দ রায় লিখেছেন, "কোনো কারণে যখন আশ্রমে কোনো ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তখন অভিনয়াদির আয়োজনে সবই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।" কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তাঁর ইচ্ছাক্রমেই তখনকার দিনে অভিনয়ের মহড়া হত খোলা জায়গায়—তিনি চাইতেন আশ্রমবাসী সবাই এসে দেখুক, শুনুক, শিখুক ; আশ্রমের শিক্ষার এও একটি অঙ্গবিশেষ।"

নাটকের মহড়া ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'নিখুঁতবাদী'। এ সাক্ষ্য কতজনেই দিয়ে গেছেন। শান্তিদেব ঘোষ, পিয়ার্সন সাহেব, অমিতা সেন, সীতা দেবী, সাহানা দেবী, জসীমউদ্দীন—এঁদের বিবরণ হাতের কাছেই আছে। "নাটকের মহড়া যতদিন চলে ততদিন ক্লাশ প্রায় হয়ই না, কারণ সারা স্কুলের ছেলেরা সারাক্ষণ মহড়াতে উপস্থিত থাকে।" এ ব্যাপারে শান্তিনিকেতনে একটি কৌতুককর ঘটনা শুনেছি। লতিকা রায় আশ্রম বালিকা। তখন মেয়েরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করছেন। জগদানন্দ রায় খুব কড়া শিক্ষক। তাঁরই ক্লাশ চলছে। রবীন্দ্রনাথ মহলার জন্য লতিকা রায়কে ক্লাশ থেকে ছেড়ে দেবার জন্যে টুক্‌রো চিঠি পাঠাচ্ছেন। জগদানন্দবাবু ক্লাশের শৃঙ্খলা এবং মেধাবী ছাত্রীটিকে ছুটি দিতে নারাজ। এই নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পত্রবাহকের আনাগোনা চলল, অতঃপর হার মানতে হল জগদানন্দবাবুকে। ভাবলে মজা লাগে। কিন্তু সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মহলা সম্পর্কে, থিয়েটার সম্পর্কে, অভিনয় সম্পর্কে, মঞ্চ সম্পর্কে আগ্রহটাও প্রবলভাবে প্রকাশ পায়।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সকলের জীবনে নাট্যচর্চা হয়ে উঠুক তাদের অন্যতম জীবনচর্চা এটা তিনি চেয়েছিলেন—চেয়েছিলেন নাচে-গানে-পাঠে-অভিনয়ে সকলেরই থাকুক একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা।

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চপ্রতিমা তাই মাটির প্রতিমা নয়। চালচিত্র সমেত একটা আদ্যন্ত জীবনের প্রতিমা।

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে : নাটক ও অভিনয়

অমিতা ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে কোনদিকে বিচ্ছুরিত হয়নি তা গবেষণার বিষয়। ওঁর বিষয় চিন্তা করলে এ কথাই বারবার মনে হয় যে, তিনি পরম বিস্ময়! যে দিকেই তাকাই না কেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

মনে হয়—তাঁর সব কিছুই এমন সহজাত যে তার জন্যে যেন কোনো বিশেষ অনুশীলনের দরকারই হয়নি। তিনি বারবারই বলতেন 'আমি কবি এটাই সত্য'। তা ঠিক, কে আর তা অস্বীকার করছে, কিন্তু কবির যে প্রবল ভাবপ্রবণতা—আবেগ সে তো অসাধারণ, তার দুর্বার বেগ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারত কিন্তু তাঁর সেই সঙ্গে অদ্ভুত balance যা তাঁকে অচঞ্চল রেখেছিল এবং প্রত্যেকটি দায়িত্ব পালন করিয়েছিল। পিতার কর্তব্য যেমন পালন করেছিলেন সংসারে, জমিদারি পরিচালনার কাজও শুধু কর্তব্যপরায়ণ জমিদাররূপে নয় মানব হৃদয়ের সমস্ত দরদ দিয়ে ও স্বদেশ চিন্তা-ভাবনা নিয়েই তাদের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছেন এবং জমিদারির কাজে গিয়েছিলেন বলেই প্রজাদের সমস্যা—তাদের জীবনযাত্রার মান সব কিছুই খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। শিক্ষা বিষয় নিয়েও তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও তাঁর অবদানের মৌলিকতা অনস্বীকার্য। তাই দেখতে পাই অন্যান্য সব কিছুর মতই তাঁর অভিনয়-ক্ষমতা সহজাত তো ছিলই তাছাড়া নাটক অভিনয় নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিরও বিশেষত্ব ছিল।

জীবিতকালে তাঁর নাট্য-অভিনয় সম্বন্ধে তিনি যেমন নির্দেশ দিয়েছেন তাই-ই হয়েছে, কিন্তু তাঁর কোনো নাটকেই পাত্রপাত্রীর সাজসজ্জা বা মঞ্চসজ্জা সম্বন্ধে লিখিতভাবে কোনো নির্দেশ বইয়ে দেওয়া নেই, সেখানে পরবর্তীকালের হাতে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আছে। এই কারণে ওঁর নাটক মঞ্চস্থ করতে গেলে তাঁদের হয়ত একটু অসুবিধেতেও পড়তে হয়।

রবীন্দ্রনাথ কী চাইতেন না চাইতেন সেটা জানানোরও একটা দায়িত্ব আছে তাঁদের—যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের নাট্যাভিনয়ে, যেমন রবীন্দ্রনাথ মঞ্চকে নানা সাজসজ্জা দিয়ে ভারাক্রান্ত করা বা দৃশ্য পরিবর্তন করা পছন্দ করতেন না—বারবার ড্রপসিন তোলা ও ফেলা একেবারেই চলত না—পাত্র-পাত্রীদের সাজপোশাকে গতানুগতিকতা চলত না, কোনো ঝকমকে সাজপোশাক বা ঝকমকে মুকুট বা গহনা মাথায় দিতে দিতেন না, মুখের ভাব ঢাকা পড়ে না যায় তার দ্যুতিতে, এইজন্যে। অতিবাস্তবতা বলতে এখানে কী বলতে চাইছি রবীন্দ্রনাথের ও ঠাকুর পরিবারের অভিনয়ের কথায় পরে আসছি। সেই সময়কারই একটি অভিনয়ের ঘটনা এটি। সত্যেন্দ্রনাথের বিরজিতালাও-এর বাড়িতে বিসর্জন, বোধহয় এটিই প্রথম অভিনয় হয়—অরুণেন্দ্রনাথ জয়সিংহ ও রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন—সে ছবিও সকলের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। জয়সিংহরূপী

অরুণেন্দ্র যখন আত্মবলিদান দিয়ে পড়ে গেলেন তখন তাঁর পা-টা একটু একটু নাড়তে লাগলেন খিঁচুনির মত খানিকটা। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'ওকি করছ? অমন করে পা নাড়ছ কেন?' তাতে অরুণেন্দ্র বললেন 'বারে! মারা যাবার আগে একটা খিঁচুনির মত হবে না?' উনি বললেন, 'না—না, ওসব চলবে না—অত বাস্তব অভিনয়ে কাজ নেই।' সেই কথায়ই আসছি—আজকাল অনেকে একটু যাকে ইংরিজিতে বলে dramatic অর্থাৎ নাটকীয়তা তাই করবার চেষ্টা করেন—যেটা রবীন্দ্র নাট্যাভিনয়ে তাঁর জীবিতকালে কখনও কেউ দেখেনি। অভিনয়টা যদি অভিনয় করছে বলে মনে হয়, তবে তো সব মাটি হয়ে গেল, তাই না?

নাট্যাভিনয়কালে উনি অনেকখানি দর্শকদের কল্পনার জন্যেই ছেড়ে দিতেন। যেমন চণ্ডালিকা নৃত্যাভিনয়ে প্রকৃতি (মা) যখন মন্ত্র পড়ে ডাকিনী-যোগিনীদের ও ভৈরবের ভূতপ্রেতদের ডাকছে তখন সেটা খানিকটা কল্পনাতে থাকাই তিনি বরাবর পছন্দ করে এসেছেন—প্রকৃতির নাচে ও অভিনয়ে এবং গানের কথায় ও সুরেই তা অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে ওঠবার কথা। বড়জোর নাচের খাতিরে কয়েকজন ডাকিনী-যোগিনীরা একটু অস্পষ্ট আলোয় অল্প একটু নেচে চলে গেল মঞ্চের পেছন দিকে ছায়ার মত—ঐ পর্যন্ত, কিন্তু তা না হয়ে তাকে পুরোপুরি বাস্তব রূপ দিতে গেলে স্থূলতা এসে পড়বেই।

'তপতী' অভিনয়ে যেমন তপতী যখন অগ্নিতে আত্মাহুতি দিল তখন পুরোপুরি অন্ধকার মঞ্চের একটা কোণ আগুনের শিখায় লাল হয়ে উঠেছে দেখা গেল—যে কোণ দিয়ে তপতী অন্তর্হিতা হল অগ্নিতে প্রবেশের জন্যে,—এই-ই যথেষ্ট। একটা suggestion মাত্র—সূক্ষ্ম রুচির সেইটেই পরিচয়।

একবার কোন এক রঙ্গমঞ্চে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য দেখতে গিয়ে ঠিক এইরকম একটি দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল দেখেছি, যখন উত্তীয়কে জহ্লাদ বধ্যভূমিতে নিয়ে বিকট উল্লাসের নৃত্য করতে লাগল খড়্গ হাতে উত্তীয়কে ঘিরে ঘিরে অনেকক্ষণ ধরে। ওটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত নৃত্যে শেষ করা উচিত ছিল। তা না করে অনেকক্ষণ বীভৎস নাচ অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ মনে হয়েছিল ও সমস্ত নৃত্যনাট্যটি যে ব্যাহত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয় ও নৃত্যনাট্য দেখে দেখে আমাদের অনেকেরই একটা রুচিবোধ জন্মেছে এ কথা স্বীকার না করে পারি না। এটা বোঝানো খুব শক্ত। রবীন্দ্র-সংগীত কেমন করে গাইলে সেটা ঠিক ঠিক রবীন্দ্র-সংগীত হয়ে উঠবে সেটা যেমন কাউকে ঠিক বুঝিয়ে শেখানো যায় না তার জন্যে শুধু কান নয়—প্রাণও চাই, সুর তাল লয় ছাড়াও ভাবের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটা চাই। ভাব কি কেউ তৈরি করে দিতে পারে? রবীন্দ্রসংগীতে সেটাই অনেকখানি তা ভুলে গেলে চলবে না। তেমনি তাঁর নাটকও মর্মগত না হলে অভিনয় করা কঠিন। বড় নাটকে কথা প্রধান বলে অনেকে সাহসই করেন না অভিনয় করাতে—মার খেয়ে যাবার ভয়ে। রবীন্দ্রনাথের সব কিছুই যেমন জন্মগত পাওয়া বলে মনে না করে পারি না—তাঁর অসাধারণ অভিনয়-ক্ষমতার ক্ষেত্রেও সেই এক কথাই খাটে। কী আশ্চর্য ছিল তাঁর অভিনয় করার শক্তি! তাঁর কণ্ঠস্বর ও তাঁর অভিব্যক্তি! কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন—মুখের ভাবের নানা অভিব্যক্তির আশ্চর্য ক্ষমতাই তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা করে তুলেছিল। এ সব কি লিখে বলে ঠিক প্রকাশ করা যায়—না তা সম্ভব?

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য নাটক সবই উচ্চমানের—তার জন্য একটি সত্যিকার শিক্ষিত ও পরিশীলিত মনের দরকার। যাঁরা তাঁর রচনাবলী পড়ে অভ্যস্ত নন তাঁদের পক্ষে কতকগুলো নাটক তো কঠিনই মনে হবে।

অজিতকুমার চক্রবর্তীর রবীন্দ্র-সমালোচনা গ্রন্থ কাব্যপরিক্রমা, প্রথম যুগে তো বটেই, রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। রবীন্দ্রকাব্যের নিগূঢ় তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে তার মর্মার্থ এমন করে উদঘাটিত করেছেন যা তাঁর আগে আর কেউ করেননি। উনি রবীন্দ্রকাব্য-খনির রুদ্ধ দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন—এখন সকলেরই প্রবেশ ও রত্ন আহরণ সোজা হয়ে গেছে। রবীন্দ্রসাগরও তো রত্নাকর, তার রাশি রাশি রত্নকে তুলে এনে কত দিক দিয়েই না তাকে আমরা দেখছি ও দেখাচ্ছি সকলকে। কিন্তু যতই দেখাই না কেন রবীন্দ্রনাথ কারও দেখানো বা বলবার অপেক্ষায় থাকেননি—নিজেই সব বলে ও লিখে গেছেন—তাঁর সম্বন্ধে নতুন কথা আর কে বলবে!

ঠাকুরবাড়িতে নাট্যরচনা ও সেটা অভিনয় করানো বহুকাল থেকে চলে আসছে। জীবনস্মৃতি থেকেই আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয়ের কথা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা 'এমন কর্ম আর করব না' অর্থাৎ অলীকবাবুতেই প্রথম ১৮৭৭ সালে অলীকবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়ে এমন কি বৌরাও একত্রে অনেক অভিনয় করেছেন সে যুগে ভাসুর ভাদ্দরবৌ স্বামীস্ত্রীরূপে, তা নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। কিছু পুরনো সংস্কার ভাঙতে গেলে বা নতুন কিছু করতে গেলে সমালোচনা তো হবেই। পারিবারিক এ সব নাটক করা নিয়ে মহর্ষি কিন্তু কোনো বাধা দেননি। সে যুগে যখন চারদিকে ধনীর ছেলেরা বাগানবাড়ি ও বাঈজীর নাচ গান ও আনুষঙ্গিক মদ্যপান নিয়ে ব্যস্ত সে সময় তাঁর ছেলেমেয়েরা বাড়িতে নির্দোষ আমোদপ্রমোদ নিয়ে আছে এটা তো শ্লাঘার বিষয়। তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথ যত নাটক একের পর এক লিখেছেন সবেতেই একটি প্রধান ভূমিকায় তিনি নিজে অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৮৮৯ সালে রাজা ও রানী নাটকে নিজে বিক্রমের ভূমিকায় অভিনয় করেন, তারপর ১৮৯৩ সালে বিসর্জন নাটকে রঘুপতির ভূমিকায়, এ ঘটনার কথা এই প্রবন্ধেই নাটকের অতিবাস্তবতা বলতে গিয়ে আগেই বলেছি। বিসর্জন অভিনীত হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের বিরজিতালাও-এর বাড়িতে। তারপর বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনীত হল ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে জোড়াসাঁকো বাড়িতে, অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' থেকে এই অভিনয়ের কথা জানা যায়। খামখেয়ালি সভায় রচনাটি পড়া হল আর তখুনি স্থির হল অভিনয় করার। এতে রবীন্দ্রনাথ সাজলেন কেদার। বাল্মীকি-প্রতিভা অপেরাধর্মীয়, তাতে বাল্মীকী হলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। এ সব অভিনয়ের কথা আমরা শুনেছি ও বইয়ে পড়েছি, তবে পরবর্তীকালে জোড়াসাঁকোয় ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ক্রমান্বয়ে অভিনয় হয়েছে ডাকঘর, রাজা, অচলায়তন, ফাল্গুনী, ঋণশোধ, শারদোৎসব, নটীর পূজা ও সর্বশেষ তপতী। এ ছাড়াও ঋতু-উৎসব তো ছিলই। তাঁকে অনেকগুলিতে অভিনয় করতে দেখেছি, তাই তাঁর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের কথা অল্পস্বল্প জানি। ১৮৭৭ সালে 'অলীকবাবু' দিয়ে শুরু করে ১৯২৯ সালে 'তপতী'তে শেষ হল। যৌবন থেকে বার্ধক্যে। এর মধ্যে ডাকঘরের মঞ্চসজ্জায় বেশ নূতনত্ব ছিল। তার ছবিও আছে। অবনীন্দ্রনাথের লেখাতেও পড়েছি আর মুখেও শুনেছি। ফিনিশিং টাচ যাকে ইংরাজিতে বলে তা দিয়েছিলেন একটি শূন্য পাখির খাঁচা ঝুলিয়ে দিয়ে। সমস্ত নাটকের মূল কথাটি যেন তখনি মূর্ত হয়ে

উঠল। কী অদ্ভুত suggestion ! ফাল্গুনী অভিনয়েও স্টেজের মধ্যে দুটি দোলনায় 'ওগো দখিন হাওয়া ও পথিক হাওয়া' গানটি দোলনায় দুলতে দুলতে গেয়েছিল দুটি বালক। সেটাও কম নতুনত্ব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নানা রকম বাদ্যযন্ত্র অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করেননি—না গানের সঙ্গে না নাট্যাভিনয়ে। প্রথম নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখেছি উদয়শঙ্করের নাচের সঙ্গে।

কলকাতায় অনেক সময় তাঁর ভাইঝি মনীষা দেবীকে পিয়ানো বাজাতে শুনেছি কোনো সংগীতাভিনয়ে, তিনিই ডাকিয়ে আনাতেন। ইন্দিরা দেবীও বাজাতেন। মনীষা দেবীর হাত বড় মিঠে ছিল এবং কখনই গান ছাপিয়ে তা উঠত না এমনভাবে মিলেমিশে যেত তারই অঙ্গ হয়ে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোয় সুরের ঢেউ তুলতেন, সেই সুরে কথা বসাতেন রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়বাবুও কখনও কখনও। এ ছাড়া মৃদঙ্গ ও খঞ্জনী অনেক কিছুর সঙ্গে বেজেছে। একবার বর্ষামঙ্গলে ওঁর আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নাটোরের মহারাজা মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলেন, চমৎকার হয়েছিল। বাঁশি বেজেছে বহুবার, এস্রাজ তো ছিলই।

রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য নিজেই সব বলে গেছেন—তাই নতুন কথা বলবার মত কিছু রাখেননি। তিনি মনে করতেন দর্শকও অভিনয়ের অংশ হোক, যেমন আমাদের যাত্রায় হয়ে থাকে। বাস্তবতার অভাব পূরণ করুক তাদের কল্পনা দিয়ে। তাঁরই ভাষায় এ বিষয় তাঁর বক্তব্য উদ্‌ধৃত করে এ রচনা শেষ করব।

রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পাওয়া যায়। তাঁর কথায়—"যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে তাহার কি নিজের সম্বল কানাকড়াও নাই? সে কি শিশু? ...তাহারা নিজের কল্পনাশক্তি বাড়িতে চাবিবন্ধ করিয়া আসে নাই।

··· আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐ জন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে। ··· ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মরু, কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিমতা অপছন্দ করতেন এবং বিলাতের থিয়েটারের নকলকে ভারাক্রান্ত ও স্ফীত পদার্থ বলে উল্লেখ করেছেন এবং তা আপামর সকলের দ্বারের কাছে উপস্থিত করা দুঃসাধ্য বলেছেন। তিনি আপামর সকলের কাছেই তাঁর সৃষ্টিকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন কিন্তু যে পর্যন্ত আপামর সকলে যথার্থভাবে শিক্ষিত হয়ে রস গ্রহণ করার উপযুক্ত না হচ্ছে ততদিন তাঁর ইচ্ছাপূরণ হবে কী করে! তবে আশা ও বিশ্বাস রাখতেই হবে এবং সুদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যেতেই হবে।

রবীন্দ্রসংগীতের মর্মলোকে

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

মনের ভাবকে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা কথা বলি। তাই থেকে ভাষার উৎপত্তি। আমাদের আটপৌরে কথাগুলি বেশির ভাগই হয় কাজের কথা। আমাদের আচার-বিচার, লাভ-ক্ষতি, অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ, উদ্বেগ, সংশয় দৈনন্দিন জীবনের হাজারটা সমস্যা ও বিষয় আমাদের কথার ব্যঞ্জনায় স্থান পায়। তার কোনো হিসাব বা লেখাজোকার প্রয়োজন হয় না। জীবনধারার সঙ্গে মিশে কথার ধারাও বয়ে চলে; তার কোনো পাকা দাগ পড়ে না আমাদের মনে কিংবা জীবনে।

কিন্তু এরই মধ্যে কিছু কিছু কথা আমরা বলি যেগুলি একটু বিশেষ ধরনের। যেগুলি আমাদের মনের গভীরতা হতে উঠে আসে। আমাদের কোনো বিশেষ উপলব্ধিকে ব্যক্ত করে, কোনো নিবিড় অনুভবকে প্রকাশ করে। এই কথাগুলি সহজে হারিয়ে যায় না, এরা থেকে যায় মনের গভীরে কোনো বিশেষ জায়গায়।

এই সব বিশেষ কথার উৎসে আমরা যদি পৌঁছতে চাই আমরা এসে দাঁড়াই মনের অন্দরমহলে। সেখানে দেখি মনের দুই ধরনের বৃত্তিকে প্রকাশিত হতে। একটি হল মননশীল বৃত্তি এবং মনের আর একটি বৃত্তি হল অনুভবের। যা হৃদয়ে অনুভূত হয় তাকে বুদ্ধি আলোকিত করে। নীরস বুদ্ধিবৃত্তিতে মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যদি না তা হৃদয়ের অনুভবে উত্তীর্ণ হয়। মননের এলাকা যদি হয় একান্তভাবেই গদ্য, নিরাবরণ আকাশের তলে কেবলমাত্র জ্ঞানের শুভ্র আলোর বিকিরণ; অনুভবের এলাকা সেখানে কাব্য এবং সংগীতের ভাবময় আকাশ আবেগের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত। কাব্যকে যদিও-বা আমরা টেনে নিয়ে যেতে পারি গদ্যের এলাকায়, —তাকে পরাই যুক্তির এবং বিতর্কের সাজ— সংগীত কিন্তু তাতে কখনই সায় দেবে না। ভাবই সংগীতের প্রাণ, ছন্দ, সুর, তাল তার বিকাশের উপকরণ।

এখন এই ভাব বস্তুটি কী জিনিস? একটি ফুল দেখে আমার ভালো লাগে, আমি বলি ফুলটি সুন্দর। আমার অন্তরের অনুভূতি-সায়রে ঢেউ তুলেছে বলেই আমি ফুলের সৌন্দর্য উপলব্ধি করছি। এই অনুভূতিই আমার মনের ভাবকে জাগিয়ে তুলেছে। যদি আমার চোখের সামনে তারপর ফুলটি নাও থাকে তবু আমার ভিতরে আনন্দের রেশটুকু থেকেই যায়। তা বেজে চলে অশ্রুত বীণার ঝংকারের মতো। সেই আনন্দের প্রবেশ যে ভাবের রসকে জাগিয়ে তোলে তাকে কবি কাব্যময়ী ছন্দে, ভাবময় কাব্যে রূপান্তরিত করেন। আবার সেই আবেগ ঘনীভূত হয়ে সুরের জন্ম দেয়, সংগীত হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের গানের অভিকর্ষ প্রধানত ভাবের দিকে। ভাবটিই তার প্রাণ, তার উপাদান, তার নিহিত গূঢ় রহস্য। সেই ভাব নান্দনিক এবং আধ্যাত্মিক। তা যেমন একদিকে প্রকৃতির রূপে রসে তন্ময়, তেমনি আবার আত্মার বোধে আলোকিত, উদ্দীপিত। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত হতে উৎসারিত হয়ে তা খুঁজেছে অসীমের আশ্রয়, চেয়েছে অনির্বচনীয়কে স্পর্শ

করতে। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীগুলি ধ্যান করলে তাই বোধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন সুরে গাওয়া হয় তখন তা যেন ভাবের পরিপূর্ণ প্রতিমা হয়ে ওঠে। সুর বাণীকে নিয়ে যায় অনির্বচনীয়ের দ্বারে, তাকে মুক্তি দেয় রসের অবন্ধন সঞ্চারে। তখন আর তা যেন মর্ত্যকণ্ঠের সংগীত নয়—তা প্রাণের সৌন্দর্যলোকে অভিসার, অন্তরের বীণাঝংকার, আত্মার স্বরূপোপলব্ধি। অনেকে বলেন রবীন্দ্রসংগীত শুনলে মন কেমন উদাস হয়ে যায়, সারাদিন কী যেন একটা ভাবের ঘোরে বিভোর হয়ে থাকে। এই উদাস-করা বিভোর-করা সমস্ত চিত্তকে অধিকার-করা গুণটিই রবীন্দ্রসংগীতের মৌলিক রহস্য। এই রহস্য তার কাব্যগুণসমৃদ্ধ কথার জাদুতে কিংবা সুর ছন্দ তালের কোনো একটিতে নয়, তা সব কিছুর নিখুঁত সমাহারে সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যে তাদের perfection-এ। একটি প্রতিমাকে খণ্ড খণ্ড করে যদি তার অবয়বের নানা অংশকে বর্ণনা করা হয় তাহলে তা থেকে প্রতিমার যতটুকু সত্য সংগৃহীত হতে পারে রবীন্দ্রসংগীতেরও সুর তাল লয় শম ফাঁক ধ্রুপদ ধামার দাদরা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে ততটুকুই তার আসল জিনিসটি উদঘাটিত হতে পারে। কিন্তু এর একটি অন্য বিপদ আছে। সেটি বিশেষ করে ভাবা উচিত। তা হল রবীন্দ্রসংগীতের মুখ্যবস্তু ও তার স্বরূপ বৈশিষ্ট্যটি আড়ালে পড়ে গিয়ে তার গৌণ ব্যাপারগুলিই মুখ্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে রবীন্দ্রসংগীতের তাল লয় মাত্রা রাগ-রাগিণী এগুলির গুরুত্ব নেই। এদের স্থান গানের সমগ্রতা এবং সৌষম্যের মধ্যে; অর্থাৎ তারা নিখুঁতভাবে আপন আপন ভূমিকায় কাজ করবে। আপনাদের উৎকটভাবে জাহির করে গানের প্রাণকে পর্যুদস্ত করবে না। ধরা যাক কোনো গানে কেদারায় সুর দেওয়া হয়েছে। মার্গসংগীতে কেদারার বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে বর্ণিত আছে। শিল্পী যদি সেই ঝোঁকে রবীন্দ্রসংগীতকে খানিকটা শাস্ত্রসম্পদ করে তুলতে চান তবে রবীন্দ্রনাথের গানটিকে নষ্ট করা হবে। ভাবের দিকে না অগ্রসর হয়ে তার গৌণ বিষয়গুলি নিয়ে মেতে উঠলে রবীন্দ্রসংগীত তার নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আর পাঁচটা আধুনিক কিংবা প্রাচীন গানের দলে মিশে যাবে। ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত বলে আজকাল একটি বিশেষ বিভাগ করা হচ্ছে। ওস্তাদি ঝোঁক যাঁদের তাঁরা এই গানগুলিকে পুরোদস্তুর ধ্রুপদীচালে কেন গাওয়া চলবে না সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। আবার রবীন্দ্রসংগীতের গেয় রীতি ও পদ্ধতি তার প্রকাশভঙ্গি ঘরানা গায়কি ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা চারদিকে শুরু হয়েছে। নানা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এবং তার জবাবও দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে। এখানে একটি কথা বলতে বাধা নেই যে অধিকারি মাত্রেরই রবীন্দ্রসংগীতের গুণাগুণ, তত্ত্ববিচার এবং তার সঠিক চরিত্র সম্পর্কে মৌলিক মতামত দেওয়ার অধিকার স্বীকার্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানগুলি কী, তার রসের স্বরূপই বা কী সে সম্পর্কে এই অনন্য সংগীতজগতের যিনি স্রষ্টা তাঁর নিজস্ব মতামতগুলি সর্বাগ্রে অবধান করা উচিত—নইলে খোদার উপর খোদকারি করতে গিয়ে হয়তো আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পদ আমরা খোয়াতে পারি।

এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে রবীন্দ্রসংগীতের আশ্রয় অবলম্বন হল তার বাণীর ভাবসম্পদ। সুর তাকেই প্রকাশ করে। 'আমার সুরের রসিক নেয়ে, তারে ভোলাব গান গেয়ে'—গান যদি এই রসিক নেয়েকে ভোলাতে না পারল তবে বৃথাই সে গান

গাওয়া। আর ভোলাতে হলে তার জাদুকাঠিটি পাওয়া চাই—যেটি লুকোনো রয়েছে গানেরই ভিতরে।

রবীন্দ্রসংগীতের এই ভিতরের রহস্যটি কীভাবে উদঘাটন করা যায়? কীভাবে শিল্পী তার খোঁজ পাবেন? সে রহস্যের সন্ধান তিনি পেতে পারেন যদি তিনি কোনো একটি গানকে খুঁটিয়ে দেখেন। প্রথমে সেই গানের বাণী যে ভাবকে ব্যক্ত করছে সেটি হৃদয়ংগম করতে হবে। প্রতিটি গানই কোনো বিশেষ অভিব্যক্তির দ্বারা মনের মধ্যে একটি ছবি ফুটিয়ে তোলে এবং হৃদয়ে তার প্রতিফলন ঘটায়। রবীন্দ্রসংগীতের রহস্য তার মীড়ে, তার সুরের আলপনা আঁকায়। কীভাবে তা এক একটি শব্দকে বিচিত্র আলপনায় বা মীড়ে বা ঝংকারে ফুটিয়ে তুলেছে তা লক্ষ করার বিষয়। কথাগুলি যে ভাবকে প্রকাশ করতে চাইছে সেই ভাবকে সুর সংযোগে আরও ব্যঞ্জনাময় করে তোলা সংগীতের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, "আমরা যখন কবিতা পাঠ করি তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়, সংগীত আর কিছুই নয়—সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।" তাঁর এই উক্তিকে যদি মানা যায় অন্তত রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে তাহলে কবিতা ও তার ভাবটাই শিল্পীর সবিশেষ দৃষ্টির ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে ঝোঁকটা সব সময়ই থাকবে কথার অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি ও আবিষ্কার করার দিকে। তখনই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ সুরকে কীভাবে তার অনুকূলে ঢেলেছেন, তার অলংকরণ করেছেন। এই বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে কিছু কিছু শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করেছেন সেগুলি গভীর হৃদয়ভাবদ্যোতক। যেমন তাঁর একটি গান 'এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে'—গানটিতে বর্ষার নৃত্যপরা রূপের বর্ণনা সংগীতের ছন্দে ছন্দে জলের ধারাপাতে নেচে চলেছে—কিন্তু কবির হৃদয়ে এক দূরান্তের পথ-হারানো সুর ভরে উঠেছে, তিনি শোনেন তাঁর অন্তরে 'কোন ব্যাকুলের করুণ কাঁদা।' এখানে লক্ষ করতে হয় এই 'করুণ' শব্দটিতে সুরের মীড়। সারা গানটি চঞ্চল ছন্দে মুখরিত, একেবারে শেষে ওই 'করুণ' তার মীড়ে যেন হৃদয়ের সমস্ত আকুলতাকে উজাড় করে দিতে চায়।

একটি গান 'বিরহ মধুর হল আজি।' বেহাগ সুরের গান, বর্ণনা রাত্রির। এই গানটিতে অনুভূতির তীব্র সংক্ষোভ ফুটে ওঠে 'বেদনা' এই শব্দটিতে হঠাৎ সুরের একটা অভাবনীয় মোচড়ে।

'উদাস'—এই শব্দটি রবীন্দ্রনাথের বহু গানেই বারে বারে এসে দাঁড়ায়। 'উদাস' কথাটি বৈরাগ্যের ভাবের দ্যোতক। এই বৈরাগ্য মানুষের অন্তরে কোথায় যেন লুকোনো থাকে। সকল কোলাহল-চঞ্চলতামুখর জীবনের পশ্চাদ্‌পট রচনা করে রাখে। সে বৈরাগ্যের স্মৃতি মনে জেগে ওঠে একটি গানে—

'শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়, ঐ দূরে
উদাস করা কোন্ সুরে॥'

এই গানটিতে 'উদাস' শব্দের সুরের ভিতর দিয়ে তার সমস্ত ভাবটি মুখর হয়ে ওঠে। একটি সুদূর দীর্ঘশ্বাস যেন আকুলিত হয়ে ওঠে দীর্ঘ মীড়ে। গানের অন্য পদগুলি সেই একই mood-কে নানা ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করে।

আরেকটি গান 'মম অন্তর উদাসে'—এই গানে 'উদাস' শব্দে সুরের ব্যবহারটিও লক্ষ করার মতো। এই 'উদাস'-এর সঙ্গে আগের গানটির 'উদাস' ভাবের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এর আবেদন মনের অন্য কোনো পর্দায়। 'উদাস' 'উদাসিয়া' এই শব্দগুলি অনেক গানেই আমরা পাই। সুরের বৈচিত্র্যে প্রতিটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ফুটে ওঠে।

একটি গান 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে'—এর কথাগুলি মরমী ভাবের—সঙ্গে সঙ্গে একটি হার্দ্য ছবি এঁকে যায় মনে। প্রকৃতির যেটুকু রূপ দেখা যায় তা আভাসে, বরং তুলির সামান্য আঁচড় দিয়ে ইন্দ্রিয়ে ছোঁওয়া দিয়ে সরে যায়। কিন্তু অন্তরে একটি ভাবকে প্রগাঢ় করে তোলে। সমস্ত গানটির মধ্যে যেন একটা আনমনা সুর। শেষে 'উদাসিয়া' শব্দে এসে একটি গভীর বৈরাগ্যের ভাবকে মেলে ধরে। 'উদাসিয়া'র স্বরলিপি লক্ষ করলে দেখা যায়,

পা	-ণা	ণা	ৰ্সণা	-ধা	ণা	-া	-া	I
উ	০	দা	সি	০	য়া	০	০	I

এখানে 'সি' এই অক্ষরে ৰ্সণা এই স্পর্শ-সুর দেওয়া হয়েছে। ফলে উদাসিয়ার মর্মবাণী অনুভূতিতে অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওই স্পর্শসুর ঠিকমত প্রয়োগ না করতে পারলে তার সম্পূর্ণ মাধুর্য প্রকাশ হয় না।

'উদাস' শব্দের একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রসবৈচিত্র্য ফোটে 'মম মন উপবনে' গানটিতে। বর্ষার এই গানটি প্রকৃতির আবেশে ভরা। বর্ষণমুখর রাত্রি, মেঘের গর্জনধ্বনি, বিদ্যুতের ঝিলিক্ হানছে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার শশীতারাহীন নিবিড় রাত। এই গভীর নিবিড় রাত্রিতে বিরহিণী ঘর ছেড়ে অজানার উদ্দেশে অভিসারে চলেছে। গানটি গম্ভীর এবং ললিত রসের সমন্বিত রূপ। গানের শেষ পদে 'উদাসিনী' এই শব্দে হঠাৎ ভাবটি যেন মূর্ছাহত হয়ে থেমে দাঁড়ায়। কিন্তু তারপরেই আবার 'উদাসিনী' ললিতচঞ্চল নৃত্যগতিতে ধেয়ে চলে। এই গানে 'উদাসিনী'র প্রথম সুরটির মধ্যে যে ভাবের একটি আকস্মিক পরিবর্তন বা অভাবিত উচ্ছ্বাস সেটি অনবদ্য। এই গানে কবি যে অনুপ্রাসের সঙ্গে সুরবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন সেটিও লক্ষ করার। কয়েকটি গান যেমন—'নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি', 'এসো শ্যামছায়াঘন দিন', 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'—এইগুলিতে অনুপ্রাসের সঙ্গে মিল করে সুরের বিন্যাস লক্ষণীয়।

কোনো একটি শব্দে অনেক সময় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সমস্ত আবেগ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। 'শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়' এই গানে 'পরশ' শব্দটি তিনবার তিনভাবে ফিরে এসেছে। কিন্তু প্রতিবারই সুরের রূপ ভিন্ন। গানটির ভাব ভক্তিমূলক। ভগবানের নিকট ভক্তহৃদয়ের একটি আন্তরিক প্রার্থনা তাঁকে জানার ও পাওয়ার। যেখানে ভাষা পৌঁছয় না, মন যার নাগাল পায় না, সেই অনির্বচনীয়ের স্পর্শলাভের গভীর আকুতি বেজে ওঠে এই গানের 'পরশ' শব্দটিতে। মনে হয় এই শব্দটির ভিতরেই গানের চাবিকাঠি রয়েছে। অন্তর যাঁর সাক্ষাৎ-স্পর্শলাভের তৃষ্ণায় ব্যাকুল তার মরমী স্পর্শ ভাষা এনে দিতে অকুলান হয়ে পড়ে। হৃদয়ের সমস্ত আকুতি আর আকিঞ্চন সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সব শেষের 'পরশ' শব্দটির সুরে। গানের এই 'পরশ'

শব্দের সুরের সম্পূর্ণ উপলব্ধি ঘটলেই এই গানের ভাবরহস্য মূর্ত হয়ে ওঠে, অনুভূতিময় হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে।' এটিও মরমী অধ্যাত্ম-ভাবনার গান। এই গানের সুর ও বাণীর ভাবমূল কেবল ওই 'প্রেম' শব্দটিকে ঘিরে। শব্দটিকে নানাভাবে সুরের বিন্যাসে প্রকাশ করা হয়েছে। সুর ও বাণীর একাত্মতা ও সহমর্মিতা আবেগের এক নিবিড় অনুভূতি মনে আনে। রবীন্দ্রসংগীতে এই ধরনের কোনো একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বার বার গানের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনে সুরের বৈচিত্র্য রচনা অনেক গানেই পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রসংগীতের কৌশল বা টেকনিকের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ স্পর্শ-সুরের ব্যবহার। বাংলা গানে স্পর্শ-সুরের ব্যবহার বা প্রয়োগ বিশেষ দেখা যায় না। স্পর্শ-সুর স্বরলিপিতে দেখানো হয় সাধারণত কোনো একটি স্বরের মাথায় ছোটো অক্ষরে লেখা আরেকটি স্বর হিসাবে। কিন্তু মাত্র স্বরলিপি দেখে এই স্পর্শ-সুরের-রূপ কেমন তা জানা সম্ভব নয়। এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দে প্রকাশ পেলেই তার মাধুর্য ফোটে। যারা শান্তিনিকেতনে বা সুযোগ্য শিক্ষকের কাছে গান শেখে, স্বাভাবিকভাবেই এই স্পর্শ-সুরগুলি তাদের গলায় এসে যায়। কিন্তু বাইরের চর্চাক্ষেত্রে এগুলি প্রায়ই অস্ফুট, কষ্টকৃত বা ভোঁতা হয়ে যায়। একটি গানের উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে'—এই গানে অন্তরা ও সঞ্চারিতে 'চরাচরলোকে', 'অপরূপ', 'ছাপিয়া' এই শব্দ কয়টির স্বরলিপিতে 'চরাচর'-এর 'র' অক্ষরটিতে র্সা, অপরূপ'-এর 'রূ, প অক্ষর দুটিতে র্সা, 'ঝাঁপিয়া'-এর ঝাঁ অক্ষরে র্সা, 'ছাপিয়া'-এর 'পি' ও 'য়া'তে র্সা, র্সা— এইগুলি স্পর্শ-সুরের বিশিষ্ট প্রয়োগ। লক্ষ করা যাবে এই গানটিতে আরও কয়েক জায়গায় এই জাতীয় স্বরলিপি রয়েছে। কিন্তু সবগুলি স্পর্শ-সুরের পর্যায়ে পড়ে না। যে গুলির উল্লেখ করা হল সেগুলি ছাড়া আর সব ক'টি অন্য ধরনের কাজ। 'শাওন গগনে' গানটির 'উন্মাদ পরনে যমুনা তর্জিত' এই পদে 'তর্জিত' শব্দে 'ত'-এর র্সা একটি স্পর্শ-সুর। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এটি ফোটে না কিন্তু ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে এই স্পর্শ-সুরের গুরুত্ব অপরিসীম। 'আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা' গানটিতে 'অন্ধকারের অন্তরধন' এই পদের 'অন্তর' শব্দে 'র'-এর র্সা স্পর্শ-সুরে প্রায়ই ফোটে না বা অস্পষ্ট থেকে যায়। 'অন্তর' কথাটির গভীরতা ফোটাতে কিন্তু ওই স্পর্শ-সুর অপরিহার্য। 'এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি' এই গানের অন্তরায় 'প্রতীক্ষার' 'তী' অক্ষরে র্সা আছে। প্রায়ই এই স্পর্শ-সুর 'তী'-তে না লেগে 'ক্ষা'-তে গিয়ে পড়ে। এই উদাহরণগুলি 'থেকে বোঝা যাবে স্পর্শ-সুরের প্রকৃতি কেমন হওয়া দরকার। গায়ক একটু মনোযোগ দিয়ে গাইলেই স্পর্শ-সুর প্রয়োগে গানের যে মাধুর্য ফোটে তা বুঝতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ গানের ভাষাকে একেবারে ঘরোয়া আটপৌরে করে যখন রচনা করেন তখন তার সুরও আমাদের অত্যন্ত আপন বলে মনে হয়। আমরা বাংলাভাষীরা 'ওগো' কথায় যেন একটু বেশি হৃদয় মিশিয়ে থাকি, খুব গভীর আত্মীয়তার ভাব ফোটাতে চাই। একটি গান—'ওগো সাঁওতালি ছেলে'—এতে 'ওগো' শব্দে একটি দীর্ঘ তান যুক্ত হয়েছে— ফলে সম্বোধনটি বড় আন্তরিক হয়ে উঠেছে। এর সুরের খেলাতেই যেন সমস্ত গানের

আবেগময়তা ফুটে ওঠে। আরেকটি গান 'ওগো তুমি পঞ্চদশী' এতেও 'ওগো'-তে দুবার দুরকম তান যুক্ত করা হয়েছে। 'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর' এই গানটির আবেদন 'ওগো' শব্দে শুধু প্রকাশ করা হয়েছে মগ মা—গা এই মীড়ে, শুরুতেই যা এর ভাবটিকে প্রকট করে।

'ও' এই সম্বোধন একাক্ষর। এর উদাহরণ দেওয়া যায় 'ও মঞ্জরি ও মঞ্জরি' গানে। 'ও'-তে সুরের বিন্যাসের রূপটি লক্ষণীয়। গানে প্রথম 'ও' একটি তীক্ষ্ণ হাঁকের মতো—র্রা-র্মা-র্রা অতি উচ্চ পর্দায়, তারপর মঞ্জরি কথাটা আসছে। যেন অনেক দূর থেকে কেউ ডাকছে। কবি আহ্বান করছেন বসন্তের দূত আম্রমঞ্জরিকে। দ্বিতীয়বার 'ও' ধ্বনিটি এক প্রলম্বিত সুরের খেলায় নৃত্যচ্ছন্দে ধেয়ে চলে। গানটি বসন্তের লীলাচঞ্চল রূপের ভাবকে প্রকাশ করে। যেখানে সম্বোধনবাচক কোনো একাক্ষর বা দুই অক্ষরের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে এই ধরনের বিশেষত্ব আছে। 'হে' এই সম্বোধনেও একই সুরের ঢং দেখি। 'হে আকাশবিহারি নীরদবাহন জল'—এই গানের 'হে' শব্দে একটি তান ব্যবহার করায় তার গতিময় ছন্দময় বর্ষণধারার রূপ বিশেষভাবে ফোটে, যা সারা গানটির মেজাজ এনে দেয়। প্রসঙ্গত প্রকৃতি পর্যায়ের কোনো কোনো গানে এই গতিময় ছন্দের সঙ্গে সুরের অপূর্ব সংগতি আমরা বিশেষ করে লক্ষ করতে পারি।

এখন আমরা আলোচনা করতে চাই রবীন্দ্রসংগীতে তান ও মীড়ের ব্যবহার সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, তান চলে তরঙ্গায়িত গতিতে, আর মীড় চলে গড়িয়ে। শাস্ত্রীয় মার্গ সংগীতে তান ও আলাপের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছোটো ছোটো তান ব্যবহার করেছেন মাত্র কথার ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। ভাবের অভিব্যক্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই। একটি উদাহরণ পাই 'পাতার ভেলা ভাসাই নীরে'—এই গানটিতে। জলের স্রোতোধারার সঙ্গে সুরের মিল যেন সম্পূর্ণ। সারা গানটিই তানে তানে মুখর, স্রোতের ভাবটি ফুটিয়ে তোলার জন্য। 'প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে'—এই গানে 'খুশির তুফান উঠেছে' এই কথার ভিতর প্রাণের উচ্ছল আনন্দ ছুটে বার হয়ে আসতে চাইছে। সেই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দকে প্রকাশ করা হয়েছে কয়েকটি তানে। 'উঠেছে' এই শব্দের শেষে বারে বারে এই তান ঘুরে ঘুরে আসে। অন্য একটি বিশেষ গানের উদাহরণ দিই। 'স্বপ্নে আমার মনে হলো'—গানটিতে একটি নিবিড় বিহ্বল আনন্দের অপরূপ ভাবমূর্তি ফুটে উঠেছে—তার ছন্দে, সুরে, ভঙ্গিমায়। এই গানে ছোটখাটো দু'তিনটি তান লাগানো হয়েছে যা গানের বাণীকে অধীর আবেগে মাতিয়ে তুলেছে। বিশেষ করে 'বনের চারিধারে' এর 'চারিধারে' শব্দে যে তান তা যেন ছড়িয়ে পড়ার পুলকে আকুল। 'শ্রাবণের গগনের গায়'—এই গানেও কয়েকটি তানে শ্রাবণের একটি উদ্দাম অধীর আনন্দের রূপকে প্রকাশ করেছেন কবি। কখনও একেবারে খাদের পর্দা থেকে তান ছুটে চলেছে ঊর্ধ্বে, আবার কখনও নেমে গিয়েছে গভীরের দিকে। প্রকৃতির বর্ষণমুখর রূপের সঙ্গে সুর কথা এবং অনুভূতি অপূর্ব ঐকতান সৃষ্টি করেছে।

এর পর মীড়ের প্রসঙ্গে আসা যাক। তান যদি প্রাণের লীলাচঞ্চল ভাবকে মূর্ত করতে সাহায্য করে মীড় সেখানে আবেগকে টেনে নিয়ে যায় গভীরে—মর্মের অন্তরালে। সেখানে এক 'তরঙ্গহীন গভীর মৌন' জেগে উঠে হৃদয়-আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এমন একটি মীড়ের

ব্যবহারের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি—'শুধু তোমার বাণী নয় গো' গানে 'পরশ' শব্দটির তাৎপর্য আলোচনাকালে। ঐ মীড়ের কাজটি ঠিকভাবে ফোটাতে পারলে অনির্বচনীয়ের আভাস পাওয়া যায় মনে।

'দিনান্ত বেলায় শেষের ফসল' গানটিতে 'সারা' এই শব্দের একটি মীড় পাই যার রূপ প্রশান্তিকর। 'এপারে কৃষি হল সারা, যাব ওপারের ঘাটে'—'সারা' এই শব্দে সারা জীবনের একটি কাজ সাঙ্গ হওয়ার সুর কর্মবহুল জীবনপ্রান্তে নিবিড় প্রশান্তির আকাঙ্ক্ষায় মগ্ন মীড়টিতে তা রণিয়ে ওঠে। আরও দুটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে—'সঘন গহন রাত্রি' এবং 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই।' এই গান দুটিতে মীড়ের দ্বারা যেভাবে একটি রাত্রির সঘন গহন রূপ এবং অসীমতার ভাবকে ধরবার চেষ্টা হয়েছে তার তুলনা মেলে না।

রবীন্দ্রসংগীতে আলাপের সুরও ফোটে কোনো কোনো গানে। যেমন 'শুভ্র প্রভাতে' গানটি। এর 'পূর্ব গগনে উদিল'-এর সুর শুনে মনে হয় শরৎপ্রভাতে যে একটি শুভ্র শান্ত স্থির আলোর ধারা ছড়িয়ে থাকে সুরে তারই একটি ছবি ফুটে উঠেছে। অন্য একটি গান 'অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে' এখানেও সারা গানটি যেন এক অপূর্ব সুরের বিহার।

রবীন্দ্রসংগীতের ভাব, প্রকৃতি, গীতরীতি সম্পর্কে নানাদিকে উল্লেখ করার সঙ্গে অন্য একটি বিষয়ও উল্লেখ করা দরকার। সেটি হল রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনে যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার। আজকাল বিশেষ করে আধুনিক গানে অর্কেস্ট্রা বা ঐকতানবাদন না হলেই নয়। গানের চেয়ে ঐ অর্কেস্ট্রাই বেশি গুরুত্ব পায় সিনেমা এবং আধুনিকতার কল্যাণে। রবীন্দ্রসংগীতেও ঐরূপ অর্কেস্ট্রা যোগ করে পরিবেশন করার দিকে ঝোঁক পড়েছে। কিছু কিছু গানের রেকর্ডে যন্ত্রসংগীতের বাহুল্য এত প্রবল যে গানটিই হারিয়ে গেছে মনে হয়। এ বিষয়ে কিছু বলতে হলে সেই আগের কথাই বলতে হয়। আমাদের খাঁটি দেশজ বাংলা গান—যাকে বলা হয় কীর্তন বাউল ভাটিয়ালি—এইসব গানে ঐকতান বাদনের কথা ভাবাই যায় না। যদিও কোথাও একটা বাঁশি কি বেহালা খোল মন্দিরা বাউল গানে গুপিযন্ত্র এর বেশি কোনো বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রসংগীতও এই বাংলা গানেরই স্বজাতি। তার প্রধান অঙ্গাভরণ হল মীড়। কোথাও শ্রুতির কাজ, কোথাও খুব সূক্ষ্ম সুরের নকশা। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ ছড়টানা তারযন্ত্রকেই তাঁর গানের বিশেষ উপযোগী বলে সাব্যস্ত করেছিলেন এবং তালসংগতে পাখোয়াজ এবং খোলের ব্যবহারই বেশি পছন্দ করতেন। কিন্তু আজকাল তার সম্পূর্ণ বিপরীত—তবলারই প্রাধান্য। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে এস্রাজ শিক্ষা তিনি সংগীতশিক্ষায় বাধ্যতামূলক করে গেছেন। শান্তিনিকেতনে সংগীতশিক্ষার পাঠক্রমে এই নির্দেশ পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে। এই কারণেই রবীন্দ্রসংগীতে হারমোনিয়াম ব্যবহার নিতান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করি। হারমোনিয়ামের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইবার অভ্যাস শিক্ষার্থীর পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রসংগীতের সমস্ত সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য ঘুচে যায় তার কণ্ঠে। মীড় ও শ্রুতির পর্দাগুলি এবং স্পর্শ-স্বর—যা রবীন্দ্রসংগীতের প্রাণ, তাও অস্ফুট থেকে যায়। রবীন্দ্রসংগীতের শুদ্ধভাব এবং রসটিকে ফোটাতে হবে কণ্ঠের এবং প্রাণের উপলব্ধি দ্বারা ; যন্ত্রবাদ্যের উপর নির্ভর করলে চলবে না।

উপসংহারে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। আজকাল রবীন্দ্রসংগীতের রাগ-রাগিণী, ধ্রুপদ, ধামার ইত্যাদি নানা বিষয়ও বিচারের দিকে ঝোঁক দেওয়া হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বয়সে যে পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন সে পরিবেশ ছিল শাস্ত্রীয় ধ্রুপদী পরিবেশ। বড়ো বড়ো ওস্তাদের গান শুনতে শুনতে তাঁর সংগীতের মনটি গড়ে ওঠে। তাঁর সমস্ত গানই তিনি শাস্ত্রীয় কাঠামোয় ফেলে অন্তত প্রথম দিকে রচনা করেছিলেন। কিন্তু কোনো সময়ই তিনি ওই শাস্ত্রীয় মার্গের বাঁধা পথচারী হয়ে চলার নির্দেশ মানেননি। তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল সম্পূর্ণ নতুন অভিনব সব সংগীতের রূপ সৃষ্টি করার দিকে ; যেখানে সংগীতের ভাবটি কীভাবে সম্পূর্ণ নতুন ফুটবে, কাব্যময়তাকে প্রকাশ করবে এইটাই ছিল সবচেয়ে বড়ো কথা। তাঁর লেখার একটি উদ্‌ধৃতি দিয়ে আলোচনা শেষ করতে চাই—

"কথা কহিয়া যে ভাব অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করি, রাগ-রাগিণীতে সেই ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করি। অতএব রাগ-রাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু এখন তাহা কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানাড়া বজায় আছে কিনা। আরে মহাশয়, জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কী ঋণে বদ্ধ যে তাহার নিকট অমন অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে? যদি মধ্যমের স্থলে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা থাকে তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুক বা মরুক আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন—আমি জয়জয়ন্তীর কাছে এমন কী ঘুষ খাইয়াছি যে তাহার জন্য অত প্রাণপণ করিব? বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ উপরি উক্ত ওস্তাদের সহিত একজন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ।"

বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসংগীতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের স্থান

শান্তিদেব ঘোষ

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নৃত্যগীতকে সম্মানজনক শিক্ষণীয় বিদ্যা হিসেবে স্থান দিয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের বুদ্ধিজীবী বাঙালি সমাজের জন্য ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা নতুন একপ্রকার নৃত্য আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিলেন। এ নাচের সৃষ্টি হয়েছিল গুরুদেব রচিত নানাপ্রকার নাটকের গানকে নির্ভর করে। গানের ভাবকে নৃত্যভঙ্গিতে অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশের চেষ্টা থেকেই, ভারত ও বিদেশী নানাপ্রকার ধ্রুপদী ও লোকনৃত্যের সমন্বয়ে রচিত মিশ্রপদ্ধতির একপ্রকার নাচের উদ্ভব এখানে হয়। যে সব অঞ্চলের লোকনৃত্য এই আন্দোলনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল, তার মধ্যে গুজরাত, কথিওবার, মণিপুর, নাগা, কেরল, এবং বিদেশের হাঙ্গেরি, রাশিয়া ও শ্রীলঙ্কার নাম করা যেতে পারে। এর সঙ্গে, বাংলার বাউল ও রাইবিশে নাচের যে কতখানি স্থান ছিল আজকে আমি বিশেষ করে তারই কথা প্রথমে বলতে চেষ্টা করছি।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক বছর পর শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবা-বিভাগ গ্রামোন্নয়নের নানা প্রকল্পের মধ্যে নিকটবর্তী গ্রামের মেলাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করবার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। একাজের জন্য শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন থেকে একদল ছাত্র ও কর্মীকে স্বেচ্ছাসেবকরূপে নিয়ে আমার পিতৃদেব কালীমোহন ঘোষ প্রথম গিয়েছিলেন ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে পৌষ-সংক্রান্তির সময় বীরভূমের বিখ্যাত জয়দেব-কেন্দুলির মেলায়। আমাদের থাকবার ব্যবস্থার জন্য একসারি তাঁবু ফেলা হয়েছিল মেলার প্রাচীন বটগাছের তলায় যেখানে বাউল নরনারীরা দলে দলে থাকতেন, তার গায়ে-লাগা পশ্চিমের খোলা মাঠে নদীর পারে। পাশাপাশি থাকার দরুন, বাংলার নানা জেলার বাউলদের সঙ্গে মেশবার এবং তাঁদের গান শোনা ও নাচ দেখবার সুবিধা পেয়েছিলাম, খুবই সহজে। সে যুগের মেলার এই বাউল সমাবেশে, সকালে বিশাল বটগাছের ডালপালা ভেদ-করা সূর্যের আলোয় আলোকিত অঙ্গনে এবং সন্ধ্যায় কাঠের আগুনে ও কেরোসিনের বাতির আলোর চারিপাশে ছোটো ছোটো আখড়ায় সমবেত বাউল নরনারীদের কণ্ঠের গান, একতারার ঝংকার, মন্দিরা বাঁয়া ও খঞ্জনির তালের বোল এবং পুরুষদের বৈচিত্র্যময় পদছন্দে উত্থিত কাঁসার নূপুরের ধ্বনি ও বাঁশির সুরে চারিদিক মুখরিত হয়ে থাকত। এখনকার মত বিজলির সুবিধায় মাইক ও লাউডস্পিকারের সাহায্যে যেরূপ কোলাহলময় শব্দতরঙ্গের দৌরাত্ম্য ঘটে, তখন তা ঘটত না।

সে-যুগে প্রতি আখড়ায় বাউলরা যখন পূর্বাহ্ণে এবং অপরাহ্নে একজনের পর একজন নাচ ও গানে আনন্দ করতেন তখন আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম। এইভাবে বাংলার বাউলদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁদের নাচ ও গানের টানে আরও কয়েকবার সেখানে গেছি। প্রতিবারেই কয়েকজন খুবই উঁচুদরের নৃত্যকুশলী

বাউলকে পেয়েছি। সে-যুগের গোপাল ক্ষেপার কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। তিনি আমাদের আগ্রহে ৭ পৌষের উৎসব-মেলায় প্রায়ই আসতেন। শেষদিকে পেয়েছিলাম পূর্ণ দাসের পিতা নবনী দাসকে। তিনি ছিলেন আমার বন্ধুর মত। আমার আগ্রহে তিনি প্রায়ই শান্তিনিকেতনে আসতেন এবং নাচে ও গানে সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। প্রতিবারই জয়দেব-কেন্দুলির মেলা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে গুরুদেবের গানের সঙ্গে বাউলদের মত নাচের অনুকরণ করতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু তা প্রকাশ্যে নয়, অতি গোপনে।

তখনকার দিনে, শান্তিনিকেতনে দোলের সময় সকালে অনুষ্ঠান এ যুগের মত আনুষ্ঠানিকভাবে হত না। আম্রকুঞ্জে বা অন্যত্র, অধ্যাপকগণ ও ছাত্রছাত্রী দল, একসঙ্গে বসে আপন আনন্দে গুরুদেব রচিত যাবতীয় বসন্ত ঋতুর গান সমবেত কণ্ঠে গাইতেন। রঙখেলাও চলত তার সঙ্গে। ১৯৩১-এর দোলের দিনে সকালের এইরূপ গানের আসর বসেছিল শালবীথির দক্ষিণে ও সন্তোষালয়ের উত্তর-পশ্চিমে, পুরোনো একটা ভাঙা বাড়ির সিমেন্টের উন্মুক্ত চাতালে। সেদিনের সেই আসর যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন আমি নিজে থেকেই উঠে দাঁড়ালাম গানের সঙ্গে নাচবার প্রবল উৎসাহে। গাছের একটি ডাল ভেঙে নিয়ে ডান হাতে বাউলদের একতারার মত সেটিকে ধরে নাচতে শুরু করলাম। তা দেখে কলাভবনের একটি ছাত্রও আমার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছামত নাচতে শুরু করলেন। সংগীতাচার্য দিনেন্দ্রনাথ, শিল্পাচার্য নন্দলাল ও অন্যান্যরা আমাদের ক্রমান্বয়ে উৎসাহ দিতে লাগলেন। শিল্পাচার্য নিজে একটি পাতলা চাদর আমার কোমরে খুবই আঁট করে বেঁধে দিলেন। সকলের কাছ থেকে এভাবে উৎসাহ পেয়ে প্রবল আনন্দে একটার পর একটা গানের সঙ্গে আমরা একটানা নেচেছিলাম, প্রায় দু ঘণ্টা। একটুও ক্লান্তি বোধ করিনি। বাউলদের নাচের ঢঙকে গুরুদেবের নানা ছন্দের বসন্ত ঋতুর গানের সঙ্গে মিলিয়ে কীভাবে যে সেদিন নেচেছিলাম, তা জানি না। কিন্তু গুরুদেবের গানের বিভিন্ন ছন্দে নাচতে গিয়ে কোনোবার যে ছন্দপাত করিনি সেটুকু বুঝতে পেরেছিলাম ভাল করেই। গুরুদেবের কানে আমার নাচের সংবাদ পৌঁছনো মাত্রই, অপরাহ্নে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'নবীন'-এর অনুষ্ঠানেও আমাকে নাচতে হবে। সেদিন যে গানটি তিনি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন সেটি ছিল, 'ফাগুন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়'। এইভাবে, প্রকাশ্যে আমার নৃত্যজীবনের প্রথম সূত্রপাত ১৯৩১-এর দোলের সকাল ও সন্ধ্যার আনন্দানুষ্ঠানে। জয়দেব-কেন্দুলির বাউলদের মতো অত নিখুঁত ছন্দে নাচতে পারিনি সেদিন, কিন্তু তাঁদের প্রেরণা যে ছিল আমার নাচের মূল উৎস একথা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি।

'নবীন'-এর অনুষ্ঠানে আমার নাচ দেখে গুরুদেব খুবই খুশি হলেন। স্থির করলেন কলকাতায় রঙ্গমঞ্চে 'নবীন'-এর পরবর্তী অনুষ্ঠানেও আমার নাচ থাকবে। একক, দ্বৈত ও সমবেত নৃত্যের জন্য মোট তিনটি গান আমাদের জন্য তিনি বেছে দিয়েছিলেন।

প্রবল উৎসাহে 'নবীন'-এর মহড়ার কাজ যখন চলছে তখন খবর এল, বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারী নৃত্য আন্দোলনের উদ্‌বোধনের জন্য বাংলার কতগুলি জেলার লোকনৃত্যগীতের শিল্পীদের সংগ্রহ করে একটি অনুষ্ঠান করছেন, সিউড়িতে। দেখবার জন্য তিনি নিমন্ত্রণও জানিয়েছেন। গুরুদেব আমাদের সিউড়িতে পাঠালেন।

সেই অনুষ্ঠানেই আমার বীরভূমের রাইবিশে এবং বাংলাদেশের মৈমনসিংহ অঞ্চলের মুসলমান যুবকদের রুমাল হাতে জারিগানের সঙ্গে দলবদ্ধ নাচ, প্রথম দেখি। এ দুটি নাচই আমাদের ভাল লেগেছিল। সিউড়ি থেকে ফিরে, গুরুদেবের কাছে আবেদন করলাম, গুরুসদয় দত্তকে বলে রাইবিশে নর্তক আনিয়ে দিতে ; সেই নাচ শিখে 'নবীন'-এর নাচ তৈরি করব। গুরুদেব উৎসাহ দিলেন শেখবার জন্য এবং গুরুসদয় দত্তকে খবর দিয়ে নাচিয়েদের আনালেন। তাঁদের কাছে আমরা দিন সাতেক কিছু নৃত্যভঙ্গি শিখে, বাউল নাচের সঙ্গে তাকে মিশিয়ে 'নবীন'-এর গান কটির সঙ্গে নতুন করে নাচ তৈরি করেছিলাম। কলকাতায় নাচের সময় প্রচলিত একতারার অভাবে আমাদের জন্য পশ্চিম ভারতীয় একতারা কিনে দেওয়া হল কলকাতার যন্ত্রের দোকান থেকে। গুরুদেবের গানের সঙ্গে এভাবে নতুন নাচ তৈরি করবার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পরবর্তী জীবনে বহু নাচ তৈরি করেছি, অন্যদের তা শিখিয়েছি এবং নিজেও নেচেছি। বাউল নাচকে ভিত্তি করে এভাবে পরবর্তী যুগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে অন্য নাচের নানাপ্রকার পদছন্দও মিশিয়েছি, কিন্তু তার জন্য বাউল নাচকে তার মূল প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দিইনি। এইরূপ মিশ্রিত বাউলনাচ রচনার সময় গুরুদেবের নির্দেশ আমাকে খুবই সাহায্য করেছিল। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বাউল নাচের মূল চরিত্রটিকে ঠিক রেখে কীভাবে মিশ্রণ সম্ভব। যে কাজ তিনি নিজে করেছিলেন 'ফাল্গুনী' নাটকের অন্ধ বাউলের চরিত্রে গানের সঙ্গে নাচের সময়।

১৯২৪ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত বাউলদের যে নাচ দেখেছি এবং পরবর্তী যুগে নবনী দাস যেভাবে গান গেয়ে নাচতেন, সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

সে যুগের বাউলেরা যখন নাচতেন তখন তাঁরা পুরুষোচিত নানাপ্রকার বলিষ্ঠ পদছন্দ প্রকাশ করতেন গানের ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে। এছাড়া গানের মাঝে মাঝে বাঁয়া ও মন্দিরার ছন্দও পায়ে তুলতেন এবং তালের সমে এসে তালের নাচ শেষ করে পুনরায় গান ধরতেন। তাঁদের নাচে ছিল পুরুষোচিত প্রচণ্ড ছন্দবেগ যা এ যুগের কোনো বাউলদের মধ্যে আর দেখা যায় না। এ নাচ রীতিবদ্ধ নৃত্যাভিনয় নয়। গানের ভাবকে হাতের ভঙ্গিতে অভিনয়ে প্রকাশ করবার সুযোগ এ নাচে ছিল না। কারণ, এঁদের দুই হাত যুক্ত থাকত একতারা ও বাঁয়ার সঙ্গে। দেহের ও পায়ের নৃত্যভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেভাবে বাউলরা ডান হাতে একতারাকে পরিচালনা করতেন, তার পিছনে যে সুনির্দিষ্ট ছন্দবোধ কাজ করছে তা বোঝা যেত। হাতের একতারাটির বিচিত্র বিন্যাস দেখে মনে হত, যেন যন্ত্রটি সমগ্র দেহের সঙ্গে আপনা থেকেই নেচে চলেছে। যদিও গানের সুরের সুবিধার্থে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হত, কিন্তু বাউলরা সেটিকে তাঁদের নৃত্যভঙ্গিরই একটি বিশেষ অঙ্গ করে নিতে পেরেছিলেন।

তাঁরা যখন গান গাইতেন নাচের সঙ্গে, তখন তাঁদের মুখ ও চোখ দেখে মনে হত, যেন তাঁরা গানের ভাষায় তাঁদের বক্তব্য শোনাচ্ছেন। চারিদিকে উপবিষ্ট সঙ্গীদের দিকে ঘুরে ফিরে, চোখে চোখে তাকিয়ে, আনন্দোজ্জ্বল হাসিমুখে যেন বোঝাতে চাইতেন তাঁরা কী বলতে চান। তাঁদের তখনকার নৃত্যমুখর দেহভঙ্গি এবং চোখ ও মুখের ভাবে প্রকাশ পেত গভীর প্রেমানন্দে মগ্ন প্রেমিকের মনের একটি উদ্দাম আনন্দের আবেগ।

বাউলদের গানের সঙ্গে নৃত্যছন্দে অভিনয়ের এই পদ্ধতিটিকে আমরা গুরুদেবের নানা প্রকৃতির গানের সঙ্গে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলাম। ভারতীয় লোকনৃত্যগীতের প্রতি গুরুদেবের কিরূপ আগ্রহ ছিল ব্যক্তিগত একটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে তা বোঝাবার চেষ্টা করছি।

১৯৩১-এ কলকাতায় 'নবীন'-এর গানের সঙ্গে নাচের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ভাল করে পুরুষদের নাচ শেখবার প্রবল ইচ্ছা আমার মনে জাগে। গুরুদেবের কাছে তা প্রকাশ করি। তিনি খুবই উৎসাহ দেন। পুরুষ লোকনৃত্য বিষয়ে খোঁজখবর করে মে মাসের মাঝামাঝি আমি যাত্রা করি দক্ষিণ ভারত অভিমুখে। বিশ্বভারতীর একজন প্রাক্তন ছাত্রের সাহায্যে, সদ্য প্রতিষ্ঠিত কেরলের কথাকলি নাচের বিদ্যালয়ে কেরলা কলামণ্ডলমের প্রতিষ্ঠাতা ভালাথোল নারায়ণ মেননের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে কথাকলি নাচ শেখবার অনুমতি আমাকে দেন, সানন্দে।

এ ধরনের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ভ্রমণের সময় পরিচয়পত্রের যে প্রয়োজন হয় সে বিষয়ে আমার খেয়াল ছিল না, যার জন্যে যাত্রার পূর্বে গুরুদেবের কাছ থেকে আমার পরিচয়পত্র নিতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কেরলে পৌঁছে, ভালাথোলের কথা, বিদ্যালয়ের কথা এবং আমার নাচ শেখবার বিস্তারিত বিবরণসহ আমার চিঠি পাবার কদিন পরেই তিনি নিজে থেকেই আমার একটি পরিচয়পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেটি পাবার পর আমার খেয়াল হয়েছিল যে, এইরূপ একটি পত্র আমার যাত্রার পূর্বেই সংগ্রহ করা উচিত ছিল। আমার ভুলোমনের কথা চিন্তা করে গুরুদেব নিজে থেকেই পরিচয়পত্রটি পাঠানোয় আমি সত্যিই অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলাম। চিঠিটিতে তিনি বিশেষ করে এক জায়গায় লিখেছিলেন—

"He intended to travel in various parts of India studying different kinds of indigenous dancing and collecting folk tunes."

সঠিক খবর না নিয়ে, নাচ শেখবার উৎসাহে শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে পড়ে আকস্মিকভাবে আমি কথাকলির সন্ধান পাই। কিন্তু, আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লোকনৃত্যের চর্চা। লোকসংগীতের চর্চার বিষয়ে তখনো পর্যন্ত আমি কিছুই ভাবিনি এবং এ নিয়ে গুরুদেবকে আমি কিছু বলিওনি। তবুও, পরিচয়পত্রের ঐ দুটি পংক্তি পড়বার পর আমার মনে হয়েছিল, গুরুদেব যেন চাইছেন, লোকসংগীতের প্রতিও আমি মন দিই। তখন থেকে তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকরী করবার প্রতি মনে আগ্রহ দেখা দেয়। শান্তিনিকেতনে ফিরে আসবার পর বীরভূমের এবং অবিভক্ত বাংলার লোকসংগীত সংগ্রহের কাজ শুরু করি, আমার অন্যান্য কাজের সঙ্গে। ধীরে ধীরে এ কাজ চলতে থাকে। অনেকখানি যখন এগিয়েছি, তখন বুঝতে পারলাম যে, বাংলার লোকসংগীত গুরুদেবের গানে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। গুরুদেব নিজে বাংলার বাউলদের গানের প্রভাবের কথা লিখিতভাবে উল্লেখ করে গেছেন, কিন্তু নিজে বিশ্লেষণের দ্বারা তা বুঝিয়ে না বলায়, আমাদেরই তার কথা ভাবতে হয়েছিল। এ গানের সংগ্রহের পর দেখা গেল যে, তিনি লোকসংগীতের সুর, ছন্দ ও ভাবের কেবল অনুকরণ করেননি, তার সাহায্যে এমন সব নতুন ধরনের বিচিত্র পর্যায়ের গান রচনা করে গেছেন যা বাংলার লোকসংগীতে

কোনদিন ছিল না। বাংলার লোকসংগীতের প্রভাব গুরুদেবের গানে কিরূপে প্রতিফলিত হয়েছে, এবার সংক্ষেপে তার আলোচনা করছি।

বাংলার লোকসংগীতের সহজ সরল মনমাতানো রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, গুরুদেব তার সুর ও ছন্দের অনুকরণে, প্রথম দিকে বেশ কিছু গান রচনা করেছিলেন। এই গানগুলিকে পুরোপুরি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি বলা চলে না। কারণ, এর সুর ও ছন্দ তিনি গ্রহণ করেছিলেন গত শতাব্দীর নানাপ্রকার লোকসংগীত থেকে। এর কথাগুলি ছিল কেবল গুরুদেবের। এইরূপে গান রচনা করে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর নিজের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন ধারার গানের সুর ও ছন্দের মিলন ঘটাতে। সেদিক থেকে অনুকরণজাত এই গানগুলি যে কোন শ্রেষ্ঠ পল্লীগানের পাশে স্থান পেতে পারে। এই গানগুলির দ্বারা তিনি যেন নিজেকে পরীক্ষা করেছিলেন। এইরূপ গানের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ হল—

(১) তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ
(২) আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
(৩) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
(৪) আমার সোনার বাংলা।

লোকসংগীতের প্রচলিত এই রচনা রীতির মধ্যে গুরুদেব নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেননি। তিনি পরিবর্তন আনলেন, কিন্তু কীভাবে তা আনলেন, এবারে তা বলি।

ভারতের লোকসংগীতগুলি সুরের দিক থেকে ধ্রুপদের মত চারকলির গান নয়, এ হল দু-কলির গান। এই রীতিটির পরিবর্তন করে গুরুদেব তাঁর ঐ সুরের গানকে চারকলিতে সাজিয়ে তৃতীয় বা সঞ্চারী কলিতে, প্রথম দু-কলির সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভিন্ন সুর যোজনা করতে লাগলেন। তৃতীয় কলিতে সুর যোজনার সময় লোকসংগীতের সঙ্গে হিন্দি গানের রাগরাগিণীকেও স্থান দিলেন। কিন্তু, গানগুলি শোনার পর পরিষ্কার বোঝা যায় যে মূল সুরের সঙ্গে তার স্বাতন্ত্র্য নেই। রাগরাগিণীগুলিও যেন লোকসংগীতের সুরের সঙ্গে সহজে মিশে গেছে। লোকসংগীতের সাহায্যে রচিত এইরূপ চারকলির কয়েকটি গানের উদাহরণ উদ্ধৃত করছি—

(১) ঐ আসনতলের মাটির পরে
(২) বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা
(৩) এ বেলা ডাক পড়েছে।

বাংলার লোকসংগীতের সুর ও ছন্দের সাহায্যে প্রকৃত সৃষ্টিমূলক যে সব গান গুরুদেব রচনা করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) এই তো ভালো লেগেছিল
(২) কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি

প্রথমটি, অন্যান্য চারকলির গানের মতো ছোটো আকারের গান নয়। গানটি মূলত মোট চারকলিতে বিভক্ত হলেও এর প্রতি কলিতে আছে মোট পাঁচটি পংক্তি। সবসমেত গানটি

মোট কুড়ি পংক্তিতে রচিত। নানাপ্রকার দেশী সুরের সমন্বয়ে গানটি রচিত হয়েছে। দেশীগানের দুইকলি, কিংবা ধ্রুপদের মত চারকলির রীতিতে এ গানে সুর বসাননি। গানটির প্রতি পংক্তির অনুযায়ী সুরগুলি অতি সহজে জলের ধারার মত আপন আবেগে বয়ে চলেছে। সুরের বৈচিত্র্য বোঝা যায় কিন্তু তার জন্য গুরুদেবকে রাগরাগিণীর সাহায্য নিতে হয়নি, লোকসংগীতের সুরের দ্বারাই এত বড়ো গানের পংক্তিকে সাজিয়েছেন।

'কৃষ্ণকলি' গানটি লোকসংগীতের সুর ও রাগিণী মিশ্রিত গুরুদেবের আর একটি উল্লেখযোগ্য সার্থক রচনা। এটি হল, মোট পাঁচকলির আখ্যানমূলক লিরিক আবেগের, দেশী ও রাগসংগীতের সুরে মিশ্রিত, গল্পবলার ছন্দে অভিনয়ের রীতিতে, আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা গেয়ে শোনাবার গান।

এ ধরনের এইরূপ দুটি কবিতায় সুর যোজনার এই রীতি ভারতের আর কোনো প্রকার লোকসংগীতে প্রচলিত নেই। এ যুগের আর কোনো গীতরচয়িতা এ ধরনের গান রচনা করেছেন বলে শোনাও যায় না।

এই গান দুটির সুর যোজনার রীতি যেমন আধুনিকতার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন, তেমনি দেশের সংগীতের বিশাল ও মূল্যবান সম্পদকে নির্ভর করে কীভাবে আমরা নতুন যুগের উপযোগী গান সৃষ্টি করতে পারি, তারও নির্দেশ এতে আমরা পাই।

রবি-বাউলের উৎসমুখে

অরুণকুমার বসু

"চারিদিকে দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয় যে, বাঙালি জাতির যথার্থ ভাষাটি যে কী তাহা আমরা সকলে ধরিতে পারি নাই—বাঙালি জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে তাহা আমরা ভালো জানি না। এই নিমিত্ত আধুনিক বাংলা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। ···আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থে একটি গান আছে—

আমি কে তাই আমি জানলেম না
আমি আমি করি কিন্তু, আমি আমার ঠিক হইল না
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি
চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি,
কোথা হইতে এলাম আমি তারে ক'ই গণি!

আমাদের ভাব আমাদের ভাষা যদি আমরা আয়ত্ত করিতে চাই, তবে বাঙালি যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।"[১]

বাংলা ১২৯০ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ 'সঙ্গীতসংগ্রহ' নামক একটি গীতসংগ্রহের প্রথম খণ্ডে সংগৃহীত বাউল-জাতীয় গানগুলির উদ্দেশে সর্বপ্রথম এই ভাষায় তাঁর কবিচিত্তের কৌতূহল ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছিলেন। এই গ্রন্থভুক্ত 'দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা' গান উদ্‌ধৃত করে তিনি লিখেছিলেন, "ইহাকে দেখিলেই এমনি আত্মীয় বলিয়া মনে হয় যে, কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ইহাকে প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিই।"[২] এই আত্মীয়তা তিনি দীর্ঘকাল রক্ষা করেছিলেন। গীতাঞ্জলির যুগে এই 'রূপ-সাগরে' অবগাহন করেই তিনি অরূপরতন-প্রত্যাশী হতে চেয়েছিলেন। এই গানটির সুরও তাঁর আপন গীতসৃষ্টির ভাণ্ডারে, ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে বিসর্জন নাটক রচনাকাল থেকেই প্রবেশ করেছিল। 'আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই আপনারে' গানটির কথা ও সুরের সঙ্গে প্রাগুক্ত 'দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ' গানটির কথা ও সুরের তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে। অবশ্য উক্ত বাউল গানটি প্রাচীন কোনো লোক-কবির রচনা নয়, সেটিও এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। গানটিতে 'পথিক' ভণিতাদৃষ্টে বোঝা যায়, এর রচয়িতার নাম আনন্দচন্দ্র মিত্র, জন্ম উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে এবং তিনি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত প্রচারক ও গীতিকার ছিলেন। যে 'সঙ্গীতসংগ্রহ' গীতসংকলনে তাঁর দেখেছি 'রূপ-সাগরে মনের মানুষ' সংকলিত হয়েছিল, তারও সম্পাদক ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, আর ঐ সংকলনে বাউল গান ছাড়াও বিপুল সংখ্যক ব্রহ্মসঙ্গীত স্থান পেয়েছিল। গানটির রচয়িতা যে প্রাচীন

কোনো গ্রাম্য কবি নন, কবিও সম্ভবত তা জানতেন, কারণ গানটি উদ্‌ধৃত করার আগে তিনি লিখেছিলেন, "গানটি আধুনিকই হউক আর পুরাতনই হউক ইহার বাংলা কেমন সহজ, ভাব কেমন সরল।"[৩] এই কারণেই বাইশ বছর বয়সের তরুণ রবীন্দ্রনাথ সংকলন-গ্রন্থের অন্য ধরনের গানগুলির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সংকলয়িতার উদ্দেশে সক্ষোভ মন্তব্যে লিখেছিলেন, তিনি "ব্রহ্মসংগীত ও আধুনিক ইংরেজিওয়ালাদিগের রচনাকে ইহার মধ্যে স্থান দিলেন কেন?"[৪]

মাত্র বাইশ বছর বয়স্ক নাগরিক কবির পক্ষে অশিক্ষিত 'অকৃত্রিম হৃদয়ের সরল গান' শোনার জন্যে এই অভীপ্সা তাঁর পরবর্তী জীবনের লোকসাহিত্য লোকসংগীত ও লোকসংস্কৃতির প্রতি ক্রমজায়মান অন্তরঙ্গতারই উপক্রমণিকা। উল্লেখনীয় যে আলোচ্য গ্রন্থ-সমালোচনার অব্যবহিত পূর্বেই কবি স্বকীয় উদ্যমে কিছু তথাকথিত বাউল-জাতীয় গান সংগ্রহ করেছিলেন এবং উক্ত সমালোচনার উপসংহারে সেগুলি মুদ্রিত করেছিলেন।[৫] সেইসঙ্গে অনুরূপ লোকসংগীত ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে মুদ্রণার্থে প্রেরণের জন্য পাঠকদের কাছেও তাঁর আহ্বান ছিল।[৬] সে আবেদনে সাড়া দিয়ে কেউ কেউ কয়েকটি অপ্রকাশিত লোকগীত ভারতীতে পাঠিয়েও ছিলেন। মনে হয় পারিবারিক সূত্রে একাধিক লোকগীতের সুরের সঙ্গে কবির ইতিমধ্যেই পরিচিতি ঘটেছিল। 'দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ' গানটির সুরও তিনি জানতেন আগেই তা বলা হয়েছে। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের (জন্ম ১২৫৮) এই গানটি প্রায় একই সুরে রচিত সেকালের একটি জনপ্রিয় গান—

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিণী
ও যার বিমল তটে রূপের হাটে
বিকাত নীলকান্ত মণি ॥...
কোথা চারুচন্দ্রাবলী কোথা বা সে জলকেলি
কোথা ললিতাসখী সুহাসিনী
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী
বামেতে রাই বিনোদিনী ॥...[৭]

১২৯৭ সালে রচিত 'আমারে কে নিবি ভাই' গানটি ছাড়াও 'মা কি তুই পরের দ্বারে' (১৩১২), 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়' (১৩১৬), 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি' (১৩২৪) ইত্যাদি বেশ কয়েকটি গানের সুর একই কাঠামোয় তৈরি। তা ছাড়া, রূপ-সাগরের মনের মানুষ-কে 'ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলেম আর পেলেম না'—এই ধরতে না-পারার ব্যর্থতার সঙ্গে, লালনের

'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়'

—এই অচিন-পাখিকে না-ধরার ক্ষোভ মিশে গিয়ে একটি নির্বিঘ্ন ব্যাকুলতার ইমেজ তৈরি করেছিল। সেই ধরা-না-ধরা অলোকরহস্য তাঁর উত্তরজীবনের গানে ও কবিতায় একটি সুবিদিত থিম-রূপে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

২

তথ্য হিসেবে আমরা এ-যাবৎ জেনে এসেছি যে বাংলার আঞ্চলিক লোকসংগীতের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ আত্মিক গাঢ়তা ঘটল পল্লীবাংলায় অবস্থানকালে, নদীয়া-পাবনা-রাজশাহিতে জমিদারি-পরিচালন কাজের উপলক্ষ্যে। এই সময়কালের মধ্যে (১৮৯০-৯৫) বিভিন্ন প্রসঙ্গে লালনশাহ ও তাঁর সহযোগী বাউলদের গান যথেষ্ট শ্রবণ ও সংগ্রহে তাঁর ক্লান্তি ঘটেনি ধরে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য এরও আগে বা পরে অন্য সূত্র থেকেও তিনি গ্রাম্যগীত শ্রবণ ও সংগ্রহ করেছেন, তারও প্রমাণ আছে। সরলা দেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' থেকে আমরা জানতে পারি, মহর্ষিদেব যখন চুঁচুড়ায় থাকতেন, তখন তাঁর বোটের মাঝিদের কাছ থেকে সরলা নানা প্রকার বাউল-ভাটিয়ালি গান শিখেছিলেন এবং 'যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্য প্রাণ ব্যস্ত থাকত—তাঁর মতো সমাজদার আর কেউ ছিল না।' ছিন্নপত্রাবলীতে গ্রাম্য গীত-শ্রবণের একাধিক অভিজ্ঞতার কথা আছে। 'যোবতী ক্যান বা কর মন ভারি' গানের সকৌতুক উল্লেখ শুধু ছিন্নপত্রে (৯৩ সংখ্যক) নয়, লোকসাহিত্য গ্রন্থের 'গ্রাম্যসাহিত্য' (১৩০৫) প্রবন্ধেও আমরা পাই। ঐ প্রবন্ধে আরও যে অজস্র গ্রাম্যসাহিত্যের পদ্যবন্ধ উদাহরণ আছে সেগুলির সুরও তিনি শুনেছিলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি' (১৯৬৬) গ্রন্থে শিলাইদহ অঞ্চলে পদ্মা-বোটে অবস্থানকালে ভাসমান নৌকোগুলির মাঝিদের মুখ থেকে একাধিকবার ভাটিয়ালি-সারি শোনার অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ আছে। পদ্মার অন্য পারেই উত্তরবঙ্গ, রাজশাহিকে চলতি ধারণায় উত্তরবঙ্গই বলা যায়। শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর সাক্ষ্যে জানতে পারি, উত্তরবঙ্গের জনৈক রাজবংশী কবির কর্মচারীও ছিল। সুতরাং উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানও তাঁর যথেষ্ট শোনা ছিল, জানাও ছিল। তাঁর সংগীত সৃষ্টিতে তার প্রমাণও যথেষ্ট মিলেছে। এমন-কি এই সময়, কী কোন সময় নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব না হলেও, অনুমান করা অসংগত নয় যে, বাঁকুড়া-বর্ধমান-পুরুলিয়ার টুসু পরবের গান, মালদহের গম্ভীরা গান, মেদিনীপুর-পুরুলিয়ার ঝুমুর গানের সুরের সঙ্গেও তাঁর অল্পবিস্তর জানাচেনা ঘটেছিল, যদিও তাঁর সঙ্গীতসৃষ্টিতে সে স্বাক্ষর নিশ্চিতভাবে সন্ধান করা সম্ভব নয়।

তবে ১৩০০ সালের পূর্বে রচিত রবীন্দ্রসংগীতে কবির সমকালীন অভিজ্ঞতালব্ধ লৌকিক সুর সবেগে প্রবেশ করেনি। শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, কবি তাঁর সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত "দেশী সুরের সাহায্যে যে সব গান লিখলেন তার মধ্যে দেখলাম তার প্রায় সবই কলকাতা অঞ্চলে প্রচলিত কীর্তন ও রামপ্রসাদী সুরে রচিত।" গানগুলির তালিকাও দিয়েছেন তিনি—

গহনকুসুমকুঞ্জ মাঝে	মিশ্র কীর্তন
আমিই শুধু রইনু বাকি	রামপ্রসাদী
আমি জেনে শুনে তবু	কীর্তন
শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি	রামপ্রসাদী
সুখে আছি	মিশ্র কীর্তন ইত্যাদি

তাঁর মতে, "এই বয়সে রচিত মোট ৪০০ গানের মধ্যে এই কটি ছিল তাঁর দেশী সুরের গান।"[৮]

মোটামুটি ১৩০১-০২ সালের হিসেব ধরে আমরা শান্তিদেব-কথিত 'দেশী' বা তথাকথিত লোকগীতের সুরে প্রভাবিত আরও যে গানগুলি পাচ্ছি তার তালিকা এই প্রকার—

হরি তোমায় ডাকি (ভাদ্র ১২৯২)
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক (প্রভাতকুমারের মতে, ১২৯২ মাঘোৎসব)
আমরা মিলেছি আজ (পৌষ ১২৯২)
আমি নিশি নিশি কত রচিব ('ভারতী ও বালক', আশ্বিন ১২৯৩)
ওর মানের এ বাঁধ টুটবে না কি (১২৯৩?)
ওগো এত প্রেম-আশা (কড়ি ও কোমল, ১২৯৩)
তবু মনে রেখো (অগ্রহায়ণ ১২৯৪)
এবার যমের দুয়োর খোলা পেয়ে (রাজা ও রানী, শ্রাবণ ১২৯৬)
আজ আসবে শ্যাম (রাজা ও রানী, শ্রাবণ ১২৯৬)
আমারে কে নিবি ভাই (বিসর্জন, ফাল্গুন ১২৯৬)
আমারে কে নিবি ভাই (১২৯৭, পূর্বে উল্লিখিত)
ওগো তোমরা সবাই ভালো (গোড়ায় গলদ, ভাদ্র ১২৯৯)
খাঁচার পাখি ছিল (আষাঢ় ১২৯৯)
খ্যাপা তুই আছিস আপন (আশ্বিন ১২৯৯)
বড় বেদনার মতো বেজেছ (আষাঢ় ১৩০০)
হৃদয়ের একূল ওকূল (আষাঢ় ১৩০০)
এসো এসো ফিরে এসো (ভাদ্র ১৩০১) ইত্যাদি

এর মধ্যে অনেকগুলিই কীর্তন, মিশ্র কীর্তন, ঢপকীর্তন ও মনোহরশাহি কীর্তনের সুরের উপর ভিত্তি করে রচিত। সম্পূর্ণ আখরযুক্ত কীর্তন গানও এই পর্বে পাই, সেটি 'ওহে জীবনবল্লভ ওহে সাধনদুর্লভ'—সম্ভবত ১৩০১-এর বৈশাখে রচিত। অন্য গানগুলি সাধারণভাবে 'বাউল' নামে পরিচিত, একটি কেবল রামপ্রসাদী। উল্লেখযোগ্য যে ১২৯০ বৈশাখে প্রকাশিত প্রকৃতির প্রতিশোধ-এ 'প্রিয়ে তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে' গানটিও রামপ্রসাদী, কিন্তু শান্তিদেবের তালিকায় নেই।

আলোচ্য তালিকার তথাকথিত বাউল গানগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। 'ওর মানের এ বাঁধ টুটবে না কি' গানটি প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬) নাটকে ব্যবহৃত, স্বরবিতান নবম খণ্ডে 'বাউলের সুর' বলে উল্লিখিত। সম্ভবত এটি বাউলের সুর নয়, পরে তার আলোচনা হবে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী-র প্রথম খণ্ডে (২য় সং ১৩৮০) অনুমান করেছেন, গানটি বউঠাকুরাণীর হাটের কেদার চৌধুরীকৃত নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়'-এর জন্য লেখা (অভিনয়, আষাঢ় ২০, ১২৯৩)।

প্রচলিত সুরটি যদি তখনই কবি দিয়ে থাকেন, তবে এই গানটিকেই কবি-প্রদত্ত প্রাচীনতম লৌকিক সুরের গান বলতে হয়, মিশ্র কীর্তন সুর এর মধ্যে ধরা হচ্ছে না। 'ওগো তোমরা সবাই ভালো' গানটি গোড়ায় গলদের শেষ দৃশ্যে সমবেত কণ্ঠে গেয়, 'বাউলের সুর' বলে উল্লিখিত। গানটি বীণাবাদিনী, অগ্রহায়ণ ১৩০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত "পরিহাসের গান ('গঞ্জনা ও উপদেশ')" শীর্ষক নিম্ন-উদ্‌ধৃত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত গানটিকে অনিবার্যভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়—

তোমরা যা হোক ভ্যালা।
নূতন নূতন কতই যতন — পরে পুরাতনে হ্যালা!
প্রথম প্রথম 'হৃদয়-রতন' — শেষে—ইঁট-পাটকেল্ ঢ্যালা!
নূতন প্রেমে ভাবের ঘটা — আগাগোড়া বাক্যছটা
এখন—বোঝা গেছে ভাবখানাটা — শুধু হৃদয় নিয়ে খ্যালা!
পেরিয়েছে যার তিনটে বিশ — সেও মিসি দেখলেও অনিমিষ
ধোড়া হলেও থোড়া বিষ — মোদ্দা কেউ যাও না ফ্যালা
তোমরা কেউ যাও না ফ্যালা।
আমরা রাঁধব তোমরা খাবে — নিজের সুখটি বোঝ আগে
চুনটি খসলে দারুণ রাগে — কথা শোনাও ম্যালা
তোমরা কথা শোনাও ম্যালা !
যখন যেটা হচ্ছে সাধ — কিনব বেচব নাহিক বাধ
বেজায় খরচ অপরাধ — শুধু আমাদেরই ব্যালা
শুধু আমাদেরই ব্যালা!
কিন্তু একি বিধির কল — তোমরা নৈলে আমরা বিকল
প্রাণে প্রাণে বাঁধা শিকল — ওরে সাধ্য কি তায় ঠ্যালা!
তোমরা ঘোড়া আমরা গাড়ি — আমরা মাঝি তোমরা দাঁড়ি
উভয় মিললে তবেই পাড়ি — নৈলে যায় না চলা
ভবে নৈলে যায় না চলা।
কাজ কি তবে আর বিবাদে — মুক্‌খু বলি কি তোদের সাধে
যার জালে মাছ যেমনি বাধে — জুড়া তাতেই মনের জ্বালা
জুড়া তাতেই মনের জ্বালা ॥

রবীন্দ্রনাথের গানটি এর পাশাপাশি তুলে দিচ্ছি—

ওগো, তোমরা সবাই ভালো—
যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে — ওগো সেই আমাদের ভালো—
আমাদের এই আঁধার ঘরে — সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো ॥

কেউ-বা অতি জ্বলোজ্বলো, — কেউ-বা ম্লান ছলো-ছলো,
কেউ-বা কিছু দহন করে, — কেউ-বা স্নিগ্ধ আলো ॥

নতুন প্রেমে নূতন বধূ
আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর
একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে
চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে
সমান ভাগে ঢালো ॥

আমরা তৃষ্ণা, তোমরা সুধা—
তোমরা তৃপ্তি, আমরা ক্ষুধা—
তোমার কথা বলতে কবির
কথা ফুরালো।
যে মূর্তি নয়নে জাগে
সবই আমার ভালো লাগে—
কেউ বা দিব্যি গৌরবরণ,
কেউ বা দিব্যি কালো ॥

নারী-পুরুষের তুলনাত্মক বিচার প্রথম গানটির বিষয়, আর দ্বিতীয় গানটি কেবল নারী স্তুতি। সাদৃশ্য শুধু কথায় নয়, সুরেও। প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত গানের সুরের অংশ দেখাচ্ছি—

॥ ॥ গা -া মা | গমা -পা -া | ধা পা -মা | মপা মগা -া |
তো - ম্ রা - - যা হো ক্ ভ্যা লা -

গা গর্সা -া | র্সা র্সা -া | র্সা না -র্রা | র্সা র্সা -র্সনা |
নূ ত ন্ নূ ত ন্ ক ত ই য ত ন্

-া -া ননা | না র্সা -া | র্সা র্সা -না | ধনা পা -া |
পরে পু রা - ত নে - হে লা -

পর্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া | র্সা না -র্রা | র্সা র্সা -র্সনা |
প্র থ ম্ প্র থ ম্ হৃ দ য়্ র ত ন্

-া -া ননা | র্সা -া র্সা | -া র্সা -না | ধনা পা মগা ॥ ॥
শেষে ইঁ ট্, পা ট্ কে ল্ ঢ্যা লা -

(বীণাবাদিনী, অগ্রহায়ণ ১৩০৪)

পঞ্চম খণ্ড স্বরবিতান (১৩৮৫ সংস্করণ) থেকে রবীন্দ্রনাথের গানটির প্রথম দুটি চরণের স্বরলিপি—

মা গা- মা
ও গো ০

II রা -া -গা | মা -পা -া I (-া -া পা | -না ধা পা I
তো ০ ম্ রা ০ ০ ০ ০ স ০ বা ই

I মা পা মগা | -া গা গা)} I পা -র্সা র্সা | র্সা -া র্সা I
ভা ০ লো০ ০ ও গো যা র্ অ দৃ ষ্ টে

I না -া র্রা | র্সা র্সা -র্রা I র্সনা -া -া | -া না না I
যে ম্ নি জু টে ০ ছে ০ ০ ০ ও গো

I না -র্সা র্সা | র্সা র্সা -না I ধনা -া ধপা | (-া না না) I
সে ই আ মা দে র্ ভা০ ০ লো ০ ও গো

মনে হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানটিই প্রথম-রচিত, রবীন্দ্রনাথ তাঁরই কথা ও সুর গ্রহণ করে আপন স্বভাবানুকূল শিল্পসম্মিতি দিয়ে একটি শোভনরম্য গানে পরিণত করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনায়, কথা ও সুরে একটি অমার্জিত গ্রাম্যতা সচেতনভাবে রক্ষিত, বাউল সুরের বাউল গানের তথাকথিত মৌলিকতার স্মারকহিসাবেই। কিন্তু তারপর সে-সুর তো রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেরণাই, তাই তা যৌগিক হয়ে রাসায়নিক প্রতিভাযোগে আপন মাধুর্যে অনুবিম্বিত হয়ে গেছে। তৃতীয় স্তবকে রবীন্দ্রনাথের গানটিতে একটি সঞ্চারীও আছে, যেন মূল সুরের অপরিহার্য প্রভাব সচেতনভাবে অস্বীকার করার তাগিদেই বৈচিত্র্যসৃষ্টি, এবং তারপরই আবার মূল সুরে প্রত্যবর্তন ঘটেছে।

তুলনামূলক আলোচনা আপাতত বিস্তার্য নয়। কিন্তু এ থেকেই বোঝা যাবে, ১২৯৯ সালে তথাকথিত বাউল সুর কেমন করে রবীন্দ্রনাথের গানের ভেলায় যাত্রী হয়ে বসেছে। 'খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে' গানটিতে বাউল গানের একটি মধুর-বিষণ্ণ ভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে যা রবীন্দ্রনাথের আর কোনো গানে পরবর্তীকালে আমরা পাই না।[৯] 'হৃদয়ের একূল ওকূল' গানটির সুরও বাউল নামে পরিচিত, তবে শান্তিদেব দেখিয়েছেন যে, এই সুরের বনিয়াদ হল বাংলার নিজস্ব বিভাসের স্বরবিন্যাস-প্রণালী যা অসংখ্য লৌকিক গানে বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। দীন বাউলের (গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) 'বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে শ্মশানঘাটে যাচ্ছ চলে' গানটি কিংবা কাঙাল ফিকিরচাঁদ বা হরিনাথের 'বসায়ে সখের মেলা রসের খেলা' গানটি যাঁরা শুনলেই এই সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। এই

বিভাস-রূপের ও লৌকিক ভঙ্গির এবং বাউল-নামে পরিচিত গানের তালিকা রবীন্দ্র-সংগীতানুরাগীদের জানা আছে। এই ধরনের বহু গানে আবার আশ্চর্য নৈপুণ্যে একদিকে সারি গানের ভঙ্গি ও অন্যদিকে কীর্তনের ভঙ্গিকে কবি মিশিয়ে দিয়েছেন। 'বঁধূ তোমায় করব রাজা তরুতলে', 'ওলো সই ওলো সই', 'আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়', 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', 'এই যে তোমার প্রেম ওগো' প্রভৃতি গানগুলি এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেকগুলি গানের উল্লেখ আবার পরে অন্য প্রসঙ্গেও পুনরাবৃত্ত হবে।

এইবার 'তবু মনে রেখো' গানটির বিষয়। ১২৯৯ সালের চৈত্র সংখ্যা ভারতীতে এর স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। মূল কবিতা ১২৯৪ অগ্রহায়ণে রচিত, মানসীর অন্তর্ভুক্ত। প্রভাতকুমারের মতে, "১২৯৭ পৌষ 'তবু' কবিতাটি ভাঙিয়া গানটি রচিত" (গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী)। তাল ছাড়া কীর্তনের যে বিশিষ্ট ভঙ্গি এই গানে প্রকাশিত হয়েছে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি গানে তা শুনতে পাই, যেমন 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' (১৩১৮ আষাঢ়, রাজা) 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ' (১৩১৭ পৌষ, অচলায়তন)। এই তিনটি গানের সুরের মধ্যেই একটি লক্ষ্যগোচর ঐক্যসূত্র আছে এবং মনে হয় কবি তার প্রেরণা পেয়েছিলেন লালনের একটি গান থেকে। শিলাইদহ অঞ্চলে থাকাকালে লালনশাহি সুরের দ্বারা তিনি যে ভালোভাবেই প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণও যথাসময়ে দৃষ্টিগোচর হবে। লালনের দুটি বিখ্যাত গানের স্বরলিপি পাওয়া যায় বীণাবাদিনী ২য় ভাগ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যায়, স্বরলিপিকার ইন্দিরা দেবী। প্রথম গানটি 'কথা কয় কাছে দেখা যায় না।' দ্বিতীয় গানটি 'ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ'। প্রথম গানের সুরের ভঙ্গি ঢপকীর্তন-ঘেঁষা। আর সেই সুরের সঙ্গে মিল আছে 'হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে' গানের। পরবর্তীকালে লালনের জনপ্রিয়তা বাড়লেও তাঁর গানের বিশুদ্ধতা হারিয়ে গেছে— বিকৃত হতে হতে লালনের নিজস্ব সুরের রূপটি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইন্দিরা দেবীর স্বরলিপি-নিবদ্ধ গান দুটি লালনের সুরের প্রাচীনতম, সঠিক, অবিকৃত ও যথাযথ নিদর্শনরূপে অসাধারণ ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মূল্যের অধিকারী। বিশেষ করে 'ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ' গানটি পুনরুদ্ধার করার ফলে আমরা জানতে পারছি, এই অসাধারণ অভিনব কীর্তন-ভাঙা সুরটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষভাবে পরিচিত ও প্রিয় ছিল। এই গানের সুরের আদলেই তিনি 'তবু মনে রেখো' জাতীয় রচনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে থাকবেন। এই সুরের তালনিবদ্ধ ভঙ্গি 'হরি তোমায় ডাকি সংসারে একাকী', 'সখী বয়ে গেল বেলা শুধু হাসিখেলা' (অগ্রহায়ণ ১২৯৫, মায়ার খেলা) 'ভালোবেসে সখী নিভৃত যতনে' (আশ্বিন ১৩০৪) প্রভৃতি গানে যেমন দেখা যায়, তেমনি তালছাড়া ভঙ্গিটি পূর্বকথিত 'তবু মনে রেখো' এবং পরবর্তীকালে আচলায়তন ও রাজা নাটকের গান দুটিতে আমরা সুস্পষ্টভাবে খুঁজে পাই।

'ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ' গানটির অংশ বিশেষের স্বরলিপি এখানে উদ্‌ধৃত হল—

II II সা গা রা | -গমা -পা -ধপা | -মপমা -গা -া | -া গা গা |
ক্ষ ম, অ প - -- --- রা - ধ্, ও হে

গা গা গমা | -পা -া -ধপা | মপা -মগা রা | -া -া -া |
দী ন না - - - - - - - - - - - - থ্

রা রগা মমা | রগরা সা -া | ন্সা ন্সরা রা | -া -া -া
কে শে ধ রে - - আ — মা - - য়

গপা পা -া | -া -া ধপা | মগা রা -া | -গমগা -রগরা -সন্া ॥ ॥
লা গা - - ও কি না রে - --- --- --

-া {গগা | মা পা ধনা | পধা পা -া | পা ধা পা | মা গা} -মগা |
তুমি হে লায়্ যা ক র - তাই ক র্তে পা র --

রগা -া মা | পা পধা পা | মগা রা গমা | গা রা -গরা ॥ ॥
তোমা - বি নে, পা পী তা রণ কে ক রে - -

-া {-া | গা গা পা | -া পা ধা | ধা র্সা নর্সর্রা | র্সনা র্সা র্সনধা |
শুন তে পা ই প রম পি তে গো তু মি তোমার্

ধা ধা নর্সা | র্সা -া -র্সনা | ধা ধা নর্সা | নধা পা} গমা |
অ তি অ বো - ধ বা লক যে আ মি যদি

পা পা না | র্সা -া -র্সনা | ধা ধা নর্সা | নধা পা মগা |
ভ জন ভু লে - -- কু প থে ভ্র মি তবে

মা পা পা | পা ধা পধপা | মগা -রা -গমা | গা রা -গরসন্া |
দাও না কে নে, সু পথ স্ম র ণ ক রে ----

কথার প্রসঙ্গেও 'হরি তোমায় ডাকি' গানটির কথা অনিবার্যভাবে মনে আসে। প্রথমে লালনের গানটির একটি স্তবক—

হেথায় তরঙ্গে আতঙ্গে মরি
কোথায় হে অপারের কাণ্ডারী
ফকির লালন বলে তরাও তো তরি
নইলে দয়াল নামে দোষ রবে সংসারে।[১০]

'হরি তোমায় ডাকি' গানটির অংশ বিশেষ—

হরি তোমায় ডাকি, সংসারে একাকী
আঁধার অরণ্যে ধাই হে,
গহন তিমিরে নয়নের নীরে
পথ খুঁজে নাহি পাই হে।...
নয়নের জল হবে না বিফল
তোমায় সবে বলে ভকতবৎসল
সেই আশা মনে করেছি সম্বল
বেঁচে আছি শুধু তাই হে...

৩

মূলত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে বাংলার গ্রাম্যগীত-লোকগীতের সুর বা বাক্‌সম্পদকে কবি তাঁর সাংগীতিক সৃষ্টির উপাদান বা প্রেরণারূপে গভীরভাবে গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ খুব একটা নেই। অবশ্য তাঁর সমকালীন ও অগ্রজ একাধিক কবিগীতিকার সাধারণ বৈরাগ্য-সংগীতে ও ব্রহ্মচেতনামূলক সংগীতে বাউল জাতীয় গানের সুর প্রয়োগ করতে শুরু করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগেই কবি স্বদেশপ্রেম প্রকাশের প্রয়োজনে লোকসংগীতের অপরিসীম ক্ষমতা ও উদ্দীপনা অনুভব করলেন। ইতিপূর্বে স্বদেশচেতনা জাগাবার কাজেও বাউল সুরকে লাগানো হয়েছিল। হিন্দুমেলায় মনোমোহন বসুর বাউল সুরে রচিত :

কোথা মা ভিকটোরিয়া দেখ আসিয়া
ইণ্ডিয়া তোর চলছে কেমন
ছিল মা সুখের রাজ্য ধরা পূজ্য
আর্যধাম এই ভারত ভুবন।—

গানটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দশকে। কিন্তু স্বদেশী গান রচনার ঘটনাগত তীব্র প্রেরণা সমাজে তখনো জাগেনি বলেই সম্ভবত দেশাত্মদীপক গানে লোকগীত ব্যবহারের তেমন সুযোগ আসেনি। বঙ্গভঙ্গ সেই সুযোগ কবির কাছে প্রস্তুত করল। ১৩২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"সে-সব সভা গেছে, তাই সংগীতের সেই যত্ন আদর হৃষ্টপুষ্টতা গেছে। কিন্তু গ্রাম্য সংগীত বাউলের গান এ সবের মার নাই। কেন না, ইহারা যে-রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে। আসল কথা প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড় শিল্পও টিকিতে পারে না।"[১১]

আরো পরবর্তীকালে, ১৩৪২ সালে, জনশিক্ষার ক্ষেত্রে লোকগীতের ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে কবি একটি বক্তৃতায় বলেন,

"জনসংগীতের প্রবাহ সেও ছিল বহুশাখায়িত। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যেমন ছোট-বড় নদীনালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি বয়েছিল গানের স্রোত নানা ধারায়। বাঙালির হৃদয়ে সে রসের দৌত্য করেছে নানা রূপ ধরে। যাত্রা পাঁচালি কথকতা কবির গান কীর্তন মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে। লোকসংগীতের এত বৈচিত্র্য আর কোনো দেশে আছে কিনা জানি না।"[১২]

এই দুটি উদ্‌ধৃতিতে প্রতিফলিত মনোভাব, ধরে নেওয়া যায়, তাঁর যৌবনকাল থেকেই বুদ্ধি ও হৃদয়ের যোগে বিশ্বাসের ভূমিতে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। যাত্রা-পাঁচালি-কথকতা কবিগান-কীর্তন-বাউল এ সমস্ত কিছুকেই তিনি লোকসংগীত বলে মনে করতেন। সারি-ভাটিয়ালির পার্থক্যও তাঁকে খুব একটা বিব্রত করেনি কোনোদিন। সুতরাং সেই লোক-সংগীতকে তিনি দেশপ্রেমাত্মক সংগীতসৃষ্টিতে ব্যবহার্য করতে চাইলেন 'বাঙালির হৃদয়ে রসের দৌত্য' করার অভিপ্রায়ে, শিল্পকে প্রাণের সঙ্গে যুক্ত করার দাবিতে। তখন তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়পাত্রে, *repertoire*-এ, জমে উঠেছিল মুখ্যত এক ধরনের বাউল গানের ও কীর্তন-ভাঙা ঢপকীর্তন, মনোহরশাহি কীর্তন, পালা-কীর্তন, পাঁচালি-কীর্তন ও যাত্রাপালার সুরসম্পদ। তাই দিয়েই তিনি দেশাত্মবোধক গানের এক নিপুণ শিল্প গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। অচিরেই তাঁর বিশ্বাস সত্যে পরিণত হল, বাউল-ভঙ্গিম দেশপ্রেমারক্ত গানগুলি দ্রুত কণ্ঠে কণ্ঠে তরঙ্গায়িত হল, শহরের সর্বশ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট করল, নাগরিক চেতনাকে অভিভূত করল, বাঙালি বুদ্ধিজীবীর স্বদেশচৈতন্যের ভিত্তি ধরে নাড়া দিল। সেইসঙ্গে কবির স্বদেশপ্রেমের, কবির দেশচেতনার তথা রাজনৈতিক ধ্যানধারণার একটি চরিত্রও স্বতন্ত্রভাবে ফুটে উঠতে লাগল এই গানগুলি রচনার ভিতর দিয়ে। তিনি যেন বোধিতে অনুভব করলেন, চিন্ময় দেশকে ভালবাসতে হয় বাউলের মতো নিঃস্বার্থ নিরাসক্ত আবেগ দিয়ে, স্বদেশের পথের ধুলোয় ধূসর হয়ে—বৈরাগ্য ও মুক্তির সূত্রেই আসক্তি সত্য হয়ে ওঠে। বুঝলেন, তাঁর দেশচেতনা সাম্প্রদায়িক নয়, গোষ্ঠীনির্ভর নয়, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম নয়, তা প্রবল একক ব্যক্তিত্বে অনুপ্রাণিত, আত্মশক্তিতে বলীয়ান। তাঁর অভীপ্সিত স্বদেশপ্রেমিক তিনিই, স্বদেশের ধূলিকণা যাঁর উত্তরীয়কে গৈরিক করে, মৃত্তিকার প্রতি মমতা যাঁকে নিঃসঙ্গ পথের পথিক করে। বাউল সুরই তখন তাঁর একমাত্র কণ্ঠসম্পদ হয়।

সম্ভবত এই কারণেই ১৯০৫ সালে প্রকাশিত স্বরচিত স্বদেশী গানের সংকলনের নাম দিয়েছিলেন তিনি 'বাউল', যদিও তার সব কটি গানই বাউলসুরে রচিত ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের এই পর্বে রচিত গানগুলির সুরের এক-নজর পরিচয় নেওয়া যেতে পারে—

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে। মূল গান 'মন মাঝি সামাল সামাল'। 'বাউল' বলে 'শতগানে' উল্লিখিত, যদিচ এতে দেশী বিভাসের ছোঁওয়া রয়েছে, আবার পূর্ব-বাংলার সারি গানের প্রভাবও আছে।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। মূল গান 'হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে একলা নিতাই'। 'শতগানে' এটিও 'বাউল' বলে উল্লিখিত। কিন্তু সুরটি আসলে ঢপ কীর্তন। লালনের পূর্ব উল্লিখিত 'কথা কয় কাছে দেখা যায় না' গানের সুরের সঙ্গে গভীর মিল।

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে। কোনো মূল গানের সন্ধান পাওয়া যায়নি, সুতরাং এটি মৌলিক গান। সঙ্গীত প্রকাশিকা বৈশাখ ১৩১৩ সংখ্যায় এর স্বরলিপিতে ইন্দিরা দেবী বলেছেন মিশ্র বিভাস।

মা কি তুই পরের দ্বারে এবং ছি ছি চোখের জলে। দুটি গান এক জাতীয় সুরে রচিত। এই সুরের সঙ্গে পূর্ববর্তী 'ওগো তোমরা সবাই ভালো' এই কীর্তনাঙ্গ সুরের এবং 'দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ' বা 'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে' গানগুলির আত্মিক সারূপ্য আছে।

তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে। মূল গান নেই। ভূপালি-বিভাস-সারি মিলিত সুরের আভাস দেয়, কোনোটিকেই নির্দিষ্ট করে না।

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক। মূল গান গগন হরকরা রচিত 'ও মন অসার মায়ায় ভুলে রবে কতকাল এমনি ভাবে'। মূল গানের দ্বিতীয় চরণ কবির গানে প্রথম চরণ এবং মূল গানের প্রথম চরণ কবির গানে দ্বিতীয় চরণের সুররচনা করেছে। সুরগুলি কীর্তনভাঙা বাউল নামে প্রচলিত।

যে তোরে পাগল বলে। ইন্দিরা দেবী 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগমে' উল্লেখ করেননি। কিন্তু আলোচ্য গানটির মূল গান 'আমার এই দেহতরী কি দিয়ে বানালে গুরুধন'। মূল গানটি 'শতগান'-এ সরলা দেবী স্বরলিপিবদ্ধ করেছেন। বিষয়ের দিক দিয়ে গুরুবাদী দেহতত্ত্বাশ্রিত বাউল গান হলেও এর সুর সম্ভবত ভাওয়াইয়া। চতুর্মাত্রিক ছন্দকে কেবল ত্রিমাত্রিকে রূপান্তরিত করেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথ ভাওয়াইয়া সুরের দ্বারা প্রভাবিত হননি, আলোচ্য গানটি এই ভ্রান্তধারণার নিরসন ঘটাতে পারে :

ওরে তোরা নাই বা কথা বললি। মূল গান নেই। কীর্তনাঙ্গ সুর।

যদি তোর ভাবনা থাকে এবং ও জোনাকি কী সুখে ওই। দুটিই মৌলিক গান, দেশী বিভাস ও ছায়ানটের সুরে। ইতিপূর্বে রচিত 'আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ' এবং 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' গানগুলির ঢঙে প্রথম গানটি রচিত।

আপনি অবশ হলি এবং আমরা পথে পথে যাব সারে সারে। মূল গান নেই, কবির নিজস্ব সৃষ্টি। বাউল ভঙ্গির সঙ্গে টোড়ি কালেংড়া ইত্যাদি রাগমিশ্রণে শ্রবণরম্যতার সৃষ্টি।

বাংলার মাটি বাংলার জল। ইতিপূর্বে 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' (১২৯২) গানে যে ঝিঁঝিট-কীর্তনের ঢঙ ব্যবহৃত হয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি। এটিও মূলত ঢপ কীর্তন।

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি। মৌলিক সুরসৃষ্টি, দেশী সুরের প্রভাব আছে আড় ছন্দ ব্যবহারে, কিন্তু তথাকথিত বাউল গানের ভঙ্গি নেই। খাম্বাজ রাগের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

আমাদের যাত্রা হল শুরু। বাউল ঢঙের গান নয়, ভৈরবী সুরে গাঁথা, কবির মৌলিক সৃষ্টি।

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে। মূল গান নেই, সুরে একাধিক বাউল ঢঙের মিশ্রণ আছে।

ওরে ভাই মিথ্যা ভেবো না। মূল গান নেই, বাউল ঢঙেরও গান নয়। সিন্ধু-ভৈরবীর সুরে রচিত।

সার্থক জনম আমার। ভৈরবীতে তালছাড়া ভঙ্গিতে নিবদ্ধ মৌলিক গান।

আমার সোনার বাংলা। মূল গান গগন হরকরা রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে'। মূল গানে বাউল গানের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গির চেহারা ফুটে উঠেছে স ণ্ ধ্ এই descending notes-এ।

ও আমার দেশের মাটি। মূল গান 'আমার গৌর ক্যানে কেঁদে এল ও নরহরি।' কাফি ঠাটের সাদৃশ্যযুক্ত কীর্তন-বাউলাঙ্গ সুরের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি গানটিতে রক্ষিত। শতগান-এ স্বরলিপি আছে :

নিশিদিন ভরসা রাখিস। মূল গান নেই। বিভাস-আশ্রিত।
বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি। মূল গান নেই, বেহাগ-আশ্রিত।
আমি ভয় করব না ভয় করব না। মূল গান নেই। মিশ্র ভূপালি-আশ্রিত।
এখন আর দেরি নয় ধর গো তোরা। মূল গান নেই। মিশ্র ইমন-আশ্রিত।

১৯০৫ সালের পর থেকেই ক্রমশ বাউল সুরের সোপান বেয়ে তিনি বাউল সাধনার বেদীপীঠে সন্তর্পণে এসে পৌঁছেছেন। খেয়া-র 'কৃপণ' কবিতায় বাউলের মাধুকরী বৃত্তির উল্লেখ, 'আমার নাই বা হল পারে যাওয়া' গানে বাউলের আত্মসন্তুষ্টি অভিমান, 'সীমা' কবিতায় আপন মনের নিবিষ্ট একতারায় হৃদয়াধিরাজের নামটি নির্দ্বিধায় বাজানোর অনুষঙ্গ প্রমাণ করে বাউলাদর্শের ক্রমশ সমীপবর্তী হয়ে উঠতে শুরু করেছেন কবি। দেশতান্ত্রিক আন্দোলনের থেকে সরে এলেও সদ্যোপরিচিত বাউল সংগীতকে আর ছাড়লেন না, তাকে ধনঞ্জয় বৈরাগী নামে চিহ্নিত করে, নতুন এক স্বোপলব্ধ রাজনৈতিক চেতনার ইচ্ছা-মন্ত্রে দীক্ষিত করে, প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬) নাটকের গণমঞ্চে পাঠিয়ে দিলেন তাকে। তারপর থেকে গীতাঞ্জলির যুগ বেষ্টন করে, শারদোৎসব (১৩১৫), রাজা (১৩১৭) ও অচলায়তনে (১৩১৮) ঢল নামল বাউলাঙ্গ-কীর্তনাঙ্গ গানের। ধনঞ্জয়ের একতারায় উঠল ঘনঘন ঝংকার, গান বাজল 'বাঁচাও বাঁচি মারেন মরি', 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়', 'রইল বলে রাখলে কারে', 'ওরে আগুন আমার ভাই', 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ', 'আমি ফিরব নারে ফিরব না আর', এই সব। পরবর্তী নাটকগুলিতেও বাউলের গেরুবাস কত চরিত্রের গায়েই যে চাপানো হল, কণ্ঠে কত বাউল গান নিঃসৃত হল। সেইসব সুরে অন্য রাগরাগিণীর আভাসও বেশি করে লাগতে লাগল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যার পরীক্ষা ঘটেছিল কয়েকটি গানে। এখন রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মুদ্রাচিহ্নে সেগুলি হয়ে উঠতে লাগল একান্তই রবীন্দ্রসংগীত। আমরা পেলাম, 'আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়' 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', 'এই তো তোমার প্রেম ওগো', 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ', যেথায় তোমার লুঠ হতেছে', 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে', বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা', 'যা ছিল কালো ধলো', 'এ পথ গেছে কোনখানে গো', কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন', 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা', 'হারে রে রে আমায় ছেড়ে দেরে', ওরে 'ওরে ওরে আমার মন মেতেছে', 'যিনি সকল কাজের কাজী', আমি সে সব নিতে চাই' ইত্যাদি গান। বৈরাগ্যের ঝুলিতে বাড়তে লাগল আসক্তির খুদকুঁড়ো। প্রেমে-প্রাণে-গানে-গন্ধে আলোকে-পুলকে সর্বত্রই এই লোকায়ত বাউল জাতীয় গানের সুর অনায়াস পারংগমতায় প্রকাশ করতে পারলেন কবি। রৌদ্রপায়ী শরতের ছুটির আনন্দনৃত্যে, বসন্তের রিক্ততায়, শ্রমের ঐকছন্দে, কৈশোরের চঞ্চল বহির্মুখিতায়, প্রাণের মানুষের নিভৃত পথসন্ধানে একই সুর ভিন্ন ভিন্ন রসের রহস্যদ্বার খুলে দিল। পরবর্তী গীতিমাল্য-গীতালির (১৩২১) অজস্র গানও এমনি-ধারা বাউলে-কীর্তনে-রাগে রঙিন হয়ে উঠেছে। মাঝে-মধ্যে তাতে রাগসংগীতের প্রলেপ পড়েছে, গানের বাণীতে লেগেছে আউল-বাউল ব্রাত্য-বৈরাগী লোকসাধকদের অশাস্ত্রীয় সংস্কারমুক্ত সহজ জীবনাচারের স্পন্দন। উদাহরণ আছে 'জানি

নাই গো সাধন তোমার বলে কারে', 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে', 'ও নিঠুর আরো কি বাণ আছে তোমার তূণে', 'এই কথাটা ধরে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে', 'সহজ হবি সহজ হবি' প্রভৃতি গানে। ১৩২১ সালে কবি লিখলেন ফাল্গুনী নাটক। নিজে পরলেন অন্ধ বাউলের সাজ, আঁকা হল অবনীন্দ্রনাথের সেই অবিস্মরণীয় রবি-বাউলের ছবি। নাটকে বাউল দলের ভূমিকা আরও গুরুত্ব পেল, যদিও তাদের সব সুর বাউল গানের সুরের মতো হয়ত হয়নি। ফাল্গুনী-র বাউলসম্মত গানগুলি হল, 'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে-কাজ', 'আমাদের পাকবে না চুল', 'আমাদের ভয় কাহারে', আমাদের খেপিয়ে বেড়ায়', 'সবাই যারে সব দিতেছে' প্রভৃতি। এই শেষ গানটির সুর শারদোৎসবের শরতে আজ কোন অতিথি' গানটিকে মনে করায় এবং দুটি সুরের সঙ্গেই লোকসংগীতের একটি সুপরিচিত প্রভাতী সুরের আভাস মেলে।

৪

১৩২২ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গ সুরসৃষ্টির ধারা স্তিমিত হয়েছে, কিন্তু একেবারে রুদ্ধ হয়নি। এই বছরই প্রবাসীতে 'হারামণি' বিভাগের প্রবর্তন-কৃতিত্ব তাঁরই এবং তাঁর সংগৃহীত লোকগীতিই সর্বাগ্রে প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে বাউলতাত্ত্বিক ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে কবির ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের মধ্যবর্তিতায় এই লোকায়ত সাধনার রাজধানীতে তিনি নিত্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলেছেন। এই বছরই আমরা অন্তত তিনটি স্মরণীয় গান পাচ্ছি—'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন', 'তুমি কোন পথে যে এলে পথিক', এবং 'এই তো ভালো লেগেছিল'। এইগুলি সবই রবীন্দ্রসংগীতের স্বকীয়তায় চিহ্নিত, কিন্তু বাউল-কীর্তনের সেই প্রচ্ছন্ন-ভঙ্গি চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। এখন থেকে ঋতুসংগীতে প্রেমসংগীতে ও গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যে, বর্ষামঙ্গল-বসন্তোৎসব-শারদোৎসবের বাঁশরি-সংগীতে একতারার ঝংকার ক্ষণে ক্ষণেই শোনা যায়। ১৩২৫ থেকে ১৩২৮-এর মধ্যে রচিত উল্লেখ করার মতো গান 'আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে', 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান', 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই', 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে', 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে', 'চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো', 'মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে', 'এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে', 'আমার দোসর যে জন ওগো তারে', 'তোমরা যা বলো তাই বলো', 'ও তো আর ফিরবে না রে', 'শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে', 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব', 'তোর শিকল আমায় বিকল করবে না'। শেষের গানগুলি অল্প সময়ের ব্যবধানে রচিত, মুক্তধারা (১৩২৯) নাটকের জন্য। আবার ধনঞ্জয় বৈরাগীর সাক্ষাৎ পেয়ে রবি-বাউল যেন সাময়িকভাবে তাঁর বাউল-ব্যাকুল গীতধারাকে ফিরে পেলেন। এই ১৩২৮ সালেই কবি রচনা করেন শিশু ভোলানাথ-এর সেই বিখ্যাত বাউল কবিতা। ১৩২৮-২৯ সালের তালিকায় পাচ্ছি, 'তোমার সুরের ধারা', 'যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে', 'হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর', 'একলা বসে একে একে', মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা' 'সেকি ভাবে গোপন রবে', 'এ বেলা ডাক পড়েছে কোনখানে' ইত্যাদি বাউল-কীর্তনাশ্রিত গান। এই ১৩২৯ সালের এক বর্ষণব্যথিত আষাঢ়ে (৩২ আষাঢ়) আত্রাই নদীর বুকে কবি লিখলেন স্মরণীয় বাউল সুরের গান 'আমি কান পেতে রই।[১৩] লালনের একটি গানে আছে —

এক ফুলে চার রঙ ধরেছে
ও সে ফুলে ভাবনগরে
কী শোভা ধরেছে।
কারণবারির মধ্যে সে ফুল
ভেসে বেড়ায় একূল ওকূল
শ্বেতবরণ এক ভ্রমর ব্যাকুল
সে ফুলের মধুর আশে ঘুরতেছে।[১৪]

দিনমণি-ভণিতাযুক্ত এক লোককবির 'বলো কোন গুরুর করো অন্বেষণ' পদের অন্তিম স্তবকে আছে —

আমার হৃৎপদ্মে নীলপদ্ম আছে
নীলপদ্মেতে বদ্ধ সোনার পদ্ম
ফুটে রয়েছে এমন।[১৫]

সেই গোপন হৃদপদ্মটির সন্ধান কবিও দিয়েছেন আশ্চর্যভাবে তাঁর গানে—
ভ্রমর সেথা হয় বিবাগি
নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে,
কোন রাতের পাখি গায় একাকী
সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে বারে বারে।

১৩৩০ সালে রক্তকরবীর জন্য রচিত হল 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' এবং 'মোর স্বপনতরীর কে নেয়ে' গান দুটি। 'পৌষ তোদের' গানে পূর্বরচিত 'এবার তোর মরা গাঙে', 'আমি মারের সাগর', 'বসন্তে কি শুধু কেবল' প্রভৃতি গানগুলির আভাস যেমন আছে, তেমনি পাই টুসু ব্রতের একটি পরিচিত সুরের আপতিক প্রতিধ্বনি। ১৩২২ সালের বর্ষামঙ্গলে আবার ঢপকীর্তনের প্রিয় সুরটিকে ভেঙে রচনা করলেন 'বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা' গানটি। ১৩৩৬-এ মুক্তধারা ভেঙে পরিত্রাণ লিখতে আবার ধনঞ্জয়ের সাড়া মিলল, তারই অনুরোধে কবি লিখলেন 'তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া', 'আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো', 'তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন'। ১৩৩৯-এর রচনা 'মন রে ওরে মন', 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ'। ১৩৪০ সালে তাসের দেশের জন্য রচিত 'আমার মন বলে চাই চাই'। মৃত্যুর এক বছর আগে পেলাম 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে' এবং 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা' গান দুটি।

এ তালিকা সম্পূর্ণ নয়, নিঃসংশয়ও নয়। কিন্তু বাউলভঙ্গির গানের ধারাবাহিকতা লক্ষ করার জন্য এই প্রাথমিক তালিকাই যথেষ্ট।[১৬]

৫

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গানে লোকসংগীতের প্রভাব নিরূপণ করতে গেলে তা শেষ পর্যন্ত বাউল নামে চিহ্নিত বিশেষ এক ধরনের গানের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে

এবং বাউল সুরের সঙ্গে বাউল ধর্মের তত্ত্ব ও সাধনাদর্শের প্রসঙ্গও অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। অথচ বাংলার বাউল ধর্ম ও বাউল সাধনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্ভবত এতখানি গভীর ছিল না যার দ্বারা তিনি এই লোকায়ত ধর্মের মর্মমূলে উপনীত হতে পেরেছিলেন বলা যায়।[১৭] পরিণত বয়সে এই লোকধর্মের যে আলোচনা তিনি করেছিলেন,[১৮] তা এই সাধনার সামগ্রিকতার বিচারে নয়, বিচ্ছিন্ন কিছু উক্তির সাহায্যে এবং দর্শনের কিছু সার্বভৌম সূত্রের ভিত্তিতে। প্রথম জীবনে মুদ্রিত গ্রন্থের মাধ্যমেই সম্ভবত বাউল গানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল, এর মধ্যে মানবহৃদয়ের গভীর চিরন্তন কোনো বাণী তাঁকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছিল।[১৯]

যৌবনে শিলাইদহ-কুষ্টিয়ায় বাউল দলের সঙ্গে তাঁর যত গভীর সম্পর্কই ঘটুক, উক্ত সম্প্রদায়ের এসোটারিক তত্ত্বে তাঁর অধিকার জন্মেছিল বলা যায় না। স্বদেশী যুগে বাউল ঢঙকে স্বদেশী গানে প্রয়োগ করে তিনি একটি শিল্পরীতির আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ক্রমশ তিনি বাউল গান সম্ভবত অপরের সংগ্রহে শুনে শুনে এইটুকু অনুভব করেছিলেন যে, পল্লীবাংলার কবিসাধকদের অশিক্ষিতপটু রচনায় গভীর তত্ত্বকথা আছে, ধর্মের অন্তর্নিহিত সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে নিবিড় উপলব্ধিজাত প্রকাশ আছে, আছে পরম সত্যের চকিত কাব্যবাণী।[২০] কবি তত্ত্বের গভীরে খুব একটা প্রবেশ করেননি কোনোদিন, তবে গ্রামীণ বাউল-বৈরাগীদের ধর্মচেতনার কিছু অংশের সঙ্গে আপন ধর্মবোধের সহমর্মিতা অনুভব করেছিলেন। লোকধর্মের এই বিশিষ্ট শাখাটির শাস্ত্রবিরোধিতা, সহজ ঈশ্বর-উপলব্ধি, আত্মদর্শন, পরমাত্মা ও পরমার্থকে 'মনের মানুষ' বলে সম্বোধন, এবং আপন চিৎস্বরূপের মধ্যেই পরমাত্মার উপলব্ধি, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা, এইগুলি কবিকে বিস্মিত করেছিল। সহকর্মী ও পণ্ডিতদের কাছে এই ধর্মশাখার তত্ত্বকথা শুনে তাঁর পূর্বলব্ধ সংস্কার দৃঢ়তর হয়েছিল। বাউলদের আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, উলটা সাধনা, যোগতত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব, কায়সাধন-রহস্য প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ ছিল না। আসলে বাউলদের মিস্টিক তত্ত্ব, বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্ব ও উপনিষদ তাঁর কবিচেতনায় একটি সহজ সমন্বয় লাভ করেছিল। এই সহজ সমন্বয়ের ফলেই বাউল-কীর্তন ও রাগরাগিণী তাঁর গানে একটি রাসায়নিক যোগে একাকার হয়ে রবীন্দ্রসংগীত হয়ে উঠেছিল।

৬

বাংলার লোকগীতের বিশেষ আঞ্চলিক রীতিপদ্ধতি কবিকে কোনদিনই বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেনি, কিন্তু সেগুলির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলেন তিনি। আগেই বলেছি, পূর্ব বাংলার সারি-ভাটিয়ালি বা উত্তর বাংলার ভাওয়াইয়া-চটকা বা পশ্চিমবঙ্গের ঝুমুর তিনি যথেষ্ট শুনেছেন, কিন্তু এ সবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হননি কখনো। গম্ভীরা-টুসু জাতীয় গানের প্রভাবও সেইভাবে তাঁর গানে পাওয়া যায় না। তবে পশ্চিমবঙ্গের তরজা জাতীয় গানের বিশেষ একটি সুরভঙ্গি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তরজা গানের সুর রবীন্দ্রসংগীতে আছে, এ কথা ইতিপূর্বে কোনো রবীন্দ্রসংগীত-বিশেষজ্ঞ লক্ষ করেননি। শতগান স্বরলিপি গ্রন্থে সরলা দেবী 'বাউল' চিহ্নিত অংশে 'চল লো ধনী বিনোদিনী' গানটির স্বরলিপি নিবদ্ধ করেছেন, সম্ভবত এটি তরজা জাতীয় গানের সুরে রচিত। গানটি শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র প্রমোদকুমার ঠাকুরের সংগৃহীত—তিনিই সম্ভবত তাঁর গৃহে

অনুষ্ঠিত কোনো তরজা গানের আসর থেকে এটি সংগ্রহ করে স্বরলিপি-নিবদ্ধ করে রাখেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে পাঠান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই স্বরলিপি *বীণাবাদিনী* পত্রিকার ভাদ্র ১৩০৪ সংখ্যায় 'চলিত পৌরাণিক সঙ্গীত' শিরোনামে প্রকাশ করেন। গানটির পরিচয় হিসেবে লেখা আছে, রচয়িতা 'অজ্ঞাত', রাগিণী পাহাড়ী জংলা একতালা। সরলা দেবী কেবল 'বাউল' বলেই সেরেছেন। সরলা দেবী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপিতে সামান্য পার্থক্য আছে। জ্যোতিরিন্দ্র-স্বরলিপি ঈষৎ সরলীকৃত, সরলা দেবীর স্বরলিপিতে সুরের অলংকরণ সামান্য বেশি। গানটি এইরূপ—

চল লো ধনী বিনোদিনী আপন মন্দিরে
পথে বসে কাঁদা ভালো নয়।
তুমি রাজার মেয়ে রাজার ঝি
তোমায় লোকে দেখলে বলবে কি গো, চল।
চল চল চল,
এখন, অঙ্গ হবে অচল, চল,
চল চল চল ॥

এই গানের সুর ভারি চমকপ্রদভাবে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি নানা সময়ের নানা মর্জির গানকেই সংক্রামিত করেছে। প্রভাবিত গানগুলির তালিকা এই প্রকার হতে পারে—

ওর মানের এ বাঁধ টুটবে না কি (পূর্বে উল্লিখিত, রচনা সম্ভবত ১২৯৩, সুরারোপ সম্ভবত ১৩১৬, তার পূর্বেও হতে পারে)।
আকাশ হতে খসল তারা (মাঘ ১৩২৬, অরূপরতনে ব্যবহৃত)।
তোমায় গান শোনাব (ফাল্গুন ১৩২৯, রক্তকরবীতে ব্যবহৃত)।
রাঙিয়ে দিয়ে যাও (ফাল্গুন ১৩৩৩, শাপমোচনে ব্যবহৃত)।
নীরবে থাকিস সখী (ভাদ্র ১৩৪৬, শ্যামা নৃত্যনাট্যে ব্যবহৃত)।

এই প্রভাব হয়ত সর্বত্র সচেতন নয়, কিন্তু পাশপাশি শুনলেই বোঝা যায়, বাউল সুরকে যেমন কবি আপন স্বকীয়তার সাঙ্গীকৃত করে নিয়েছিলেন, এই সুরটিও তেমনি অনায়াসে তাঁর নিজস্ব স্বভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, অথচ মূল সুরের আদলটিও স্পষ্টত অনুভব করা যায়। উল্লেখযোগ্য যে, এই তরজা সুরটির উপর ভিত্তি করেই প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নামে জনৈক শিক্ষিত বাউল 'ওহে দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে' গানটি রচনা করেছিলেন।[২১] বর্তমানে গানটিতে 'ওহে' স্থানে 'হরি' শব্দটি প্রযুক্ত হয়ে গেছে।

৭

এইবার রবীন্দ্রনাথের গানে গৃহীত বাউল সুর সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত প্রকাশ করা যেতে পারে। বাউল সুর বলতে কবি আশৈশব যে সুর বা সুরগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, আগেই বলেছি, তাকে ঠিক গ্রাম্য আঞ্চলিক সুর বলা যায় না। স্বয়ং লালন পর্যন্ত ঢপ ও মনোহরশাহি কীর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অন্যান্য বাউল গানেও কীর্তনের সুরগত

প্রভাব পর্যাপ্ত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাউল সুর ও কীর্তন বহুক্ষেত্রে সমার্থক হয়ে উঠেছিল। এই তথাকথিত বাউল সুরের গঠন ও মূল উপাদানগুলি নিয়ে আরও তথ্য সমীক্ষার প্রয়োজন আছে। সাধারণভাবে এইটুকু বলা যায় যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, সম্ভবত সত্তরের দশক থেকেই, একজাতীয় গ্রাম্য সংগীত নদীয়া-বর্ধমান-পাবনা-কুষ্টিয়া অঞ্চলে উদ্‌ভূত অনুশীলিত হয়ে ক্রমশ গ্রামে-গ্রামাঞ্চলে এবং নগর কলকাতায়ও সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। এই গীতরূপের সুরসৃষ্টিগত কাঠামোতে একদিকে মোহনচাঁদি ঢপকীর্তন, মধুকানের সুর ও মনোহরশাহি কীর্তনের গভীর উপাদানগত প্রভাব ছিল, অন্যদিকে লালনশাহি সুরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। হরিনাথ মজুমদারের ফিকিরচাঁদি সুরের বিশেষত্বও একে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করেছিল। অপেক্ষাকৃত পূর্বাঞ্চলে পাগলা কানাই, ভানু শেখ, হাসন রজা ও দীন বাউলের নামেও কয়েকটি সুরের স্ট্রাকচার প্রচলিত হয়েছিল। এই সব উপাদানই নানা কণ্ঠে একত্র হয়ে যৌগিক সংমিশ্রণ লাভ করে এক প্রকার ভঙ্গিপ্রধান বাউল গানের কাঠামো তৈরি করেছিল, যা রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়স থেকেই জানা ছিল। বেশ কিছু সাক্ষর বা শিক্ষিত কবিই তথাকথিত পপুলার বাউলের এই স্ট্রাকচার গড়ে তুলেছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সারল্য সৌন্দর্য গভীরতার আবেদন শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই স্পর্শ করেছিল। বেশ কিছু তথাকথিত বাউল গান জনপ্রিয়তায় খাঁটি গ্রাম্য-সংগীত বনে গিয়েছিল। যেমন, শিক্ষিত শহুরে বাউলের 'দিন তো গেল সন্ধ্যা হল' গানটি গ্রামের অশিক্ষিত বৈরাগী ভিখারির কণ্ঠেও সম্প্রচারিত হয়েছিল। সিলেটের শেখ ভানু-রচিত 'নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভোমরা' শচীনদেবের রেকর্ড-মাধ্যমে শহরের শিক্ষিত মনকেও উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল।

এই জাতীয় বাউল গানে রাগরাগিণীরও স্পর্শ ছিল। ফিকিরচাঁদি বাউলের সুরে রাগ-রাগিণীর সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যেত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে। অথচ সেই সুরগুলো স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণী ও রাগিণীর আভাস পাই, কিন্তু ধরিতে পারা যায় না। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে, রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক, সে কিসের কেয়ার করে? এই সুরগুলিকে কোনো রাগকৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না—স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয়।"[২২]

এইজন্যই আনন্দসঙ্গীত পত্রিকায় 'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে' গানের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপির ঊর্ধ্বে লেখা আছে ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, 'বাঙ্গালীর গানে' 'বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের' গানের শীর্ষে লেখা তিলককামোদ। কবিও এইভাবেই বাউল গানের কাঠামোর সঙ্গে অন্যান্য রাগরাগিণীর অনায়াস মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এই কারণেই বুঝতে পারি কবির এই স্বীকৃতির সার্থকতা—

"আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীরসঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।"[২৩]

রবীন্দ্রনাথের গানে এই বাউল-সুর প্রয়োগের পূর্বেই স্বয়ং বিহারীলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী অনুরূপ কয়েকটি বাউল সুরের গান রচনা করেছিলেন।[২৪] এই তথাকথিত বাউল সুরকে এদিক-ওদিক করে, ছন্দ-তাল-নোট বদলে, নানা ভাবের গানে প্রয়োগ করে শহরের বেশ কয়েকজন গীতকার-সুরকার দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ব্রহ্মসংগীতেও এই বাউল সুর প্রবেশ করেছিল। মনোমোহন বসু, আনন্দচন্দ্র মিত্র, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ধর্মানন্দ মহাভারতী, বিহারীলাল সরকার, চিরঞ্জীব শর্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল), প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত, গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়—সেকালের অনেক গীতকারের গানেই এই বাউল সুরের প্রবল প্রতাপ অনুভূত হয়। এঁদের মধ্যে দীন বাউল, ফিকিরচাঁদ, লালনশাহ ও হাসন রজার সুর ছিল রীতিমত জনপ্রিয়। এই তথাকথিত বাউল গানের সুরকেই রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে' তাঁর নিজের গানে অনুসরণ করেছেন। সে অনুসরণের ব্যাকরণ ও সূত্রগুলি আরও কৌতূহলপ্রদ, আরও রহস্যময়—কিন্তু সে আর এক স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

১। বিশ্বভারতী প্রকাশিত সঙ্গীতচিন্তা (১৯৬৬)-য় সংকলিত 'বাউলের গান' পৃ ২৬৬-৬৭।

২। তদেব পৃ ২৬৮, ৩। তদেব, পৃ ২৬৮, ৪। তদেব, পৃ ২৭২, ৫। তদেব পৃ ৩১৬-১৭

৬। "গ্রাম্য গাথা ও প্রচলিত গীত-সমূহ (যে বিষয়ের ও যে সম্প্রদায়েরই হউক না কেন) সকলে মিলিয়া সংগ্রহ করেন, তবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর উপকার হয়। আমরা আমাদের দেশের লোকেদের ভালো করিয়া চিনিতে পারি, তাহাদের সুখ-দুঃখ আশা-ভরসা আমাদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত থাকে না। ভিক্ষুকরা মাঝিরা যে সকল গান গাহে তাহা শিখিয়া লইতে অধিক পরিশ্রম নাই। আমরা এইরূপ দুই একটি গান লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহাই প্রকাশ করিয়া উপসংহার করি।" সংগীতচিন্তা-য় পুনরুদ্ধৃত। পৃ ৩১৬

৭। আনন্দসংগীত পত্রিকার ১৩২০ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় গানটির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, এই কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন 'পরিব্রাজক' ভণিতায় বেশ কয়েকটি বাউল গান লিখেছিলেন এবং সুবিখ্যাত 'বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের' গানের সুরে 'দুর্গা নামে রয় না জীবের ভয়ভাবনা' এই গান রচনা করেছিলেন।

৮। শান্তিদেব ঘোষ, 'রবীন্দ্রসংগীত' (৫ম সং, ১৩৮৬), পৃ. ৭৮

৯। "বাউল সুরে গান প্রথম বেশি লেখা হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই তিনি বাউল গান রচনায় মন দেন। তাঁহার বাউল সুরের স্বদেশী গানগুলি দেশের তরুণদের পাগল করিয়াছিল। (প্রথম দেখা গেল খেয়ায়।) প্রথম দিকের বাউল গান সবই হালকা চালের। যেমন, রাজা ও রানীতে 'যমের দুয়ার খোলা পেয়ে', বিসর্জনে 'আমারে কে নিবি ভাই', গোড়ায় গলদে 'যার অদৃষ্টে যেমন জুটেছে'। বাউল গানের ভাব ও ভঙ্গি পুরাপুরি দেখা গেল 'খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে' গানে। বাউল গানের গভীরতায় তখনো কবি ডুব দেন নাই, এবং তাঁহার অধ্যাত্ম-অনুভূতিতে তখনো মরমিয়া রঙ ধরে নাই।" সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), ৩য় সং, ১৩৬৮, পৃ ৪৮৭

১০। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাংলার বাউল ও বাউল গান গ্রন্থে (২য় সং ১৩৭৮) গানটির স্বতন্ত্র একটি পাঠ পাওয়া যায় (পৃ ৫৪৮ দ্রষ্টব্য)।

১১। সংগীতের মুক্তি সংগীতচিন্তা-য় সংকলিত পৃ ৫৯

১২। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান, সংগীতচিন্তা-য় সংকলিত, পৃ ৭৯

১৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে রচনার তারিখ ২ শ্রাবণ ১৩২৯। প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, গ্রন্থে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, গানটি শান্তিনিকেতনে রচিত।

১৪। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান ২য় সং, পৃ ৬২৩

১৫। তদেব, পৃ ৮৬৭

১৬। রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গ গানের সম্পূর্ণতর তালিকার জন্য বর্তমান লেখকের 'বাঙলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত' (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১ম সং ১২৭৮) পৃ ৭২৯-৩০ দ্রষ্টব্য।

১৭। "শিলাইদহে যখন ছিলাম বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি ··· বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।" হারামণি (মহম্মদ মনসুর উদ্দীন-সংকলিত) গ্রন্থের ভূমিকায় ব্যবহৃত, প্রবাসী ১৩৪৪ চৈত্র, সংগীতচিন্তা-য় সংকলিত, পৃ ২৮৩

১৮। শান্তিনিকেতন ভাষণমালার 'আত্মবোধ' ও 'ছোট ও বড়' ভাষণে, ১৯২২-এ প্রদত্ত ভাষণে, ১৯২৫-এ প্রদত্ত ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে (১৯৩০) ও মানুষের ধর্ম (১৩৯২) বক্তৃতায় তার কিছু উদাহরণ আছে। এই সূত্রে পত্রপুট কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতাটিও স্মর্তব্য।

১৯। "প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের গানের একটা মিল খুঁজিয়া পাই তবে আমাদের কী বিস্ময়! কী আনন্দ! আনন্দ কেন হয়। তৎক্ষণাৎ সহসা মুহূর্তের জন্য বিদ্যুতালোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি আমরা দেখিতে পাই বলিয়া। ···" সংগীতচিন্তা-য় সংকলিত, পৃ ২৭২

২০। "আমাদের দেশের ইতিহাস প্রয়োজনের মধ্যে নয় মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনা দেখি —এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে। সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরল। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে কোরান-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।" হারামণি-র ভূমিকায় উদ্‌ধৃত সংগীতচিন্তা-য় সংকলিত, পৃ ২৮৫

২১। বাঙ্গালীর গান (১৯০৫)-এর মতে গানটির রচয়িতা প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী, যদিও গানটি হরিনাথ মজুমদার বা কাঙাল ফিকিরচাঁদের রচনা রূপেই পরিচিত। বাঙ্গালীর গানে প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচয়-লিপিতে আছে—"কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকির বা হরিনাথ মজুমদারের ইনি সহযোগী ছিলেন। সুতরাং ইঁহার অনেক গান হরিনাথ মজুমদারের গানের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে।"

২২। সংগীতের মুক্তি, সংগীতচিন্তা-য় সংকলিত, পৃ ৬২

২৩। হারামণি-র ভূমিকায় উদ্‌ধৃত পূর্বোক্ত প্রবাসীর প্রবন্ধ, সংগীতচিন্তা-য় সংকলিত, পৃ ২৮৩

২৪। বিহারীলাল বাউল গানের রীতিমতো প্রেমিক ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর বাউলবিংশতি (১২৯৪) গ্রন্থ। বিহারীলালের 'পাগল মানুষ চেনা যায়' এই বাউল গানের সুর অবলম্বনেই রবীন্দ্রনাথ 'আমরা বসব তোমার সনে' প্রায়শ্চিত্তের এই গানটি রচনা করেন। স্বর্ণকুমারী-র 'কে তুমি প্রেমিক বাদক' এই বাউল-ভঙ্গির গানটির সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় কবির 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস' (১৩৩৬) এই সুপরিচিত গানটিতে।

শিলাইদহ পর্ব ও চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন কবির জীবন এবং সাহিত্যের জগতে শিলাইদহ পর্বের গুরুত্ব কতখানি। ইতিমধ্যে কলকাতার জোড়াসাঁকো বাড়িতে কিংবা বাংলার বাইরে পশ্চিমের কোনো নিভৃতবাসে রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করেছেন অনেকগুলি। প্রকাশিত হয়েছে পর পর বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ, সন্ধ্যাসংগীত থেকে মানসী। কিন্তু স্বীকার করতেই হয়, আত্মকেন্দ্রিক গণ্ডিবদ্ধ সেই জীবনে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ছিল খুবই সামান্য। মূলধন মাত্র স্বল্পপরিসর পারিবারিক পরিমণ্ডলে নিজের স্বপ্নবিলাসী মনের এলোমেলা ভাবনা, যা হয় 'অতীতের স্মৃতি' নয় 'অনাগতের প্রত্যাশা'। 'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে'—কথাটা বোধ হয় এ যুগের কাব্য সম্বন্ধে বড় বেশি সত্য। প্রতিভাদীপ্ত মন আছে, অথচ সেই মনের উপযোগী সৃষ্টির প্রয়োজনীয় রসদ নেই, এভাবে আর কতদিন চলতে পারত। ঠিক এ হেন সময়ে এক অভাবিত দিকপরিবর্তন কবিকে এই অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে ত্রাণ করেছিল।

পিতা দেবেন্দ্রনাথের অলঙ্ঘনীয় আদেশকে তরুণ ভাববিলাসী পুত্র প্রথমটা যে খুব প্রসন্ন মনে নিয়েছিলেন এমন হয়তো নয় ; কিন্তু অব্যবহিত পরেই মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন তাঁর জীবনে এই পরিবর্তন কতখানি বাঞ্ছনীয় ছিল। কোথায় কলকাতার পাথরে-মোড়া চিৎপুর, অথবা পশ্চিমের কৃপণ-প্রকৃতি-বেষ্টিত নির্জন বাংলোঘরের আত্মসর্বস্ব নিভৃতবাস, আর কোথায় পল্লী বাংলার এমন অপর্যাপ্ত সবুজের উচ্ছ্বসিত সমারোহ, এমন দিগন্ত থেকে দিগন্ত জোড়া আকাশে হরেকবর্ণ মেঘের অবিরাম যাওয়া-আসা, ঘনপুঞ্জিত সবুজের ফাঁকে ফাঁকে বাংলার লোকালয়ের দৈনন্দিন জীবনের হাসিকান্না সুখদুঃখে মর্ত্যপ্রাণের নিয়ত স্পন্দন, এবং সর্বোপরি এক বিশাল জলধারার তরঙ্গিত প্রবাহ—জীবনের ভাঙাগড়া খেলারই প্রতীক যেন।

দেখার দৃষ্টিকে জাগিয়ে তোলার এমন উপযুক্ত লগ্ন কখনও আসেনি আগে। জোড়াসাঁকোতে জন্মলাভ হলেও রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ভূমিষ্ঠ হলেন শিলাইদহে এসে। দৃষ্টির এতো খোরাক, সৃষ্টির এতো উপকরণ আগে কখনো মেলেনি। এই সময়কার 'মুক্তদ্বার অন্তরের' বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে কাব্যে, গানে, গল্পে, সাহিত্যের আরও নানান ধারায়। মানসী যুগের সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষীণ স্রোতে হঠাৎ বান ডেকে গেল। রবীন্দ্র সাহিত্যের ইতিহাসে শিলাইদহ পর্ব যে কী অপূর্ব স্বর্ণপ্রসূ তা অবিদিত নয় কারও।

কিন্তু রবীন্দ্রচিত্রসাধনার দিক থেকেও যে এই পর্বটির মূল্য অপরিসীম তা অনেকেরই অজানা। কথাটিকে স্পষ্ট করে বলি।

একদা যৌবনে জোড়াসাঁকো বাড়িতে ছবি আঁকার উৎসাহে কবি কিছু এঁকেছিলেন, নিজের জীবনের স্মৃতিকথায় তা বলেছেন। কিন্তু তারপর আঁকজোকের আর কোনো

খবরই মেলে না। সৃষ্টির সংবেগ সাহিত্য আর গান রচনাতেই নিয়োজিত হয়েছে নিঃশেষে। দীর্ঘদিন পর পদ্মাতীরের দিনগুলিতে চিত্রচর্চার দ্বিরাগমন ঘটেছে দেখতে পাই। কিন্তু এই সময়কার ছবি রচনার প্রেরণা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। সেই বিচিত্র অনুভবটি সমকালীন ছিন্নপত্রের পাতায় ধরা পড়েছে। কথাটিকে একটু বিশদ করা যাক। শিলাইদহে প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্য হঠাৎ প্রবল প্রেরণা নিয়ে এল ছবি আঁকার। নতুন করে শুরু হল 'প্রকৃতি পাঠ'। সমকালীন সাহিত্যে—কবিতায়, গানে নিসর্গের কথা প্রকাশ পেয়েছে কম নয়। কিন্তু তবু কবির মনে এক অদ্ভুত অতৃপ্তি দেখা দিল। এই অতৃপ্তিবোধটি একটু নতুন ধরনের।

পদ্মার বুকে তাঁর বোটে বসে দিনরাত চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেবলই মনে হতে লাগল, প্রকৃতির নিজের একটি ভাষা আছে, একটি সুর আছে। সাহিত্যে যতই কেন আমরা প্রকৃতির কথা বলি সে বলায় তাকে নিঃশেষে উপস্থাপিত করা যাবে না কিছুতেই। কাব্যে সাহিত্যে যখনই তাকে প্রকাশের চেষ্টা করা যায়, মানুষের ভাষা প্রাকৃতিক ভাষার নিরঙ্কুশ অভিব্যক্তিকে অনেকটা ক্ষুণ্ণ করে, কিংবা বলা যায় আচ্ছন্ন করে। তার যথার্থ দ্যোতনাটিকে হারিয়ে ফেলে। মানুষী ভাষার সরবতা প্রাকৃতিক ভাষার নীরব বাণীকে ঢেকে ফেলে এক অবাঞ্ছিত বিমিশ্রতার সৃষ্টি করে। ছিন্নপত্রের পাতায় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবনাকেই প্রকাশ করেছেন যে মানুষের বকুনি প্রকৃতির ভাষার মৌনকে চাপা দিয়ে ফেলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয়েছে প্রকৃতির প্রাণের যে রূপটিকে সাহিত্যে ভাষার সরবতায় ঠিক ধরা যায় না, তাকে হয়তো ধরা যায় ছবির মৌনে। যৌবনে যখন কবি ছবি এঁকেছেন জোড়াসাঁকো বাড়িতে তখন ছবি জিনিসটা ছিল তাঁর কাছে একটি অতিরিক্ত আনন্দ। ভাষার সীমাবদ্ধতা জনিত অভাববোধের অনুভবটি সেখানে ছিল না। কাজেই দেখা যায় শিলাইদহের চিত্রচর্চা অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতে, এবং প্রবর্তনা ভিন্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, পরবর্তীকালে ব্যাপক চিত্রচর্চার যুগে কবি যে অনুভবটি প্রকাশ করেছেন (যা বিশ্বভারতী প্রকাশিত চিত্রলিপি গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে) তার মধ্যে ছিন্নপত্রের মর্মরধ্বনিই শুনতে পাওয়া যায়। সেখানে বলেছেন—

The world of sound is a tiny bubble in the silence of the infinite, the Universe has its only language of gesture, it talks in the voice of pictures and dance.

My Pictures, Chitralipi I.

বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে এই পর্বের চিত্রসাধনার একটি রসাল পরিচয় দিয়েছেন পত্রে—

"শুনে আশ্চর্য হবেন, একখানা স্কেচবুক নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকছি। ···বলা বাহুল্য সে ছবি আমি প্যারিসের সেলোন-এর জন্যে তৈরি করচি নে এবং কোনো দেশের ন্যাশনাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন, এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব স্নেহ জন্মে, তেমনি যে বিদ্যেটা ভাল আসে না, সেইটের উপর অন্তরের টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা করি এবার ষোলো আনা কুঁড়েমিতে মন দেবো, তখন ভেবে ভেবে

এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এ সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করবার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি, তার চেয়ে ঢের বেশি রবার চালাতে হচ্ছে ; সুতরাং এই রবার চালনাটাই অধিক অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে—অতএব মৃত র‍্যাফেল তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিত হয়ে মরে থাকতে পারেন—আমার দ্বারা তাঁর যশের কোনো লাঘব হবে না। —১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০০, চিঠিপত্র ৬

রবীন্দ্রনাথ তখন ভাবতেও পারেননি যে ঐ প্যারিস সেলোনেই তাঁর ছবি একদিন প্রকাশিত হবে, এবং জার্মনীর ন্যাশন্যাল আর্ট গ্যালারীতে তাঁর উপহার-প্রদত্ত পাঁচটি ছবি স্থান পাবে।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ যে সব স্কেচ করেছেন তার কোনো হদিশ আজ পাওয়া যাবে না। স্কেচ খতাখানি বিলুপ্তি দেবীর অঙ্কে স্থান নিয়েছে। কিন্তু তারই কিছুদিন পরে আঁকা কতকগুলি স্কেচ আজ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সেগুলি থেকে অনুমান করা শক্ত নয় স্কেচ খাতায় কী ধরনের স্কেচ্ কবি করেছিলেন।

পরবর্তী জীবনে ব্যাপক চিত্রচর্চার যুগে (১৯২৪-৪১) রবীন্দ্রনাথ অজস্র নিসর্গ চিত্র এঁকেছেন নানা আয়তনের, কালোয় সাদায়, নানা বর্ণে, কখনও কালিকলমে, কখনও ক্রেয়নে, কখনও বা রঙে[১] তুলি ডুবিয়ে। এগুলির সংখ্যা কয়েক শো হবে। দেখা যায় শান্তিনিকেতনে অথবা বাংলার বাইরে কিংবা ভারতের বাইরে সুদূর ইউরোপে বসে আঁকা হলেও অধিকাংশ নিসর্গ দৃশ্য শিলাইদহের স্মৃতিবাহী। সবুজের সমারোহ দেখলেই দর্শকের একথা বুঝতে সময় লাগে না। পূর্ববাংলার গ্রামের সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সন্ধ্যায় ঘনায়মান অন্ধকার, গোধুলির বর্ণালি নানা ছবিতে স্থান পেয়েছে। তারই সঙ্গে দেখা দিয়েছে পদ্মার আভাস, ভাঙা ঘাট এবং শিলাইদহের সজীব স্মৃতির মূর্তরূপ অসংখ্য কুমীরের ছবি। কবি বলেছেন, পদ্মা তাঁর আমৃত্যু মানসসঙ্গিনী। দেখা যায়, নদীটি শুধু তার ভাবমূর্তিতে অ্যাবস্ট্রাক্ট' রূপেই কবির মনে বাসা নেয়নি, তার জলজ্যান্ত অনুচরগুলি বাস্তব মূর্তিতে মনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছে সমস্ত জীবন। পদ্মাবাসের সমকালীন কাব্যে এদের যত বর্ণনা পাই উত্তরকালের ছবিতে এদের রূপায়ণ তার চেয়ে ঢের বেশি। এটি বিশেষ করে লক্ষ করবার।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে আঁকা প্রকৃতি-চিত্রগুলি যে অধিকাংশই শিলাইদহের স্মৃতিকে উপজীব্য করেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় ছিন্নপত্রাবলীর প্রকৃতি বর্ণনাগুলি ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই। দু-একটির নমুনা উপস্থিত করি।

'সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ···সমস্ত এপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে—একটি কোমল বিষাদ—ঠিক অশ্রুজল নয়—একটি নির্বিশেষ চোখের বড় বড় পল্লবের নীচে ছলছলে ভাবের মতো।'

—জানুয়ারি ১৮৯১, ছিন্নপত্রাবলী

কিংবা—

'ডাঙায় বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঘনকালীর মতো অন্ধকার এবং জলের উপর গোধূলির একটি বিবর্ণ ধূসর আলো পড়ে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মতো দেখতে হয়েছে।'

—১০ জুলাই ১৮৯৫, ছিন্নপত্রাবলী

কিংবা—

'সেই সমস্ত ঢেউ খেলানো স্তরে-স্তরে কোঁচানো বালির উপর নানা রঙের চিক্কন আভা পড়ে ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড সাপের নানা-রঙে খোলসের মতো দেখাচ্ছিল। আমি মনে করলুম—পদ্মা তো একটা নাগিনীই বটে, সে এক সময় এই বৃহৎ চরের উপর বাস করত, এখন কেবল তার একটা খোলস বালির উপর পড়ে চিকচিক করছে।'

—১৪ ডিসেম্বর ১৮৯৪, ছিন্নপত্রাবলী

প্রবীণ বয়সের ছবিতে, বিশেষত বহুবর্ণ ছবিগুলিতে এই বর্ণনা যে কী আশ্চর্য 'চিত্রময়ী বাণী' পেয়েছে, নিসর্গ দৃশ্যগুলি দেখলে তা বোঝা যাবে।

কিন্তু শিলাইদহ তো শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষও । বোধ হয় বলা অসংগত হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ এখানেই প্রথম মানুষের সংসর্গে এলেন যথার্থভাবে। পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষ—চাষি, মুটে, মজুর, হিন্দু-মুসলমান প্রজা, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, তাদের গ্রাম্য কুটির, ক্ষেতখামার হাল-লাঙল নিয়ে উপস্থিত হল কবির সামনে। তারা আকর্ষণ করল তাঁর মনোযোগী দৃষ্টি। এ পর্যন্ত যারা সাহিত্যে স্থান পায়নি তারা সাহিত্যের আসরে আসতে শুরু করল। গল্পগুচ্ছের পাতায় পাতায় এদের ভাষিক চিত্র কবি এঁকেছেন। জন্ম নিয়েছে দেনা- পাওনা, স্বর্ণমৃগ, শাস্তির মতো গল্প। কিন্তু ছবিতেও যে এরা আসবে এবং সংখ্যায় বহুগুণিত হয়ে তারও সূচনা ঘটে গেছে শিলাইদহে। পূর্ববঙ্গবাসকালে কবির মনের মাটিতে কেটে বসে যাওয়া মুখগুলি, সাহিত্যেও যাদের গতি হয়নি, তারা মুক্তি না-পাওয়া স্রোতের মতো দিনরাত প্রকাশের আর্তি জানিয়েছে। শেষ বয়সের চিত্ররাজ্য তাদের বহু-বাঞ্ছিত মুক্তিক্ষেত্র। ঠোঁট, নাক, চিবুক, ভ্রূর কত ভঙ্গি, কত ইশারা। জোড়া জোড়া চোখের কত বিচিত্র চাউনি, করুণ মধুর রহস্যময়, কঠিন, তীব্র, মর্মভেদী, কালোয় সাদায় রেখার রঙে ছবির পর্দায় আবির্ভূত। শিশু, কিশোর, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কত মানুষের কত মুখের মিছিল। এই সময়ে তোলা প্রজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গ্রুপ ফোটো অথবা শিল্পাচার্য নন্দলালের আঁকা প্রজাদের ছবির মুখগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আঁকা কয়েকটি মুখাবয়বের অতি স্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যাবে। পদ্মাতীরে খ্যাতিবিড়ম্বনাহীন নিভৃতবাসের সহজ দিনগুলিতে কবি পল্লীবাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত দরিদ্র জীবনের অতি কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। নিজেই বলেছেন—

'বাংলাদেশের গ্রাম আমি দেখিনি, এটা সত্য নয়—বাংলাদেশের গ্রাম অতি গভীর করে দেখেছি, দেখেছি তার আনন্দ, তার বেদনা।'

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, মৈত্রেয়ী দেবী পৃ ১৬৭

উত্তরকালে অবিশ্বাস্য বোধ হবে এমন অভাবনীয় নৈকট্যের কথা তাঁর শিলাইদহের অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের মুখে শোনা গেছে। সাহিত্যে সমকালীন চিঠিপত্রেও তার পরিচয় নেই এমন নয়। গল্পগুচ্ছের অতি অল্পসংখ্যক কিন্তু চমকে-দেওয়া কয়েকটি গল্পে লিরিকরসলেশহীন রূঢ়বাস্তব জীবনের মর্মান্তিক বর্ণনায় তার সাক্ষ্য মেলে। ভাগ্যবিড়ম্বিত, দুঃখক্লিষ্ট সরল গ্রাম্য মানুষের যে ছবি তিনি সাহিত্যে আঁকার চেষ্টা করেছেন, তাই শেষ জীবনের বিপুল ছবি সৃষ্টির পর্বে তাঁর মনকে উদ্‌বেজিত করেছে, সৃজন-সংবেগকে উদ্দীপিত করে তুলেছে এবং ছবির পটে তুলির টানে ফুটে উঠেছে একটির পর একটি, অসংখ্য। কেউ সলজ্জ

কুণ্ঠিত, কেউ ছায়াচ্ছন্ন ম্লান, কারও চোখে ক্লান্তি ও হতাশা, কারও চোখে বা ক্রুদ্ধ আবেগের প্রবল ইঙ্গিত। জীবনযুদ্ধে পরাভূত মানুষ, জীবনজয়ের অঙ্গীকারে দৃঢ়মুষ্টি উদ্যত মানুষ ফুটে উঠেছে ছবির পর ছবিতে।

এমন নয় যে এই ছবিগুলি শুধুই একদা ফেলে-আসা শিলাইদহ জীবনের করুণ মধুর স্মৃতি-রোমন্থন। পাঠক যদি ছবির আঁকার সমকালীন রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে লেখা চিঠিগুলি পড়েন তবে দেখবেন শিলাইদহ-চিন্তা বা পল্লী-চিন্তা কতখানি সেই মুহূর্তের জীবন্ত ভাবনার অন্তর্গত ছিল। এমন অভিপ্রায়ও সে সব লেখার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে যে বিধাতা যদি আবার তাঁকে নতুন জীবন দান করেন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পরমায়ু দিয়ে, তবে সেই নবজাত রবীন্দ্রনাথের একটি মাত্র ব্রত হবে পল্লীবাংলার নিরক্ষর, দরিদ্র মানুষের মধ্যে কাজ করে সময়ের সদ্‌ব্যবহারে জীবনকে সার্থক করে তোলা।

১। ১৯৩০ সালে অর্থাৎ এ পত্র লেখার ত্রিশ বছর পরে প্যারিসের 'গালরি পিগাল'-এ রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রথম প্রদর্শনী হয় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর উৎসাহে। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে লেখকের 'রবীন্দ্র চিত্রকলা ঃ রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা' (দে'জ পাবলিশিং) গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথের কর্মলোক

বাসা

মৈত্রেয়ী দেবী

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সম্প্রতি নানা মানুষ নানাভাবে লিখছেন। তাঁর কাব্য, সাহিত্যকর্ম, জীবন, সমস্ত কিছু নিয়ে বিরাট বিস্তৃত আলোচনা চলেছে। তিনি যেন এক অফুরান উৎস। যেখান থেকে বহু মানুষ এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাবিত মানুষ চিন্তার ও মননের খোরাক পেতে পারে। এমনকী তিনি তাঁর লেখায় কী কী ফুলের নাম করেছেন তা নিয়েও গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

আমিও তো আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তাঁর সম্বন্ধে লিখে আসছি। এখন তাই আর কলম ধরতে ভরসা পাই না বিশেষ করে বহু জ্ঞানীগুণী যেভাবে তাঁর লেখার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন—অনেক সমাজতত্ত্ব, দর্শনতত্ত্ব ইত্যাদি লেখা হয়েছে। আমার পক্ষে কোনোদিনই তা সম্ভব হয়নি। সাজাহান কবিতায় তিনি যে কথা লিখেছেন—তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ—এই কথাটি কলম ধরতে গেলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার মনে পড়ে। তাঁর বিশাল রচনাসম্ভার, অপার কাব্যমাধুর্য সমস্ত ছাপিয়ে তার জীবনখানি আমার মনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন আমার বয়স নয় বছর। বলাই বাহুল্য, তখন আমি রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করে বিশেষজ্ঞ হইনি। যদিও আমাদের বাড়িতে সর্বদা রবীন্দ্রকাব্য পড়া ও আলোচনা হত এবং চার বছর বয়স থেকে আমাকে আমার মা কথা ও কাহিনীর কবিতা মুখস্থ করাতেন। তার প্রভাব আমার বালিকা মনে কীরকম হয়েছিল তা জানি না। শুধু মনে পড়ে এক একটা কবিতার এক একটা জায়গা কীরকম মনকে ব্যাকুল করে দিত। কথা ও কাহিনীর 'পণরক্ষা' কবিতায় সেই যেখানটায় আছে—বেলা যায় যায় ধূ ধূ করে মাঠ, দূরে দূরে চরে ধেনু—অতি দূর হতে সকরুণ রবে বাজে রাখালের বেণু—এইখানটা যখন মা পড়তেন তখন এইটুকু বর্ণনার মধ্যে ঐ কাহিনীর আসন্ন বিষণ্ণতার আভাস পেয়ে মন উদাস হয়ে যেত, চোখে জল আসত। সেই অল্প বয়সে আমি অবাক হয়ে ভাবতুম কয়েকটা কথার মধ্যে দিয়ে কী করে মনের মধ্যে এরকম আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে। পরে যখন রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখলাম তখনও যেন এই কাব্যের অনুভূতি মনের মধ্যে ফিরে এল। একজন মানুষের উপস্থিতি যে এরকম কাব্যের মত সুন্দর হতে পারে এবং দর্শকের মনকে কোনো এক অদৃশ্য বীণার মত বাজিয়ে তুলতে পারে তা আজও ভাবলে আশ্চর্য হই। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষদিকের পনের বছর অতি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং তখন শেষের দিকে আমার প্রায় সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য পড়া হয়ে গিয়েছিল এবং একটা বড়ো অংশও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যই তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম রবীন্দ্রনাথ মানুষটি তাঁর রচনার চেয়ে পৃথক নন। তিনি যা বলেন যা প্রচার করেন, তাঁর জীবন ও কর্ম তার থেকে পৃথক নয়।

অল্প বয়সে আমার বেশ কিছু জ্ঞানীগুণী মানুষকে দেখার সুযোগ হয়। সেজন্য আমার লক্ষ হয়েছে যে অনেকেই যা বলেন ঠিক তা করেন না। এক একজন মনীষীর ব্যবহার দেখে আশ্চর্য হয়েছি। আমি লক্ষ করেছিলাম যে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা ইত্যাদির সঙ্গে একটি দরদী পরমতসহিষ্ণু উদার মন যে থাকবেই এমন কোনো কথা নেই।

রবীন্দ্রনাথ বিত্তবান পরিবারে মানুষ হলেও সাম্যভাবনা তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত ছিল। অনেকে মনে করেন সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে জমিদারের ছেলে পরোপজীবী হবার গ্লানিটা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু আসলে তা নয়। তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ঘটনা তাঁর শিলাইদহ ও পতিসরের জমিদারিতে বাস। ওই সময় বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষদের জীবনের হতাশা, দুর্দশা তাঁকে ভাবিয়েছিল। সে সময়ের লেখা তাঁর জামাই-এর কাছে একটি পত্রে পরিষ্কার করে লিখেছিলেন যে চাষিদের অন্নে তোমরা বিলাতে লেখাপড়া শিখতে গিয়েছ ফিরে এসে সেই চাষিদের অন্নের গ্রাস যদি বাড়াতে না পারো তবে সেটা অপরাধ হবে। বস্তুত ছেলে এবং জামাই—দুজনকেই আধুনিক চাষবাস ইত্যাদি শিক্ষা করতে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন।

সমস্ত ছিন্নপত্রাবলী জুড়ে এই নিরন্ন চাষিদের বেদনার সঙ্গে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি মিশে গেছে। অন্যান্য অনেক লেখকের মতো সে বিষয় শুধু লিখেই ক্ষান্ত হননি। প্রতিকারের দুর্দমনীয় ইচ্ছা তাঁকেও নানা অসম্ভব কাজে প্রবৃত্ত করেছে। হয়ত সব সফল হয়নি। কিন্তু সেই চেষ্টার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা যেমন তিনি লিখেছেন—ধন্য করো দাসে সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।

শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা মনে ছিল অনেকদিন ধরেই। শুধু শিক্ষাব্যবস্থা নয় তারই সঙ্গে বিলাসিতাবর্জনের ও সরল জীবনের প্রতিষ্ঠা। আহার ছিল পরিমিত এবং বিরাট বড়ো বাড়ি পছন্দ করতেন না। অল্প পরিসর স্থানেই তাঁর থাকতে আরাম লাগত। আমি দু-একজন লেখকের স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের আহারের যে বিরাট বর্ণনা পড়েছি তাতে আমার অবাক লাগে এ সব তাঁরা পান কোথায়! বনফুলের বইতে লেখা হয়েছে যে, সকালবেলায় অর্থাৎ প্রাতরাশে ছোলা, মুগ, একবাটি ক্রীম ইত্যাদির সঙ্গে সিঙাড়া, কচুরি প্রভৃতি ভোজন করছেন। এ তো অসম্ভব কথা! তাছাড়া সিঙাড়া, কচুরি সকালবেলার খাদ্যই নয়। অনেকেই দেখি কী দেখেছেন তা ভুলে গিয়ে ইচ্ছামতো নানা কথা লেখেন। সেইজন্যই মনে হয়, যদিও আমি ব্যক্তি মানুষ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছি, তবুও হয়তো এখনও আরও কিছু লেখা দরকার—কারণ আমার কলম অচিরেই থেমে যাবে ; তখন সে অতুলনীয় ব্যক্তিসত্তার পরিচয় লেখবার মানুষ কমই বেঁচে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে শুধু চোখে দেখা নয় দেখার সঙ্গে কিছু বোঝা মিলিয়ে নিতে হবে। তিনি কেন কোনো কাজ করছেন সেটা বুঝতে হলে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে একটা সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি থাকা চাই।

আমার মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র দশ-বার বছর পরে একটি আফ্রিকান পরিবার শান্তিনিকেতন বেড়িয়ে আমাদের পাহাড়ের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের কি শেষ বয়সে একটু মাথার গোলমাল হয়েছিল?" আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "কেন এ ধারণা আপনার জন্মাল? তাঁর শেষ কবিতাটি তাঁর কবিতাবলির মধ্যে একটি উজ্জ্বল রত্ন। চিত্তের অস্থিরতা থাকলে তা কি সম্ভব?" তিনি

অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "তা নয়, আমি তো তাঁর সব কবিতা ভালোমত পড়িনি। শেষ কবিতা তো নয়ই। তবে আমাকে যিনি শান্তিনিকেতন দেখাচ্ছিলেন তিনি একটার পর একটা বাড়ি দেখিয়ে বলছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কোনো এক জায়গায় স্থির থাকতে পারতেন না। এই একটা বাড়ি হল পছন্দ হল না করো আর একটা বাড়ি। আবার দুদিন পরেই সে বাড়ির কোনো ত্রুটি দেখতে পেলেন ; তার পরেই করো আর একটা বাড়ি। এমনি করে একটা খেয়ালিপনা যেন একটা পাগলামির মতো মনে হয়েছিল আমার।" তাকে আর কী বলব, আমার মনে হচ্ছিল যারা রবীন্দ্রনাথের কথা বলবে তারা যদি তাঁকে বুঝতে না পারে তবে তো সেটা নতুন মানুষের কাছে অদ্ভুত ঠেকবেই।

সমস্ত সচল সজীব বস্তুর মধ্যে একটা অস্থিরতা আছে, সে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। প্রাণী তো বটেই এমনকী গাছপালাও তার দীর্ঘ শাখার বাহুগুলিকে চারিদিকে আন্দোলিত করে চঞ্চল হতে চায়। একজন কবির সজীব মন তেমনি সর্বদাই ভাবে—'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনোখানে—'

বাড়ি বদলের প্রসঙ্গে এসে আমার একটি কথা অকপটে লিখতে ইচ্ছা করছে। এটা ঠিকই যে রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তন পছন্দ করতেন। বাড়িবদল যদি না-ও হয় ঘরবদল, নয়তো এক ঘরের মধ্যেই আসবাবপত্র স্থানান্তরিত করা তাঁর ভালো লাগত। এটা একটা জিনিস, কিন্তু উত্তরায়ণের হাতার মধ্যে যে তিনি বারবার ছোটো ছোটো বাড়ি বানিয়েছেন তার পিছনে অন্য কথাও ছিল। সকলেই জানেন কবি জোড়াসাঁকোর প্রাসাদোপম বাড়ি ছেড়ে ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যে বসবাস করা স্থির করলেন, কারণ কলকাতার পাষাণ-দেবতার মন্দিরে তিনি পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি চাইতেন পরিবেশ যেন সরল, সংযত, পরিমিত, পরিচ্ছন্ন হয়। ড্রইংরুম না ডাইনিং রুম না, তক্তাপোশ এবং ঢালা বিছানা—শান্তি এবং সন্তোষ—কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতা না, বিরোধ না, স্পর্ধা না—এই হলে জীবন নিজেকে সরল করবার অবকাশ পায়।

অন্তরের শান্তির জন্য যে অনাড়ম্বর জীবনের প্রয়োজন সে কথা ভারতীয় শাস্ত্রে বারবার বলা হয়েছে। সেই কথাটাই যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনচর্যার মধ্যে ফিরিয়ে আনছিলেন। তাই তাঁর শান্তিনিকেতনে বসবাস করার ইচ্ছা তাঁকে কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেল। সে সময় শান্তিনিকেতন খুব আরামপ্রদ ছিল না। কিন্তু প্রকৃতির সাহচর্য অন্য সব অভাবকে দূর করে দিয়েছিল।—"আজ শান্তিনিকেতনে এসে শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। ···আমি একলা অনন্ত আকাশ বাতাস এবং আলোকের ছায়া পরিবেষ্টিত হয়ে যেন আদি জননীর কোলে স্তন্য পান করছি।"

এই যদি ছিল তাঁর শান্তিনিকেতন তবে আজ সেখানে ইঁট কাঠের সমারোহ দেখে নিশ্চয়ই মনে হয় যে পরিবর্তনের ধর্মকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না, রবীন্দ্রনাথও না। তবে সেই পরিবর্তনের দায় যদি রবীন্দ্রনাথের ঘাড়ে চাপানো যায় তাহলে ভুল হবে। রবীন্দ্রনাথ যখন নিজে সংসার করতেন তখন তিনি যে বাড়িগুলোতে বাস করেছেন সেগুলো ছোটো ছোটো এবং একেবারে স্বল্পবিত্ত মানুষদের বাড়ির তুল্য। 'দেহলী' ভারি সুন্দর কিন্তু তাতে জাঁকজমক নেই। আমি তাঁকে মাটির বাড়িতে থাকতে দেখেছি। তারপরে এলেন 'কোনার্কে'। তখন ছোট্ট দু-তিনখানি ঘরের বাড়ি। খুব নীচু ছাদ এবং স্বল্পপরিসর,

বস্তুত ছাদ অতো ছোটো হবার দরুণ গরমকালে বেশ কষ্টকর—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিক গরমে কষ্ট পেতেন না। প্রকৃতির সঙ্গে এবং ছয় ঋতুর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে ছিল তাঁর রসোপভোগ। কোনার্কেরই পাশে তখন অল্প অল্প ভাবে 'উদয়ন' গৃহ তৈরি হচ্ছিল। এই বিশাল প্রাসাদ একদিনে তৈরি হয়নি। অজন্তা থেকে রূপসজ্জা নিয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় স্থাপত্যের অনুকরণে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের সাহায্যে রথীন্দ্রনাথ এই আশ্চর্য বাড়িটি তৈরি করেছেন। এর প্রত্যেকটি কোণায় তাঁর চিন্তা ও শিল্পদৃষ্টির পরিচয় আছে। এরকম একটি বিস্ময়কর স্থাপত্য তৈরি করতে পারা কম কথা নয়। আজকাল বড়ো বড়ো শহরে বহু লক্ষ টাকা খরচ করে যে সমস্ত বাড়ি তৈরি হচ্ছে আমার চোখে তার কোনোটাই রথীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয় নয়। আমি এই সৃষ্টির প্রশংসা করি কিন্তু তবু আমাকে বলতে হবে এটি রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপ্রসূত নয়। তিনি প্রাসাদ ছেড়ে চলে এসেছিলেন আর একটি প্রাসাদে বাস করবার জন্য নয়। মাটির কাছাকাছি প্রকৃতির মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের মতো সরল জীবনযাপন করতে। কোনো ব্যয়বাহুল্য তাঁর পছন্দ হত না। এই 'উদয়ন' গৃহ সম্পূর্ণ তৈরি হবার আগেই তাঁর পূরবীর প্রসিদ্ধ কবিতাটি লেখা হয়েছিল—

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এককোণে
রহিব আপন মনে—
ধন নয়, মান নয় একটুকু বাসা
করেছিনু আশা—

এই কবিতায় উচ্চারিত আশাগুলির অনেক কিছুই পূর্ণ হয়নি। ধনের টানাটানি ছিল বটে, মানহানিও মাঝে মাঝে হয়েছে এবং একটুকু বাসাকে একটুকু রাখার জন্য তাঁকে অবিরত চেষ্টা করতে হয়েছে। কিন্তু অন্যের ইচ্ছার সঙ্গে বিরোধ করে তা রাখা সম্ভব হয়নি। উত্তরায়ণের বাড়ি যে কত সুন্দর তা তিনি ভালই জানতেন কিন্তু তাঁর মনে হত এ বাড়ি তাঁর আশ্রমের আদর্শের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। সেই জন্যই এ বাড়িতে না থেকে অন্য কোনো ছোট বাড়িতে থাকতে চাইতেন। মাটির বাড়িতে থাকা তাঁর চিরকালের শখ। তারই পরিপূরণের জন্য তৈরি হল 'শ্যামলী'। শুধু বাড়ি নয়, খাওয়াদাওয়াও খুব সাধারণ করতে চাইতেন। যখন তাঁর নিজের সংসার ছিল তখন আমরা দেখিনি কিন্তু তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া হেমলতা দেবী লিখেছেন বিলাসিতাবর্জন ও উপকরণ-বর্জন ছিল তাঁর মুখের বুলি। যদিও 'উদয়ন' বাসভবনে যে সব রূপসজ্জা আসবাবপত্তর ব্যবহার হত তা সৌন্দর্যের মূল্যেই মূল্যবান। আজকালকার এমনকী তখনকার ধনী গৃহের আসবাবের সঙ্গে তা তুলনীয় নয়, তবু রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ঐ 'উদয়ন' বাড়ি কারও নিজস্ব গৃহ হওয়া তা আশ্রমের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেছে। অতি স্পষ্ট ভাষায় এ কথা তিনি অনেককেই বলেছেন, আমাকে তো বটেই। কিন্তু যদি কেউ বলে তা হলে করতে দিলেন কেন? তিনি বলতেন এ রাজবাড়ি আমার আদর্শকে মুড়িয়ে দিয়েছে। তাই যদি হবে তবে মুড়োতে দিলেন কেন? এর উত্তরও তাঁর নিজের বিশ্বাসের মধ্যে

রয়েছে। কারণ উনি বিশ্বাস করতেন কারও উপর জোর করে নিজের ইচ্ছা চাপানো অন্যায়। একটি লাইনে এই কথাটা খুব স্পষ্ট করে বলেছেন— I am also a worshipper of idea but in my worship of idea, I am not worshipper of Goddess Kali (আমি আদর্শের পূজারি কিন্তু সে পূজার আমি কালী ভক্ত নই)। অন্যের ইচ্ছাকে বলি দিতে তিনি রাজি নন বরং নিজের ইচ্ছা যায় যাক। সেই হতাশা কবিতায় গানে বিকশিত হোক।

অন্যের ইচ্ছাকে মূল্য দেবার কথা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। যদিও সেইসব ব্যক্তিদের চিন্তার দৈন্য তাঁর অজানা ছিল না, তবুও নিজের ইচ্ছাকে জোর করে কারও ওপর চাপাবেন না, এ কথা যেমন বলেছেন তেমনি করেছেন। কষ্ট এবং ক্ষতি সহ্য করেও রবীন্দ্রনাথের জীবনে কথা ও কাজের এই সামঞ্জস্য বারবারই দেখা গেছে। প্রত্যেকবার কোনো একটি পারিবারিক ব্যয়বাহুল্যের সামনে তাঁকে কষ্ট পেতে দেখেছি। 'উদীচী'র সামনে গোলাপ-বাগান মনোহরণ বটে, কিন্তু ওটা লাইব্রেরির সামনে হলে বেশি খুশি হতেন। এই কথা—যা আমার তা সকলের। নাতনীর বিবাহের সময় ব্যয়বাহুল্যের কথা চিন্তা করে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এসব কথা বলবার লোক আজ বেশি নেই। তবু দু-একজন আছেন তারমধ্যে শান্তিদেব ঘোষ অন্যতম। শুধু বয়স হলেই তো হয় না। যাদের কাছে মনে কথা বলতে পারতেন তাদের সংখ্যা কম কিন্তু তারাও মুখ খোলেননি। আজ তাই দেখি ৭ই পৌষ প্রার্থনার পরে সমবেত জনতা 'উদয়ন' গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে 'আগুনের পরশমণি' গান করে তখন আমার কষ্ট হয়। ওরা তো জানে না এই প্রাসাদ তাঁর অনুমোদিত নয়। যাঁরা অনেকদিন শান্তিনিকেতনে আছেন তাঁরাও জানেন না। কে বলবে? বললেও বিশ্বাস করবে না। বরঞ্চ থামের ওপরে বসানো একখানা ঘর উঠেছিল (পরে নিচের তলায় ঘর হয়েছে), তাঁর প্রিয় ও শেষ বাসস্থান। খুব বেশি অসুখের সময় তাঁকে এক রকম জোর করে উত্তরায়ণে আনা হয়েছে। আশা ছিল এই উদীচীতে আবার ফিরে যাবেন, তা হয়নি। তিনি সকলকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপনের জন্য, অথচ নিজে প্রাসাদে বাস করছিলেন এই রকম চিন্তা কার মনে আসতে পারে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল হবে। তবে আমার এই ক্ষীণ প্রতিবাদ কে বা মানবে? কিন্তু 'আশা' কবিতার মতো আর একটি কবিতা আমার সত্যবাদী সাক্ষী।

আশ্রমের মোড় ঘুরতেই বাঁ-হাতে একটি মাটির ঘর আছে যার নাম 'তালধ্বজ', একটি তালগাছকে বেষ্টন করে, এ ঘরের খড়ের চাল। তালগাছটি সোজা দাঁড়িয়ে তার পাতার ধ্বজায় মহাকবির একটি বিশেষ ইচ্ছাকে বাতাসে আন্দোলিত করছে।

'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতা আছে নাম 'কুটিরবাসী'। এই কবিতাটির ভূমিকায় কবি লিখেছেন—এটি যেন মৌচাকের মত নিভৃত বাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় বলেই মনে করি। সেই সঙ্গে এও মনে হয় বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকারভেদ আছে। যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়ত আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না। এই কবিতায় তিনি ঐ কুটিরবাসীকে সম্বোধন করে যা বলেছেন তাতে তাঁর নিজের অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বেদনা প্রকাশ পেয়েছে—

তোমার বাসাখানি
আঁটিয়া মুঠি
চাহে না আঁকড়িতে
কালের ঝুঁটি।
দেখি যে পথিকের মতোই তাকে,
থাকা ও না-থাকার সীমায় থাকে।
ফুলের মতো ও যে,
পাতার মতো,
যখন যাবে, রেখে
যাবে না ক্ষত।
নাইকো রেষারেষি
পথে ও ঘরে,
তাহারা মেশামেশি
সহজে করে।
কীর্তিজালে ঘেরা আমি তো ভাবি—
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি ;
হারায়ে ফেলেছি সে
ঘূর্ণিবায়ে,
অনেক কাজে, আর
অনেক দায়ে ॥

গ্রামসংগঠনে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাইরের জগতের কাছে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রধানত একজন বড় কবি হিসাবে। পৃথিবীর সর্বদেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ মহাকবিদের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে অন্যতম। কবিতা ও গান ছাড়া তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, জ্ঞানগর্ভ ও দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ, সমালোচনা এবং চটুল রসরচনাসমূহ শুধু বাংলা সাহিত্যকে নয়, অনুবাদের মাধ্যমে ইংরেজি ও বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তিনি কেবল কল্পনাবিহারী কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন বড়ো সহৃদয় মানুষ, একাধারে একজন যুগপ্রবর্তক চিন্তানায়ক, ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত, জ্ঞানতপস্বী শিক্ষাব্রতী এবং কঠোর কর্মযোগী। তাঁর ধর্ম ছিল সবরকম ভেদবুদ্ধি ও সংকীর্ণ সংস্কারমুক্ত মানবধর্ম। তিনি নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের আনন্দময় উপস্থিতি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই সমাজের সংসারের সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তি ছিল তাঁর কাম্য। গ্রামসংগঠনের মতো দুরূহ কাজের দায়িত্ব তাই তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন—গ্রামে-গাঁথা দুঃখী দেশের পুনরুজ্জীবনের জন্য। ভারতে গ্রামোন্নয়নের তিনিই পথিকৃৎ। মহাত্মাজি তাঁকে 'গুরুদেব' বলতেন, অকারণে বলতেন না।

এদিকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একান্তভাবেই নাগরিক মানুষ। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে, তখনকার ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতার এক ধনী সম্ভ্রান্ত বিদগ্ধ পরিবারে। পারিবারিক বৈদগ্ধ্যের, গানবাজনা, অভিনয় ও সাহিত্যচর্চার আবহাওয়ায় ছেলেবেলা থেকেই অনুকূল প্রেরণা ও আশ্রয় পেয়ে তাঁর কবিচিত্ত পরিপুষ্ট ও বিকশিত হয়েছিল, যদিও নগরগৃহের এবং বিদ্যালয়ের বন্দীদশায় তাঁর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপিপাসু মন হাঁপিয়ে উঠত। তিনি দাদাদের সঙ্গে কয়েকবার বাইরে গেছেন, প্রথম যৌবনেই বিলেত ঘুরে এসেছেন, দূর থেকে পল্লীপ্রকৃতির শোভা দেখে কাব্যরচনার সুযোগ তাঁর হয়েছে। কিন্তু গ্রামের লোকের দুঃখদৈন্য এবং বিবিধ সমস্যার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছে অনেক পরে, পিতৃনির্দেশে জমিদারি পরিচালনার কাজে গিয়ে ঊনত্রিশ বছর বয়সে। সে সময়ে অবিভক্ত বঙ্গের নদীয়া, পাবনা ও রাজসাহী জেলায় ঠাকুর পরিবারের বিস্তীর্ণ জমিদারি ছিল, তার নায়েব-গোমস্তা-পাইক-বরকন্দাজদের ছিল প্রজামহলে দোর্দণ্ডপ্রতাপ। নগরবাসী তরুণ কবির পক্ষে সেই জমিদারি শেরেস্তার রাশি রাশি দলিলদস্তাবেজ, মোকর্দমার নথিপত্র, তহশিল ও আর্জির মধ্যে প্রবেশ করা এবং প্রজাদের অভাব-অভিযোগের সত্যমিথ্যা নির্ণয় করা ছিল খুবই কঠিন কাজ। আমলাদের অত্যাচার এবং অন্যায় আদায় থেকে দরিদ্র গ্রামবাসীকে রক্ষা করা ছিল যেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার, তেমনি, যারা নিজেদের ভালো বোঝে না, উপকার করতে গেলে নিঃস্বার্থ শুভার্থীকে মন্দ-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে সন্দেহ করে, স্বজাতিবিদ্বেষে অন্ধ, 'নিজেদের নাক-কেটে-পরের-যাত্রাভঙ্গ' করতে যারা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত, তাদের মঙ্গলসাধনও ছিল কঠিন। অসীম ধৈর্য এবং আন্তরিক মমতা নিয়ে তিনি ঐসব গ্রামের লোকের হৃদয় জয় করলেন। আমলাদের দাপট কমালেন, প্রতাপশালী

দোষীকে শাস্তি দিয়ে, গুণী-দরিদ্রকে মান্য দিয়ে, অন্যায় আদায় বন্ধ করে। প্রত্যক্ষদর্শী প্রমথ চৌধুরী মশাই লিখে গেছেন, তিনি একবার আড়াই লক্ষ টাকার 'ওজরী খাজনা' মকুব করে দেন প্রজাদের দুরবস্থা বিবেচনা করে। সমবায় ব্যাংক খুলে তার মারফত অল্প সুদে কৃষকদের ঋণ দিয়ে তিনি মহাজনদের চড়া সুদের ঋণজাল থেকে তাদের রক্ষা করেন। ক্রমে তিনি প্রজাদের পিতৃতুল্য শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র হয়ে দাঁড়ান।

আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও উত্তর ও পূর্ববঙ্গের পৈতৃক জমিদারির গ্রামগুলিতে রবীন্দ্রনাথের গ্রামসংগঠনের কাজ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল। মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় তাঁর আগে ও অঞ্চলে ছিল না। তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ে পরে একসময়ে তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীও পড়িয়েছেন এবং হাতের কাজ শিখিয়েছেন। বর্ষার সময় নদী-নালার দেশে নৌকো করে ছাত্রছাত্রীদের আনার ব্যবস্থা ছিল। শিলাইদহকে কেন্দ্র করে জমিদারি পরিচালিত হত। কার্যালয় ছিল প্রাচীন কুঠিবাড়িতে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে অধিকাংশ সময় পদ্মার ধারে 'পদ্মা' নামক বজরা বেঁধে জলের উপরেই বাস করতেন। প্রজারা সেইখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করত, তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলত, তাঁকে গান শোনাত, গল্প শোনাত, ঘন্টার পর ঘন্টা চলত তাদের আলাপ নিবেদন আবেদন। জমিদারির কাগজপত্র দেখাও চলত তারই ফাঁকে ফাঁকে, চলত তাঁর সাহিত্যচর্চা। তাঁর চিত্রা, চৈতালি এবং বিসর্জন ঐ সময়কার লেখা। কিন্তু গরিব প্রজার শ্রমের অন্নে ভাগ বসিয়ে অলস জীবনযাপনে তাঁর ধিক্কার এসেছিল, তাদের আর্থিক ও সামাজিক দুর্গতি মোচনের জন্য কী করা যায় এই ছিল তাঁর দুশ্চিন্তা। তাঁর ঐ সময়কার লেখা স্মরণীয় কবিতা (১৩০১ বঙ্গাব্দ) 'এবার ফিরাও মোরে'-তে তিনি বলেছেন, 'বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা সমুখেতে কষ্টের সংসার/বড়োই দারিদ্র্য, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার। অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,/চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু/সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে কবি,/একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।' সমাজের উচ্চস্তরের শিক্ষিত পূর্বপুরুষেরা বহু যুগ ধরে নীচের তলার মানুষকে প্রবঞ্চনা করে দাবিয়ে রেখেছেন, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাঁকে। তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, বহুযুগের অনভ্যাসে দেশের মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ভুলে গেছে বলেই তাদের এত দুর্গতি। দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত, তাই প্রথমেই চাই সুশিক্ষার ব্যবস্থা ; শুধু অক্ষরজ্ঞান নয়, যে শিক্ষায় মন মুক্তি পায় সেই শিক্ষা দিতে হবে তাদের। কিন্তু সে তো জমিদারের গদিতে বসে পাইক-পেয়াদার সাহায্যে দেওয়া চলবে না তার জন্য চাই অন্যত্র আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, যেখানে গুরু-শিষ্য নিভৃতে তপস্যা করবেন সমবেতভাবে। তাঁর গ্রামসংগঠনের কাজে শহরের সভায় বক্তৃতা দিয়ে প্রবন্ধ লিখে দেশের যুবকদের কাছে গ্রামসেবার জন্য আবেদন জানিয়ে যখন ফল হল না, তখন নিজেই অতীতের তপোবনের আদর্শে ভারতের পুনরুজ্জীবনের জন্য মানুষ গড়ার কাজে নামলেন। বীরভূমে বোলপুরের উপকণ্ঠে তাঁর পিতৃদেবের ধর্মসাধনার জন্য রচিত 'শান্তিনিকেতন' আশ্রমে প্রথমে ছটি বালককে নিয়ে 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম' (১৯০১ খ্রিঃ) আরম্ভ হয়, মুক্ত প্রকৃতির কোলে নগরের প্রলোভনের বাইরে। ক্রমে ছাত্র বাড়ল, রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কয়েকজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী অধ্যাপকও এলেন। ছেলেদের একদিকে ঘড়ি-ঘন্টার নিয়ন্ত্রণে নিরলস, কষ্টসহিষ্ণু আত্মনির্ভরশীল, সাহসী ও সেবাপরায়ণ হতে শেখানো হল, অন্যদিকে খেলাধূলা, গাছেচড়া, সাঁতারকাটা, নিজেদের সাহিত্যসভায় নিজেদের রচনা-পড়া এবং রঙ্গ

মঞ্চ সাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা ও নিজেদের লেখা নাটক অভিনয়ের স্বাধীনতা দেওয়া হল। কায়িক শাস্তি ছিল না, কেউ কোনো অপরাধ করলে ছাত্রদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিচারসভা তাদের বিচার করে কিছু শ্রমসাধ্য কাজ তাদের দিয়ে করাত। শিক্ষকেরা গল্পচ্ছলে তাদের ইতিহাস, ভূগোল, দেশবিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বলতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে পড়াতেন, তাদের সঙ্গে অভিনয় করতেন, তাদের সঙ্গে ফুটবল খেলতেন, প্রতি বুধবার মন্দিরে তাদের ধর্মোপদেশ দিতেন। গ্রামে আগুন নেবানোর কাজে, আশ্রম পরিষ্করণের কাজে, কাছাকাছি এবং দূরের মেলায় স্বেচ্ছাসেবকের কাজে তারা পারদর্শী হয়ে উঠল ক্রমে। আনুষ্ঠানিকভাবে তখন পর্যন্ত গ্রামসংগঠনের কাজে না লাগলেও জমিদারির অভিজ্ঞতার মতো এই-আশ্রম বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাও রবীন্দ্রনাথের গ্রামসংগঠনে ভবিষ্যতে খুব কাজে লেগেছিল। গ্রামে গ্রামে দেশসেবায় উদ্‌বুদ্ধ যে ব্রতীবালকদলগুলি আজও তাঁর শিক্ষা-প্রচেষ্টাকে অম্লান গৌরবে জাগিয়ে রেখেছে তাদের মূলে আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী কাজ করছে, সে কথা ভুললে চলবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ-ভ্রমণে গিয়ে 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি'র যে বীভৎস পরিণতি দেখে এলেন তাতে তাঁর কর্তব্য মনে হল, তাঁর শান্তিনিকেতনে বিশ্বমানবের একটি মিলনক্ষেত্র রচনা করা, যেখানে সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সমান সমাদরে শান্তিতে বাস করবে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান চলবে। 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আহ্বানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মনীষী পণ্ডিত এবং শিক্ষাব্রতী, অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীরা এলেন ; নানা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানচর্চা এবং বিভিন্ন রীতির চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়াদির চর্চা আরম্ভ হল। কবি রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি শিক্ষাশাস্ত্রী হিসাবে বিশ্বের সুধীসমাজে স্বীকৃত হল। কিন্তু ঘরের পাশে বাংলার গ্রামে গ্রামে যে দীনদুঃখী অবহেলিত নরনারী শিশু প্রবলের উৎপীড়নে, মহাজনের শোষণে, রোগের ও ক্ষুধার তাড়নায় বেঁচে মরে আছে তাদের কথা ভেবে তাঁর শান্তিনিতেকনের নিত্যোৎসবের মধ্যেও শান্তি ছিল না মনে। অথচ দ্বারকানাথের জমিদারি ইতিমধ্যে তাঁর বহু বংশধরের মধ্যে ভাগ হয়ে রাজশাহি জেলার 'পতিসর'-এর যে অংশটুকু তাঁর ভাগে পড়েছিল তা থেকে তাঁর পারিবারিক ব্যয় চলত কোনোরকমে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে যে নির্লোভ শিক্ষাব্রতী অধ্যাপকেরা পড়াতেন, তাঁদের নামমাত্র বেতন ও পেটভাতাও তিনি সময়ে দিতে পারতেন না। গ্রামোন্নয়নের জন্য নতুন করে খরচ বাড়ানো সম্ভব ছিল না। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্য তাঁকে তাঁর পুরীর সমুদ্রতীরের বাড়ি বেচতে হয়েছিল, স্ত্রীর গহনা বেচতে হয়েছিল। তাঁর অনেক বই বিভিন্ন প্রকাশককে অর্থাভাবে নামমাত্র দক্ষিণায় প্রকাশ করতে দিতে হয়েছে। ওরই মধ্যে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্র, তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এবং বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে আধুনিক উন্নত প্রথায় কৃষি ও গোপালন শিখতে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন গ্রামের কাজে লাগাবেন বলে। রথীন্দ্রনাথ ফিরে এসে শিলাইদহের কুঠিতে একটি কৃষিগবেষণাগার খুলেছিলেন, ভালো বীজ ও সার দিয়ে চাষিদের কিছু আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রামসংগঠনের কাজ কোথা থেকে আরম্ভ হবে তা একরকম ঠিক ছিল কেবল অভাব ছিল কর্মীর এই প্রাথমিক খরচ চালাবার টাকার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেলপথ যখন বর্ধমান থেকে সাঁইথিয়া পর্যন্ত এগোল তখন তার তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত ইংরেজ এঞ্জিনিয়রের

কার্যালয় ও বাসভবন তৈরি হয় সে সময়ের বর্ধিষ্ণু গ্রাম সুরুলের পাশে। পরে বোলপুরে স্টেশন তৈরি হলে ঐ বাড়ি, ভাঙা এঞ্জিন ও গাড়ি মেরামতের কারখানা-ঘর প্রভৃতি পরিত্যক্ত হলে রায়পুরের জমিদার সিংহবাবুরা শস্তায় কিনে নেন কিন্তু কোনো কাজে লাগাতে পারেননি। সেই ভুতুড়ে বাড়ি ও সংলগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ জমি রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছ থেকে (১৯১২) কিনে কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে মেরামত করিয়েছিলেন। ১৩২১ সালের ১লা বৈশাখ রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক ঐ বাড়িতে বাস করতে এবং কৃষিগোপালনে গ্রামবাসীকে নতুন যুগের আদর্শ দেখাতে আসেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে চলে যেতে বাধ্য হন। সুরুল তখন ম্যালেরিয়ার প্রিয় বিহারভূমি ছিল। রবীন্দ্রনাথ ভয় পেলেন না, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ঐ বাড়িতে নিজে বাস করলেন। বীরভূম জেলার ঐ কুঠিকে কেন্দ্র করে তাঁর গ্রামসংগঠনের কাজ আরম্ভ হবে স্থির করলেন। সেবার ঐখানে বসেই ফাল্গুনী নাটক লিখলেন। এর পর তাঁর ছোট জামাই নগেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে যুবক সহকর্মী সন্তোষকুমার মিত্রকে নিয়ে এখানে আসেন এবং কিছুদিন চাষবাস ও গোপালনের কাজ করেন, কিন্তু তিনিও বেশিদিন থাকতে পারেননি। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় গিয়েছিলেন বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে, সেইখানে গ্রামের কাজে উৎসাহী ইংরেজ যুবক লেনার্ড নাইট এলমহার্স্টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এলমহার্স্ট রবীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা শুনে আকৃষ্ট হন এবং এক ধনবতী সহৃদয়া আমেরিকান বিধবা ডরোথি স্ট্রেটের কাছে সুরুলের গ্রামোন্নয়ন কাজের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দানস্বরূপ পেয়ে সেই টাকা নিয়ে ভারতবর্ষে এসে রবীন্দ্রনাথের গ্রামসংগঠনের কল্পনাকে রূপায়িত করেন। এলমহার্স্ট পরে ঐ বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন এবং তিনি দেশে ফিরে যাবার পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বভারতীর আর্থিক দায়িত্ব নেবার পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বৎসর নিয়মিত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা কর্মীদের বেতন এবং অন্যান্য ব্যয়বাবদ সাহায্য করেছিলেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি এলমহার্স্ট শান্তিনিকেতনের ন-জন যুবক ছাত্র এবং কয়েকজন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে সুরুল গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্রের গোড়াপত্তন করলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রথমেই কোনো সম্পূর্ণ কর্মতালিকা দিতে পারেননি কেবল বড় কথা কটা জানিয়ে দিয়েছিলেন : গ্রামবাসীকে নিজেদের সমবেত চেষ্টায় আত্মনির্ভরশীল হতে কর্মীরা সাহায্য করবেন নিজেদের দৃষ্টান্তে এবং আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করে কুটিরশিল্পের এবং কৃষিগোপালন, হাঁস মুরগি মৌমাছি পালন এবং মাছের চাষের দ্বারা গ্রামে বসে তারা যাতে যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি করতে পারে। সমবায় প্রথায় গ্রামে স্বাস্থ্য সমিতি গঠন করে রোগনিবারণ, ব্রতীবালকদল তৈরি করে জঙ্গল কেটে পথঘাট পরিষ্কার করিয়ে পচা পুকুর খানাডোবায় কেরোসিন ছিটিয়ে এবং অগ্নি-নির্বাপণে সুশৃঙ্খলভাবে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শ স্থাপন, জলকষ্ট নিবারণের জন্য গ্রামে গ্রামে কুয়া খোঁড়া এবং মজাপুকুর পুনরুদ্ধার প্রভৃতি কাজে সহায়তা ও উৎসাহদান, সমবায়কোষের সাহায্যে ঋণদান করে কৃষকদের মহাজনদের হাত থেকে মুক্তিদান—এইসব ছিল কর্মতালিকার মধ্যে। ১৯২১-এর ২২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার অঙ্গস্বরূপ 'শান্তিনিকেতনে কর্মসমিতি' এবং 'সুরুল কৃষি-সমিতি' নামে দুটি পৃথক সমিতি গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে সুরুল কেন্দ্রে কটি ইমারত ছাড়া একশ বিঘা জমি ছিল। ১৯২৩-এর ২৬ ডিসেম্বরের সভায় বিশ্বভারতী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের সময়

সুরুল কৃষিসমিতির নাম বদলে শ্রীনিকেতন গ্রামোন্নয়ন সমিতি করা হয়। শ্রীনিকেতন নামটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল তা শুধু কৃষির উন্নতির মতো কোনো সীমিত অর্থে নয়, পল্লীজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করে গ্রামে গ্রামে (লক্ষ্মীছাড়া দেশে) লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনবার শুভপ্রয়াস। শ্রীনিকেতনের প্রথম ডিরেক্টর বা পরিচালক এলমহার্স্ট প্রত্যক্ষে সামনে থাকলেও রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষে নিয়মিত অনেক পরামর্শ এবং প্রেরণা দিয়েছেন, কল্যাণকর্মের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ সুরুচি এবং আনন্দ যোগ করতে যেন ভুল না হয়, গ্রামের যাত্রা, কথকতা, কবিগান এবং বাউল গানকে যারা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের যেন মর্যাদা দেওয়া হয়, সে বিষয়ে সজাগ থাকতে বলেছেন। শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে তিনি ঐসব লোকোৎসবকে মান দেওয়া ছাড়া, হলকর্ষণ উৎসবে নিজে লাঙল চালিয়ে কৃষককে সম্মান জানিয়েছেন, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু সে ঘটনাকে ভিত্তিচিত্রে রূপ দিয়ে স্থায়িত্ব দিয়েছেন।

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার একমাস পরে 'ফিরে চল মাটির টানে' গানটি কবি রচনা করেছেন। তাঁর লেখা 'আমরা চাষ করি আনন্দে' প্রভৃতি গান হলকর্ষণ উৎসবে এবং 'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন, ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে' শিল্পোৎসবে প্রতি বৎসর কারখানার মজুরদের প্রেরণা দেয়। বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি তাঁর প্রবর্তিত অসাম্প্রদায়িক উৎসব বাংলার বহু গ্রামে নির্মল আনন্দ বিতরণ করছে। কর্মীদের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল, 'বিনীতভাবে আক্রমণে বিদ্রূপে অবিচল থেকে নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব নিয়ে গ্রামের লোকের সঙ্গে মিশবে, তাদের কুসংস্কার, কুরুচি, জ্ঞাতিবিদ্বেষ ও অপরিচ্ছন্নতা দূর করবে হুকুম চালিয়ে নয় আত্মীয়ের মমতা নিয়ে, তাদেরকে বাইরের বৃহত্তর জগতের, স্বদেশের অতীতের গৌরবময় ইতিহাস শোনাবে, সেই সঙ্গে গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছে শিখবে লোকসংগীত, লোকসাহিত্য, টোটকা চিকিৎসা, ছড়া, বচন ইত্যাদি। তাদের শোকে সমবেদনা এবং উৎসবে আনন্দ জানিয়ে আপনজন হয়ে যাবে। একই সঙ্গে দিতে এবং নিতে না জানলে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ চলে যাবে, স্বাধীন ভারতে দ্রুত গ্রামোন্নয়নের কাজ চলছে, তাতে গ্রামবাসীর সরকারি দাক্ষিণ্যের জন্য হাহাকার নিজেদের আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস কমিয়েছে। বেতনভুক কর্মচারীরা যন্ত্রের মতো কৃপা বিতরণ করছেন, 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্' যাকে যা দেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবে, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় অতীতের এই বাণী অনেকেই ভুলে গেছেন। কর্মীদের দাবির জিগির যত বাড়ছে, কাজে শৈথিল্য ততই বাড়ছে। যে নিজের কর্তব্য করে না, তার বাঁচবারই অধিকার নেই, বেশি সুযোগ ও বেতনের কথাই নেই। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রামসংগঠন কাজের প্রথম পর্বে ঐ রকম নিঃস্বার্থ পল্লীদরদী কয়েকজন কর্মীকে পেয়েছিলেন। সুপণ্ডিত অক্লান্তকর্মা এলমহার্স্ট সাহেব নিজে ছাত্র এবং কর্মীদের সঙ্গে জঙ্গল সাফ করতেন, পচাপুকুরের পঙ্কোদ্ধার করতেন, রাস্তা মেরামত করতেন, নিজের হাতে লাঙল ও কোদাল চালাতেন, নিকটবর্তী গ্রামের অগ্নিদাহে নিজে জ্বলন্ত কুটিরের চালে উঠে জল ঢালতেন। বীরভূমে ঐ অঞ্চলে হনুমানের উপদ্রব খুব বেশি, হনুমানের দল এসে এক একদিনে এক একটা ফলের বাগান, সবজির ক্ষেত শেষ করে দিত, গ্রামবৃদ্ধদের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি কয়েকটা হনুমানকে গুলি করে মারতেই হনুমানেরা বহুদিনের মতো দেশত্যাগী হল। কালীমোহন ঘোষ অনেক আগে থেকেই—জমিদারির আমল থেকেই ছিলেন দেশব্রতীপ্রাণ কর্মী ; বীরভূমের গ্রামসংগঠনে এলমহার্স্টের পরেই ছিল তাঁর স্থান।

তিনি ছিলেন সুবক্তা, সুলেখক, চরিত্রমাধুর্যে বহু গ্রামবাসীর আপনজন। বীরভূমের প্রায় প্রত্যেক বড়ো গ্রাম ও শহরের পাশে একটি বা একাধিক সাঁওতাল পল্লী আছে। আদিবাসীরা অধিকাংশই ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বা ধানকলের ও বাড়ি তৈরির মজুর। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে কালীমোহন স্থানীয় সাঁওতাল গ্রামগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আদিবাসী সহায়ক সমিতি গঠিত হয়, পরবৎসর শান্তিনিকেতন সংলগ্ন ৭০০ একর জমি সরকার অধিগ্রহণ করে বিশ্বভারতীকে দেন। তার মধ্যে ৩০০ বিঘা ডাঙা জমি চাষবাসের জন্য স্থানীয় সাঁওতাল পরিবারগুলির মধ্যে বিলি করা হয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনিকেতনসংলগ্ন পাঁচটি সাঁওতালপাড়া নিয়ে একটি সাঁওতালকেন্দ্র ও পল্লীসেবাসমিতি গঠিত হয়। সভ্যসংখ্যা ছিল ৬৪টি পরিবার ১৯৩৭-এ ১০৭টি পরিবারে দাঁড়ায়। দু'টি মাটির স্কুলঘর পাড়ার লোক নিজেদের শ্রমদানে গড়ে দেয়, ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও এদেশে প্রথম পড়বার সুযোগ পায়। ব্রতী বালকদল গঠিত হয়, সমাজশিক্ষার কাজে সন্ধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে বয়স্ক শিক্ষাদান আরম্ভ হয়। স্থানীয় বিবাদ সালিশি বিচারে মেটানোর ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন সাঁওতাল গ্রামের অনেক শিক্ষার্থী পড়ছে ও হাতের কাজ শিখছে। কালীমোহন ঘোষ আদিবাসী-কল্যাণ ছাড়া বাঙালি পল্লীসমাজে অস্পৃশ্যতাবর্জন, সালিশিবিচারে বিবাদ মেটানো প্রভৃতি কাজেও ছিলেন অগ্রণী। কেঁদুলি, কঙ্কালিতলা ও অন্যান্য মেলায় ব্রতী বালকদল নিয়ে গিয়ে মদ, তাড়ি, জুয়া ও দুর্নীতি নিবারণে ও মেলাক্ষেত্রের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সাহায্য করেছিলেন। আমেরিকান সমাজসেবিকা গ্রেসেন গ্রীন প্রাথমিক চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কাজে নিপুণা ছিলেন, এলমহার্স্ট ১৯২৫-এ দেশে ফিরে গেলেও তিনি পল্লীসেবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, ১৯২৬-এ তাঁর চেষ্টায় শ্রীনিকেতনে ডাক্তারখানা স্থাপিত হয়। এখান তো কাছাকাছি অনেক গ্রামেই সমবায় প্রথায় গ্রামবাসীর বার্ষিক চাঁদায় ডাক্তারখানা চলছে। ১৯২৫-এ এলমহার্স্টের পর সন্তোষচন্দ্র মজুমদার শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষ হন কিন্তু তিনি ১৯২৬-এ অকালে পরলোক গমন করলে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ গ্রামের কাজের ভার নেন। তিনি প্রায়ই পিতার সঙ্গে বিদেশে যেতেন। সে সময়ে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক, মোহনবাগানের ভূতপূর্ব বিখ্যাত খেলোয়াড় গৌরগোপাল ঘোষ কাজ চালাতেন। তিনি কবির সঙ্গে ইউরোপে ঘুরে ওদিকের সমবায় ব্যাঙ্কের কাজ দেখে এসেছিলেন, তাঁর উদ্যোগে ১৯২৭-এ বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য আগে থেকেই পল্লী-উন্নয়নসমিতি, সমবায়-স্বাস্থ্যসমিতি, ধর্মগোলা, কৃষি-ঋণদানসমিতি, সেচ-সমবায়-মৎস্যচাষ-সমিতি, সমবায়-বয়ন সমিতি বিভিন্ন গ্রামে স্থানীয় উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে এবার তিনটি থানা এলাকায় ৩৫১টি বিভিন্ন ধরনের কাজ চলল। ১৯৩১-এ পার্শ্ববর্তী নটি সমবায় ঋণদান সমিতির সভ্যসংখ্যা ছিল '১৯৮ জন। সমবায়-সেচ-সমিতিগুলির মাধ্যমে সেচের পুকুর সংস্কার ও নালা তৈরি হত। শান্তিনিকেতনের মধ্যবিত্ত সমাজের ছাত্রদের এবং অভিভাবকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের ছাপ চাকরির জন্য অত্যাবশ্যক বোধ হওয়ার রবীন্দ্রনাথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এন্ট্রান্স পরীক্ষা ও পরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর আদর্শরক্ষার জন্য একেবারে নিম্নবিত্ত কটি ছেলেকে নিয়ে স্বনির্ভরতা শিক্ষা দেবার জন্য 'শিক্ষাসত্র' নামক অবৈতনিক আবাসিক বিদ্যালয় খুলেছিলেন ইতিমধ্যে। শান্তিনিকেতনে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের বাড়ির পাশে একটি চালাঘরে

তারা থাকত, গো-সেবা করত বাগানে সবজি করে এবং বাঁশের বেতের মোড়া টোকা করে বেচত, তাঁত বুনে কাপড় এবং সেই কাপড় কেটে জামা তৈরি করে পরত। শ্রীনিকেতন থেকে ননীবালা রায় এসে তাদের প্রাথমিক শুশ্রূষা শেখাতেন। সন্তোষকুমারের মৃত্যুর পর শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনে উঠে যায়, প্রেমচাঁদ লাল সেখানে গোশালার কর্মী ছিলেন, তিনি তাদের ভার নেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি চলে গেলেও বহুদিন শিক্ষাসত্র গুরুদেবের আদর্শ বজায় রেখে চলেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বভারতীর ভার নেওয়ার পর শিক্ষাসত্রে অনাবাসিক ছাত্ররাও কাছাকাছি গ্রাম থেকে আসছে, শান্তিনিকেতন থেকেও ছাত্রছাত্রীরা যাতায়াত করছে দুবেলা স্কুলের মোটরবাসে।

একটি-একটি বড় গ্রামকে কেন্দ্র করে পাঁচ-সাতটি গ্রামে কৃষি, গোপালন, স্বাস্থ্যসমিতি গড়ে উঠেছে। গ্রামের ধর্মগোলায় কৃষক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান-গম জমা রেখে দেয়, প্রতিবেশী সে শস্য প্রয়োজনে ধার নেয় ও সুদশুদ্ধ শোধ করে। সমবায় কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে ঋণদান সাহায্যের উৎপীড়ন কমিয়েছে। গোশালায় সিন্ধি ও পাঞ্জাবি গোরুর সঙ্গে দেশী গোরুর মিশ্রণে উৎপন্ন সংকরজাতীয় গোরু ও বলদ আজ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়েছে উন্নত জাতের মুরগি-মোরগের মতো।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামসংগঠন বিষয়ক বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গেলেও পঞ্চাশ-ষাট পৃষ্ঠার বই লিখতে হয়। স্বাধীনতার পর বিশ্বভারতী সরকারি তত্ত্বাবধানে অনেক ব্যাপকভাবে কাজে হাত দিয়েছে। এদিকে গ্রামোন্নয়নের অনেক কাজ সরকার সরাসরি ভার নেওয়ায় শ্রীনিকেতনের দায়িত্ব কমেছে। কৃষি মহাবিদ্যালয়ে, সমাজ শিক্ষা-শিক্ষণ বিভাগে, তথ্যসংগ্রহ ও গবেষণা বিভাগে, জনস্বাস্থ্য, কুটিরশিল্প, বয়স্কশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচেষ্টায় চলন্তিকা গ্রন্থাগার, সমবায়কোষ, ধর্মগোলা, আদিবাসী কল্যাণ-প্রচেষ্টা ও ব্রতী বালক-বালিকার সংগঠনে, ভূমিসংরক্ষণে, লোকশিক্ষাসংসদে রবীন্দ্রনাথের আরব্ধ কাজ কোথাও বেড়েছে, কোথাও বন্ধ হয়েছে, কোথাও আদর্শ ক্ষুণ্ণ করে টিকে আছে। শিল্পভবনে চামড়া ট্যানিং বন্ধ হয়েছে, চামড়ার উপর অলংকরণ (গঁদের আঠা দিয়ে বাটিকের রূপরেখা চিত্রণের সহজ পদ্ধতি শ্রীনিকেতনেই আবিষ্কৃত হয়) আজ ভারতের বাইরে সমাদৃত হলেও নিত্য-নতুন ডিজাইনের ঝোলা, বটুয়া, প্রসাধনপেটিকা, বইয়ের মলাট, লেটার প্যাড, পোর্টফোলিও প্রভৃতি না হওয়ায় (শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ও তাঁর কন্যা-জামাতা এবং তাঁর কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা ঐ বিভাগের প্রাণস্বরূপ ছিলেন) এবং বয়নশালার বিছানাঢাকা, পরদা, কাঁধে ঝোলাবার থলি, (জাপানি ও সুইডিস তাঁতের শৌখিন নক্সা বন্ধ হওয়ায়) মার্জিতরুচির দারুশিল্প এবং মৃৎশিল্প (কেয়োলিনের অভাবে দেশী মাটির ফুলদান, প্রদীপ, পিয়ালা, পিরিচ প্রভৃতি বিচিত্র আকারে ও রঙে 'গ্লেজ' করে নির্মিত হয়) হাতে তৈরি কাগজ, পুতুল তৈরি প্রভৃতি পূর্বগৌরব হারিয়েছে। যদিও বহু ছাত্র কাছাকাছি গ্রামে কাঠের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। গ্রামে নতুন করে ঘানি চালাবার উদ্যোগ ও পাঁউরুটি তৈরিও বন্ধ হয়েছে। শ্রীনিকেতন থেকে শিক্ষা পেয়ে ছেলেমেয়েরা অবশ্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামে বসে নানা বিচিত্র শিল্প সৃষ্টি করছেন, রবীন্দ্রসংস্কৃতির বিকিরণে, সৌন্দর্যবোধ ও সুরুচির উদ্বোধনে সাহায্য করছেন। বীরভূম ইলামবাজারের গালার কাজ এক সময়ে ভারতবিখ্যাত ছিল। বিদেশী খেলনা ক্রমে বাজার দখল করায় ঐ শিল্প ডুবতে বসেছিল, শেষ দুজন শিল্পীকে শ্রীনিকেতনে এনে আধুনিক রুচির শৌখিন গালার কাজ শেখানো হচ্ছিল, সম্প্রতি বোধহয়

তা বন্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসম্প্রসারণের আর একটি পরিকল্পনা লোকশিক্ষা সংসদও সম্প্রতি বন্ধ হয়েছে। নানা কারণে যে-সব ছেলেমেয়ে এবং বয়স্ক নরনারী স্কুল-কলেজে যেতে পারেন না তাঁরা যাতে নিজেদের চেষ্টায় গ্রামে বসে একটা নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসরণ করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত জ্ঞানলাভ করে শিক্ষিত সমাজে স্থান পেতে পারে তার ব্যবস্থা ছিল, আক্ষরিকা প্রাথমিকী, প্রবেশিকা, আদ্য-মধ্য ও অন্ত্য পরীক্ষার মারফতে। স্থানীয় কোনো শিক্ষাব্রতী পুরুষ বা মহিলা দায়িত্ব নিলে তাঁর সাহায্যে এবং সংসদ সম্পাদকের সঙ্গে পত্রযোগে শিক্ষা লাভ করে পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্র-কর্তা বা কর্ত্রীর সামনে বসে সংসদের পাঠানো প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখত। খাতাগুলি কেন্দ্র-কর্ত্রী বা কর্তা সংসদে পাঠালে বিশ্বভারতীর পরীক্ষকেরা সেগুলি পরীক্ষা করে দিলে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হত। নীচের দিকে অভিজ্ঞানপত্র এবং শেষ পরীক্ষায় সাহিত্যভারতী, সাহিত্যতীর্থ, ইতিহাসভারতী বা ইতিহাসতীর্থ উপাধি দেওয়া হত। রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনানুযায়ী ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রামে, নগরে, পাঠাগারে, গ্রন্থাগারে, কারাগারে, ব্যক্তিবিশেষের গৃহে, এমন কি বিশ্ব-ভ্রাম্যমান জাহাজে পোতাধ্যক্ষককে পরিদর্শক রেখে পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে। শতাধিক কেন্দ্রে স্থানীয় চেষ্টায় পাঠচক্র গড়ে উঠেছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দেড় হাজার পর্যন্ত উঠেছিল এক সময়ে। চাকরির ক্ষেত্রে উপযোগিতা না থাকায় সংসদ প্রায় আটাশ বছর সগৌরবে কাজ করে ক্রমে ক্ষীণকায় হয়েছিল। শেষ সম্পাদক প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কুড়ি বছর কাজ চালিয়ে পদত্যাগ করার পর ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয়েছে।

লোকশিক্ষা সংসদের প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরোয়নি। রবীন্দ্রচিন্তাধারায় যে-সব ছাত্রছাত্রী ঐ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে শিক্ষালাভ করেছে, চাকরি না পেলেও সুশিক্ষিত সুনাগরিক হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রের অধ্যক্ষ সমীরণ চট্টোপাধ্যায় এবং পল্লী-উন্নয়নের কর্মী তারকচন্দ্র ধরের নাম উল্লেখ্য। রথীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষ থাকার সময় এবং বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে যাওয়ার পর বিশ্বভারতীর উপাচার্য হওয়ার পরেও নিয়মিত বিভিন্ন গ্রামের কাজের খোঁজ-খবর নিতেন এবং শৌখিন কাঠের কাজে ও চামড়ার কাজে শিক্ষণে ও লোকশিক্ষাসংসদের প্রশ্নপত্র রচনায় অংশ নিয়েছেন। তাঁর সহসচিবরূপে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য অনেকদিন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চা ও অভিনয়াদির দ্বারা শ্রীনিকেতনে এবং কাছাকাছি গ্রামগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী কল্যাণকার্যের সঙ্গে আনন্দকে মিলিয়েছিলেন। ঐ সময়ে কলাভবনের ছাত্র শিশিরকুমার ঘোষ আশ্রমবাসীকে সংগীতে মাতিয়ে রেখেছিলেন। বিশ্বজিৎ রায় গ্রামে গ্রামে সংগীতশিক্ষা দিতেন। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা ও মহিলাসমিতির সম্পাদিকা ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের মেয়েদের নিয়ে ও শিশুদের নিয়ে প্রথম অভিনয় আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথের গ্রামসংগঠনের কাজে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য অনেকদিন অবৈতনিক সহাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর পর নীলাদ্রিশেখর বসু, ড. ধীরানন্দ রায় সহসচিব ছিলেন। তারকচন্দ্র ধর গ্রামের কাজে, সন্তোষচন্দ্র ভঞ্জ শিল্পভবনের অধ্যক্ষরূপে, মণীন্দ্র রায় ও মণীন্দ্রচন্দ্র সেন শিল্পভবনের কর্মপরিচালক ও বয়নশালার কর্মীরূপে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মণীন্দ্র রায়ের মতো নির্লোভ দেশসেবকের অকালমৃত্যুতে রথীন্দ্রনাথ তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্মীকে হারান। হৃষীকেশ চন্দ্র যন্ত্রশালার কাজে অনেকদিন কঠিন পরিশ্রম করেছেন। কৃষিক্ষেত্রের কাজে

কেদারেশ্বর গুহ এবং গোশালার কাজে পরিমল মিত্রের নাম স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, "মানুষ পশুর চেয়ে বড় হয়েছে পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফসল সহজে আয়ত্ত করতে পেরে পুঁথিপত্রের মাধ্যমে। চাকরি না পাক, জীবিকার্জনের নানা পথে অর্জিত জ্ঞান মানুষকে সাহায্য করে। ভারতবর্ষের জঙ্গলে যে হাতিটা ঘুরে বেড়ায় আফ্রিকার জঙ্গলে তার জ্ঞাতি হাতিটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু পৃথিবীর যে প্রান্তেই জন্ম নিক শিক্ষার দ্বারা মানুষ পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের পরিচিত সমস্ত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির— সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কীর্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। জ্ঞান মানুষের দৃষ্টির চিন্তার সংকীর্ণতা দূর করে, তাকে পশুত্বের ঊর্ধ্বে উন্নীত করে।" গ্রামসংগঠনে রবীন্দ্রনাথের শুভপ্রচেষ্টা আজ বাংলার বীরভূম ছাড়িয়ে ভারতের এবং পৃথিবীর দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছে। স্বনির্ভরতা এবং সমবায় পদ্ধতি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়নি আজও। সরকারি কাজে নিঃস্বার্থ পল্লীদরদী কর্মীর অভাবে আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে না। তবু আমরা আশা ছাড়ব না, কবির কথায়, 'মরে না, মরে না কভু, সত্য কভু মরিবার নহে।' তিনি বলেছিলেন, "সংসার মাঝে দুএকটি সুর রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর, দু একটি কাঁটা করি দিব দূর, তারপরে ছুটি নিব।" শুধু সাহিত্যে সংগীতে নয়, গ্রামজীবনে কিছু সংকীর্ণতা, কুরুচি, আলস্য এবং প্রবলের উৎপীড়ন তিনি কমিয়ে গেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর ইচ্ছা ছিল, "মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরি লোক।" রবীন্দ্রভক্ত নগরবাসী কবির সাহিত্য, নৃত্যগীত, অভিনয়-উৎসবের ভাগ তাদের অবহেলিত গ্রামবাসীকে যেন দিতে ভুলে না যান, তাদের দুঃখমোচনে, শিক্ষাপ্রসারে সাধ্যমত সাহায্য করেন, তবেই কবিকে সত্যকারের শ্রদ্ধা জানানো হবে।

রুজভেল্টের কাছে রবীন্দ্রনাথের তার : রাজনৈতিক পটভূমি

নেপাল মজুমদার

১৯৪০ সালের মে-জুন মাসের কথা। ইউরোপীয় ভূখণ্ডে মহাযুদ্ধের অবস্থা তখন ভয়াল রূপ ধারণ করেছে। নরওয়ে যুদ্ধের বিপর্যয়ের জন্য যখন চেম্বারলেন পার্লামেন্টে অত্যন্ত তীব্র ও কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে পদত্যাগের সংকল্প করেছেন এবং ব্রিটেনে ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট গঠনের আওয়াজ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময় (৯ মে) জার্মানি চতুর্দিক থেকে প্রচণ্ড বিক্রমে হল্যান্ড ও বেলজিয়াম আক্রমণ করে এবং ফ্রান্সের সীমান্ত ভেদ করে কয়েকটি জায়গা দখল করে নেয়। এর ফলে ইংল্যান্ডে চেম্বারলেন সরকারের পতন হয় (১০ মে), গঠিত হয় চার্চিলের নেতৃত্বে নতুন আপৎকালীন জাতীয় সরকার। কিন্তু জার্মানির প্রচণ্ড 'ব্লিৎস ক্রিগ্' আক্রমণের মুখে মিত্রশক্তি টিকতে পারে না। ১৫ মে হল্যান্ডের হেগ, আমস্টার্ডাম, রটারডাম ও বেলজিয়ামের নামুর দুর্গ এবং সেই সঙ্গে ফ্রান্সের সিডান এলাকা জার্মানদের দখলে আসে। ১৭ মে ব্রুসেলস্ নগরীর এবং পরদিন আন্টোয়ার্প নগরীরও পতন হয়। বিজয়ী নাৎসিবাহিনী তখন বিপুল বিক্রমে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে আক্রমণ চালায় এবং প্যারিসের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করে। ইংলিশ চ্যানেল এলাকায়ও জার্মান অভিযান শুরু হলে ব্রিটিশ নৌশক্তির সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধের সূচনা হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন কালিম্পঙে। মহাযুদ্ধের এই নিদারুণ বীভৎসতায় কবির মানসিক প্রতিক্রিয়ার আভাস তো আগে থেকেই পাওয়া গিয়েছে। কালিম্পঙে থাকাকালে রচিত কয়েকটি কবিতা ও চিঠিপত্রেও তাঁর এই মানসিক যন্ত্রণা অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কবির ধারণা, এই মহাবিধ্বংসী মারণ যুদ্ধে একটা মহাপরিবর্তনের—একটা নতুন যুগের সূচনার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মহাধ্বংসের চিতাভস্মে মানুষ মহাসৃষ্টিরই অঙ্গীকার গ্রহণ করবে। 'অভিশাপ' কবিতায় (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৭ ; পৃ ২৮২-৮৩) কবি লিখলেন :

রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
        শতশত নগর গ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে ;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
        বন্যা নামে যমলোক হতে
রাজ্য সাম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা স্রোতে।
        যে লোভ-রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে
সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো,
        দেশ-বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,

লোলজিহ্বা সেই কুক্কুরের দল
অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
ভুলে গেল আত্মপর ;
আদিম বন্যতা তার উদ্‌বারিয়া উদ্দাম নখর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলো ছিন্ন করে,
ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।
★ ★ ★
শ্মশান-বিহার-বিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি
বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা
শত স্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি পান।
এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে
মানব তপস্বী-বেশে
চিতাভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে।
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

(২২। ৫। ৪০, গৌরীপুর ভবন, কালিম্পঙ)

যুদ্ধের বিরুদ্ধে এতখানি সুতীব্র ঘৃণা, এত ক্রোধ ও আক্রোশ সমকালীন বাংলা কাব্যে আর কারও কবিতায় প্রকাশ পায়নি। এমন বলিষ্ঠ ও জোরালো কণ্ঠস্বর, এমন লক্ষ্যভেদী ও সার্থক শব্দপ্রয়োগ এবং চিত্রকল্প সৃষ্টিরও দ্বিতীয় নজির নেই।

দিন কয়েক পরে বুলোন নগরীর পতন হয়, সে দিনই (২৪ মে '৪০) রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে কালিম্পঙ থেকে এক পত্রে তাঁর এই কবিতা রচনা সম্পর্কে লেখেন—

"···তুমি জানো আমার অনেক কবিতা দুর্যোগের ফসল। দুর্দিনের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ আমার কলমের স্বভাব—সে চেম্বারলেনের ছাতার বাঁটে তৈরি নয়। লক্ষ্মীর চেলারা দুঃসময়ের কাছে ভেবড়ে যায় কিন্তু সরস্বতীর চেলা তাকে ডিঙিয়ে যায় কিংবা তার ফুটোয় ফুটোয় বাঁশির আওয়াজ তুলে উদ্‌বিগ্ন হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস ডুবিয়ে দিতে থাকে। আজ এই খানিকক্ষণ হোলো সূর্যের আলো পরিণত শিমুলের তুলোর মতো ফেটে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশে আকাশে একটা দুশ্চিন্তার কালিমা লেপে গিয়েছিল সেটাকে মুছতে আরম্ভ করেছে। মনে আশা হচ্ছে কাছে হোক দূরে হোক একটা সহজ পরিণাম আছেই যার মধ্যে ভাগ্যের প্রসন্নতা প্রকাশ পাবে। মানুষের মন হিসেবী, তাই সে ভীরু,

তাই সে আশঙ্কার কারণ খতিয়ে খতিয়ে মাথা ধরিয়ে তোলে। মানুষের আত্মা বীর্যবান, সে নৈরাশ্যবাদী নয়, কেন না তার মাপকাঠি বহুদূরকে নিয়ে। তার মাপকাঠি রাজ্য-সাম্রাজ্য পেরিয়ে যাবে, পৌঁছবে সেইখানে যেখানে সর্বমানবের চরম জয়পতাকা অভ্রভেদ করে আছে। সেই পতাকার বাহন কারা সে তকরার করে লাভ নেই, নিশ্চয়ই খুঁতখুঁতে-ঝগড়াটে পরশ্রীকাতর বাঙালি নয়। তবু বাঙালিও সেখানকার তীর্থযাত্রীদের জন্যে একটা কিছু পাথেয়ের জোগান দেবে। কিন্তু হায়রে, জগজ্জয়ী বীরের অন্নে ক্ষুদ্র সব কীট লাগিয়ে দিয়ে বাঙালি প্রতিদিন তাতে বিকার ঘটিয়ে দিচ্ছে। ওর মনের মধ্যে উইয়ের বাসা, তৈরি জিনিসকে নষ্ট করতেই আছে। ওর কণ্ঠে সবচেয়ে যে সুর অকৃত্রিম সে হচ্ছে দুয়ো দেবার সুর।…"

'মানুষের আত্মা বীর্যবান… পৌঁছবে সেইখানে যেখানে সর্বমানবের চরম জয়পতাকা অভ্রভেদ করে আছে।'—এ কয়টি কথা লক্ষণীয়। কবি এখানে মনুষ্যত্বের সংগ্রামে মানুষের নৈতিক ও আত্মিক শক্তির মহা-পুনরুত্থানের প্রতি তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জ্ঞাপন করেছেন। বিশ্বমানবের এই চরম দুর্যোগের দিনে আজ যখন এই মহান আদর্শবাদের জন্য চরম আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামের প্রস্তুতির প্রয়োজন, বাঙালি তখন পারস্পরিক দোষারোপ ও ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থের কলহে লিপ্ত, এটাই কবির আক্ষেপ। এই মন্তব্যের দ্বারা কবি বাংলার সম-সাময়িক বিশ্রী ও নোংরা পলিটিক্সকে চরম তিরস্কার ও ভর্ৎসনা জানিয়েছেন। স্মরণ রাখা দরকার, বাংলা দেশে তখন সুভাষপন্থীদের সঙ্গে অ্যাডহকপন্থী ও হিন্দুমহাসভা দলের বিরোধ-সংঘাত চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। পত্রের উপসংহারে কবি লিখেছেন—

"চেষ্টা করে দেখছি য়ুরোপের ইতিহাসে পরে পরে দুটো দারুণ যুদ্ধের তাৎপর্য বুঝে দেখতে। এই নিয়ে যারা উত্তেজিত উৎসাহ প্রকাশ করচে তারা কাপুরুষ। তারা নিজেরা অক্ষম বলে সক্ষমদের সংকটে উল্লাস বোধ করচে। এটা হচ্চে দূর থেকে নিরাপদে দুয়ো দেবার প্রবৃত্তি।" (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃ ৩৫২)

স্মরণ রাখা দরকার, যুদ্ধে মিত্রশক্তির ক্রমাগত বিপর্যয়ে সেদিন দেশের সাধারণ মানুষের—এমন কি বহু শিক্ষিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তির মনেও একটা চাপা আনন্দ-উল্লাস উঠেছিল। কবি তারও নিন্দা করলেন। এর সপ্তাহখানেক পরে কবি অমিয়বাবুর উদ্দেশে 'নবজাতকের উত্তরকাণ্ড' শিরোনামে একটি কবিতা লিখে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দেন (৩১ মে), এটিও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় আগের কবিতারই রেশ পাওয়া যায় :

'দামামা ঐ বাজে
দিনবদলের পালা এলো
ঝোড়ো যুগের মাঝে
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়,
নইলে কেন এত অপব্যয়
কেন এ অন্যায়।
অন্যায়ের এই সম্মার্জনী
উঠেছে আজ ঝেঁকে।

★ ★ ★

শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে,
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কী যাবে কী রইবে।
পালিস-করা জীর্ণতাকে চিন্‌তে হবে আজি,
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি।

এই কবিতায়ও কবি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সমাজসভ্যতার সুনিশ্চিত ধ্বংসের কথাই ঘোষণা করেছেন।

বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে তখন প্রচণ্ড লড়াই চলছে। ৪ জুনের (১৯৪০) মধ্যেই ফ্লান্ডার্স ও ডানকার্কের পতন হয়। ফ্লান্ডার্স ও ডানকার্কের যুদ্ধে মিত্রপক্ষকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। জার্মানরা এরপর প্যারিস দখলের জন্য মরিয়া হয়ে আক্রমণ এবং যুগপৎ প্যারিস ও ব্রিটেনের বহু এলাকায় প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করতে থাকে। ইতালি ঠিক এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল। ১০ জুন ইতালি মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বিপুল বিক্রমে প্যারিসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শত্রুপক্ষ যখন প্যারিসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত সেই সময় ফরাসি প্রধানমন্ত্রী মঁসিয়ে রেনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন জানিয়ে ১০ ও ১৩ জুন পর পর দুটি জরুরি তারবার্তা প্রেরণ করেন। আমেরিকা নিরাপদ দূরত্বে থেকে যুদ্ধে মিত্রপক্ষের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিল মাত্র—তখনও পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কিংবা সাহায্য করেনি। ১ জুন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মার্কিন কংগ্রেসের কাছে এক হাজার মিলিয়ান ডলার যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ করার জন্য আবেদন জানালেন। ১০ জুন ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঘৃণা ও পাশবশক্তির অপদেবতার বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই করছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি তাঁদেরই প্রতি। তাঁদের সমস্ত রকম বস্তুগত সাহায্যদানের কথাও কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করছেন বলে তিনি জানান। তবে এটাও মৌখিক প্রতিশ্রুতি মাত্র। বিপন্ন ফ্রান্সের এই আশু বিপত্তির তাতে কোনই সুরাহা হবে না।

কিন্তু ফরাসিদের সব আবেদন, সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ১৪ জুন (১৯৪০) ঐতিহাসিক প্যারিস নগরীর পতন হয়। পরদিন সমস্ত পত্রপত্রিকায় এই দারুণ দুঃসংবাদ ফলাও করে ছাপা হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন কালিম্পঙে। প্যারিসের পতনের সংবাদে কবি যে কী ভয়ানক মর্মাহত ও বিচলিত হন, বলার নয়। সংবাদপত্রে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে ফরাসি প্রধানমন্ত্রী রেনোর ঐ আকুল আবেদন পাঠ করে কবি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন। কবি ঐদিনই মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে একটি জরুরি তারবার্তা পাঠান। ভারতবাসীর নিদারুণ অসহায় অবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বিশ্বব্যাপী এই মহাবিধ্বংসী 'মারণযজ্ঞের' অবসান ঘটাবার জন্য আমেরিকাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আবেদন জানান (কালিম্পঙ, ১৫ জুন '৪০)। সে তারবার্তায় কবি বলেন :

'Today, we stand in awe before the fearfully destructive force that has so suddenly swept the world. Every moment I deplore the smallness of our means and the feebleness of our voice in India, so utterly inadequate to stem, in the least, the tide of evil that has menaced the permanence of civilization.

'All our individual problems of politics today have merged into one supreme world politics, which, I believe, is seeking the help of the United States of America as the last refuge of the spiritual man, and these few lines of mine merely convey my hope, even if unnecessary, that she will not fail her mission to stand against the Universal disaster that appears so imminent.'

কবির এই তারবার্তা প্রেরণের সংবাদ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র প্রচারিত হয়, পরদিন দেশের প্রায় সমস্ত দৈনিকপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড়ো বড়ো হরফে প্রকাশিত হয়। আমেরিকার বিখ্যাত New York Times পত্রিকায়ও এই খবর প্রকাশিত হয়। সুতরাং সে হিসাবে এটিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে রবীন্দ্রনাথের নিছক ব্যক্তিগত তারবার্তা বলা যায় না, বরঞ্চ এটিকে কবির প্রকাশ্য আবেদন-বিবৃতি বা Public Statement: Appeal to America বলাই শ্রেয়।

এ একটা মস্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। খাস আমেরিকার কথা বাদ দিলে সমকালীন বিশ্বের আর কোনো মনীষী, আর কোনো শিল্পী-সাহিত্যিককে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে অনুরূপ মর্মে আবেদন জানাতে দেখা যায় না। অথচ আমেরিকার উপর এই নৈতিক চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা মনীষী ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের খুব কমও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যে কতবড়ো বিবেকবান কবি ও মনীষী ছিলেন এই ঘটনায় তা আরও একবার প্রমাণিত হল! কারো অনুরোধে উপরোধে নয়, সম্পূর্ণ নিজের বিবেকের তাড়নায় কবি রুজভেল্টের কাছে এই অনুরোধ জানান।—যদিও মঁ রেনোর ঐ আবেদন-এর একটা উপলক্ষ্য হয়েছিল বলা যায়। 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' মন্ত্রের উপাসক রবীন্দ্রনাথ এখানে নিছক শান্তিবাদীদের (বা Pacifists) মতো বলেননি, 'আমি সমস্ত রকম যুদ্ধের বিরোধী',—কিংবা গান্ধিজীর মতো বলেননি, 'আমি সমস্ত রকম হিংস্র বা সশস্ত্র প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিরোধী'। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের পৈশাচিক বর্বরতার বিরুদ্ধে এখানে তিনি মিত্রপক্ষের সমস্ত প্রতিরোধ-যুদ্ধকে কায়মনোবাক্যে সমর্থন করলেন এবং আমেরিকাও যাতে পূর্ণশক্তিতে এই বর্বরতাবিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ করে তারই জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত আকুল নিবেদন জানালেন। স্মরণ রাখা দরকার, এবার মহাযুদ্ধের শুরুতেই কবি নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও ইঙ্গ-ফরাসি শক্তির প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রতি নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে তার জয়কামনা করেছিলেন,—একটি মাত্র প্রধান কারণে যে, এর দ্বারা ফ্যাসিবাদী বর্বরতার হয়ত অবসান ঘটবে। কবি সেদিন বলেছিলেন (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯):

'এই যুদ্ধে ইংলন্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেন না মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না।'

এর পর যখন একে একে পোল্যান্ড ডেনমার্ক নরওয়ে বেলজিয়াম হল্যান্ড লুকসেমবুর্গ এবং সর্বশেষে মহা পরাক্রমশালী ফ্রান্সেরও পতন হয়, তখন আর কবি স্থির থাকতে পারলেন না। মুহূর্তের জন্যও তাঁর ব্যক্তিগত মানসম্মান ও সীমাবদ্ধতার সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ দূরে ঠেলে তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে জরুরি তারবার্তায় তাঁর মনোবেদনা ব্যক্ত করে আমেরিকাকে এ যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ হবার আহ্বান জানালেন। এ চিন্তা মনে এল না, মহাঐশ্বর্যশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে তাঁর মত কবির—তা যতই

খ্যাতিমান হোন না কেন—আবেদনের তেমন কোনো মূল্যই নেই। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কবিকে জবাবে কী বলেছিলেন কিংবা তিনি আদৌ তার জবাব দিয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে প্যারিসের পতনের পরদিনই তিনি ফরাসি প্রধানমন্ত্রী মঁ রেনোর জবাবি তারবার্তায় ফরাসিদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রশংসা এবং মৌখিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। তবে সেই প্রশংসাবাক্যে ফরাসিরা মোটেও সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। জাতির এতবড় সর্বনাশ ও বিপদের দিনে তারা আমেরিকার কাছে সক্রিয় সাহায্য প্রত্যাশা করেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্যারিসের পতনের পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ ও 'মাদার' একযোগে মাদ্রাজের তৎকালীন গভর্নরের কাছে এক বাণী প্রেরণ করে এই যুদ্ধে ইংরেজের প্রতি নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে তার জয়কামনা করেন। এই যুদ্ধকে তাঁরা ন্যায়ের এবং মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। সেই বাণীতে শ্রীঅরবিন্দ আত্মিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা না করে অত্যন্ত বাস্তববাদীর মত নাৎসিবাদের ধ্বংস ও পরাজয়ের জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ-যুদ্ধের উপরই প্রধানত নির্ভর করতে চেয়েছেন এবং এই কারণেই তিনি যুদ্ধে ব্রিটেন বা মিত্রশক্তির জয়কামনা করেছেন।

প্রসঙ্গত আরও একটি তথ্য ও ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেদিন প্যারিসের পতন হয় ঐদিনই প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটিকার অভিনয় হচ্ছিল। রেডিও মারফৎ এই খবরও প্রচারিত হয়। মাদ্‌মোয়েল বসনেক নামে এক ফরাসি মহিলাই সেদিন সন্ধ্যায় কবির শয্যাপ্রান্তে আছাড় খেয়ে পড়ে কবিকে এই সংবাদ নিবেদন করেন। মৈত্রেয়ী দেবী ঘটনাটির এক মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন—

"...এইবারই কালিম্পং-এ একদিন সন্ধেবেলা তাঁর কাছে বসে আছি,—তখন ঘোরতর যুদ্ধ চলেছে, প্যারিসের সেদিন পতন হয়েছে। কিছুদিন থেকে রোজই সবাই মিলে রেডিওর সংবাদ শোনা হচ্ছে, খবরের কাগজ পড়া হচ্ছে, আর চলেছে উত্তেজিত আলোচনা। বিশেষ করে 'মাদ্‌মোয়েল বসনেক' বলে একটি ফরাসি ভদ্রমহিলা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, ফ্রান্সের খবর তাই খুঁটিয়ে শোনা হত। সেদিন গুরুদেবের শরীরটা ক্লান্ত ছিল, চুপচাপ বিশ্রাম করছেন। হঠাৎ দরজার কাছে উত্তেজিত অথচ মৃদু করুণ কণ্ঠস্বর 'গুরুদেব' বলে মাদ্‌মোয়েল ঘরে ঢুকে তাঁর বিছানার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন—"গুরুদেব আজ ওরা প্যারিসে 'ডাকঘর' অভিনয় করছে এখন।" উনি উঠে বসলেন। বেশ বুঝলুম মনের ভিতরে একটা নাড়া লাগল। 'আজ? আজ ওরা 'ডাকঘর' অভিনয় করছে?' একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে আবার যেমন ছিলেন তেমনি শুয়ে পড়লেন, শুধু উত্তেজিতভাবে পা নড়ছিল। অনেকক্ষণ পরে বললেন—'সেবারও রাশিয়াতে ওদের দারুণ দুঃখের দিনে ওরা বারবার অভিনয় করেছে 'King of the Dark Chamber'। আবার দীর্ঘক্ষণ নীরবতা—'একেই বলে পুরস্কার'?" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ২৪৬-৪৭)

যুগান্তর পত্রিকায় অবশ্য লেখা হয়, ডাকঘর অভিনয় হয়েছিল প্যারিসের পতনের আগের দিন রাত্রে। এই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐ পত্রিকায় লেখা হয় : 'প্যারিস নগরীর পতনের ঠিক পূর্বদিন রাত্রে প্যারিস বেতারযোগে ফরাসী ভাষায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নামক নাটকখানি অভিনীত হইয়াছিল। খবরটি কেবল চমকপ্রদ নহে, ইহার সহিত পারিপার্শ্বিক করুণ অবস্থার চেহারাও বিজড়িত। নাৎসী বাহিনীর বিমানগর্জনে ফরাসীর আকাশ যখন কম্পমান, মারণাস্ত্রের ঝঞ্ঝনায়, মৃত্যুর আর্তনাদে পলায়মান উদ্ভ্রান্ত

জনতার কাতর কোলাহলে যখন সমস্ত ফরাসীদেশ আলোড়িত, শত্রুর আসন্ন আবির্ভাবের সম্ভাবনায় নগরবাসী ও রাজসরকার যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেই সময় সরকারী বেতারযোগে 'ডাকঘর' অভিনয়টি বড়ই মর্মস্পর্শী।…

'…দুর্দিন ও দুর্ভাগ্যের দরজায় দাঁড়াইয়া ফরাসীরা এই করুণ মধুর নাটকটি অভিনয় করিয়া কেবল যে রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহাই নহে, ফরাসী জাতির আত্মার ভিতরে যে অবিনশ্বর মুক্তি ও স্বাধীনতার তীব্র বাসনা লুক্কায়িত তাহারই একটা নির্ভুল উদাহরণ তাঁহারা জগতের সম্মুখে প্রচার করিয়াছেন।' (যুগান্তর ১০ আষাঢ় ১৩৪৭, ২৪ জুন ১৯৪০)

প্যারিসের পতনের পরদিন ভার্দুঁর (Verdun) পতন হয়। ঐদিন ফরাসি প্রধানমন্ত্রী মঁ রেনো পদত্যাগ করলে প্রেসিডেন্ট লেব্রাঁ (M. Lebrum) মার্শাল পেতাঁকে (Petain) মন্ত্রিত্ব গঠনের আহ্বান জানান। মার্শাল পেতাঁ দায়িত্ব গ্রহণ করেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে হিটলারের কাছে সন্ধিপ্রস্তাব পাঠালে হিটলার পূর্ণ আত্মসমর্পণের দাবি জানালেন। বলা বাহুল্য, বহু ফরাসি দেশপ্রেমিক মার্শাল পেতাঁর এই কার্যক্রম সমর্থন করেননি। দ্য গল প্রমুখ ফরাসি নেতারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে কৃতসংকল্প হলেন। ইংরেজরাও পেতাঁ-সরকারকে সমর্থন না করে দেশপ্রেমিক প্রতি ফরাসিকে মিত্রপক্ষে যোগদান এবং সহযোগিতার আবেদন জানান। এদিকে ফ্রান্সের পতনের পর জার্মানরা ইংলন্ডের উপর আক্রমণকে তীব্রতর করে। ২০ জুন ইংলন্ডের বিভিন্ন এলাকায় জার্মানরা প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে। ইতিপূর্বে এত ভয়াবহ আক্রমণ সেখানে হয়নি।

এসব সংবাদে কবির মন কী পরিমাণ উৎক্ষিপ্ত ও বিচলিত হচ্ছিল তা আর না বললেও চলে। কিন্তু তাঁর পক্ষে করারই বা কী আছে। একমাত্র সম্বল লেখনী। এই পৈশাচিক বর্বরতা ও নরহত্যালীলার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করে ঐদিনই তিনি অমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে এক খোলা-চিঠি লিখে সেটি প্রকাশের জন্য প্রবাসীতে পাঠিয়ে দিলেন। 'দস্তুর সভ্যতা' নামে সেই লেখা প্রবাসীতে (শ্রাবণ ১৩৪৭—পৃ ৪২৩-২৪) প্রকাশিত হয়। এই পত্রপ্রবন্ধের শুরুতেই কবি লিখলেন—

"কয়েক শতাব্দী পূর্বে য়ুরোপীয় সভ্যতা হঠাৎ সদাগরী শাবক প্রসব করতে শুরু করেছিল। তারা খাবার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমাদের এশিয়া আফ্রিকার পাড়ায় পাড়ায়, ওদের মধ্যে কেউ কেউ গিলেছিল মোটা মোটা পিণ্ড চর্ব্যচোষ্যলেহ্য নানাবিধ আকারে। এই ভোজের লোভনীয় মাংসগন্ধ পৌঁচচ্ছিল য়ুরোপীয় নাসারন্ধ্রে। যে সব বঞ্চিত শাবকদের জিভে জল আসছিল অথচ মুখে গ্রাস জুটছিল না, তাদের জঠরানল ঠান্ডা ছিল না। অবশেষে ভুক্ত অভুক্ত দুই পক্ষের মধ্যে লেগে গেছে কামড়াকামড়ি। একদা চলছিল শিকার এবং শিকারীর পালা, এবার শুরু হলো শিকারী এবং শিকারীর পালা। য়ুরোপ-জননীর পক্ষে এটা শোকাবহ। আজ সে কাতর কণ্ঠে বলচে শান্তি চাই। কিন্তু শান্তি তো বাইরে থেকে আসে না, ভিতরে তার উৎস। লুব্ধ অভ্যাসবশত অন্যদের না খেয়ে যাদের চলে না সেই মাংসাশীদের মধ্যে হননীতি কিছুতেই থামতে পারে না। বহুদিন থেকে এদের কারো বা সামনের দিকে প্রকাশ্যে কারো বা কসের দিকে গোপন দাঁতগুলো কী অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে চলেছিল আজকের দিনে বড় করে বদন ব্যাদান করতেই ভীষণভাবে সেটা প্রকাশ পেল। এটা যে না হলে নয়। শিকারকে চিবোতে যদি দাঁতের দরকার হয় তাহলে পাশের শিকারীকেও দাঁত খিঁচোবার জন্যে দাঁতের দরকার হবেই। আজকের হানাহানিতে যে জিতল

কালকের আশঙ্কা নিবারণের জন্যে তাকে উঠে পড়ে বৈজ্ঞানিক ডেন্টিস্ট্রির চর্চা করতেই হবে। শ্বাপদ সভ্যতার শিক্ষামন্দিরে এই আত্মঘাত চর্চাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠতে বাধ্য। এই কামড়ের ঘূর্ণ্যচক্র অন্তহীন বেগে বাড়তেই থাকবে। আজ যারা কামড়ায়নি কামড় খেয়েছে তারা দায়ে পড়ে কালই কামড়বিদ্যার পাঠশালা খুলবে। য়ুরোপের উত্তর অংশে অনেকদিন অহিংস্র শক্তিকে আশ্রয় করে যথার্থ সভ্যতার মহৎরূপ বিরাজ করছিল, আজ তারা খ্যাপা জন্তুর কামড় খেয়েছে, কাল তাদের ঠান্ডা রাখব কিসে? তাহলে এই বিরাট পশুশালার মধ্যে মানুষের সন্ধান পাব কোথায়। ডারুয়িন বলেছেন বানরের অভিব্যক্তি মানুষে কিন্তু মানুষের অভিব্যক্তি এ কোন্ জানোয়ারে। প্রাণীজগতের আদি যুগে বর্মে চর্মে ভারাক্রান্ত বিকট জন্তুরা আস্ফালন করে পৃথিবীকে দলিত করেছিল তারা তো প্রাণলোকে অসহ্য হয়ে উঠল, টিকতে পারল না—সৃষ্টিবিভাগে সেই ব্যর্থ পরীক্ষার স্মৃতি এখনি কি লুপ্ত হয়েছে। আবার সেই বর্মের বোঝা বেড়ে উঠে মানবধর্মকে অন্তরে অন্তরে ফেলবে পিষে।···প্রাচীন ডাইনোসরদের সঞ্চরণক্ষেত্র আজকের দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে, সেখানে তার প্রেত উঠেছে জেগে, যে রাস্তা দিয়ে তারা নিষ্ক্রান্ত হয়েছে সেই রাস্তা দিচ্ছে দেখিয়ে।”

বোধ করি রবীন্দ্রনাথের আর কোনো রচনায় যুদ্ধবাজ এই হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতাকে এত তীব্র ও কঠোরভাবে আক্রমণ করা হয়নি। এই আক্রমণ-অভিযানে (উপমা, প্রতীক, বিশেষণ ও শব্দচয়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে) রবীন্দ্রনাথ যে কী অমোঘ ও অব্যর্থ শরনিক্ষেপ করেছেন তার পরিচয় সমগ্র রচনাটির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। ফ্রান্সের পতনের পর কবি যে কী ভয়ানক ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছিলেন, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর মনে যে কী প্রমাণ ঘৃণা ও ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল তারও পরিচয় মেলে এই রচনার প্রতিটি ছত্রে।

কিন্তু এটি শুধু আবেগধর্মী সাহিত্যরচনাই নয়—যুক্তিপারম্পর্যে এবং তত্ত্বগত দিক থেকেও এর মূল বক্তব্য অর্থনীতি-রাজনীতি-শাস্ত্রসম্মত। সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা এবং মহাযুদ্ধের আসল রহস্যটুকুর মর্মভেদ করে তিনি তা অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন। কবির দিক থেকে অবশ্য এসব কথা নতুন নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতেই 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধেও তিনি প্রায় একই কথা বলেছেন। পরবর্তীকালেও নানা উপলক্ষ্যে নানা রচনায় বক্তৃতায় ভাষণে ও চিঠিপত্রাদিতে তিনি এই একই বক্তব্য তুলে ধরেছেন। মনে হতে পারে, কবি যেন বারে বারে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

তার একটা প্রধান কারণ এই যে, সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার মূল চরিত্রের, তার শোষণ ও লুণ্ঠনের তো কোনো পরিবর্তন হয়নি পরন্তু তা আরও তীব্রতর হয়েছে এবং লুঠের বখরা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই তারা বিশ্বজোড়া আরও এক ভয়াবহ যুদ্ধ-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে সুসভ্য জাতিগুলি আজ যে বীভৎস 'খেয়োখেয়ি' শুরু করেছে যা আদিম হিংস্র বর্বরতাকেও হার মানায়, তার মূলে রয়েছে তার সাম্রাজ্যবাদী বা পরদেশ-লুণ্ঠনের লোভ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তার প্রচণ্ডতা যতই ভয়াবহ হয়েছে ততই কবি বারেবারে এই মূল সত্যতা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার জন্য নিজের অন্তর ও বিবেকের থেকে তাগিদ অনুভব করেছেন। নৈতিক বিচারের মূল্য ও ভূমিকা সম্পর্কে কবি যে কী সুউচ্চ ধারণা পোষণ করতেন তার পরিচয় আগে বহুবার লক্ষ করা গিয়েছে। আরও একটা মস্ত বড় কথা এই, কবি সুসভ্য জাতিগুলির এই মহাবিধ্বংসী তাণ্ডব নৃত্যের

এমন বীভৎস দৃশ্য দেখার পরও মনুষ্যত্বের প্রতি তাঁর আস্থা হারাননি। এই ধ্বংসলীলার চিতাভস্ম থেকেই একদা মনুষ্যত্ববোধের মহাজাগরণ আসবে বলে আন্তরিক আস্থা ঘোষণা করে তিনি এই পত্রপ্রবন্ধের উপসংহারে বলেন,

"তবু সেই বর্মমন্থর জন্তুরাই যে মানুষের ভবিষ্যৎবর্ত্মের পথপ্রদর্শক এ কথা মন মানতে চায় না। কেন না সমস্ত বিরোধের মধ্যে মানুষকে দেখেছি। মাথাগুণতিতে তারা অল্প কিন্তু 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' আজ যে বৈশ্যয়ুরোপ ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র, শূদ্রের দাস্য নিজের শক্তিক্ষেত্রে অপহরণ করে অপ্রতিহত হয়ে উঠেছে এই তো দেখছি বিনাশের ঢালুতটে তার পা পড়ল। টিকে থাকবার শক্তি তার নয়, সে শক্তি তাদেরই যাঁরা অলুব্ধ, যারা নম্র, যারা বিশ্বাসপরায়ণ, যারা প্রমাণ করতে এসেছে মনুষ্যত্ব পরস্পরকে গিলে গিলে নয়, পরস্পরে মিলে মিলে। তারা কোনো একটা বিশেষ জাতি নয়, তারা সকল জাতির মধ্যেই ব্যক্তিগতভাবে অখ্যাত হয়ে আছে। আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার যাত্রা, এই কথা সে প্রমাণ করবে যে, সে মৃত্যুঞ্জয়।"

কিন্তু এত সব কথা বলার পরও কবি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। মনে হয় তাঁর বক্তব্যবিষয় তিনি পরিষ্কার গুছিয়ে বলতে পারেননি। ঐদিনই আবার অমিয়বাবুর একটি চিঠি এবং কবিতা এসেছিল। কবি তার জবাবে লিখলেন (২০ জুন '৪০) :

"… তোমাকে একটা চিঠি আজ সকালেই লিখেছি, কিন্তু তোমার চিঠির ঠিক উত্তর দেওয়া হয়নি। যেমন সমস্ত জীবাণুকোষ মিলে একদেহ, তেমনি প্রত্যেক মানুষকে মিলিয়ে এক মহামানব, এ বিশ্বাস আমি পূর্বেই জানিয়েছি। দেহকোষের এক অংশে আঘাত লাগলে সব দেহই পীড়িত হয়। ঐক্যের অনিবার্য ধর্মই তাই। ঐক্যের বেদনা যাঁরা নিজেরই মধ্যে উপলব্ধি করেন তাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলি। আমাদের ধারণার অতীত যে বিরাট মহাপুরুষে এই বোধ সম্পূর্ণ হয়ে আছে উপনিষদে তাঁকে বলেন সর্বানুভূঃ, তিনি সমস্তই অনুভব করেন। প্রত্যেকে তাঁর মধ্যে অথচ তিনি প্রত্যেকের অতীত। এই জন্যে তিনি নির্মমভাবে প্রত্যেককে বিচার করতে পারেন। তিনি বলতে পারেন সমগ্রের মধ্যে ভুল ঢুকেছে অতএব তাকে ত্যাগ করতে হবে। তিনি বলতে পারেন নতুন করে আরেক সমগ্র রচনা করা চাই। তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণতার একটা আদর্শ আছে—স্পষ্ট বুঝতে পারি প্রথম যুগের উদ্ভিদ পশুপক্ষী কী কুশ্রী ছিল, অভিব্যক্তির তপস্যায় সমস্তই একটা সুশ্রীতায় পৌঁছচ্ছে। এই অভিব্যক্তি তাঁরই আত্মোপলব্ধির সোপানপরম্পরা। দেখচি এতে স্খলন ঘটে, ছন্দ মেলে না ওজনের ভুল হয়, বুঝতে পারি তিনি সর্বশক্তিমান নন, সেই জন্যে তাঁকে এত কাটাকুটি করতে হয়, সেই কাটাকুটির দুঃখ আমরা এড়াব কী করে। আমাদের সেই চেষ্টাই নৈতিক চেষ্টা যে চেষ্টায় কাটাকুটির কারণের শোধন হয়, জগদ্‌গুরুরা তারি ধ্যান করেছেন। এই ধ্যানে তাঁরা পেয়েছেন মূলগত শোধনের উপায় প্রেম ও ত্যাগ—তাই তাঁরা প্রচার করেছেন। বলেছেন, মা গৃধঃ, বলেছেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। তাঁদের এই বাণী বিরাট মহাপুরুষের বাণীর অন্তর্গত। আমাদের আশার কথা এই বাণী উচ্চারিত হয়েছে, সুতরাং ক্রমশ যুগ যুগ ধরে এ বীজের মতো কাজ করবে নইলে এমন সব আশ্চর্য কথা ভাষা পেতই না।—এ কথার মতো অদ্ভুত কথা নেই যে আত্মবৎ সর্বভূতেষু, য পশ্যতি স পশ্যতি। বহু শতাব্দী ধরে এই নীতির ব্যতিক্রম হয়ে চলেছে—কিন্তু ব্যতিক্রমের ভিতর দিয়েই গড়া চলে, যেমন করে আমরা কবিতা লিখি… "

বলা বাহুল্য, এও এক মহান অধ্যাত্মবাদী কবির ভাবোচ্ছ্বাস। মাত্র এইটুকু বললেই সব কথা বলা হয় না। আর এ সব কথাও তিনি যে এই প্রথম বললেন তাও নয়। 'The Religion of Man', 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতামালায় এবং পরবর্তীকালে বহু রচনায় ও ভাষণে তিনি এই একই কথা বিভিন্নভাবে ও ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

বক্তব্য এই, মহাযুদ্ধ এবং বর্তমান সভ্যতার সমস্যা-সংকটের মূল কার্যকারণ সম্পর্কে কবির পর্যবেক্ষণ ও বিচার মোটামুটি ঠিক হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথটি তাঁর কাছে খুব পরিষ্কার ছিল না। অগণিত মানুষের শ্রেণীচেতনা, সংঘবদ্ধ আন্দোলন, বিদ্রোহ এবং সমাজ-আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবকে তিনি যে একেবারে দেখতে পাননি, তা নয়, কিন্তু তার উপর ঠিক ভরসা স্থাপন করতে পারেননি। মহাযুদ্ধের সেই প্রচণ্ড বিভীষিকার মধ্যে তার কোনো লক্ষণসূচনা কিংবা সম্ভাবনাও দেখা যায়নি। সমাধানের ক্ষেত্রে বস্তুত তিনি ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদীদের মতই মানুষের অধ্যাত্মচেতনা এবং নৈতিক পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখেছেন। আর তাঁর মতে, কিছু মহান ব্যক্তিত্বই মানুষের সেই শুভবুদ্ধি ও নৈতিক চেতনার পুনরুত্থান ঘটাতে সমর্থ হবেন। কেন না ধ্বংস ও হানাহানি প্রবৃত্তির পাশাপাশি মানুষের মনের মধ্যে মঙ্গল-ইচ্ছা ও কল্যাণ-চেতনা অলক্ষ্যে নীরবে কাজ করে চলেছে—প্রকৃতপক্ষে যা সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছানুসারেই হচ্ছে। কেন না সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং এই ভাঙাগড়ার মধ্যে সৃষ্টিকে ক্রমাগত পরিশোধিত ও সুন্দর করে তোলার সাধনায় রত আছেন। একেই তিনি বলেছেন সৃষ্টিকর্তার লীলা। এভল্যুশান তত্ত্ব (Evolution) রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে, সুন্দরের দিকে অভিব্যক্তির ঊর্ধ্বমুখী চিরযাত্রা,—সুন্দরের লক্ষ্যে মানুষের অবিশ্রান্ত যাত্রা, শুধু এটা বললেই সব বলা হয় না। সঙ্গে সঙ্গে অসুন্দর, অশুভের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম ও অভিযানের কথাটাও বিশেষ জোরের সঙ্গেই তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এই বক্তব্যের মধ্যেও একটা জিনিস লক্ষণীয়। এখানে তিনি 'ধারণার অতীত যে বিরাট মহাপুরুষের' কথা বলেছেন, তার থেকে জাগতিক মহাপুরুষদেরই সৃজনশক্তি ও নৈতিক মনোবলের মহিমা গান করেছেন বেশি। তাঁদের উদ্দেশেই তিনি জয়ধ্বনি করেছেন,—এবং শেষ পর্যন্ত করেছেন, বিশ্বজোড়া কোটি কোটি সাধারণত মানুষের। এই অতি-সাধারণ এবং সমষ্টি মানুষই একদিন সমস্ত দুঃখ-নির্যাতনভোগ ও মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে জগতের সমস্ত কিছু অন্যায়, শোষণ, পীড়ন ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। কবি সাধারণ মানুষের এই কল্যাণচেতনার ও সংগ্রামপরতার প্রতি তাঁর সুদৃঢ় আস্থার কথা ঘোষণা করে বললেন,—'আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার যাত্রা, এই কথা সে প্রমাণ করবে যে, সে মৃত্যুঞ্জয়।'

কিন্তু এ তো স্থায়ী সমাধানের কথা,—সুদূর কোন এক ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু এই বিশ্বজোড়া আশু সর্বনাশ ও বিনষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণের আশু উপায় বা পথ কী? এই সব আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেও কবি তাঁর বাস্তবতাবোধকে হারাননি। এবং হারাননি বলেই তিনি আমেরিকাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য রুজভেল্টের কাছে এমন আকুল আবেদন জানিয়ে তার করলেন। ফ্যাসিস্ট ও নাৎসিদের ঐ পৈশাচিক তাণ্ডবলীলাকে প্রতিহত করার জন্য আমেরিকাও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে মিত্রপক্ষের সঙ্গে প্রতিরোধ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হোক, কবির এই ছিল আন্তরিক ইচ্ছা। এই মোটা কথাটাকেই তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ ভাষায় এবং অত্যন্ত আবেগ দিয়েই বলেছিলেন তাঁর ঐ আবেদনের মধ্যে।

স্মরণ রাখা দরকার, তখনও সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হয়নি। তখনও পর্যন্ত মহাযুদ্ধের চরিত্ররূপ সঠিক অর্থে এবং সর্বাত্মক ফ্যাসি-বিরোধীরূপ পরিগ্রহ করেনি। ফ্যাসিস্টরাই যে মানবতন্ত্রের প্রধান শত্রু এবং তাদের পরাস্ত ও চূড়ান্ত উৎসাদনের জন্য জগতের সমস্ত দেশ রাষ্ট্র ও মানুষের যে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করা দরকার, এই বোধ ও চেতনা তখনও তেমনভাবে দেখা যায়নি। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের এই বিচার ও চিন্তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিশেষত ইংরেজের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবির মনে বিস্তর সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল এবং তা তিনি প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করেছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের যুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যে নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন ও জয় কামনা করতে দ্বিধা করেননি। ফ্যাসিজমই যে প্রধান এবং আশু শত্রু (Principal and Immediate Enemy) এবং এখনই সকলে মিলে তাকে পরাস্ত করাই যে আশু কর্তব্য এ মূল বিচারে তাঁর কোন ভুল হয়নি। উল্লেখযোগ্য যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-বিরোধী কবিতাগুলি ছাড়াও এই কালের মধ্যে তিনি ফ্যাসিস্ট দেশ ও নেতাদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে কয়েকটি ছড়াও রচনা করেন, যথা—

> "ঐ শোনা যায় রেডিওতে বোঁচা গোঁফের হুমকি
> দেশবিদেশে শহরে গ্রামে গলাকাটার ধুম কি!
> গোঁ গোঁ করে রেডিওটা কে জানে কার জিত,
> মেশিনগানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত।"

কিংবা

> "মনে রেখ দৈনিক,
> চা খাইবে চৈনিক
> গায়ে যদি বল পাও
> হবে তবে সৈনিক
> জাপানীরা যদি আসে
> চিঁড়ে নিক দৈ নিক
> আধুনিক কবিদের
> যত পারে বই নিক"

কিংবা

> "জাপানী জাপানী
> তোমার হাড়েতে লাগিবে কাঁপানি
> এখন যতই কর লাফানি ঝাঁপানি।"

এগুলিকে শুধু 'ছেলেভুলানো ছড়া' বলে অভিহিত করা যায় না। 'রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি/শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি'—হিটলার মুসোলিনীদের সম্পর্কেও কবির সেই একই কথা। এর প্রায় ২-৩ বছর পর 'ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' এবং 'গণনাট্য সঙ্ঘ' যেসব ফ্যাসি-বিরোধী কবিতা ও গান রচনা করেন তার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের এই সব কবিতা প্রবন্ধ ছড়াগুলি বিচার করলে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে।

তীর্থদর্শন ও উত্তরণ

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ও বহির্জগত

বিপ্লবোত্তর রাশিয়া—বিশ্বের অভূতপূর্ব একটি ঘটনাকেন্দ্র। একটা জরাজীর্ণ শাসনব্যবস্থার গর্ভে এমনই এক নবজাতক ভূমিষ্ঠ হল যার জন্মমাত্র রীতচরিত্র শুধু ভিন্নতর নয় সম্পূর্ণভাবে নজিরবিহীন। নবজাতক বলে একে অনুকম্পা করাও যায় না কেন না এ শুধু জন্মপরিবেশ ধ্বংস করেছে তাই নয় একেবারেই নতুন এক তাত্ত্বিক শক্তি—শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে সংগঠিত হয়ে নিজের দেশের সীমা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে স্থিতাবস্থা ও কায়েমি স্বার্থের ভিতে কাঁপন সৃষ্টি করেছে। সুতরাং এ নবজাতককে সূতিকাগারেই হত্যা করতে হবে যে কোনো ছলে বলে কৌশলে। প্রবল প্রতাপান্বিত বিশ্ব পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদ অস্থিরতার আতঙ্কে মরিয়া হয়ে শুরু করল চক্রান্ত। ভিতরে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি—কারণ এটা তো রাজাবদল নয়, সমাজব্যবস্থার বদল। তাই সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের অভ্যন্তরে চতুর্দিকে বিদ্রোহ, সঙ্গে কৃত্রিম খাদ্যাভাব সৃষ্টি করে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি গড়ে তোলা। উদ্দেশ্য মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দেওয়া। মহামতি লেনিনের প্রাজ্ঞতা, স্তালিনের ক্ষিপ্র সাংগঠিক ক্ষমতা ও শৌর্য এবং লালফৌজের অসীম দৃঢ়তা প্রতি-বিপ্লবকে চিরতরে রাশিয়ার বুকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। তাই রাশিয়ার অভ্যন্তরে যখন নবজাতককে ধ্বংস করা গেল না তখন শুরু হল বিপ্লবের মতাদর্শের অলোকসামান্য প্রভাব থেকে বাকি দুনিয়াকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা। তাদের আতঙ্ক বিপ্লবের সেই বাণী—'বিশ্ববিপ্লব সম্পন্ন করো—দুনিয়ার মজদুর এক হও'।

ধনবাদী দেশে দেশে প্রচার হতে লাগল রাশিয়ার বুকে এক দানবের আবির্ভাব ঘটেছে, রক্তের ধারাস্রোতে সেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এমন কি ব্যক্তিগত পরিবার-জীবনও হরণ করা হয়েছে, পরিবর্তে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এক আদিম জীবন। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের নামে অন্যান্য অংশের মানুষকে নির্বিচারে হত্যা ও নিপীড়ন করা হচ্ছে। রাশিয়ার সীমানায় এক লৌহপ্রাচীর তুলে দিয়ে সঙিন হাতে সেনাদলের সঙ্গে একদল বুদ্ধিজীবীকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল যাঁদের কাজই হল রাশিয়ার অভ্যন্তরের এক দানবীয় বীভৎসতার চিত্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। প্রচার করা হল রাশিয়ার গৌরবজনক শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের উপর বুলডোজার চালিয়ে বিপ্লবোত্তর রাশিয়া বালখিল্য-সুলভ নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। গৃহযুদ্ধ অবদমিত করে সমাজতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থাগঠনের সূচনাকালেই বিপ্লবের সাত বছর না পেরতেই লেনিনের মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুতেও শান্তি নেই—লেনিনের মৃত্যুর সংবাদ-পরিবেশনেও পুঁজিবাদীজগত লেনিন সম্পর্কে বিষোদ্গার করতে কুণ্ঠিত হল না। বরং শীর্ষনেতার মৃত্যুতে বিপ্লবী রাশিয়ার বিরুদ্ধে কুৎসার পালে হাওয়ার বেগ বৃদ্ধি পেল। কিন্তু সুন্দরের দ্যুতি, নবীনের বাণী, সূর্যের দীপ্তি কি কুৎসার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে অবরুদ্ধ করা যায়? তাই পুঁজিবাদী প্রহরা ও সতর্কতা সত্ত্বেও রাশিয়ার

ভিতরের নতুন নতুন কর্মকাণ্ডের খবর কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়ছিল। ফলে দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন, শুধু তাই নয়, বহু সৎ বুদ্ধিজীবীও কৌতূহলী হয়েছিলেন। বঞ্চিত, নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের হারাবার কিছু নেই, তাঁরা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবিক অধিকার থেকে চিরকাল বঞ্চিত, সুতরাং তাঁদের সামনে সমস্যা নেই। সমস্যা বুদ্ধিজীবীদের সামনে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, সর্বশ্রেণীর মানবের মুক্তি ইত্যাদি সংস্কার তাঁদের দ্বিধাচিত্ততায় দোদুল্যমান করে তুলেছে। আর প্রচারযন্ত্রে এঁরাই প্রধান শক্তি। তাই পুঁজিবাদী ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে প্রখর সতর্কতা—কোনোভাবেই যেন বুদ্ধিজীবীরা রাশিয়ার সপক্ষে মুখ না খোলেন। আর এজন্য প্রচ্ছন্ন হুমকি ও পরন্তু শাস্তির ভয় দেখাতেও ধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা কুণ্ঠিত নয়।

এমন এক পরিস্থিতিতে অনিবার্যভাবেই পুঁজিবাদী জগতের মিথ্যা কুৎসার গতিরোধ ও প্রকৃত সত্য প্রকাশের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার শাসকদের 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সংস্থা' বা সংক্ষেপে 'ভক্স' গড়ে তুলতে হয়েছিল যাতে বহির্জগতের বুদ্ধিজীবীদের রাশিয়ায় আমন্ত্রণ করে এনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আয়োজন করা যায়। কিন্তু নিজ নিজ দেশের শাসকদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ এবং স্বদেশে ফিরে গিয়ে সত্যকথা প্রচার করাও সহজ কাজ ছিল না। এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকা সত্ত্বেও ভক্স সংস্থা বিশ্বের প্রথম সারির যে কয়েকজন বিবেকবান ও স্বাধীন মতাবলম্বী বুদ্ধিজীবীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। রুশ কর্তৃপক্ষ খুব স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া-ভ্রমণের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রথমত নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই গীতাঞ্জলির রুশ অনুবাদের সূত্রে এবং একাদিক্রমে রবীন্দ্রগ্রন্থাবলীর অনুবাদের মাধ্যমে রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। দ্বিতীয়ত ভারতের মুক্তিসংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদীদের দেশে দেশে শোষণের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে এবং রোমা রোলাঁ, আঁরি বারবুস প্রমুখের সঙ্গে যৌথভাবে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল একান্তভাবে সহায়ক।

রাশিয়া-ভ্রমণের পূর্বে রাশিয়ায় রবীন্দ্রচর্চা

বিপ্লবপূর্বকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। সেক্সপিয়র ছাড়া আর কোন বিদেশী সাহিত্যিক এত জনপ্রিয়তা লাভ করেননি। ১৯১৪ সালে ল. খাভকিন অনূদিত গীতাঞ্জলির রুশ অনুবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকদের দৃষ্টি শুধু আকৃষ্ট হয়নি, সমালোচকরাও মুখর হয়ে ওঠেন। মিস্টিক, প্রতীকীবাদী, অধ্যাত্মবাদী ইত্যাদি পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথকে ভূষিত করা হয়। গীতাঞ্জলির দ্বিতীয় অনুবাদক কবি ভি. লেবেদেভ 'আধ্যাত্মিক জীবনানন্দের সুমহান স্তবগান' বলে গীতাঞ্জলির কাব্য মূল্যায়ন করেছেন। আর একজন কবি ই. শখলোভস্কি বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ মহাবিশ্বের ধ্যানে অনুপ্রাণিত জীবন প্রেম এবং আনন্দের সংগীতকার।' লেখক ভ. তরেদভ লিখেছেন, 'তিনি প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সন্তান—ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সংস্কৃতির যেমন বায়রন, রাশিয়ার সংস্কৃতির যেমন পুশকিন।' কিন্তু রবীন্দ্র-মূল্যায়নের এই ধারার পরিবর্তন ঘটে তাঁর ছোটগল্প অনুবাদের পরে। তাঁরা গল্পগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র চিন্তার রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করলেন। তাঁর গল্পের প্রথম অনুবাদক আ. ফ. স্লুৎস্কি বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি মানুষের দৈনন্দিন অস্তিত্বের

অনবদ্য, প্রাণবান এবং জীবনসত্যের চিত্ররাজি। ...বাস্তবতায়, ব্যাপকতায় ও মানবাত্মার রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট গল্পগুলি মহামতি তলস্তয়ের গল্পের সঙ্গে তুলনীয়।' বিপ্লবের পরে রবীন্দ্র-মূল্যায়নের প্রকৃতিও বদলে গেল। সাহিত্য-গবেষক আ. ভরোনস্কির মন্তব্য-রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি আমাদের শেখায় 'দুঃখ-যন্ত্রণার মুহূর্তেও জীবনকে ভালবাসতে' কিংবা 'প্রতিবাদকারী ও নব প্রবর্তকের ভূমিকায় তাঁর উত্তরণ ঘটেছে'—বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মনস্বী আনাতোলি লুনাচারস্কি লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম...এত বর্ণাঢ্য, এত সূক্ষ্ম আবেগমণ্ডিত এবং প্রকৃত মহৎভাবে পরিপূর্ণ যে, তা এখন মানব সংস্কৃতির অন্যতম সম্পদ।' আ. কাইগোরোদভ, ক. ত্রোয়ানোভস্কি ও ভ. তানবোগোরাজ প্রমুখ গবেষকরা তাঁকে 'ভারতের তলস্তয়' অভিধায় ভূষিত করেন এবং ইয়াসনায়া পলিয়ানায় তলস্তয়ের ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কার্যকলাপের তুলনামূলক বিচার করেন। বাংলা থেকে রুশ ভাষায় সরাসরি প্রথম অনুবাদের কৃতিত্ব ম. তুবিয়ানস্কির। ১৯২৪ সালে তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'-র রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯২০ সাল থেকেই তিনি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি', 'গোরা' প্রভৃতি গদ্যরচনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে পাশ্চাত্য আলোচকরা তাঁর প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ইয়োরোপ যে রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করতে পারে না, তার প্রধান কারণ, ইয়োরোপে আধ্যাত্মিক প্রবণতা আরোপিত ভারতীয় সংস্কৃতির মিথ্যা চিত্র।' জনপ্রিয়তার এই পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় পদার্পণ করেছিলেন ১৯৩০ সালে।

রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের কর্মসূচি

সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণের ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের মনে দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ১৯২৫ সালে। এই আমন্ত্রণে সাড়া দিলেও শারীরিক কারণে যেতে পারেননি। স্টকহোমে সোভিয়েত দূতাবাসের প্রথম সচিব আ. আরোসভের কাছেও তিনি তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, তুর্গেনেভ, চেখভ ও গোর্কির দেশের আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং রাশিয়া ভ্রমণের প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। ১৯২৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কবি যখন ভিয়েনায়, রাশিয়ার ভক্স সংস্থা থেকে নিমন্ত্রণ আসে। বার্লিনে এক সংবাদদাতার কাছে তিনি বলেন, "এই যাত্রায় খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাশিয়া যাব, দেখতে চাই তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, সলোভিওভের দেশ। তারপর মরলে আফশোষ নেই। খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। আর আমার বেশি দিন নেই। ...এই রুগ্ণ হৃদয়যন্ত্রটা এবার জানান দিয়েছে, আর সে বেঁচে থাকতে চায় না। তাই তাড়াতাড়ি রাশিয়া দেখে নিতে হবে। ...মহান রুশ জাতি অন্তরের যে সম্পদ গড়ে তুলেছে তা বিশ্বসভ্যতার রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করেছে। গত কয়েক বছরের রক্তাপ্লুত ঘটনা সত্ত্বেও এখন তারা মহা ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছে।' কবি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, ভ্রমণসূচি চূড়ান্ত হল, ভিসাও পাওয়া গেল, কিন্তু অসুস্থতার জন্যে সেবারও যাওয়া সম্ভব হল না।

১৯২৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ভক্স রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আরেকবার চিঠি দেয়। ১৯২৯ সালে কানাডা থেকে ফিরে জাপানে থাকাকালীন কোরিয়া থেকে নিমন্ত্রণ

আসে। তিনি স্থির করেছিলেন কোরিয়া হয়ে রেলপথে রাশিয়া যাবেন। কিন্তু সেবারও জাপানি ডাক্তারের পরামর্শে বা আদেশে কোরিয়া ও রাশিয়া যাত্রা পণ্ড হয়। ১৯৩০ সালে কবি যখন আবার ইয়োরোপ সফর করেন তখন জেনেভা থাকাকালীন রাশিয়া ভ্রমণের বিষয় স্থির হয়। কিন্তু এবারও নানা অজুহাতে কবিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা হয়। তিনি নিজেই লিখেছেন, 'আবার অনেকে আমাকে ভয় দেখিয়েছে—কিন্তু প্রধান ভয়ের বিষয় আরামের অভাব, বলেছে আহারাদি সমস্তই এমন মোটারকম যে আমি তা সহ্য করতে পারব না। তাছাড়া এমন কথাও অনেকে বলেছে, আমাকে যা এরা দেখাবে তার অধিকাংশই বানানো।' এইসব কুকাজ যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর ইংরেজ বন্ধুরাই বেশি। একজন মার্কিন সাংবাদিক লিখেছেন, "It is understood—it is because of the impetus which his presence might give to pro-Gandhi sentiment in the U.S.A. and Russia that the coterie of English men who surrounded him here was continually against his trips for reasons of health." (New York World, 5 September, 1930)

কিন্তু অবশেষে কবিকে এবার নিবৃত্ত করা গেল না। কবি বলেছেন, 'পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত।' ১৯৩০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীসাথী ডাঃ হ্যারি টিম্বার্স, আরিয়াম উইলিয়ামস (আর্যনায়কম), কবি অমিয় চক্রবর্তী এবং জারমানি থেকে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের মেয়ে মার্গারিটা আইনস্টাইন প্রমুখকে নিয়ে রাশিয়ায় এসে পৌঁছলেন।

১১ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ ঠিক দুসপ্তাহ রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় ছিলেন। যে দেশ সম্পর্কে বহু গালগল্প, সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার কথা শুনেছেন সে দেশকে গভীরভাবে জানার সুযোগ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে এটাই ছিল কবির ইচ্ছা। সত্তর বছরের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত কবি শরীরের ক্ষমতার কথা বিস্মৃত হয়ে ঠাসা কর্মসূচি নিতে দ্বিধা করেননি। তাঁর কর্মসূচির রূপরেখাটি লক্ষ করা যেতে পারে :

১১ সেপ্টেম্বর : মস্কো পৌঁছনর পর বেলোরুশ-বল্টিক রেলস্টেশনে সদলে কবিকে অভ্যর্থনা জানান হয় ভক্স ও রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত লেখকদের যুক্ত সংঘের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে। রবীন্দ্রনাথ মস্কোর গ্রান্ড হোটেলে ওঠেন। "বাড়িটা মস্ত, কিন্তু অবস্থা অতি দরিদ্র, ...সমস্ত শহরেরই অবস্থা এই রকম...আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না।"—লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ।

১২ সেপ্টেম্বর : সকালবেলা ভক্সের সভাপতি ফ. ন. পেত্রভের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার হয়। সন্ধ্যাবেলা লেখকদের যুক্ত ক্লাবে মস্কোর লেখক, সাহিত্যবিদ্ এবং বিজ্ঞান ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মিলিত হল। এখানে স্বাগত ভাষণ দেন পেত্রভ এবং প্রত্যুত্তরে ভাষণ দেন রবীন্দ্রনাথ। সভাশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসরে পরিবেশিত হয় বলশয় থিয়েটারের শিল্পীদের অনুষ্ঠান এবং দাগেস্তানের লোকসংগীত ও লোকনৃত্য।

১৩ সেপ্টেম্বর : সকালে ভক্সের সভাপতি পেত্রভকবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। দুপুরবেলা ছাত্র ও অধ্যাপকদের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে আলাপ করেন। বিকেলে রাষ্ট্রীয় আর্ট গ্যালারীর অধ্যক্ষ

ম. প. ক্রিস্তি, কলাবিদ্ অধ্যাপক আ. আ. সিদোরভ, কলা অধ্যক্ষ আ. আ. ভালতের, প্রদর্শনী বিভাগের অধ্যক্ষ ইয়েশুকভ প্রমুখের সঙ্গে চিত্রকলা, ভাস্কর্য বিষয়ে মতবিনিময় হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা স্কেচ ও ছবি দেখান। রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী করা হবে বলে স্থির হয়। সন্ধ্যায় কবি দ্বিতীয় মস্কো আর্ট থিয়েটারে 'প্রথম পিটার' নাটকটি দেখেন। অনুষ্ঠান শেষে শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ করেন এবং বিশিষ্ট অতিথি দর্শকদের খাতায় মন্তব্য লেখেন।

১৪ সেপ্টেম্বর : একটি পাইওনিয়ার কমিউন পরিদর্শনে যান এবং সারা সন্ধ্যা আবাসিকদের সঙ্গে ব্যয় করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর : সকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র দপ্তরের গণ কমিসারের সহকারী ল. স. কারাখানের সঙ্গে আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় চলচ্চিত্র কর্মী সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর কবিকে আইজেনস্টাইন নির্মিত 'ব্যাটেলশিপ পতেমকিন' ও 'পুরাতন ও নতুন' ছবি দুটির অংশবিশেষ দেখান হয়। রবীন্দ্রনাথ-রচিত চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয় আলোচিত হয়।

১৬ সেপ্টেম্বর : বিকেলবেলায় রবীন্দ্রনাথ কেন্দ্রীয় কৃষিভবন পরিদর্শন করেন এবং যৌথ কৃষি খামারের কৃষকদের সঙ্গে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ স. ত. শাৎস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৭ সেপ্টেম্বর : শিল্পকলা মিউজিয়ামে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন হয়। সন্ধ্যায় মস্কো আর্ট থিয়েটারে লেভ তলস্তয়ের 'রেজারেকশান' উপন্যাস অবলম্বনে নাটকাভিনয় দেখেন এবং অভিনয়-শেষে প্রখ্যাত অভিনেত্রী চেখভের স্ত্রী অ. ল. ক্লিপ্‌পের-চেখভার সঙ্গে আলাপ হয়।

১৯ সেপ্টেম্বর : রবীন্দ্রনাথ মস্কোর কাছে ল.ম. কারাখানের বাড়িতে সারাদিন অতিবাহিত করেন।

২০ সেপ্টেম্বর : সকালে অধ্যাপক ল. স. ভেল্‌তমান, র. শোর প্রমুখ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। সন্ধ্যায় বলশয় থিয়েটারে 'বায়াদেরকা' ব্যালে দেখেন।

২১ সেপ্টেম্বর : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রখ্যাত রুশ সুরকার অ. অ. বর্খমান। ইনি রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় সুরারোপ করেন এবং সুরের স্বরলিপি কবিকে উপহার দেন।

২২ সেপ্টেম্বর : সকালে বিখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক ভ. ফ. জেলেমিন কবির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। সেদিন কবি সপারিষদ মস্কো শহর পরিদর্শন করেন।

২৩ সেপ্টেম্বর : জিপসী পত্রিকা 'নেভো দ্রম'-এর সহকারী সম্পাদক ও কর্মীরা কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কবি জিপসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

২৪ সেপ্টেম্বর : সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ভবনে কবির সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। পেত্রভের অভিনন্দন ভাষণের পর কবি গ. শেংগেলি কবির উদ্দেশে নিবেদিত কবিতা পাঠ করেন। কবির প্রতিভাষণের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। কবির কবিতার সুরারোপিত সংগীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় তাঁর 'নববর্ষা ও 'প্রণয় প্রশ্ন' কবিতা দুটি আবৃত্তি করেন।

২৫ সেপ্টেম্বর : সকালে কবি শেংগেলির সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে কিছু সময় আলোচনা হয়। রাত ৯টা ১৫ মিঃ-এ কবি মস্কো ত্যাগ করেন। পেত্রভ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কবিকে বিদায় জানান।

পূর্ববর্ণিত কর্মসূচি থেকে পাঠক লক্ষ করবেন রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের কর্মসূচির মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় ছিল না বললেই চলে। একদিন মাত্র তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরের কমিসার কারাখানের সঙ্গে কাটান। এদিন উভয়ের মধ্যে কী কী বিষয় আলোচিত হয় তার কোনো বিবরণী পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়নি। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কোনো নেতার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়নি। রাজনৈতিক বিষয়ে কবির আগ্রহ ছিল না এবং সচেতনভাবে তিনি তা পরিহারও করেন। তিনি প্রধানত আগ্রহী ছিলেন বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজ-পরিবর্তন ও শিক্ষার বিস্তার বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। ভক্‌সের সভাপতির সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রেও কবি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন। তাঁর একটাই আশঙ্কা ছিল, রাজনৈতিকভাবে বেশি জড়িয়ে পড়লে দেশে ফিরে তাঁকে তাঁর প্রতিষ্ঠান-পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। কবি এ বিষয়ে নিজের মনোভাব গোপনও করেননি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাংগঠনিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন :

"ভারতবর্ষ এখন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চলেছে। সেখানে গভর্নমেন্ট আর জনগণের মধ্যে চলেছে সংগ্রাম। এই পরিবেশে সন্দিগ্ধ গভর্নমেন্ট অতিসতর্ক। অত্যন্ত নির্দোষ ঘটনা, যার সঙ্গে রাজনীতির কোনই যোগ নেই, তাও প্রচার বলে ধরা হয়, মনে হয় বুঝি লুকিয়ে চুরিয়ে বিপ্লবের সহায়তা করা হচ্ছে। আমাদের এই অবস্থায় কোনরকম বিপদের ঝুঁকি নেওয়া চলে না।..... ভারতবর্ষ এখন এমন পরিবেশে রয়েছে যে আমরা যদি এমন কিছু করি যার সঙ্গে আপনাদের দেশের স্বল্পতম সম্পর্কও আছে তবে তার অর্থ বিকৃত করা হবে। ওরা বলবে, এ হল বিপ্লবের ভাবধারা প্রচারের কাজ চালানর আড়াল মাত্র, মুখোশ। আপনারা তো জানেনই আপনাদের সঙ্গে সামান্য সম্পর্ক আছে এই সন্দেহ যাঁদের উপর পড়েছে ইংরেজ গভর্নমেন্টের হাতে তাঁদের কী সইতে হয়েছে। তাঁরা জেলখানায় বন্দী হয়ে রয়েছেন।" প্রসঙ্গত কবি এখানে ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে সংকল্প পাঠ, সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ধিক্কার ও শ্রমিকদের বিক্ষোভ, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও ইংরেজের বল্গাহীন অত্যাচার ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বিশেষ করে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা কবির ভাবনায় ছিল। কেন না এই মামলায় ধৃতদের কমিউনিস্ট বলে ইংরেজ সরকার প্রমাণ করতে চেয়েছিল এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রমুখ বন্দীরা সে সত্য গোপনও করেননি। ভারতীয় এই পরিস্থিতি বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন, "এদেশে আসাটা আমার পক্ষে খুবই সাহসের কাজ। কিন্তু এপথে বেশিদূর যাওয়াটা উচিত হবে না। আমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্য হল—শিক্ষার আলোক বিস্তার। আমি পোলিটিশিয়ান নই। আমি বিশ্বাস করি, সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটলে, জনগণের মধ্যে চেতনার বিকাশ ঘটলে, আজকের অনেক দুঃখকষ্টই আপনা থেকে দূর হবে। অজ্ঞতা আজ দুর্ভিক্ষের সঙ্গে দেশবাসীর লড়াইয়ে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, অজ্ঞতাই নিজের শক্তিতে তার বিশ্বাস হরণ করছে। শিক্ষা তাকে নতুন শক্তি দেবে। দেবে নতুন শিক্ষা, বিকাশ ঘটাবে মনের স্বাধীনতার। আর সব কিছু থেকেই আমি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। সব বাদ দিয়ে এই কর্তব্যই আমি গ্রহণ করেছি। আমার প্রতিষ্ঠানকে আমি সতর্কতার সঙ্গেই এ রকমের সব আন্দোলন থেকে মুক্ত রাখি। আমাদের চাষীসাধারণকে অজ্ঞতার হাত থেকে মুক্তি দেওয়া এই হল আমার মূল লক্ষ্য।"

একথা ঠিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনকে সবসময় চেয়েছেন রাজনীতির আবর্তের বাইরে রাখতে, যাতে কোন রাষ্ট্রীয় আঘাতে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি না হয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি তো নিজেকে কখনও রাজনৈতিক প্রতিবাদ থেকে সরিয়ে রাখেননি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে যে রাজনৈতিক ভূমিকার সূত্রপাত হয়েছিল, পাবনা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতায় উপাধি-ত্যাগ ইত্যাদি ঘটনায় তা অব্যাহত থাকে। দেশে ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই হিজলি জেলে বন্দীহত্যা, বন্দীমুক্তি আন্দোলন ইত্যাদিতে তাঁর ভূমিকা গ্রহণ রাজনীতিসচেতন জাতীয় ব্যক্তিত্বের পক্ষে সংগতিপূর্ণই ছিল। আসলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্র-সমালোচনা সহ্য করলেও কমিউনিস্ট দেশ ও মতাদর্শের সঙ্গে সামান্য সম্পর্কও যে ইংরেজ সরকার বিশেষ বাঁকা চোখে দেখবে এবং তার পরিণতি যে তাঁর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সতর্কতা অবলম্বন করেন।

রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা প্রকাশের উত্তরে ভক্‌সের সভাপতি পেত্রভও অনুরূপ সতর্কতার সঙ্গে বলেন : "ভারতবর্ষের অবস্থা যদি এমনই হয় যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনার প্রতিষ্ঠানের যোগসাধন এখন অনুচিত, তাহলে আমরা দুঃখের সঙ্গে অন্য ব্যবস্থা, অন্য অনুকূল পরিবেশের অপেক্ষায় থাকব, যখন আপনার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আমাদের সঙ্ঘের সঙ্গে স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হবে।......আমাদের সংগঠন সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক। কিন্তু যদি আমাদের সমিতির সঙ্গে এই জাতের সম্পর্কেও সন্দিগ্ধ গভর্নমেন্ট কমিউনিজম প্রচারের উদ্দেশ্যে গঠিত বলে মনে করে, তবে অবশ্যই আপাতত রীতিমত সম্পর্কস্থাপন মুলতুবি রাখা ভাল।"

সাংগঠনিক সম্পর্ক স্থাপন সম্বন্ধে বাস্তব কারণেই রবীন্দ্রনাথ দ্বিধা প্রকাশ করলেও নতুন সোভিয়েত ব্যবস্থার জয়গান করতে এবং স্বদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করতে কুণ্ঠা দেখালেন না। বরং প্রেত্রভকে বললেন, "আপনার কর্মসূচি আমার জানা নেই। কিন্তু আমাদের শ্রমজীবীদের জন্য একটি কাজ করতে পারেন—আপনাদের সাফল্যের কথা, যে সাধারণজন সবদেশেই পীড়িত পরিত্যক্ত আপনাদের দেশে তাদের মঙ্গল কী করা হয়েছে—অনেক কিছুই হয়েছে—সে কথা আমাদের ভাষায় লেখা। আপনাদের শিক্ষা বিকাশের ব্যাপক তথ্যের বিস্তার আমাদের শ্রমজীবীদের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক হবে।" এ কার উক্তি? এ রবীন্দ্রনাথ আমাদের কতটুকু পরিচিত? সোভিয়েত সমাজের অভিজ্ঞতা, সমাজতন্ত্রীদের কর্মসূচি এদেশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তো সেকালে কয়েকজন কমিউনিস্ট যুবকই অনুভব করেছিলেন। কোন বিশ্বাস ও চেতনা থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই অনুভব এল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিবিদ নন ঠিকই, কবি ও স্রষ্টা। কিন্তু দেশ তথা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর এমন সততাপূর্ণ ভালবাসা ছিল যে তার জোরে তিনি সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণে স্বতঃপ্রণোদিত আগ্রহ জানাতে দ্বিধা করেননি। তিনি পেত্রভকে বললেন, "আমেরিকায় সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষার বিকাশ সম্বন্ধে একটা বই পড়ি একজন আমেরিকান মহিলার লেখা। এই বইটিতেই প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় পাই। বইটি আমার মনে গভীর ছাপ ফেলে। তারপর থেকেই আপনাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছি। এই বইটি আমায় অনুপ্রাণিত করে। দেখতে

পাই, আপনাদের দেশে যা করা হচ্ছে তার সঙ্গে আমার জীবনের স্বপ্নের অনেক মিল রয়েছে। হয়তো আরও অনেক বই আছে। তাতে আপনাদের গঠন-কাজের নানা দিকের কথা বলা হয়েছে—অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিকাশ। সে সব বই পেতে আমি খুব উৎসুক, যদি পাওয়া যায় খুবই কৃতজ্ঞ থাকব। আপনাদের যদি সে জাতীয় বই না থাকে তাহলে ইয়োরোপ আমেরিকায় তাদের খোঁজ করব। এসব বই পাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এক্ষেত্রে সবসময় যেমন ঘটে, তারা কিছুতেই আমার কাছে ধরা দেয়নি; সোভিয়েত প্রিন্সিপল সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয়ই কোথাও আছে, সেই কারণেই তারা ভারতে পৌঁছয় না। আপনাদের ইংরেজি বইপত্র আমার পক্ষে খুবই কৌতূহলকর হবে। এখানে এসে আমি যা কিছু দেখেছি শুনেছি, অনুভব করেছি সে বিষয়ে একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা তবে হবে। ভারতীয় জনসাধারণকে আপনাদের সাফল্যের কথা জানানোর জন্য আমি কিছু করতে চাই।"

লোকশিক্ষাকে সর্বব্যাপী করাই রবীন্দ্রজীবনের উত্তরপর্বের প্রধান লক্ষ্য এবং একাজ বিপ্লবোত্তর রাশিয়া কেমন করে সাধিত করেছে তা দেখতেই তিনি এসেছেন রাশিয়ায়। পেত্রভকে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "আপনারা ব্যবস্থার বদল ঘটিয়েছেন, এ ঘটনা এখনই তেমন কিছু প্রত্যক্ষ ফল দিতে পারে না। কিন্তু এই প্রথম সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, একালের শোষিত উৎপীড়িত জনসাধারণের আভ্যন্তরীণ শক্তিকে কাজে লাগানো—আপনাদের বিরাট কীর্তি।" রাশিয়া থেকে বিদায়গ্রহণের আগের দিন লোকশিক্ষা-বিস্তারের বাধাগুলি সম্পর্কে পেত্রভের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা-বিনিময় হয়। পেত্রভ কবিকে বিনীতভাবে বোঝান যে লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্যের প্রধান চাবিকাঠি হল বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর বদল। তিনি বলেন, "আমাদের সবচেয়ে বড় কীর্তি হল, আর্থনীতিক ব্যবস্থার বদল ঘটিয়ে এমন একটা কাঠামো গড়া যেখানে প্রতিটি মানুষ লাভ করতে পারবে সবচেয়ে বেশি সাংস্কৃতিক কল্যাণ, সবচেয়ে বেশি করে পাবে তাই যার উপর তার নিঃসন্দেহ অধিকার"। শিক্ষাকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে যে পূর্বশর্ত হিসেবে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর বদল ঘটানো অনিবার্য এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল। কেন না তিনি দেখেছেন ইংলন্ড ও জার্মানিতে সমাজ বদল না ঘটিয়েও জনশিক্ষা প্রসারিত হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস "আজ যদি আমরা অল্প কিছুও করতে পারি, একটি ছোট ক্ষেত্রে যদি আমাদের প্রচেষ্টা সংহত হয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই স্ফুলিঙ্গ ভবিষ্যতে সোশিয়ালিজমে বিকাশ পাবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের উত্তরে পেত্রভ ভারতের সমকালীন রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়েও আবার বলেন, "ব্যাপক জনগণকে শিক্ষার ও তাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে হলে বাইরের অনুকূল আর্থনীতিক অবস্থা গড়া চাই। তাই ইংলন্ড ও জার্মানির মেহনতি শ্রেণীর শিক্ষার গড়পড়তা মান উচ্চতর হলেও একথা বলা যাবে না যে ইংলন্ড আর জার্মানির প্রলেতারিয়েত উচ্চ সাংস্কৃতিক কীর্তি উপভোগের বেশি সুযোগ পান। ঐ সব দেশের মেহনতিদের আন্দোলন লক্ষ করে আর তা নিয়ে পড়াশুনো করে দেখেছি ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার জন্য আর উৎপাদনের প্রধান উপায়গুলোয় তাদের মালিকানা না থাকায় মেহনতিরা সংস্কৃতির প্রকৃত উচ্চমানে উঠতে পারে না। তাই আমাদের মতে, প্রত্যেক দেশকেই একটা পর্যায় পার হতে হবে। সেই পর্যায়ে পুরনো

আর্থনীতিক ব্যবস্থার জায়গায় এমন একটা নতুন সোশিয়ালিস্ট আর্থনীতিক ব্যবস্থা দেখা দেওয়া চাই—মেহনতিদের ব্যাপক অংশ যাতে সাংস্কৃতিক সব আশিস লাভে সক্ষম হয়, মানব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়।" পেত্রভের এই বক্তব্যের পরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আপনাদের ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই, দেখতে চাই তার কতটা আমার দেশে কাজে লাগাতে পারা যায়, কারণ যারা অসহায়, যাদের সহায়তা সাধনে আমি সক্ষম, তাদের সাহায্য করাটা আমার কর্তব্য বলে মনে করি।" তাঁর শেষ সংবর্ধনা সভায় প্রতিভাষণে কবির স্বীকারোক্তি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ : "যেটুকু দেখলুম তাতে দৃঢ় বিশ্বাস হল, আপনারা অপূর্ব প্রগতি সাধন করেছেন, অত্যাশ্চর্যকে সম্ভব করেছেন। আমরা অজ্ঞান ও অক্ষমতার নিবিড় ছায়ায় পড়ে আছি। আমাদের পক্ষে তাই বোঝা কঠিন এত অল্প সময়ে আপনাদের জনসাধারণের মনের বদল কী করে ঘটানো গেল। একথা জেনে খুবই আনন্দ পেলুম, যে-জনগণ সমাজ জীবনের ভিত্তি, সে-জনগণ তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত নয়, সোশিয়ালিস্ট সমাজের সব সুখ সুবিধারই তারা সমান অংশীদার। আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্যসভ্যতার ঐ প্রাচীন ভূমির সব মানুষ শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবেন। আমার বহুদিনের স্বপ্ন, যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণমানসের মুক্তির স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখতে আমায় যাঁরা সাহায্য করলেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।"

রাশিয়ার চিঠির রবীন্দ্রনাথ

"রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত"—বিদেশ থেকে অনেক মনীষী বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় এসেছেন, দেখেছেন কিন্তু এমন করে উচ্ছ্বসিত হতে কাউকে দেখা যায়নি। এক বছর পরে বার্নাড শ রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, তাঁরও অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল সোভিয়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে এবং তিনি তা ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর 'ইনটেলিজেন্ট উওম্যানস্ গাইড টু সোশ্যালিজম এ্যন্ড ক্যাপিটালিজম' গ্রন্থে। কিন্তু স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাতে কথা বলে তিনি এত প্রভাবিত হয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত কমিউনিজম সম্পর্কে তাঁর আস্থা অটুট ছিল। রবীন্দ্রনাথের ছ বছরবাদে প্রখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ আমন্ত্রিত হয়ে রাশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন। আঁদ্রে জিদ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং প্রগতিবাদের সমর্থক বলে সুপরিচিত। তিনি দশ সপ্তাহ রুশ পরিদর্শন করেছিলেন কিন্তু তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত 'রিটার্ন ফ্রম ইউ এস এস আর' প্রশংসার বদলে সমালোচনায় পরিপূর্ণ। রাশিয়ার বিয়ার বা খাদ্যসামগ্রী জিদের মনোমত হয়নি। ধনী পুঁজিবাদী দেশের একজন মানুষ হিসেবে তিনি সম্ভবত প্রাচুর্য ও উন্নত জীবনমানের বাড়তি কল্পনা নিয়ে রাশিয়া গিয়েছিলেন, ফলে নির্ধনের চেহারায় তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু দরিদ্র ঔপনিবেশিক দেশের মানবপ্রেমিক মনীষী রবীন্দ্রনাথ খাওয়া-দাওয়ার আরামের ব্যাপারে শুভানুধ্যায়ীদের সতর্কবাণী সত্ত্বেও খুব আশা নিয়ে খোলা মনে রাশিয়ায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাই তাঁর আশাভঙ্গ হয়নি বরং নির্ধনের চেহারাটা যখন দেখেছেন সকলের জন্য, বিশেষ কোন অংশের জন্য নয়, তখন তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠেছে। কবি বলেছেন। "রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখতে পাব এরকম আশা করা অন্যায় হত।.....আমাদের দুঃখী দেশে লালিত অতি-দুর্বল আশা নিয়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি।"

রাশিয়ায় আসার আগে বলশেভিকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রমনে খটকা ছিল এবং পরেও যে তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছিল তাও নয়। কিন্তু তিনি তো রাশিয়ায় বিপ্লববাদের বা সমাজবাদের খুঁত ধরতে সমালোচকের মন নিয়ে আসেননি। রবীন্দ্রনাথের মুখ্য পরিচয় কবি, কিন্তু যিনি তীর্থদর্শনে এসেছিলেন তিনি কর্মী, সংগঠক, শিক্ষাব্রতী ও উদার মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ। যিনি নোবেল পুরস্কারের সমুদয় অর্থ দিয়ে সমবায় সংগঠন করেছেন, যিনি শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিকে জড়িয়ে সমাজগঠনের নব পরিকল্পনা করেছেন শ্রীনিকেতনে, যিনি দেশ-বিদেশের জ্ঞানভান্ডার আহরণ করে বিশ্বভারতী গড়েছেন, যিনি নিরক্ষর চাষির অন্ধকার ঘরে প্রদীপ জ্বালাতে শুধু যথাসর্বস্ব ঢেলেছেন তাই নয়, সাধন ক্ষেত্রকে রক্ষার জন্য ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে সারা বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। তিনি জানতে চান বুঝতে চান কীভাবে তাঁর স্বপ্ন সফল হবে। এ অলস মনের অধ্যাত্মবাদী রোমান্টিক কবির দেখা নয়। চলার পথে জীবনের যত প্রান্তমুখী হয়েছেন ততই ক্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথ ধন ও নির্ধনের দ্বন্দ্ব, বঞ্চক ও বঞ্চিতের দ্বন্দ্ব, শোষণের ব্যবস্থা ও শোষিতের বেদনার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি প্রশ্নে অস্থির হয়েছেন, উত্তরের সন্ধান করেছেন। শোষণের যক্ষপুরীটা যে শোষিত শ্রমিকরা ভেঙে এগিয়ে যাবে 'রক্তকরবী'তে তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন। জমিদারির পরশ্রমজীবিতায় অস্বস্তি বোধ করেছেন কিন্তু মুক্তির পথ অজানা। পদে পদে পরিবেশের শ্রেণীগত বাধা। কিন্তু তাঁর মহত্ত্ব সেখানেই যেখানে তিনি বিকল্পের সন্ধান পাওয়া মাত্রই শ্রেণীগত নিগড়ের মধ্যেই স্বাগত জানিয়েছেন নবীনকে। ধনবাদী ইউরোপকে তিনি ভালভাবে দেখেছেন, যখনই সুযোগ পেয়েছেন তথাকথিত গণতন্ত্রের মুখোশ ধরে টান মেরেছেন, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নাগিনীরা চারিদিকে বিষশ্বাস ছড়াছে এবং শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হয়েছে। তাই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার পা দিয়েই তাঁর আনন্দের আর সীমা নেই। এমনই তাঁর অন্তর্ভেদী অভিজ্ঞ জহুরির দৃষ্টি যে সারা বিশ্বের অন্যান্য সমাজব্যবস্থার তুলনায় সোভিয়েত ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবনে বিন্দুমাত্র সমস্যা হয়নি। তিনি বলছেন, "যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোন দেশের মতোই নয়, একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলেছে।" তাঁর মনে পড়ে গেছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সেই সব মানুষদের কথা— "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে ; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান।.....তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।" পৃথিবীর আর কোনো মানবতাবাদী সাহিত্যিক বঞ্চিত-শোষিত মানুষের দুর্দশার এমন বস্তুনিষ্ঠ চিত্র আঁকতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এটা রবীন্দ্রনাথের কোন তাৎক্ষণিক আবেগপ্রসূত ভাষণ নয়। পরক্ষণেই তাঁর সৎ স্বীকারোক্তি—'অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে,অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে, একথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।'......'রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁসে এই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা চলছে।'

রাশিয়ায় ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব এবং জনসাধারণের অবারিত আত্মমর্যাদা কবির মনে উদ্রিক্ত করেছে তাঁর দীর্ঘকাল, লালিত স্বপ্ন, কবে তাঁর নিজের দেশ

শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবে। রাশিয়া-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাই ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশের সঙ্গে সে দেশের তুলনামূলক বিচারেরও অভিজ্ঞতা। যদিও রবীন্দ্রনাথ বলছেন তিনি এদেশে শিক্ষার বিস্তার দেখতেই এসেছেন, কিন্তু প্রায় প্রতিটি মৌলিক বিষয়ই তাঁর দর্পণে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ জানেন বিপ্লবের পরে গৃহযুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত পর্যুদস্ত করে নতুন সমাজ গঠনের কাজ শুরু করতে তিন চার বছর অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত কাজ শুরু হয়েছে ১৯২১ সাল থেকে। তিনি এও জানেন যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাত্র তিনবছর কেটেছে। সুতরাং তাঁর কাছে প্রথম বিস্ময় কী করে এরা শত শত বছরের পশ্চাৎপদতা মাত্র আট বছরে নির্মূল করতে পারল। আর এটা যে অন্য কোনো ব্যবস্থায় সম্ভব নয় তাও তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছেন। এখন আমরা রাশিয়া-ভ্রমণের উপলব্ধিজাত সত্যভাষণের ইতিবাচক দিকগুলি বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

আন্তর্জাতিকতাবোধকে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই উগ্র স্বাজাত্যবোধের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার স্বরূপ সন্ধান পেলেন রুশ বিপ্লবের মধ্যেই। তিনি একটি চিঠিতে বলেছেন, "একদিন ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য সৌভ্রাত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গন্ডি পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টিকল না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।" আর এই বিপ্লবের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের আত্মকৈফিয়ৎ : "মনে মনে ভাবছিলুম ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ওই রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তিসাধনের আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম-মহাদেশের ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এটা দেখবার জন্য আমি যাব না তো কে যাবে? ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে, ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই করব বা কেন? আমাদের শক্তিই বা কী, ধনই বা কত? আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের। যদি কেউ বলে, দুর্বলের শক্তিকে উদ্‌বোধিত করবার জন্যেই তারা পণ করেছে তাহলে আমরা কোন্ মুখে বলব যে, তোমাদের ছায়া মাড়াতে নেই?"

সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠন এবং অস্ত্রসজ্জা ও শান্তির প্রশ্নে রুশ বিপ্লবীদের নীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব আমরা স্মরণ করতে পারি এবং আজও তার প্রাসঙ্গিকতা কত জীবন্ত তাও লক্ষণীয়। কবি বলেছেন একটি চিঠিতে—"অর্থসম্বল এদের সামান্য, বিদেশের মহাজনী গদিতে এদের ক্রেডিট নেই। দেশের মধ্যে কলকারখানা এদের যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে অর্থ-উৎপাদনে এরা শক্তিহীন। এইজন্যে কোনমতে পেটের ভাত বিক্রি করে চলছে এদের উদ্যোগ পর্ব। অথচ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকলের চেয়ে যে অনুৎপাদক বিভাগ—সৈনিক বিভাগ—তাকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য। কেন না, আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রুপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলেছে। মনে আছে, এরাই 'লীগ অব নেশনস্'-এ অস্ত্রবর্জনের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়ে কপট শান্তিকামীদের মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। কেন না, নিজেদের প্রতাপবর্ধন বা রক্ষণ সোভিয়েতদের লক্ষ্য নয়—এদের সাধনা হচ্ছে জনসাধারণের শিক্ষা

স্বাস্থ্য-অন্ন সম্বলের উপায় উপকরণকে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাপক করে গড়ে তোলা। এদেরই পক্ষে নিরুপদ্রব শান্তির দরকার সবচেয়ে বেশি।.....'লীগ অব নেশনস্'-এর সমস্ত পালোয়ানই গুন্ডাগিরির বহুবিস্তৃত উদ্যোগ কিছুতেই বন্ধ করতে চায় না, কিন্তু 'শান্তি চাই' বলে সকলে মিলে হাঁক পাড়ে। এই জন্যেই সকল সাম্রাজ্যিক দেশেরই অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে।"

শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা কী তাঁর ভাষাতেই দেখা যাক—"রাস্তায় যারা চলছে তারা একজনও শৌখিন নয়, সমস্ত শহর আটপৌরে কাপড় পরা। আটপৌরে কাপড়ে শ্রেণীভেদ থাকে না, শ্রেণীভেদ পোশাকি কাপড়ে। এখানে সাজে পরিচ্ছদে সবাই এক। সবটা মিলেই শ্রমিকদের পাড়া ; যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেখানেই ওরা। এখানে শ্রমিকদের কৃষাণদের কীরকম বদল হয়েছে তা দেখবার জন্য লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খুলতে অথবা গাঁয়ে কিম্বা বস্তিতে গিয়ে নোট নিতে হয় না। যাদের আমরা 'ভদ্দরলোক' বলে থাকি তারা কোথায় সেটাই জিজ্ঞাস্য।....নিজের দেশের চাষিদের মজুরদের কথা মনে পড়ল। মনে হল, আরব্য উপন্যাসের যাদুকরের কীর্তি।"

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বহুজাতিক দেশের বিচ্ছিন্নতা ও অসম বিকাশের সমস্যা সমাধানের পন্থাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাশিয়ার নতুন ব্যবস্থার মধ্যে। রাশিয়ায় বসেই তিনি ঢাকার দাঙ্গার বিষয় জেনেছিলেন, এছাড়া হিন্দু-মুসলমানের অপ্রীতিকর দ্বন্দ্ব তো দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। ২৮ সেপ্টেম্বর লিখিত পত্রে তিনি লিখছেন, "....এখানেও ইহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লড়াই আমাদের দেশের আধুনিক উপসর্গের মতো অতি কুৎসিত অতি বর্বরভাবেই ঘটত—শিক্ষায় ও শাসনে একেবারে তার মূল উৎপাটিত হয়েছে। কতবার আমি ভেবেছি, আমাদের দেশের সাইমন কমিশন যাবার আগে একবার রাশিয়ায় তার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল।"

যৌথকৃষি, সমবায় ইত্যাদি বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব কর্মপ্রয়াসের সার্থকতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাশিয়াতে। যদিও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি একমত ছিলেন না, তথাপি যৌথখামার যে একমাত্র সমাধান স্বীকার করতেও দ্বিধা করেননি। তিনি অনাথ বালক-বলিকাদের পাইওনিয়ার ক্লাব, কৃষকদের কৃষিভবন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ট্রেড ইউনিয়ন ভবন ইত্যাদি দেখে সমাজ-জীবনের সর্বত্র যে রাজসূয় যজ্ঞ চলেছে, তার সম্যক পরিচয় পেয়েছেন এবং সবকিছুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাশিয়ার অসামান্য অগ্রগতি কবিকে মুগ্ধ করেছে। আর্ট গ্যালারিতে গিয়ে তিনি দেখেছেন যেখানে আগে বুর্জোয়া বা পরশ্রমজীবীরা আসত সেখানে আজ আসে 'স্বশ্রমজীবীর দল, যথা—রাজমিস্ত্রি, লোহার, মুদি, দর্জি ইত্যাদি। আর আসে সোভিয়েত সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র এবং চাষি সম্প্রদায়।' কীভাবে গৃহযুদ্ধের বিশৃঙ্খলার মধ্যেও আর্ট সামগ্রীকে এঁরা রক্ষা করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি লিখেছেন, "এতবড়ো উচ্ছৃঙখল উৎপাতের সময় বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে কড়া হুকুম এসেছে—আর্ট সামগ্রীকে কোনোমতে যেন নষ্ট হতে দেওয়া না হয়।....সোভিয়েতরা ব্যক্তগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্য সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার—বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয়নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্যে জমি চাষ করে এসেছে এরা তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব

দিয়েছে তা নয়, জ্ঞানের জন্যে আনন্দের জন্যে মানবজীবনে যা কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে। শুধু পেটের ভাত পশুর পক্ষে যথেষ্ট মানুষের পক্ষে নয়—একথা তারা বুঝেছিল এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালোয়ানির চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো একথা তারা স্বীকার করেছে।" রবীন্দ্রনাথ অবাক হয়েছেন যখন দেখেছেন 'রেজারেকশান' নাট্যাভিনয় তাঁর পাশে বসে অসংখ্য চাষিমজুর একমনে দেখছে। ভারতবর্ষে তো এমনটা সম্ভব ছিল না। কবি বলছেন, "রাশিয়ায় নবনাট্যকলার অসামান্য উন্নতি হয়েছে। এদের ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর দুর্দিন দুর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে—এদের ঐতিহাসিক বিরাট নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তার কোন বিরোধ ঘটেনি।....এরা সমাজে রাষ্ট্রে কলাতত্ত্বে কোথাও নূতনকে ভয় করেনি।"

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মবাদী, ব্রহ্মবাদী একথা বার বার উচ্চস্বরে বোঝাবার চেষ্টা বহুকাল ধরে চলে আসছে। কিন্তু ধর্মীয় আচার, কুসংস্কার যে মুক্ত মনের পক্ষবিস্তারের পথে কতবড় বাধা তা সে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম যে ধর্মই হোক সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন 'গোরা' উপন্যাসে, 'অচলায়তন' নাটকে। আবার ধর্ম যে শোষণের কতবড় হাতিয়ার ভারতবর্ষে বোধ করি সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন 'রক্তকরবী' নাটকে। তাঁর এই বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনোভাবেরই সমর্থন পেয়েছিলেন রাশিয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের ধর্মীয় নীতির মধ্যে। তাই তিনি উচ্চকণ্ঠে তাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন, "যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে, এই সোভিয়েট বিপ্লবীরা যাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে, এত বড়ো বন্ধনজর্জর জাতিকে এত অল্পকালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়।.....এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো ; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেন না তার মার আরামের মার। সোভিয়েটেরা রুশ সম্রাটকৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে—অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।" মার্কসবাদীরা বলেন ধর্ম আফিং-এর নেশার মতো, মানুষকে আচ্ছন্ন করে দেয় ; আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ধর্ম বিষকন্যার মতো—তা আলিঙ্গন করে মারে। একজন সৎ অমার্কসবাদীর সঙ্গে মার্কসবাদীদের একটি মৌলিক সামাজিক বিষয়েও যে হুবহু মিল ঘটতে পারে আমরা তার বিরল দৃষ্টান্ত পেলাম।

উপরের আলোচনা থেকে দেখে গেল রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধতার প্রধান কারণ পুরাতন সমাজের আমূল পরিবর্তনের পীঠভূমিতে দুর্ধর্ষ প্রতিজ্ঞার জোরে নবীনের প্রতিষ্ঠার সাধনায়। ভালমন্দ বিচার করা বড় কথা নয়, সৃষ্টিযজ্ঞকে স্বাগত জানানোই কবির কাছে শ্রেয় কাজ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সত্যিই কি সোভিয়েত ব্যবস্থার ভালমন্দ বিচার করেননি? অবশ্যই করেছেন। তাঁর প্রথম সমালোচনা শিক্ষাবিধি নিয়ে, যদিও শিক্ষাব্যবস্থার ফলশ্রুতির অকুণ্ঠ

প্রশংসা তিনি করেছেন। তাঁর আপত্তিটা কী?—"এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই, তা বলি নে—গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না।" রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা প্রকাশের পর পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু আশঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। তাঁর দ্বিতীয় দ্বিধা, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নিয়ে। যে-কোনো একনায়কত্ব সম্পর্কেই তাঁর আপত্তি। যদিও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মাত্রা নিয়ে রুশ নেতৃবৃন্দকেও ঐ সময়ে ভাবনাচিন্তা করতে হয়েছিল এবং কিছুটা ছাড় দিতে হয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া একনায়কত্বের বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব স্বীকার করে নেওয়ার মতো মানসিক প্রস্তুতি সেকালে রবীন্দ্রনাথের ছিল না। এটা শুধু শ্রেণীগত বাধা নয়, তাহলে রোমা রোলাঁর মধ্যে এই প্রশ্নে একই আপত্তি লক্ষ করা যেত না। এই তত্ত্ব স্বীকার করে নেওয়ার জন্য শুধু সৎ উদার মানবিকতা যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সক্রিয় অনুশীলন। রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় সমালোচনা—সমাজবিপ্লব আগে না শিক্ষাবিস্তার আগে। মার্কসবাদীরা মনে করেন সমাজ-কাঠামোর বদল না হলে দ্রুত শিক্ষাবিস্তার ঘটানো যায় না। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস শিক্ষার প্রসার ঘটলে আপনা থেকেই শৃঙ্খল খসে পড়বে। এ-প্রশ্নে কবির আপত্তি খুব জোরালো নয়। কেন না শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষাসত্র যে সফল হয়ে ওঠেনি তা তিনি স্বীকার করেছেন। কবির চতুর্থ সমালোচনা বিপ্লবের রক্তাক্ত পথ নিয়ে। 'রাশিয়ার চিঠি'-র পাঠক লক্ষ করেছেন বিপ্লব সম্পর্কে কবির আপত্তির অবসান হয়েছে। কিন্তু রক্তাক্ত পথ সম্পর্কে তাঁর চিরাচরিত অহিংস নীতি তিনি তখনও আঁকড়ে আছেন। পন্থা সম্পর্ক তাঁর দ্বিধা কিন্তু রক্তাক্ত পথের সাফল্য সম্পর্কে তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এটা কি স্ববিরোধিতা না মতাদর্শের দুরপনেয় সংস্কার! তাহলে মানবমুক্তির রবীন্দ্রনির্দেশিত পথ কী? মুক্তধারার, রক্তকরবীর অভিজিত, রঞ্জন কিংবা শিশুতীর্থের অধিনেতার আত্মোৎসর্গ কোন পথ নির্দেশ করছে? তিনটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, আত্মোৎসর্গের পরিণতিতে ব্যবস্থার ভাঙন। রক্তকরবী-তে দেখা গেছে যক্ষপুরী ভাঙতে শ্রমিকদের হাতিয়ারসহ অভিযান এবং যক্ষপুরীর ধ্বংস। কিন্তু সর্দারতন্ত্রের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষে এক ফোঁটাও কি রক্ত পড়েনি? এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নীরব। কিন্তু বাস্তবতার যে কিনারায় কবি আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন তা কোন দিকে অঙ্গুলিসংকেত করছে? বলপ্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি, অথচ যক্ষপুরী অর্থাৎ শোষণের দুর্গ ধ্বংসে শ্রমিকদের বলপ্রয়োগ ও হাতিয়ার গ্রহণের চিত্র তো রবীন্দ্রনাথই এঁকেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত প্রশ্নে সমালোচনা রেখেছেন সেগুলি সম্পর্কে তাঁর সমাধানচিন্তাও অমীমাংসিত। পৃথিবীতে কোথাও অহিংস বিপ্লবের নজির নেই যতই উদার মানবিকতাবাদীরা তাকে আঁকড়ে থাকুন। শোষণের মূলে রয়েছে হিংসা, তার নিবৃত্তির মধ্যেও থাকবে হিংসা। সেটা হিংসার নীতি নয়, হিংসাকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে পাল্টা হিংসার নীতি। এই নীতি তো রবীন্দ্রনাথ একবার অন্তত সমর্থন করেছেন, "রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকলের চেয়ে যে অনুৎপাদক বিভাগ—সৈনিক বিভাগ—তাকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য। কেন না, আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রুপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলেছে।"

নানা দ্বিধা, আপত্তি, সমালোচনা সত্ত্বেও 'রাশিয়ার চিঠি'তে যে রবীন্দ্রনাথকে পেলাম তিনি স্থিতাবস্থার পক্ষে নন, পশ্চাৎপরও নন, বরং দুর্দমনীয় অগ্রাভিমুখী। পিছনের জীবনের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স হল—এতকাল আমার ধৈর্যচ্যুতি হয়নি। নিজেদের দেশের অতিদুর্বহ মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশি করে দোষ দিয়েছি। অতি সামান্য শক্তি নিয়ে অতি সামান্য প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি, কিন্তু জীর্ণ আশার রথ যত মাইল চলেছে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় দড়ি ছিঁড়েছে, চাকা ভেঙেছে।' সারা জীবনের কর্মকাণ্ড নিয়ে কবির এই হতাশা কেন? একি সংস্কারক রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তি? রাশিয়া থেকে লিখিত চিঠিগুলিতে কেনই বা বার বার স্বীয় 'জমিদারী ব্যবসায়ের' উপর ধিক্কার জানালেন! তবে কি কোথাও উত্তরণের সূচনা ঘটছে, স্ববিরোধিতার ক্রমঅবসান ঘটছে? নিশ্চয় করে জানা না গেলও এটা সুনিশ্চিত, ভগ্ন-বৃদ্ধ শরীরে কবির মনে যখন ঝড় উঠেছে, যখন সারা বিশ্বের চালচিত্রে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিষবাষ্প সভ্যতার সমূহ সংকট সৃষ্টি করে তুলেছে তখন কবি কিন্তু বিশ্বের আর কোথাও নয়, একমাত্র বিপ্লবী রাশিয়ার প্রতি আস্থা পোষণ করেছেন—"সভ্যতার এই ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। ··· মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রধান রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান ··· সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন একথা মনে আপনি আসে যে, নব্য রাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করছে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা আপনিই জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক।" (কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি, ৭ মার্চ ১৯৩৫)। তা হলে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এ বিপ্লবকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান বলে মনে নিয়েছেন। আর তার জন্য রাশিয়ার চিঠির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেয় ব্রিটিশ সরকার। ১৯৩৮ সালে পেত্রভ কর্তৃক কবিকে পাঠানো একটি টেলিগ্রামের কিছু অংশ সেন্সর করে তারপর কবির কাছে পৌঁছয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথও ব্রিটিশ পুলিশের নিয়মিত নজরদারির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু সেসবকে উপেক্ষা করে মৃত্যুশয্যা থেকেও বার বার বলেছেন, 'পারবে পারবে ওরাই পারবে হিটলারের বিরুদ্ধে'।

সত্যদ্রষ্টা কবির ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী

নারায়ণ চৌধুরী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধি আধুনিক ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ মানব। দুইয়ের ব্যক্তিত্বে ও মানসিকতায় যেমন কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে তেমনি অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও প্রবল। কর্মের প্রকৃতিতে, জীবনযাত্রার রীতি ও প্রকরণের ক্ষেত্রে, তাঁদের চেয়ে দুজন ভিন্ন গোত্রের মানুষ কল্পনাও করা যায় না। অথচ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৃহত্তম পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখলে দেখা যায়, উভয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা গভীর ঐক্য আছে। তাঁরা যেন পরস্পরের পরিপূরক, দুইয়ে মিলে একটি বৃত্তের পূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথ যদি হন ভারতীয় জীবনের বাণীরূপের শ্রেষ্ঠ প্রকাশক, গান্ধিজী হলেন তার কর্মকৃতির সবচেয়ে প্রতিনিধি-স্থানীয় নায়ক। একজন কবীন্দ্র, আর একজন কর্মবীর। এই দুইয়ের মিলিত সাধনায় আধুনিক ভারতের প্রতিভার সার্থক বিকাশ হয়েছে।

স্বপ্ন ও কল্পনা কর্মে রূপায়িত না হলে অ-ধরা থেকে যায় ; আবার কর্ম স্বপ্ন বা ভাবুকতার পৃষ্ঠভূমিবর্জিত হলে শুষ্ক যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং জীবনের পরিকল্পনায় ভাব ও কর্মের সমান প্রয়োজন আছে। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ দেশের কর্মাদর্শ গান্ধিজীতে সংহত রূপ লাভ করেছে, আর সেই কর্মাদর্শের পিছনে এক সুবৃহৎ ও গৌরবসমুজ্জ্বল ভাবের পটরূপে বিলম্বিত আছে রবীন্দ্র-সাধনা। এই দৃষ্টিতে দেখলে আমরা একই কালে দুইয়ের ব্যক্তিত্বের প্রতি সুবিচার করতে পারব।

আমি আমার বর্তমান নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধির মধ্যেকার সাদৃশ্য লক্ষণগুলি যেমন দেখাবার চেষ্টা করব, তেমনি তাঁদের বে-মিলগুলিও স্পষ্ট করে তুলে ধরবার প্রয়াস পাব। বে-মিলগুলির আলোচনা না হলে এই দুইয়ের মানসিকতাকে ঠিক বোঝা যাবে না। কিন্তু সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের কথায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে প্রথমে বলে নেওয়া প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী পরস্পরকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। তাঁদের মধ্যে একাধিকবার একাধিক বিষয়ে মতান্তর হয়েছে, কিন্তু মতান্তর কখনও মনান্তরে পরিণত হয়নি। এটা সম্ভব হয়েছে একের অপরের মহিমাকে চিনতে ও বুঝতে কখনও ভুল হয়নি বলে। গান্ধিজীর নৈতিক মহত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ বরাবর স্বীকার করেছেন, আর গান্ধিজী স্বীকার করেছেন কবি ও ভাবনায়ক রূপে রবীন্দ্রনাথের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব। এই স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক সঠিক উপলব্ধির জন্যই মতামতের প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে যে বিতর্ক-বিসংবাদ হয়েছে, তার ভিতর কখনও তিক্ততা প্রবেশ করতে পায়নি।

সকলেই জানেন গান্ধিজী রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করতেন আব রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজীকে বরাবর 'মহাত্মা' অভিধায় ভূষিত করে এসেছেন ; যদিও প্রকৃত তথ্য এই যে ; গান্ধিজীকে প্রথম 'মহাত্মা' সম্বোধন রবীন্দ্রনাথ করেননি। গান্ধিজীর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর সম্মানে গোন্দ্ দেশীয় রাজ্যের রাজা যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের

আয়োজন করেছিলেন তাতে প্রথম 'মহাত্মা' অভিধাটি উচ্চারিত হয় সেখানকার প্রদত্ত মানপত্রে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে প্রথম মহাত্মা বাণী উচ্চারিত হোক আর না-ই হোক তাতে কিছু আসে-যায় না, কবির দৃষ্টিতে গান্ধিজী আজীবন মহাত্মারূপে প্রতিভাত ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজীর প্রতিষ্ঠিত সবরমতী আশ্রম পরিদর্শনে যান। তখন গান্ধিজী জেলে। ৪ ডিসেম্বর তারিখে কবি আশ্রমিকদের উদ্দেশ করে একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণের বিষয় ছিল 'কাকে মহাত্মা বলে?' Who is a Mahatma?—ওই একটিমাত্র ভাষণ পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় কবি গান্ধিজীর প্রতি কী গভীর সম্ভ্রমবোধ অন্তরে পোষণ করতেন। মহাত্মা অভিধা কেন গান্ধি নামক মানুষটির প্রতি সর্বাংশে প্রযোজ্য, উপনিষদ থেকে শ্লোক উদ্ধার করে কবি তা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। উপনিষদীয় শ্লোকের আলোকে, যিনি সকল মানুষের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, যিনি বিশ্বকর্মা, অর্থাৎ যাঁর কর্মকৃতি সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, তিনিই 'মহাত্মা' পদবাচ্য হবার যোগ্য। মহাত্মা গান্ধি এই মানদণ্ডেই মহাত্মা।

পক্ষান্তরে গান্ধিজীর রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' সম্বোধনের মধ্যে রয়েছে যুগপৎ কবির শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ও নিজের ন্যূনতার সবিনয় চেতনা। গান্ধিজীর চেয়ে কবি আট বছরের কিছু বড়ো ছিলেন। এই বয়সের পার্থক্যের দরুন একদিকে গান্ধিজীর প্রতি কবির মনোভঙ্গিতে যেমন ছিল ঐকান্তিক সম্ভ্রমবোধের সঙ্গে স্নেহের আবেগ, অন্যদিকে কবির প্রতি গান্ধিজীর ভাবনায় ছিল শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেকটা পরিমাণ ভক্তির মিশ্রণ। এই পারস্পরিক ভক্তি আর স্নেহের টানাপোড়েনে দুজনার সম্পর্ক বারংবার মতভেদের আন্দোলনে মথিত হলেও বড়ো চমৎকার দেখতে হয়েছিল। রুচি ও বিশ্বাসে যোজনব্যাপী পার্থক্য থাকলেও যে ভালোবাসার টানে সব ব্যবধান ভেসে যায় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর দৃষ্টান্ত তার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ।

এবার রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী একে অন্যকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন তার মুদ্রিত সাক্ষ্য উপস্থিত করব পরস্পরের প্রতি উদ্দিষ্ট কয়েকটি উক্তি সংকলন করে। প্রথমে কবির সম্পর্কে গান্ধিজী কী বলেছেন তা উদ্ধার করি। 'ইয়ং ইন্ডিয়া'র ৫-১১-১৯২৫ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত The Poet and the Charkha প্রবন্ধে গান্ধিজী লিখেছেন, "জীবনে আমি এক লাইন পদ্যও মেলাইনি। আমার মধ্যে কবিভাব একটুও নেই। তাঁর (অর্থাৎ গুরুদেবের) বিশালত্ব আমার আয়ত্তের বাইরে। কাব্যকলার তিনি হলেন অবিসম্বাদী অধীশ্বর। তাঁর তুল্য বড়ো কবি আজকের পৃথিবীতে আর কেউ নেই। আমার মহাত্মাগিরির সঙ্গে কবির কবি হিসাবে বিতর্কাতীত শ্রেষ্ঠত্বের কোনোই সম্পর্ক নেই। এটা বোঝাবার সময় হয়েছে যে, আমাদের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা, এবং কোনো দিক্‌ দিয়েই একের কাজের প্রকৃতির সঙ্গে অপরের কাজের ধারার মিল নেই। কবি তাঁর সৃষ্টির অপরূপ জগতে বাস করেন—ভাব দিয়ে সে জগৎ গড়া। আর আমি অন্যের তৈরি বস্তুর—চরখার—দাস মাত্র। ···কবি হলেন স্রষ্টা—তিনি সৃষ্টি করেন, ভাঙেন, আবার গড়েন। দিন থেকে দিনে নতুন নতুন মনোহর বস্তু তিনি পৃথিবীকে উপহার দেন। আমার কাজ হল পুরানো, জরাজীর্ণ জিনিসের মধ্যে সে সম্ভাবনা লুকোনো রয়েছে, তা প্রকট করা। নতুন নতুন চমৎকার বস্তুর স্রষ্টা জাদুকরের জন্য পৃথিবী অনায়াস সম্মানের স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছে আর আমাকে মানুষের মনের একটি কোণ দখল করবার জন্য আমার ভাঙাচোরা

জিনিসের পসরা নিয়ে কঠিন সংগ্রাম করতে হচ্ছে। কাজেই দুয়ের ভিতর প্রতিযোগিতার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। তবে সবিনয়ে এই মাত্র বলতে পারি যে, আমরা পরস্পরের কাজের পরিপূরক।"

রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজীর অসহযোগ ও চরখা নীতির বিরোধিতা করে ১৯২১ সালে 'সত্যের আহ্বান' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সেটি তিনি কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে পাঠ করেন। ওই বৎসরেরই অক্টোবর সংখ্যা 'মডার্ন রিভিয়ু'তে The Call of Truth নামে তার ইংরেজি তর্জমা প্রকাশিত হয়। ওই প্রবন্ধের বক্তব্যের যুক্তি খণ্ডন করবার চেষ্টা করে গান্ধিজী নিজ বক্তব্য উপস্থিত করেন 'ইয়ং ইন্ডিয়া'র ১৩-১০-২১ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত The Great Sentinel প্রবন্ধে। ওই প্রবন্ধটি প্রতিবাদ-প্রবন্ধ হলেও কবির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা রচনাটির ছত্রে ছত্রে পরিব্যক্ত হয়েছে। কবিকে তিনি বলেছেন অতন্দ্র প্রহরায় রত মহান্ সান্ত্রী। প্রহরা কিসের বিরুদ্ধে? গোঁড়ামি, শৈথিল্য, অসহিষ্ণুতা, অজ্ঞতা, জাড্য এবং ওই ধরনের আরও সব শত্রুর আক্রমণাশঙ্কার বিরুদ্ধে। যা কিছু যুক্তি ও বুদ্ধির প্রতিকূল, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার আহ্বান জানিয়েছেন শান্তিনিকেতনের চারণ কবি। গান্ধিজী সকল দেশকর্মীকে কবির বক্তব্য গভীর মনোযোগের সহিত অবধান করে নিজেদের ভিতরকার ফাঁকি, মেকি আর দুর্বলতা দূর করতে বলেছেন। বড়োর সঙ্গে বড়োর মতভেদের সংঘাতের মধ্যেও যে কত বিনয়, সৌন্দর্য আর নম্রতা থাকতে পারে, এ প্রবন্ধ তার এক সুন্দর উদাহরণ।

অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কী ভাষায় গান্ধিজীর প্রতি তাঁর অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন তা-ও একটু যাচাই করে দেখা যাক। আমরা সবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রমে প্রদত্ত 'মহাত্মা কাকে বলে?' ভাষণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি প্রমাণ যুক্ত হতে পারে। গান্ধিজীর সঙ্গে কবির যখন অসহযোগ, চরখা, বিলিতি কাপড় পোড়ানো ইত্যাদি প্রশ্নে গভীর মতানৈক্য চলছিল, সেই সময়েও দুইয়ের মধ্যে কী নিবিড় শ্রদ্ধার সম্পর্ক বর্তমান ছিল তা জানা যায় একটি সাক্ষাৎকারের সুবাদে। কবিগুরু ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর করছিলেন। শ্রী এস. কে. রায় নামে এক বাঙালি ভদ্রলোক ওই সময় কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলোচনায় মহাত্মাজীর প্রসঙ্গ ওঠে। মহাত্মাজী সম্বন্ধে কবি শ্রীরায়কে যা বলেন তার সারমর্ম এইরূপ—"গান্ধির সাফল্যের মূল তাঁর সক্রিয় আধ্যাত্মিক শক্তিতে ও নিরন্তর আত্মত্যাগে।...তাঁর জীবনটাই আত্মত্যাগের নামান্তর। তিনি মূর্ত ত্যাগ। তিনি ক্ষমতা চান না, পদমর্যাদা চান না, অর্থ চান না, যশ চান না। তাঁকে গোটা ভারতের সিংহাসন দিতে চাইলেও তিনি তাতে বসতে রাজি হবেন না, সোনা-দানা, টাকা-পয়সা তিনি আর্তদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন। আমেরিকার ভাণ্ডারে যত অর্থ আছে তা তাঁকে দেওয়া হোক, তিনি কিছুতেই তা নেবেন না, যদি-না সেই অর্থ মানবতার সেবায় কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। তাঁর অন্তর সতত দেওয়ার জন্য উন্মুখ, প্রতিদানে তিনি কিছুই চান না, এমনকি ধন্যবাদটুকুও পর্যন্ত না। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, কারণ আমি তাঁকে ভালো করেই জানি।...তাঁর এই ত্যাগের শক্তি আরও অপ্রতিরোধ্য হয়েছে তাঁর অসাধারণ ভয়হীনতার জন্য। রাজা-মহারাজা, সম্রাট, সঙিন-বন্দুক, জেল-জরিমানা-অত্যাচার, আঘাত ও অপমান, এমন কি মৃত্যু—কিছুতেই গান্ধীর শক্তিকে দমাতে পারবে

না। তাঁর আত্মা মুক্ত ("He is a liberated soul")। কেউ যদি আমার গলা টিপে মারার চেষ্টা করে, আমি সাহায্যের জন্য চীৎকার করে উঠব, কিন্তু গান্ধী যদি এই অবস্থার সম্মুখীন হন, আমি নিশ্চিত জানি তিনি চীৎকার করবেন না। তাঁকে যদি মরতে হয়, তিনি হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করবেন [কবির এই কথা পরবর্তীকালে কী মর্মান্তিকভাবেই না ফলে গিয়েছিল!]। তাঁর জীবনযাত্রার সারল্য শিশুসুলভ, তাঁর সত্যের প্রতি নিষ্ঠা অবিচলিত। মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম অপরিমেয়। তাঁর মধ্যে যাকে বলা যায় যীশুর ভাব তা অনেকটা রয়েছে। যতো তাঁকে আমি জানছি ততো তাঁর প্রতি আমার সমীহা বাড়ছে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এই মহৎ মানুষটি পৃথিবীর ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণে একটি বড়ো ভূমিকা পালন করবেন।"

শ্রীরায়ের কবিকে প্রশ্ন—"পৃথিবীতে এমন মানুষের আরও বেশি পরিচিতি দরকার। বিশ্বে আপনার প্রতিপত্তি অসীম, আপনি তাঁকে পরিচিত করবার ভার নেন না কেন?"

কবির জবাব—"গান্ধী আমার পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। কোনো মহান্ মানুষকেই মহান্ বানাবার জন্যে প্রয়াস করতে হয় না। তিনি তাঁর নিজের গৌরবেই মহীয়ান্। পৃথিবী যখন তাঁকে গ্রহণ করবার জন্য তৈরী হয়, তিনি তখন নিজের মহত্ত্বের আলোকেই দেদীপ্যমান হয়ে ওঠেন। সময় হলে গান্ধী আপনা-আপনিই পরিচিত হবেন, কারণ তাঁকে বিশ্বের প্রয়োজন। বিশ্ববাসী তাঁর প্রেম, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্রের বাণী শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। প্রাচ্যের আত্মা গান্ধীর মধ্যে একটি উপযুক্ত আধার খুঁজে পেয়েছে। মানুষের সত্তা মূলত আধ্যাত্মিক, নৈতিক আর আত্মিক স্তরেই তার ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বেশী স্ফূর্তি—গান্ধীর সাধনায় এই কথাটাই সরবে উচ্চারিত।" (আর. কে. প্রভু ও রবীন্দ্র কেলেকার সম্পাদিত Truth Called Them Differently পুস্তকে সংকলিত।)

এ থেকেই বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ গান্ধিকে কী চোখে দেখতেন। অসহযোগ আন্দোলনের নেতিবাচক কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে কবির মনে যথেষ্ট সমালোচনাত্মক মনোভাব থাকলেও, শেষ অবধি তিনি গান্ধিজীর আন্দোলনসমূহের এইভাবে মূল্যায়ন করেছেন, "বিপ্লবের ক্ষেত্রে ভারত এক নতুন শৈলীর উদ্ভাবন করেছে, যা আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। একে যদি অমলিন রাখতে পারা যায় তা হলে সেইটেই হবে সভ্যতার হস্তে ভারতবাসীর সত্যকার উপহার।"

২

আমরা দুইয়ের পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভক্তির অভিব্যক্তির হিসাব নিয়েছি। এবার তাঁদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের আলোচনায় আসা যাক। প্রথমে বৈসাদৃশ্যের কথাই বলি।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর জন্ম-পরিবেশ, পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী ইত্যাদিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। গান্ধিজীর জন্ম গুজরাটের অন্তঃপাতী পোরবন্দর দেশীয় রাজ্যের এক মোটামুটি সম্পন্ন বৈষ্ণব পরিবারে এবং জৈন আচার-আচরণ রীতি-নীতিতে মানুষ। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির তৎকালীন অনুন্নত অবস্থা সুবিদিত। গান্ধিজীর বাল্যের আবহে এমন কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না যাতে মনে করতে পারা যায় এই বালক বড়ো হয়ে একদিন সমগ্র বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণ

করবেন। নিতান্ত মামুলি আধা-সামন্ততান্ত্রিক, ইংরেজি ভাবধারার স্পর্শবর্জিত গ্রামীণ ধারায় গান্ধিজীর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ বাংলার এক শ্রেষ্ঠ নাগরিক অভিজাত গৃহের সন্তান, যে-গৃহ উনিশ শতকের মধ্যভাগে শিক্ষায়-দীক্ষায়, সমাজ-সংস্কার চেষ্টায়, ধর্মান্দোলনে, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির চর্চায় বাংলাদেশের পুরোভাগে ছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতা পুণ্যশ্লোক দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের শ্রেষ্ঠ সংস্কারে লালিত, পুত্র পিতৃদেবের কাছ থেকে ওই সংস্কার উত্তরাধিকার সূত্রে বিধিমতেই লাভ করেছিলেন। সকলেই জানেন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সব দিক দিয়ে এক নব-জাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল। যে মহাপুরুষকে এই নব-জাগরণ বা রেনেসাঁসের পথিকৃৎ বলা হয় তাঁর নাম রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন তাঁর নিজের সাধনায় ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে হিন্দু-ঐস্লামিক-খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের, এবং জীবনাচরণের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধারণার সমন্বয় করেছিলেন। রামমোহনের প্রবর্তিত সেই সমন্বয়ের আদর্শই পরবর্তীকালে বিশিষ্ট বাঙালিদের চিন্তায় কর্মে নানারূপে নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এমন এক বিশিষ্ট বাঙালি, যাঁর মধ্যে রামমোহনের প্রভাব বোধহয় সর্বাধিক হয়ে দেখা দিয়েছিল। রামমোহনের জীবনপ্রীতি, যুক্তিবাদ, মানবতন্ত্রী প্রত্যয়, বিশ্বাত্মিকা বুদ্ধি এসব রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনে ওইসব প্রভাবেরই পোষকতা ছিল সবচেয়ে বেশি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রামমোহনের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক। রামমোহনের প্রতি কবির শ্রদ্ধার সীমা-পরিসীমা ছিল না। তিনি একাধিক উপলক্ষ্যে জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, রামমোহনকেই তিনি আধুনিক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মানব বলে মনে করেন।

সেই রামমোহনকেই গান্ধিজী উড়িষ্যা ভ্রমণকালে একদিন কথাচ্ছলে কবির নানক তুকারাম নামদেব প্রভৃতি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাধকদের তুলনায় 'বামনসদৃশ' (Pigmy) বলে মত প্রকাশ করলেন। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিতে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন এবং এক বন্ধুর কাছে প্রবাস থেকে লেখা চিঠিতে উক্তিটির তীব্র প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন। অসহযোগ আন্দোলনের সমালোচনার সূত্রে বিতর্ক আগেই শুরু হয়েছিল। এই ব্যাপারে তা আরও ঘনীভূত হল। গান্ধিজী কবির মনোভাব জানতে পেরে 'ইয়ং ইন্ডিয়া'য় তাঁর ক্ষোভ দূর করবার জন্য লেখনী ধারণ করলেন, বলতে চাইলেন, কাগজে যেভাবে উক্তিটি উদ্ধৃত হয়েছে তেমনভাবে তিনি তা বলেননি, কিংবা তার যে-ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তেমন ব্যাখ্যাও তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু গান্ধিজী যতই কৈফিয়ৎ দিন না কেন, মনে হয় এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মনে একটা ক্ষত থেকে গিয়েছিল, যার পূর্ণ উপশম কখনও হয়নি। যাই হোক, এ হচ্ছে মানসিকতার ভিন্নতার প্রশ্ন, রুচি-বৈষম্যের প্রশ্ন। এই ভিন্নতা বা বৈষম্যের মূল কোথায় তার সদুত্তর পাওয়া যাবে দুইয়ের জন্ম-আবেষ্টনী ও কৌলিক পরিবেশের আলোচনা করলে। আমি একটু আগে সেই চেষ্টাই করেছি।

অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান আপত্তি ছিল এই যে, তা নঞর্থর্মী, নেতিমূলক। কবি বিতর্কটিকে তার পার্থিব অনুষঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনেক উচ্চগ্রামে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন—তার ভিতর আধ্যাত্মিক দ্যোতনার সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। কবির বক্তব্য ছিল এই যে, ভারতীয় সাধনার ধারায় 'না'-কে কখনও প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। অথচ দেখা যায়, 'নন-কোঅপারেশন' বা অসহযোগ কথাটার মধ্যে গোড়াতেই

'না'-এর ব্যঞ্জনা রয়েছে। " 'No' in its passive moral form is asceticism and in its active moral form is violence." নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অবস্থায় 'না' আত্মনিগ্রহ ; সক্রিয় প্রতিরোধের অবস্থায় তা হিংসায় রূপান্তরিত। অসহযোগের মধ্যে হিংসা নিহিত আছে। যে-আন্দোলনের মধ্যে হিংসার ভাব আছে, কবি তা সমর্থন করতে পারেন না।

এটা হল সূক্ষ্ম যুক্তির প্রশ্ন, সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে এমন যুক্তির অবতারণা করলে বোধ করি কোনো আন্দোলনই পরিচালনা করা যায় না। তেমন ক্ষেত্রে থোরোর সরকারকে কর না দেবার আন্দোলন, রাশিয়ার জার শাসনের অনাচারের বিরুদ্ধে দুখোবরদের দেশত্যাগের আন্দোলন, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন, চম্পারণ, খেড়া, বার্দোলি সত্যাগ্রহ ইত্যাদি সবই নিরর্থক হয়ে যায়। সরকারই হোক আর অন্য যে-কোনো প্রকার সংস্থাই হোক, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির প্রতীকরূপে যা-কিছু বর্তমান তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে না-ধর্মী অসহযোগী মনোভাবকে বোধকরি একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। বরং গান্ধিজীর অসহযোগের মধ্যেই তো সহযোগের ভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি বৈরীর প্রতি শত্রুভাব পোষণ করতেন না, আন্দোলনের দিনক্ষণ আগে-ভাগে প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দিতেন, প্রতিপক্ষের সঙ্গে যে-কোনো সময় সম্মানজনক শর্তে আপসের জন্যে প্রস্তুত থাকতেন। এ যদি অস্তিবাচক গুণ না হয় তো আর কিসে অস্তিবাচক গুণ হয় তা বলা মুশকিল।

আসলে কবিগুরুর আপত্তির মূল ছিল অন্যত্র। তিনি গান্ধিজীকে অবিশ্বাস করেননি। অবিশ্বাস করেছেন জনতা চরিত্রকে। বল্গাহীন অনিয়ন্ত্রিত জনতার হাতে অসহযোগের অধিকার ছেড়ে দিলে কোথায় গিয়ে সেই অধিকারের শেষ হবে সে বিষয়ে স্পষ্টতই কবির চিত্ত সংশয়ান্বিত ছিল। এবং দেখা যায় কবির সংশয়ের ভিত্তি ছিল। ১৯১৯ সালে একবার বোম্বাইয়ে নদিয়াদে বিরমগাঁওয়ে এবং ১৯২২ সালে আর একবার চৌরিচৌরায় জনতা যেরূপ মারমুখো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল তাতে বোঝা যায় কবির সমালোচনার পিছনে অমঙ্গল সম্ভাবনার দূরদৃষ্টির একটি কালোপট শুরু থেকেই শঙ্কা সন্দেহে আন্দোলিত হয়েছে। গান্ধিজী নদিয়াদের ঘটনার পর নিজের উপর সব দোষ টেনে নিয়ে বলেছিলেন, "আমি হিমালয়প্রমাণ ভুল (Himalayan blunder) করেছি।" ভুলের ভবিষ্যৎ-দর্শন সম্ভবত গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল।

কবি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমবায়ী তথা সহযোগমূলক মনোভাবের সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর এই পক্ষপাত এতই সুচিহ্নিত ছিল যে, এমনকী বিদেশী শাসকের জাত ইংরেজকেও তিনি তাঁর এই সহযোগের বৃত্তের বাইরে রাখতে অনিচ্ছুক ছিলেন। উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া লিবারাল শিক্ষার ধারায় মানুষ রবীন্দ্রনাথের দুর্জয় আশাবাদ ইংরেজকেও বন্ধু বলে ভাবতে তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছে। রেভারেন্ড সি. এফ. অ্যানড্রুজ, মিঃ পিয়ার্সন, মিঃ এলমহার্স্ট প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু কবির এই সর্বতোমুখী সহযোগী মনোভাবে বোধ হয় শেষ বয়সে কিঞ্চিৎ চিড় ধরেছিল। যুদ্ধমধ্যবর্তী বৎসরগুলির নানাবিধ ঘটনা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবির আশাবাদে প্রচণ্ড ঘা দিয়েছিল বলে সন্দেহ হয়। প্রমাণ, মিস র‍্যাথবোনকে লেখা খোলা চিঠি, 'সভ্যতার সংকট' নামীয় প্রবন্ধ। ইংরেজের সদিচ্ছায়

বিশ্বাস তাঁর একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ১৯২০ সালে গৃহীত গান্ধিজীর অসহযোগী কার্যক্রম পরবর্তীকালের ঘটনা ও চিন্তার গতিকে আগেভাগেই আঁচ করে নিতে পেরেছে। মনে হয় এইক্ষেত্রে কবির দৃষ্টি অপেক্ষা গান্ধিজীর দৃষ্টি স্বচ্ছতর ছিল।

কিন্তু একটি প্রশ্নে কবি সুদৃঢ় ভূমির উপর দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রশ্নটি শিক্ষা-সম্পর্কিত। সকলেই জানেন আন্দোলনের নামে স্কুল-কলেজ বর্জনের কার্যক্রমকে কবি মোটেই সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর কথা ছিল—অনগ্রসর ভারতবাসীর জীবনে সবচেয়ে যেটা বেশি দরকার তা হল শিক্ষার আলোক। সর্বগ্রাসী শিক্ষাবিস্তার-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যদি দিকে দিকে বিদ্যা বিকীর্ণ করে দেওয়া যায় তা হলে দেশে জাগরণের জোয়ার আসবে, সেই সূত্রে স্বাধীনতা অলভ্য থাকবে না। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে কুলুপ এঁটে দিয়ে কেবল সংগ্রামের উত্তেজনায় নেচেকুঁদে বেড়ালে কোন্ চতুর্বর্গ ফল লাভ হবে তাঁর নিকট ধাঁধা হয়েই ছিল। গান্ধিজী বললেন যে, ঘরে যখন আগুন লাগে তখন কি ছাত্র বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকে, সে কি তখন বই ফেলে বালতি নিয়ে আগুন নেভাতে ছুটে যায় না? ভারতের পরাধীন অবস্থা ঘরে আগুন লাগার তুল্য অবস্থা, এই অবস্থায় স্বাধীনতা অর্জন ভিন্ন দেশবাসীর সামনে অন্য কোনো কার্যক্রম থাকতে পারে না। লেখাপড়া দু-চারদিন অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজ নয়।

গান্ধিজীর উত্তর বরাবরই তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্য ও শিষ্টতায় মণ্ডিত। কিন্তু যাঁরা অত সৌজন্যের ধার ধারেন না, যাঁদের রসনা উগ্র, তাঁরা বলতে লাগলেন, কবির মনোভাব অনেকটা রোম নগরী যখন পুড়ছে তখন নীরোর বেহালা বাজানোর মনোভাবের মতো। সংকটকালে বাঁশি-বাজিয়ের প্রয়োজন নেই, অসি-চালিয়েরই দরকার। কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতায় এবং হালের কাণ্ড-কারখানা দেখে আমরা বুঝেছি যে, রবীন্দ্রনাথ কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের জাতীয়জীবনের পুনর্গঠনের যে-কোনোরূপ কার্যক্রমে শিক্ষারই সর্বাগ্রগণ্য স্থান হওয়া উচিত। অথচ দেখা যায় তার স্থানই সবশেষে। শিক্ষাকে পাশ কাটিয়ে কেবল হুজুগ আর আন্দোলনের তাৎক্ষণিক উত্তেজনার ফেনায় ফেনায় ভেসে বেড়ালে তার ফল কী সর্বনাশা হতে পারে আমাদের সাম্প্রতিক ছাত্র-আন্দোলনের ভিতর তার ভয়াবহ চেহারা প্রত্যক্ষ করছি। ছাত্রদের লেখাপড়াটাই আগে করণীয়, তারপর অন্য কিছু। বিদ্যাভ্যাসকে গৌণ স্থান দিয়ে ছাত্রবয়সে আত্যন্তিক রাজনীতি-চর্চায় মেতে উঠলে হিতে বিপরীত ফল হয়। মনে হয় অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও এই কথা সমান সত্য ছিল। তখন হয়তো পরিবেশ ভিন্ন ছিল, কিন্তু পরিবেশের ভিন্নতায় সত্যের প্রকৃতি আলাদা হয়ে যায় না। শিক্ষা নিয়ে হেলাফেলা করার চেয়ে আত্মঘাতী ব্যসন আর নেই।

বিলিতি কাপড় পোড়ানোর কার্যক্রমেও কবির সায় ছিল না। বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবকে তিনি ছদ্মবেশী হিংসা বলেই মনে করেছেন। যে-যুক্তিতে তিনি অসহযোগের কার্যক্রমকে সমর্থন করতে পারেননি, একই যুক্তিতে তিনি বিলিতি কাপড় পোড়ানোকেও নেতি-ধর্মীজ্ঞানে অনুমোদন দানে বিরত থেকেছেন। কিন্তু গান্ধিজী কবির সমালোচনার প্রত্যুত্তরে একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন। বিদেশী বস্ত্র বিদেশীর আধিপত্যের প্রতীক। বিদেশী বস্ত্র পোড়ানোর মধ্য দিয়ে বিদেশী আধিপত্যের ধারণাকেই ভস্মীভূত করা হচ্ছে। "In

burning my foreign clothes I burn my shame." বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে আমি আমার লজ্জাকে পোড়াই।

সুপণ্ডিত কাকাসাহেব কালেলকার নৈষ্ঠিক গান্ধি-অনুগামী বলে পরিচিত। তাঁর মতে অহিংসামন্ত্রের সাধক মহাত্মাজী এ ব্যাপারে প্রগাঢ় মনস্তাত্ত্বিকের ন্যায় কাজ করেছেন। ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে সাধারণ ভারতবাসীর পুঞ্জীভূত ক্রোধকে তিনি যদি এভাবে সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি দান না করতেন তা হলে সেই সময়ে দেশে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটত। হিংসাকে শোধন করবার এ একটা কৌশলী প্রক্রিয়া। কাকাসাহেবের এই যুক্তিতে আমাদের মন সায় দেয় না, যদিও পরাধীনতার কলঙ্ক-ভূষণস্বরূপ বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবে নীতিগতভাবে কোনো আপত্তি আমরা দেখি না।

সর্বশেষে চরখা। গান্ধিজীর চরখা-নীতির বিরুদ্ধে কবির প্রধান আপত্তি এইখানে যে, চরখা ব্যক্তির স্বাধীন অভিক্রমে অর্থাৎ initative-এ বাধা দেয়, সকলকে একই ছাচে গড়ে তোলে, মানুষের সৃষ্টিশীল অভ্যাসের বদলে তার মধ্যে যান্ত্রিক অভ্যাসের জন্ম দেয় ; তাকে আনন্দহীন খাটুনির (drudgery) শিকার করে তোলে। "সব মানুষকে একই ছাঁচে ঢালবার এই ভয়ংকর প্রক্রিয়া আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে সক্রিয় রয়েছে।··· নিরানন্দ কাজের এই একঘেয়েমির ফলে মানুষ বাঁচবার স্পৃহাই হারিয়ে ফেলেছে।" তাছাড়া এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ। যেখানে বিজ্ঞানের সুফলকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে বস্ত্রাভাব-সহ সকলপ্রকার অভাবই মেটানো যায়, সেখানে বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে এড়িয়ে চরখায় সংলগ্ন হয়ে থাকা পুরনোকেই আঁকড়ে থাকার শামিল।

গান্ধিজীর চরখা-নীতি সুবিদিত। কবিগুরুর সমালোচনার উত্তরে গান্ধিজী চরখাকে সমর্থন করে যেসব যুক্তিক্রমের বিস্তার করেছিলেন এখানে বাহুল্য বোধে তার আর উল্লেখ করলাম না। দুজনার ভিতর এ বিষয়ে মতের এমনই মৌলিক পার্থক্য যে, কোনোক্রমেই তাতে আপস-রফা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীকে এককালীন আমাদের মেনে নিতে হলে এই সমস্যাকে অমীমাংসিত রেখেই সেই যুগ্ম-শ্রদ্ধার বেদী রচনা করতে হবে।

৩

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য নিরূপণ করতে হলে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে তা নিরূপণ করা যাবে না, সাধারণ একটি তথ্য হিসাবেই তা নির্ণয় করতে হবে। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর মধ্যে ভাবগত ঐক্য তাঁদের গভীর ধর্মপ্রাণতায়, নৈতিকতায় ও ভারতের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শ্রেয়োবোধে বিশ্বাসে। ভগবৎ-প্রেরণা বা যে-নামেই তাকে অভিহিত করা যাক না কেন—সত্য বা জীবনদেবতা—দুইয়েরই তাবৎ কর্মোদ্যমের উৎস। গান্ধিজী গ্রাম-অন্ত প্রাণ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতের আত্মা গ্রামে নিহিত। রবীন্দ্রনাথও ভারতীয় গ্রামীণ সভ্যতার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যদিও বলাই বাহুল্য, দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে ও ঝোঁকে পার্থক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের চোখে ভারতের গ্রাম প্রতিভাত হয়েছে যুগ যুগ ধরে বহমান ভারতীয় সভ্যতার প্রাণপুরুষের নিকেতনরূপে। গ্রামের পঞ্চায়েত প্রথা, রাজধানী-নিরপেক্ষতা, ভূস্বামীদের বদান্যতা, স্বয়ম্ভরতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনাকে বিশেষভাবে আলোড়িত

করেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারত-ইতিহাসের ধারা মূলত গ্রামকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। যদিও তিনি নিজে নগর-জীবনের সন্তান ছিলেন, কবির গদ্য-পদ্য অনেক উৎকৃষ্ট রচনার মূলে গ্রাম, এটা কিছু অকারণ নয়। তাঁর হীরকখণ্ডসদৃশ ছোটোগল্পগুলিতেও দেখি গ্রামেরই ব্যঞ্জনা। গ্রামের প্রতি প্রীতি ও মমতার ক্ষেত্রে এই দুই অগ্রগণ্য ভারতীয় সমভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন, যদিও তাঁদের দেখার চোখ আলাদা, অনুভবের হৃদয় আলাদা। কবির শিল্পদৃষ্টি সে তাঁর একান্তই নিজস্ব। তার ফসল কারও সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করবার উপায় নেই। কর্মী গান্ধির কাব্যকল্পনা অনড় কিন্তু প্রেম বিশাল। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়েও সাধারণ মানুষের জন্য বিশাল প্রেমের জায়গা ছিল, তবে পার্থক্য এই যে সেই প্রেমকে তিনি গভীর শিল্পকল্পনার দ্বারা অনুরঞ্জিত করে নিয়েছিলেন।

অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রীতি শুধু শিল্পধ্যানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তাকে তিনি ব্যবহারিক রূপ দেবারও চেষ্টা করেছেন। শ্রীনিকেতনে তাঁর পল্লী-পুনর্গঠন প্রয়াস এ কথার প্রমাণ। গান্ধিজীও পরে নানামুখী পল্লীপুনর্গঠন প্রয়াসে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু এক্ষেত্রে পথিকৃতের মর্যাদা দিতে হলে রবীন্দ্রনাথকেই তা দিতে হয়। তিনিই বোধকরি ভারতে পল্লী-সংস্কার বিজ্ঞানের জনক। স্বপ্ন ও ধ্যানের মানুষকে কর্মীরূপে সহজে আমাদের প্রত্যয় হয় না, কিন্তু আকাশচারী কল্পনায় নিত্যধৃত স্বপ্নের দুলাল কবির মৃত্তিকানিবদ্ধ কর্মীরূপ ছিল একটি বাস্তব সত্য। এমনতরো সমন্বয় বিরল কিন্তু কবির ক্ষেত্রে সেই সমন্বয় হয়েছিল। 'হরি-হর মিলি হইল এক।' এই সমন্বয়ের মধ্যে আমরা গান্ধি-রবীন্দ্রনাথকে একাঙ্গে বিরাজিত দেখতে পাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ৭ই পৌষ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ; ইংরেজি ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২১ তারিখে।

কিন্তু এই অনুষ্ঠানের পূর্বেতিহাস বিশ্বভারতী গড়ে উঠবার ক্রমিক ইতিহাস। প্রতিষ্ঠা আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। এর পশ্চাৎপটে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার যে বিশেষ রূপ ছিল তারই ফলশ্রুতি বিশ্বভারতী। সেই ইতিহাসটুকু না জানলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীকে জানা সম্পূর্ণ হবে না। তাঁরই ভাষায় বলব, 'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলার দীপজ্বালার আগে সকালবেলার সলতে পাকানো।' আরম্ভের সেই মূল ইতিহাস উন্মোচন করলে এর পশ্চাতের রবীন্দ্রাদর্শকে বুঝতে সাহায্য করবে।

২

বীজবপন হয়তো অলক্ষিতেই হয়েছিল ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১৮ই ফাল্গুন তারিখে যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই প্রান্তরের ২০ বিঘা জমি কিনে নেন রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে। এই প্রান্তরে ছিল দুটি মাত্র ছাতিম গাছ যার তলায় বসে বিশ্রাম করার সময়ে তাঁর প্রশান্ত ঐশ্বরিক উপলব্ধি হয়। এখানে তিনি একটি বাড়ি তৈরি করে নাম দিলেন 'শান্তিনিকেতন' এবং পরে একটি উপাসনাগৃহ নির্মাণ করলেন যেখানে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোক নির্জনে উপাসনা করতে পারবেন। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে খোদিত ছিল 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' বাণী—যে বাণীর উৎসে জীবন ন্যস্ত।

১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ, ইংরেজি ২২শে ডিসেম্বর, ১৯০১, তারিখে রবীন্দ্রনাথ এখানে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর মনে কেন উদয় হয়েছিল তা অনুধাবনযোগ্য।

প্রচলিত ইস্কুলের চারদেয়ালের মধ্যে শিক্ষালাভের তিক্ত অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের ছিল সে-কথা তাঁর জীবনকাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি। তাঁর মনে হয়েছিল শিক্ষাকে এভাবে প্রকৃতি এবং মানুষের সংযোগ থেকে সম্বন্ধ থেকে বিযুক্ত করলে শিশুদের বোধের স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হয় না। মনের মতো একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রত্যক্ষ আর-একটি কারণও ছিল—তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের শিক্ষা। নিজের অভিজ্ঞতার সূত্রে ভেবেছিলেন প্রচলিত বিদ্যালয়ে পাঠের বিষফল তাঁর পুত্রদের এবং অন্যান্য শিশুদের যাতে বিকৃত না করে তার উপায় নির্ধারণ করা। ইস্কুলের শিক্ষায় শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের ঘনিষ্ঠ সহজ সম্পর্ক হয় না। উভয়েই স্কুল নামক একটি গৃহে কিছুক্ষণের জন্য এসে মিলিত হন মাত্র। উভয়ের মধ্যে অনেকটা দূরত্ব থেকে যায়। সেখানে শুধু বই পড়া ও মুখস্থ করার চেষ্টা। লক্ষ্য পরীক্ষায় কৃতকার্যতা। কিন্তু জীবনের পরীক্ষায় সচরাচর তারা কৃতকার্য হয়ে ওঠে না। জীবিকার ক্ষেত্রে এই শিক্ষার প্রয়োগ। ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের আশ্রমের শিক্ষা,

গুরুগৃহে থেকে বিদ্যার্জনের ব্যবস্থা তাঁকে আকৃষ্ট করে। কালিদাস প্রমুখ কবির রচনায় তপোবনের যে শান্ত নির্মল রূপ ফুটে উঠেছে, যেখানে গুরু ও গুরুপত্নীর সঙ্গে শিষ্যরা এক পরিবারভুক্ত, তপোবনের বৃক্ষলতা পশুপাখি যে-শিক্ষা পরিবেশের অঙ্গ, সেখানে শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীদের মনুষ্যত্ব এবং বোধি-বিকাশের সহজ ক্ষেত্র। তাঁর চিন্তায়—'ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে-একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্রজীবনের সজীব ভূমিকা।' (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ)

এই আশ্রম-শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে যিনি গুরু, তিনি যন্ত্র নন, মানুষ। তাঁর অবিরত সাহচর্য থেকেই শিষ্যরা প্রেরণা পায়। তিনি সক্রিয়ভাবে শিষ্যদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এই শান্ত ভাব-গম্ভীর পরিবেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির কথা আর-একটু শোনা যাক।—"তপোবনের যে-একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রং হয় তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানা ভাগে না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে তখনই শান্তরসের উদ্ভব হয়। তপোবনে সেই শান্তরস। এখানে সূর্য অগ্নি বায়ু জলস্থল আকাশ তরুলতা মৃগপক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।" (তপোবন)

এই প্রত্যয় নিয়ে তিনি নিজেই শান্তিনিকেতনে একটি আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথের সম্মতি ও আশীর্বাদ পেলেন। আর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ হলেন ব্রতী। কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বলেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ মারা গেলেন। আরম্ভেই এই ধাক্কা খেয়েও রবীন্দ্রনাথ কর্তব্যচ্যুত হলেন না। পরে আমরা দেখেছি এই প্রকার মৃত্যুজনিত আঘাতের পর আঘাত এসেছে, অর্থের অভাব দেখা দিয়েছে, নিজের যাবতীয় সঞ্চয় এবং পত্নী মৃণালিনীর অলংকারও ব্যয়িত হয়েছে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে, তবু তিনি সংকল্পচ্যুত হননি।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে দেখছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে এক পত্রে লিখছেন,—"শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহ-বাসের মতো সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-গন্ধ থাকিবে না—ধনী-দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোনোমতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ-চেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোনো মহৎ কার্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারো মুখরোচক হয় না। ...অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে—দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকলপ্রকার দৈন্য আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর কাজে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রেবাচাঁদ, জগদানন্দ রায়—এঁদের পেয়েছিলেন এবং পরে অজিত চক্রবর্তী, সতীশ রায়, মোহিত সেন, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের পাশে পেয়েছিলেন। কিন্তু সে ইতিহাস স্বতন্ত্র। নতুন একটি বিদ্যালয় প্রবর্তনের সূত্রে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর ধারণা ও মতামত কেমন ছিল দেখা যাক।

ইস্কুলের ইতিবৃত্ত বলে একে অবান্তর মনে করা যাবে না। কেননা, এই থেকেই ক্রমে বিশ্বভারতী-চেতনার জন্ম।

রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি,—'শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাশনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সে-ও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার।' (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ)

"শিক্ষাকে জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাকে বিদ্যালয়ের গড়া কৃত্রিম সামগ্রী করে তুললে তার অনেকখানিই আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হয়। এতে জীবনারম্ভের সুদীর্ঘকাল প্রতিদিন মন ক্লিষ্ট হয়ে তার স্বাভাবিক শক্তি কত যে নষ্ট হয় আমরা তার হিসাব স্পষ্ট আকারে দেখতে পাইনে বলে বুঝতে পারি নে।"

"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য এই যে, এখানে ছাত্ররা বিদ্যাশিক্ষাকে তাদের অখণ্ড জ্ঞানপ্রকৃতির ও মনঃপ্রকৃতির বিচিত্রলীলার অঙ্গরূপেই যেন গ্রহণ করতে পারে।"

"এই লক্ষ্য যদি যথার্থভাবে আমরা সাধন করি তবে এখানকার ছাত্রছাত্রী, এখানকার শিক্ষক ও তাঁদের পরিজনবর্গের পক্ষে এই বিদ্যালয় যথার্থ আশ্রম হয়ে উঠবে, ইস্কুল হয়ে থাকবে না।" (শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ, পৃ ১২৫)

"বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জমিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্তত হওয়া উচিত, এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, এ কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এ দেশে অতি পুরাকালে, যখন লিপি প্রচলিত ছিল, তখনো তপোবনে পুঁথি ব্যবহার হয় নাই। তখনো গুরু শিষ্যকে মুখে মুখেই শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর-এক দীপশিখা জ্বলিত। এখন ঠিক এমনটি হইতে পারে না। কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে ; তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে ; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ।" (আবরণ)

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত আশ্রমের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা' বইয়ের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ উক্তি লক্ষণীয়। লিখছেন, "যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি ··· উচ্চ আদর্শমাত্রই 'মিলেনিয়ামে'র দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সংকল্প-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা ; ইহাই আমাদের সর্বপ্রকার অবমাননা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়।"

রবীন্দ্র-রচনার ইতস্তত অংশের যৎসামান্য উদ্‌ধৃতি থেকে তাঁর শিক্ষাচিন্তার কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ, বৃহত্তর লোকালয়ের যোগ, প্রাণের মধ্যে আনন্দসঞ্চার, গ্রন্থনির্ভর না হয়ে আত্মনির্ভর হওয়া, —এইভাবে চিন্তার মুক্তিসাধন এবং

ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে নিজেই তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বক্তৃতা না দিয়ে, কেবলমাত্র উপদেশবাণী উচ্চারণ না করে দৃষ্টান্ত স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন।

৩

বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিশুশিক্ষার এই ভূমিকা অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। এই বিষয়ে আরও একটু অগ্রসর হয়ে আমরা দেখব কেমন করে, কোন্ ভিত্তিতে কোন্ ভাবে ভাবিত হয়ে, কোন্ প্রত্যয়ের জোরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী গড়ে তুলছেন।

১৩০৯ বঙ্গাব্দের নববর্ষের মন্দির-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন তার মর্মার্থ, ভারতবর্ষ তার একাকীত্বের আবরণে রক্ষিত, যুদ্ধবিরোধ না করেও সে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখতে পারে, বিপ্লবাদির মধ্যেও শান্তিরক্ষা করে চলে ; এ জন্য কোনো শক্তি ভারতকে গ্রাস করতে পারে না। ইউরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ ; আর ভারত ভাগ করে ভোগ করে, কর্ম করে একাকী। অন্যান্য অনেক রচনায় ও ভাষণে তাঁর প্রত্যয়ের, উপলব্ধির প্রকাশ। —ভারতবর্ষ বা এশিয়ার সভ্যতা সত্য বলেই প্রাচীন, কোনো চাপে তা ভেঙে পড়েনি। ভারতীয় সমাজ সংযত ও সরল ছিল, কিন্তু নিজের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ব্যাপ্ত করেছিল অনন্তের মধ্যে। সমাজের কাজ মানুষকে সব রকমের সার্থকতা দেওয়া। এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে সমাজ দুর্বল হয়ে উঠছে। তাকে পুনরায় স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা দিয়ে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। এবং এই সাধনারই ক্রমিক প্রকাশ রূপায়িত বিশ্বভারতীতে।

এমন সময়ে বঙ্গভঙ্গরোধ আন্দোলনের সূত্রপাত। বাংলায় অবশ্য দেশাত্মবোধের সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে (১৯০২) ছাত্রদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তি-শ্রদ্ধাবান করিতে চাই। ··· স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা উপহাস ঘৃণা ··· খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে চাই। ··· অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো, তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।" স্বদেশপ্রেমের নতুন এক জোয়ার এল ১৯০৫ ইঙ্গাব্দের ১৬ই অক্টোবরের বঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথ এর সামিল হলেন। 'বঙ্গদর্শনে' লিখলেন, "আগামী ৩০শে আশ্বিন (১৩১২) বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখি-বন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখিবন্ধনের মন্ত্রটি এই, 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'।"

এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথ সকলের সঙ্গে মিশে গেলেন। সরকার ছাত্রদের দমন করবার আইন করলেন। তখন বিলাতি দ্রব্য বর্জন শুরু হল, বিদেশের ইস্কুল বয়কট করবার প্রস্তাব হল। শিক্ষার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের কথা উঠল। তারই এক সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতির ভাষণে বললেন, "আমাদের সমাজ যদি নিজের বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করেন, তবে একদিন ঠেকিতেই হইবে। ··· গবর্নমেন্ট এ দেশের অনুকূল শিক্ষা কখনো দিতে পারেন না। ইহার কারণ অক্ষমতাও হইতে পারে, অনিচ্ছাও হইতে পারে। অক্ষমতা—কেন

না যেখানে হৃদয়ের যোগ না থাকে, সেখানে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না ; অনিচ্ছা—কেন না গবর্নমেন্ট জানেন যে, তাহাদিগের সাহিত্য ও ইতিহাস প্রভৃতি হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া আমাদের চিত্ত যে-ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে তাহা তাঁহাদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল নহে।”

উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা চলেছে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হল। রবীন্দ্রনাথ আলোচকদের মধ্যে থাকেন, কিন্তু সদস্যদের ভাবধারা এবং কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তাঁর মন সায় দেয় না। নতুন কোনো পরিকল্পনার কথা কেউ ভাবেন না। দেশের মধ্যে প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচেই আর-একটি বিদ্যায়তন গড়ে তোলা অনেকটাই ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনা, স্বচ্ছ চিন্তার অভাব। রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে সরে এলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর মন বিমুখ হল এই দেখে যে, সকলেই উত্তেজনার বশে গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা বলে মনে করছেন। ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩১২ তারিখে তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে এক চিঠিতে লিখছেন, “দেশে যদি বর্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইঁহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। ...উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের পাশে বসিয়া থাকিব।”

শান্তিনিকেতনে এসে এবার তিনি সংগঠন ও সমবায়ের কাজে মনোনিবেশ করার কথা ভাবলেন। এই রাজনৈতিক আবর্তের মধ্য থেকে বেরিয়ে তাঁর মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছে সর্বমানবের মিলন সাধনের কথা। স্বার্থের বিরোধের ফলে মানুষ পরস্পরের সহজ যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তাই দরকার মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ মিলন। কর্মে এবং প্রেমে। তিনি উপলব্ধি করছেন, আত্মকলহ, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং তজ্জনিত পাপের বোঝা থেকে মুক্ত হওয়াই দেশোদ্ধারের—দেশ গঠনের প্রধান অঙ্গ। মনে প্রত্যয় হল, গ্রামে গ্রামে যে সব অবহেলিত মানুষ আছে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাতে হবে, মানুষ হিসেবে তাদের মাহাত্ম্য যে অন্য কারও থেকে কম নয়, সেই বোধ আনতে হবে তাদের মধ্যে। স্মরণ করা যেতে পারে ১৩০০ বঙ্গাব্দে (২৩শে ফাল্গুন) রচিত তাঁর ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতার সেই ক'টি পঙ্‌ক্তি

> “...এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
> দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
> ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
> মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
> যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
> যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।”

‘পথ ও পাথেয়’ (১৩১৫) গ্রন্থে সেই কথাই তিনি বললেন—“ইংরেজ শাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার ’পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া সেবার

দ্বারা, প্রীতির দ্বারা সমস্ত ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে। একত্র-সংগঠনমূলক সহস্রবিধ সৃজনের কাজে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশরূপে স্বহস্তে গড়িতে হইবে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্বচেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।"

এই সময়েই 'পূর্ব ও পশ্চিম' ভাষণে বা 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' রচনায় (১৩১৫) আরও বলছেন, —"আজ যে পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতেতিহাসের একটা প্রধান অংশ জুড়িয়া বসিয়াছে ইহা কি সম্পূর্ণ আকস্মিক, অপ্রয়োজনীয়। ইংরেজের নিকট কি আজ আমাদের শিখিবার কিছুই নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাহা আমাদের দিয়া গিয়াছেন, বিশ্বমানব-ভাণ্ডারে তাহার অপেক্ষা নতুন জ্ঞান কি আর কিছুই থাকিতে পারে না। নিখিল মানবের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা আদানপ্রদানে আমাদের অনেক প্রয়োজন আছে; ইংরেজ বিধাতৃপ্রণোদিত হইয়া তাহারই উদ্যম আমাদের মধ্যে জাগাইতে আসিয়াছে—সফল না হওয়া পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হইবে না। সে সফলতা পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে, বিরোধে নহে। ···আমাদিগের সকল দাবিই আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে—হীনতার দ্বারা নহে, কিন্তু মহত্ত্বের দ্বারা, মনুষ্যত্বের দ্বারা।"

আমরা দেখতে পাচ্ছি এভাবে এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় মানুষের সঙ্গে মানুষের মহামিলন, প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের ভাববিনিময়-জনিত মিলনের প্রসঙ্গ দানা বাঁধছে। এ বক্তব্য ইংরেজপ্রশস্তি নয়, তার যেটুকু ভালো ও গ্রহণযোগ্য, যাতে আমাদের চিন্তার ব্যাপ্তি হবে। কালের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান হবে, সেটুকু উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিরোধের চিন্তায় সব কিছুই বর্জন করা আত্মঘাতমূলক। রবীন্দ্রনাথ বড়ো ইংরেজ, ছোটো ইংরেজ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন তা আমরা জানি। সংকীর্ণ চিন্তার দিন নেই, বিশ্বের মানুষ আজ চিন্তায় দর্শনে কর্মে সংযুক্ত হচ্ছে, নৈকট্য স্থাপন হচ্ছে। তাই দেশগঠনে এবং দেশের সম্পদের আদান-প্রদানে এই মনোভঙ্গির প্রয়োজন আছে. 'গোরা' উপন্যাসে ভারতধর্মের ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের একটা সূত্রও লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে এই চিন্তা এবং কর্মধারাই বিশ্বভারতী পরিকল্পনায় রূপ নিয়েছে।

৪

১৯১২ ইঙ্গাব্দ। শারীরিক কারণেই বিলেত যাচ্ছিলেন কবি। কিন্তু স্থগিত রাখতে হল কিছুদিনের জন্য। সময়টা কাটালেন শিলাইদহে। গান রচনা চলছে (গীতিমাল্য), সঙ্গে সঙ্গে খেয়ালের খেলাতেই গীতাঞ্জলি প্রভৃতির গানের ইংরেজি তর্জমা শুরু করলেন। এবং ইউরোপ যাবার সময়ে সেই তর্জমাগুলি সঙ্গে রাখলেন। এই সময় তাঁর মনে হচ্ছে একটি বিশেষ কথা; যাবার আগে লিখছেন (যাত্রার পূর্বপত্র, আষাঢ়, ১৩১৯)—"মানুষের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিদ্যালয়ের সম্বন্ধটিকে অবারিত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি"।

১৯১২ ইঙ্গাব্দের ১৬ই জুন পৌঁছলেন লন্ডনে। রোটেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে ঐ গীতিগুচ্ছের স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদের খাতাটি পড়তে দেন। এই অনুবাদগুচ্ছ পড়ে রোটেনস্টাইন মুগ্ধ হন, এবং কবি ও সাহিত্যিকদের এক সভায় আহ্বান করেন তা পড়ে শোনাবার জন্য। তারিখটা ছিল ৭ জুলাই। এরই পরিণামে ১৯১৩-তে রবীন্দ্রনাথের

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি, সে ইতিহাস সকলেই জানেন। এই সভাতেই উপস্থিত ছিলেন রেভারেন্ড চার্লস ফ্রিয়ার এন্ড্রুজ,—যিনি কাব্যানুবাদ শুনে অভিভূত হয়ে তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন। এবং এমনই আর-এক সভায় ছিলেন উইলিয়াম উইনস্টানলি পিয়ারসন। এই দুজনেই শান্তিনিকেতনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন সে কথাও কারও অজানা নেই। অর্থাৎ এখানে থেকেই তাঁর পূর্ব-পশ্চিমের মিলনস্বপ্ন কার্যকর হতে শুরু করল।

লন্ডন থেকে কবি আমেরিকা যাত্রা করলেন এবং ছয় মাস কাটালেন সে দেশে। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ তখন সেখানে পৌঁছে গেছে। পুত্র রথীন্দ্রনাথ কবির সঙ্গে ছিলেন। রথীন্দ্রনাথকে তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন প্রাণীতত্ত্ব ও উদ্ভিদবিদ্যা পাঠের জন্য। ইচ্ছা, পরে কিছুকাল কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে দেশে ফিরে কৃষিচর্চা করবেন এবং লেবরেটরি খুলবেন। অর্থাৎ মনে রয়েছে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি-গবেষণারও কাজ করবে। বস্তুতপক্ষে, শিলাইদহ ও পতিসরে রথীন্দ্রনাথ এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, পরে এটিকেই এনে স্থাপন করা হয় শ্রীনিকেতনে। অর্থাৎ, আমেরিকায় রথীন্দ্রনাথকে শিক্ষিত করবার পিছনে উদ্দেশ্য দেশের সেবার কাজে লাগানো। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে এক চিঠিতে লিখছেন, "কেবলমাত্র বিষয়ের জালে তাকে (রথীন্দ্রনাথকে) জড়িয়ে পড়তে দেব না। এমন কোনো একটা বড় আইডিয়ার কাছে তাকে আত্মনিবেদন করতে হবে যার সংস্রবে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং ধনসম্পদের মোহ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। অহরহ টাকার থলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে মানুষ আপনার মাহাত্ম্য ভুলে যায়।" আমরা জানি রথীন্দ্রনাথ আজীবন বিশ্বভারতীর কাজে উৎসর্গ করেছেন নিজেকে।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় থেকে কয়েক বছর অনেক দেশে ঘুরে বেড়ালেন। জাপানেও গেলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়টা এইভাবেই গেল। এই ভ্রমণের ফলে, এবং দেশের তদানীন্তন আন্দোলনাদির বিশ্লেষণ করে তাঁর মনে হল একটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানব-সম্মিলনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের যে গভীর বাণী পৃথিবীকে দেবার আছে, এবং বাইরে থেকে যা গ্রহণ করবার আছে, সব যেন বিশৃঙ্খল অবস্থায় পর্যবসিত। রাষ্ট্রীয় রেষারেষির ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়ার, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ব্যাঘাত ঘটছে। এই পথ ছেড়ে এর পাশাপাশি দেশগঠন ও বিদ্যাসমবায়ের পথ গ্রহণ করতে হবে। ৮ই পৌষ, ১৩২৬ তারিখে এক ভাষণে তাঁকে বলতে শুনি,—"ভারতবর্ষের যা অন্তরতর বস্তু তার তপস্যা ধ্যান আলোচনা কত যুগ ধরে হয়েছে, কিন্তু আমাদের পিতৃপিতামহের এই জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের কোনোই পরিচয় নেই। ··· ভারতের বিদ্যার ভাণ্ডারকে চাবিবন্ধ করে রাখব না। আমাদের দেশের যাঁরা জ্ঞানের ভাণ্ডারে কিছু দিয়েছেন, সকল দেশের সকল বিদ্যার সঙ্গে তার তুলনা হওয়া চাই—বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে তুলনা করে তবে তার মূল্য অনুভব করতে পারব।"

শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে এই সময় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্র আসছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরোক্ত তাঁর মনোগত আদর্শ রূপায়ণের পদক্ষেপ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন শান্তিনিকেতনকে সর্বভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এখানে প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। নিজেদের আচার-ব্যবহার নিজেরা স্বাধীনভাবে রক্ষা করে চলতে পারবে ; আর, শিশুকাল থেকে সকলে একত্র থাকার ফলে পারস্পরিক সহনশীলতা সৃষ্টি হবে, সম্ভব হবে পরস্পরের মধ্যে সহমত ও বোঝাপড়া এবং এইভাবে

জাতীয় আদর্শচর্চা সম্ভব হবে, জাতীয় সংহতিবোধ জাগবে। এ সম্বন্ধে এন্ড্রুজের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং ১৯১৮ ইঙ্গাব্দের পূজাবকাশে কলকাতায় তিনি তাঁর 'বিশ্বভারতী' পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন।

অবশ্য ১৯১৬-তেই এই ভাবনা তাঁকে দখল করেছে, এবং ২৮শে অক্টোবর তারিখে শিকাগো থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন, "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।"

এই সূত্রে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখছি, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২০ তারিখে সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখছেন, "ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোলবিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে যাক, সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অনুষ্ঠান হোক, সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন।"

এখানে একটি বলবার কথা আছে। অ্যানি বেসান্তের পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষার যে আন্দোলন এই সময়ে হয় তার মধ্যে ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক সব বিষয়েরই বিভাগের কথা ছিল, ছিল না বিশেষভাবে সংস্কৃতি চর্চার কথা। এমনিভাবেই পুরানো শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বিতৃষ্ণাবোধ থেকে মহীশূর, কাশী, আদেয়ার, ওসমানিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলেও তার মধ্যে প্রণালী পরিবর্তনের চেষ্টা বিশেষ ছিল না। সবই যেন পুরাতন ছাঁচে নূতনের ঢালাই। এ যেন—রবীন্দ্রনাথের কথায়—শিক্ষাকে বাহন না করে শুধু বহন করা। ভারতের অখণ্ড জাতীয়তাবোধ জাগাতে হলে সর্ব ধর্ম, সর্ব জাতি, সর্ব ভাষাভাষীর একটি কেন্দ্র প্রয়োজন, —এই কথাই রবীন্দ্রনাথের মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

১৯১৮ ইঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ১৩২৫ বঙ্গাব্দে (৮ই পৌষ) বিশ্বভারতীর ভিত্তিস্থাপন হল। পর বৎসর গ্রীষ্মাবকাশের পরে শুরু হয়ে গেল কাজ (জুলাই, ১৯১৯)। তখন পাঠভবনের পরের ধাপের শিক্ষালয়কেই বলা হত বিশ্বভারতী। পরে অবশ্য পাঠভবনকে পূর্ব বিভাগ এবং এটিকে উত্তর বিভাগ হিসেবে নির্দেশ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, বাইরের থেকে আগত সাময়িক ছাত্রদের নিয়ে স্থায়ী বিদ্যাকেন্দ্র গড়া যাবে না। তাই চেয়েছেন, আশ্রমবাসী শিক্ষক ও অন্যান্যদের মধ্যে উচ্চতর জ্ঞানচেতনা জাগাতে পারলে ফল ভালো হবে। আশ্রমের শিক্ষকরা স্কুলমাস্টার হবেন না, জ্ঞানতপস্বী হবেন। এক-এক জন এক-একটি বিষয় নিয়ে কাজ করবেন। প্রত্যক্ষভাবে সে প্রয়াস করেওছেন, যেমন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে 'সংস্কৃত প্রবেশ' রচনার পরে ভার দিয়েছেন 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রস্তুত করার, জগদানন্দ রায়কে প্রবৃত্ত করেছেন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনায়, বিধুশেখর ভট্টাচার্য পালি ভাষা শিক্ষা করে 'পালি প্রবেশ' লিখেছেন এবং বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও রচনা করেছেন, ক্ষিতিমোহন সেন সংগ্রহ করেছেন সাধকদের বাণী। বিশ্বভারতীর প্রধান চর্চার বিষয় ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি। তিনি বলছেন, জীবিকার লক্ষ্য শুধু অভাবকে নিয়ে, কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতা। সে জন্যই তাঁর অভিপ্রায় ছিল, শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য যোগে ছবিতে গানে অভিনয়ে ছেলেরা আনন্দরস আস্বাদন করবে। এ প্রসঙ্গে আরও বলছেন, আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ ; বলছেন, যে জাতি আনন্দ করতে ভোলে সে জাতি কাজ

করতেও ভোলে। "আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোক ভয় করে, সৌন্দর্যভোগকে তাহারা চাপল্য মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অপবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর বলিয়া জানে।" তাই এ দেশে প্রথম তিনিই জোর দিয়ে বললেন, "বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সংকল্প হউক।" অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির চর্চাও আবশ্যক।

দেখছি, বিশ্বভারতীর শুরু থেকেই সংস্কৃত পালি প্রভৃতি শাস্ত্রে বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন ; চিত্রবিদ্যায় নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর ; সংগীতে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভীমরাও হাসুরকর কর্মমগ্ন আছেন। বিশ্বভারতীর চারিত্র্যপ্রকাশে বিধুশেখর শাস্ত্রী বেদবাণী চয়ন করে দিলেন, 'যত্র বিশ্বং ভবতি একনীড়ম্' —যেখানে সমগ্র বিশ্ব এসে একটি আবাসে মিলেছে।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের কিছু শোনা যাক। "... ভারতবর্ষ নিজেরই মননশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। ... ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল—এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। ... ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খ্রিষ্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। ... ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে ; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। ...

"দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত আছেন। ...

"তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। ... ভারতবর্ষে যদি সত্যি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

"এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।" (বিশ্বভারতী, পৃ ৭-১০)

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ এই ধারায় শান্তিনিকেতনে জ্ঞানার্জন ও বিদ্যা উদ্ভাবনের কেন্দ্র করেছিলেন, এবং শ্রীনিকেতনে চাষ, তাঁত, গো-পালন, স্বাস্থ্য এবং সমবায় কেন্দ্র তৈরি করেছিলেন। এই হল ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের বুনিয়াদে বিশ্বভারতীর ইমারৎ সৃষ্টির ইতিহাস।

৫

এর পরে বিশ্বভারতী সোসাইটি গঠন এবং বিশ্বভারতীর আইনানুগ কর্মপ্রবর্তনের ইতিহাস। প্রতিষ্ঠা দিবস ৭ই পৌষ, ১৩২৮ ; ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২১। আমরা জেনেছি ইতিপূর্বে ২২শে ডিসেম্বর, ১৯১৮ তারিখে আম্রকুঞ্জে এক সভা করে বিশ্বভারতীর কর্মধারা ও আদর্শ বিশ্লেষণ করেন রবীন্দ্রনাথ। বিধুশেখর বেদানুসারে 'অথেয়ং বিশ্বভারতী। যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' বাণী উচ্চারণ করলেন। বিদ্যাচর্চার সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কলাবিদ্যা ও সংগীতের শিক্ষা ১৯১৯ থেকে। ১৯২০-তে আবার রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমযাত্রা। ইউরোপ তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানাল। যুদ্ধজীর্ণ, গতানুগতিকতায় ভাবিত পশ্চিম তখন পুব থেকে কোনো নতুন ভাবধারার বাণীর প্রত্যাশা করছিল। রবীন্দ্রনাথ ভারতের ঐতিহ্যবাহী বিশ্বমানবীয় ভাবধারার সঙ্গে বিশ্বভারতীয় মিলনবাণীর কথা বলেন। কবির এই ভূমিকা প্রসঙ্গে নরওয়ের বিদগ্ধ অধ্যাপক স্টেন কোনো, যিনি এককালে আহূত অধ্যাপক হিসেবে কিছুকাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তাঁর বিবরণে বলছেন, দ্রষ্টা কবির বাণী এমন সময়ে এল যখন যিশুখ্রিস্টের শান্তির বাণী শক্তিহীন হয়েছে। কবি বললেন, নতুনতর কোনো আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হলে সেই বিশ্বাস থেকে আসবে মুক্তি। এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সকলকে একত্রে মিলিত হয়ে বিশ্বকল্যাণের উপায় সম্বন্ধে ভাবতে হবে। বিভেদ এবং বিরোধ আছেই— তাকে এড়িয়ে যাওয়াও কঠিন। বিশ্বভারতীর লক্ষ্য এই সকল বিভেদ নিয়ে চিন্তা করা, অন্তর্নিহিত কারণ জানবার চেষ্টা করা এবং তা দূর করবার রাস্তা খুঁজে বার করা। বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যসূত্র বার করা। বিশ্বভারতীর কেন্দ্র ভারতবর্ষে স্থাপন উপযুক্ত হয়েছে ; ভারত কখনও গায়ের জোরে কোনো দেশকে কুক্ষিগত করবার বা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেনি। অহিংসা এবং মৈত্রী তার বাণী।

এই ইউরোপ সফর থেকে রবীন্দ্রনাথ যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর মনে জাগছে বিশ্বভারতীর তিন দফা কর্মসূত্রের কথা। (১) শান্তিনিকেতনে প্রাচ্যের সর্ববিধ ভাবধারা ও সংস্কৃতি চর্চার, বিশেষ যেগুলির জন্ম ভারতেই তাদের, কেন্দ্র গঠন ; (২) শ্রীনিকেতনে গ্রামসেবা ও গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রায় উন্নতিতে সহায়তা ; (৩) বিশ্বভারতীর মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব-বিনিময়, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং মানবজাতির ঐক্য ও মৈত্রী।

এ সময়েই, যখন তিনি আমেরিকাতে, তখন পরিচয় লেওনার্ড নাইট এল্‌ম্‌হার্স্ট-নামক এক কৃষিবিদ যুবকের সঙ্গে। কবির আহ্বানে তিনি চলে আসেন বিশ্বভারতীতে। এন্ড্রুজ এবং পিয়ারসন তো আগে থেকেই আছেন। এল্‌ম্‌হার্স্ট এসে ভার নেন শ্রীনিকেতনে গ্রামসংগঠন কাজের, যাতে তাঁর কর্ম ও নেতৃত্ব অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

বিশ্বভারতী ; ১৯১৮-তে যার সূত্রপাত তারই পূর্ণ রূপায়ণ ঘটল ১৯২১-এ ; ২২শে ডিসেম্বর তারিখে, ৭ই পৌষ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ। রেজেস্ট্রীকৃত হল বিশ্বভারতী সোসাইটি। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার মূল সূত্রের কিছু অংশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সত্যের বিবিধ পর্যায় বিচিত্র চিন্তাধারায় মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করেছে তার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা।

বিশেষ নিরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা প্রাচ্য দেশসমূহের বিবিধ সংস্কৃতির ধারা নিহিত ঐক্যসূত্র নির্ধারণ এবং পরস্পরের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ নির্ণয় ও সামঞ্জস্য বিধান।

পাশ্চাত্য দেশসমূহের প্রতি ও এশীয় জীবন ও বাণীর আলোকে ঐক্যসূত্র সন্ধান।

পূর্ব ও পশ্চিমের অভিন্ন সত্তা উপলব্ধির প্রয়াস এবং এই পটভূমিকায় বিশ্বের দুই প্রান্তের সংযোগ দৃঢ়তর করে বিশ্বশান্তি সূত্র উদ্ভাবন।

এই আদর্শ সামনে রেখে শান্তিনিকেতনে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ইসলাম শিখ খ্রিস্টান প্রভৃতির ধর্ম সাহিত্য ইতিহাস কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের চর্চার কেন্দ্র পশ্চিমী সভ্যতার ও সমন্বয়ে গড়ে তোলা, যে চর্চা সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে আত্মিক উপলব্ধিসঞ্জাত ; জিজ্ঞাসু ও গবেষকদের সহজ সহযোগ এবং সহায়তায় পৃথিবীর কোনো জাতি, ধর্ম, শ্রেণী, বিশ্বাস ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর প্রতি বিরুদ্ধ ভাব না রেখে পারস্পরিক প্রীতিতে সেই এক ও অদ্বিতীয় সত্তার নামে সম্পন্ন করা—যিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে এখনকার যাবতীয় কর্মবিধি এবং শিক্ষাকেন্দ্রের নিয়ম প্রস্তুত হয়। এই প্রতিষ্ঠান এখন আর বিশেষ গোষ্ঠীর আওতায় রইল না, সাধারণের সামগ্রী হল। আজীবন ও সাধারণ সদস্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এটি চালাবার দায়িত্বে রইলেন। বিশ্বভারতী সংবিধান প্রস্তুত হল, সংসদ ও কর্মসমিতি, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন সমিতি ইত্যাদি গঠিত হল। শান্তিনিকেতনে বিদ্যাভবন, শিক্ষাভবন, পাঠভবন এবং শ্রীনিকেতনে শিল্পবিভাগ ও পল্লীসংগঠন কেন্দ্র চলতে লাগল।

এই সময়টাকে বিশ্বভারতীর স্বর্ণযুগ বলা যায়। পাঠভবন বিশিষ্ট বিদ্যালয়, শিক্ষাভবন শুরু হয়েছে। বিদ্যাভবনে আছেন বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন। বৌদ্ধ জৈন ইসলাম প্রভৃতির চর্চা শুরু হয়েছে। বিদেশী অধ্যাপক এসেছেন সিলভ্যাঁ লেভি, আঁদ্রে কার্পেলেস্, উইনটারনিৎস্, তুচ্চি, লেস্‌নি, বগদানফ প্রভৃতি। এন্ডরুজ, পিয়ারসন তো ছিলেনই, এসেছেন শ্রীনিকেতনের কর্ণধার হয়ে এল্‌ম্‌হার্স্ট। কলাভবনে নন্দলাল, সুরেন কর, অসিত হালদার ; সংগীতভবনে দিনেন্দ্রনাথ , ভীমরাও প্রভৃতি। চীনা চর্চা শুরু হয়েছে, পরে তান য়ুন-শান এসেছেন, চীনভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর অধ্যক্ষতায়। হিন্দিভবন প্রতিষ্ঠা পেল, কর্ণধার হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী। শ্রীনিকেতনে কাজের জোয়ার—এল্‌ম্‌হার্স্টের সহযোগী কালীমোহন ঘোষ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, সন্তোষ মিত্র। সমগ্র বিশ্বভারতীর ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বভারতীতে নানান বিভাগ সৃষ্টি হবার সূত্রে কর্মী ছাত্র সবই বৃদ্ধি পেল, কিন্তু আর্থিক বৃদ্ধি তেমন হল না। আদি যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ সবই আশ্রম বিদ্যালয়ের জন্যে ব্যয় করেছেন। এখন সদস্যদের চাঁদাতেও প্রয়োজন স্বভাবতই মিটছে না। কিছু দান সংগ্রহ হয়,—আওয়াগড়ের রাজা, পিঠাপুরমের রাজা, ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ, নিজাম প্রমুখদের কাছে। কিন্তু বাঙালিরা বিমুখ। ডরোথি এল্‌ম্‌হার্স্ট তাঁর ট্রাস্ট থেকে শ্রীনিকেতনকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য দিয়ে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ নানাস্থানে বক্তৃতার জন্য গিয়েছেন। নৃত্যনাট্যাদির দল নিয়ে ঘুরেছেন—যা সংস্কৃতি প্রসারের আনন্দবিজড়িত ছিল, সেই সঙ্গে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহও যুক্ত ছিল। এইভাবেই বিশ্বভারতী চলেছে। কিন্তু ইংরেজ সরকারের সাহায্য নেবার কথা ভাবেননি। সরকারি সহায়তার আওতায় স্বাধীন প্রয়াস ক্ষুণ্ণ হবার পুরো সম্ভাবনা।

বিশ্বভারতী যখন ভারতে, বহির্ভারতে এবং বিশ্বে বিশেষ আসন নিয়েছে, এমনই সময়ে ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বভারতীর গৌরব কিছুটা স্তিমিত হয়ে এল ক্রমে ক্রমে। আর্থিক অসাচ্ছল্য দেখা দিল। শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের দুশ্চিন্তা ছিল তাঁর অবর্তমানে বিশ্বভারতীর কী হবে, কেমনভাবে চলবে, অর্থাভাব মিটবে কীভাবে ইত্যাদি। তিনি এই ভার দিতে চাইলেন মহাত্মা গান্ধিকে ; গান্ধিজী সানন্দে সম্মত হলেন, বললেন, বিশ্বভারতীর জন্য ভাবনা নেই। গান্ধিজী বলেছিলেন, যখন যেখানেই থাকি না কেন শান্তিনিকেতন আছে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে। গান্ধিজী রবীন্দ্র-তিরোধানের পরও বেশ কয়েকবার এসেছেন শান্তিনিকেতনে আর ভরসা ছিলেন জওহরলাল নেহেরু—প্রতি বছরই আসতেন। সরোজিনী নাইডু বিশ্বভারতীর আচার্য হন অবনীন্দ্রনাথের পরে। তাই অর্থাভাব থাকলেও দেশ-বিদেশের গুণী-জ্ঞানীদের আগমন ও সংযোগ ছিল অক্ষুণ্ণ।

অবশেষে ভারত স্বাধীন হবার পরে রথীন্দ্রনাথ জওহরলাল প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা করে বিশ্বভারতী সোসাইটির এক সভা আহ্বান করে বললেন, এতকাল ইংরেজ সরকারের আওতায় বিশ্বভারতী যায়নি তার স্বাধীন চরিত্র বজায় রাখবার জন্য। কিন্তু এখন স্বাধীন ভারতে সে বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করা যায়। অন্যথায় হয়তো অর্থাভাবে কিছু শিক্ষাবিভাগ বন্ধ করে দিতে হবে। জওহরলাল, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ সকলে আশ্বাস দিয়েছেন বিশ্বভারতী পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সরকারে ন্যস্ত হলেও এর বিশেষ চরিত্র এবং সামগ্রিক আদর্শের হেরফের হবে না। এটি হবে স্বতন্ত্র ধরনের বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়। সকলের অনুমোদনক্রমে বিশ্বভারতীর ভার ন্যস্ত হল ভারত সরকারের উপর। ১৯৫১ ইঙ্গাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে উদ্‌বোধিত হল। উপাচার্য হলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ভাষণে তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনা থেকে যে যে অবস্থার ভিতর দিয়ে বিশ্বভারতী কাজ করে এসেছে তার ইতিবৃত্ত বললেন। মৌলানা আজাদ বললেন, বিশ্বভারতীর ভার নিয়ে ভারত সরকার যেমন গর্বিত তেমনি সচেতন। এই প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য এবং আদর্শ পুরোপুরি রক্ষা করতে তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মূল লক্ষ্য ও আদর্শের সবই রক্ষিত হয়েছে, শুধু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' বয়ানটি বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, তাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, ঐ বয়ান এখানে আকাশে বাতাসে বৃক্ষে প্রান্তরে সকলের মনের মধ্যে জ্বলন্ত ও জাগ্রত আছে ও থাকবে, তার বিনাশ নেই।

৬

রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর বিশ্বভারতী প্রসঙ্গ অবশ্যই তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়নি বা শেষ হয়েও হয়নি। বিশ্বভারতী কেন্দ্র অধিগ্রহণ করবার পূর্বেই গান্ধিজী প্রয়াত হয়েছেন। সেই পর্যন্ত সোসাইটি পরিচালিত ধারাই ছিল রবীন্দ্রধারা। এখন মৌলানা আজাদ, সরোজিনী নাইডু, জওহরলাল—কেউ নেই। নেই রথীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন এঁরাও। বিশ্বভারতীও সেই আয়তনের নেই। তাই অনেকের মনে সংশয় বা প্রশ্ন বিশ্বভারতী আদর্শচ্যুত হচ্ছে কি না, রবীন্দ্র চিন্তাধারা কতখানি বজায় আছে, পরিবর্তন আগ্রাসী কি না, —বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে অন্তরের পরিবর্তনও কি লক্ষ করা যায়। ইত্যাদি।

প্রশ্ন বা সংশয় অবান্তর বলা অযৌক্তিক নয় সম্ভবত। তবে, এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের কথা কিছু শোনা যাক। তাঁরই বিচার-বিবেচনার আলোয় সাম্প্রতিক চেহারার ছায়া দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় শিক্ষার মান সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যভূত ছিল, তা পরীক্ষার ফলের উপরেই নির্ভর করে না, জীবনে শিক্ষার ব্যাপ্তি ও চাপ কতটা পড়েছে সেটা দেখাই প্রধান। বিশের দশকের শেষভাগে নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলী শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে আসেন, ছাত্রবৃদ্ধি এবং পড়াশোনার ব্যাপারে উন্নতি সাধন করেন। তাঁর আমলে বহু ছাত্র পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করলে খুশি হয়ে তিনি সে-কথা রবীন্দ্রনাথকে জানান। উত্তরে তিনি লেখেন, "পরীক্ষার ফল যে খুব বেশি দামী এ-কথা আমি কোনোদিন মনে করি নে। ··· শিক্ষার যথার্থ সার্থকতা প্রাণের মধ্যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা—পরীক্ষায় পাশ করানো নয়।"

তাঁর কথাগুলো অনুধাবন করলে মনে হবে সম্ভবত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। দরকার নতুনভাবে ভেবে দেখবার। পন্থা বদলের প্রয়োজন। এই সূত্রে একটি কথা মনে আসছে। আজকাল মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা শোনা যাচ্ছে। বিশ্বভারতীতে তাঁর প্রবর্তনায় লোকশিক্ষা সংসদের প্রতিষ্ঠা, শহরে গ্রামে যে কোনো অবস্থারই পুরুষ বা মহিলা যাঁরাই বিদ্যোৎসাহী অথচ স্কুল-কলেজে যাবার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাঁদের জন্য তিন পর্যায়ের পাঠক্রম। এঁদের পরীক্ষায় বসতে হত, কিন্তু প্রশ্নকর্তার প্রতি নির্দেশ থাকত যে, এঁরা পাঠ্য-পুস্তকাদি সঙ্গে রাখতে পারবেন সে-কথা ধরে নিয়ে এমনভাবে প্রশ্নপত্র রচনা করতে হবে যাতে বিষয়টির প্রতি তাঁদের দখল এবং মুক্ত চিন্তা প্রকাশ পায়।

আর্থিক অনটন প্রসঙ্গে ১৯২৯-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখছেন,— "ভালো করে যখন ভেবে দেখি তখন বুঝতে পারি যে আমাদের যা সামর্থ্য আছে তার মধ্যেই নিজের কাজকে যথাসম্ভব সুসম্পন্ন করাই সংগত। ··· আজ কুড়ি বছর পূর্বে যখন হাতে কিছুই ছিল না তখন মনে হত বছরে যদি দু-তিন হাজার পাই তা হলেই আর ভাবনা থাকে না। আজ বছরে বারো হাজার টাকা খরচ করেও মনে বুঝেছি অভাব আগেকার চেয়ে বেশি বই কম নয়। বস্তুত অর্থলাভের দ্বারা দৈন্য ঘোচে না।"

আজ বিশ্বভারতীর অর্থাভাব নিশ্চয় ঘুচেছে। কিন্তু 'দৈন্য' ঘুচেছে কি না ভেবে দেখা ভালো। ১৯২১-এই এন্ড্রুজকে যা লিখছেন তার অনুবাদার্থ নিম্নপ্রকার। অর্থ নিশ্চয় নানাবিধ অভাব দূর করতে পারবে, কিন্তু এখান থেকে 'শান্তম্ শিবম অদ্বৈতম্'-কেও হটিয়ে দিয়ে এক দক্ষ হিসাবরক্ষকের হাতে ভার তুলে দেবে। এই ভবিষ্যৎবাণীর মতো বক্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য। সরকার উপরোক্ত বয়ানটিকে পরিত্যাগ করেছেন ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ভেবে, হয়তো শিব অদ্বৈত এ সব অভিধায় এসে চিন্তা ধাক্কা খেয়েছে। এই শব্দগুলির যে ভিন্নার্থ সম্ভব, বৈদিক বয়ান 'সত্যমেব জয়তে'-র মতো, তা মনে হয়নি। কোনো এক পরম নিয়ন্তা—তাঁকে আমরা যে নামেই ডাকি না কেন—তাঁর প্রতি কর্মভার ন্যস্ত করে দিতে না পারলে আদর্শ বজায় থাকে না, তর্ক ও যুক্তিজালে কর্ম ও ভক্তি আবদ্ধ হয়ে যায়।

এন্ড্রুজ সাহেবকে ঐ পত্রে আরও লিখেছিলেন যে, শান্তিনিকেতনকে যেন রাজনীতির আবর্ত থেকে দূরে রাখা হয়। এ যুগের জিজ্ঞাসা মানুষ, সেই মানুষকেই খুঁজে পেতে হবে, জাতি বা নেশনের পথে নয়। ঐ সময়ে অসহযোগ আন্দোলনে দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল.

যেমন আর-একবার হয় চল্লিশে। ব্রিটিশরাজের চোখে শান্তিনিকেতন সন্দেহভাজন হলেও শিক্ষালয় থেকে রাজনীতিকে মুক্ত রেখেছেন, স্রোতের শামিল হতে দেননি। যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা এখানকার সংস্রব ত্যাগ করে গিয়েছেন। একালে কি রাজনীতি-মুক্ত বিদ্যালয় সম্ভব? আজকাল তো দেখি রাজনৈতিক দলের সাগরেদি করেই শিক্ষালয়কে চলতে হয়। মনে হয় পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরির ব্যাপারে কথাটা ভেবে দেখা উচিত।

এখন তো জাতিগত বিভেদ মাথা চাড়া দিয়েছে। জাতীয় সংহতির কথা খুবই চিন্তা করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ শুরু থেকেই এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। ১৯৩৭-এ চীনভবনের উদ্‌বোধনে তিনি বলছেন যে, জগতের সমস্যা এই নয়—কী করে ভেদ ঘুচিয়ে মিলন হবে, সমস্যা হল নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে মিলন ঘটানো। বিবিধের মাঝে মিলন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।

বিশ্বভারতীর কর্মের অঙ্গ হিসেবে পরিবেশ সচেতনতার কথা তিনি বরাবর বলে এসেছেন। বলেছেন, অরণ্য সম্পদ রক্ষা করার কথা। গাছপালা ধ্বংস করলে মানুষের কী ক্ষতি হয়, সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেই কথা। বৃক্ষরোপণ উৎসবের সূত্রপাত এই চিন্তারই ফলে। এখন সরকার এই পদক্ষেপেরই ফলশ্রুতি হিসেবে নিয়েছেন বনমহোৎসব প্রকল্প।

বিশ্বভারতীর জন্য নিয়ম-কানুন প্রবর্তনের এবং কন্‌স্টিটুশ্যান রচনার সূত্রে তিনি কী বলেছেন শোনা যাক। ৯ই পৌষ, ১৩৩২, তারিখে আশ্রমিকদের কাছে এক ভাষণে মন্তব্য করছেন,—"এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধি-বিধান দ্বারা সুসম্বদ্ধ করবার ভার আপনারা নিয়েছেন।···এই অঙ্গবন্ধনের প্রয়োজন আছে। জলের পক্ষে জলাশয়ের উপযোগিতা কে অস্বীকার করবে। সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত দেহে বাস করে বটে, কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায় বদ্ধ, কিন্তু চিত্তের বিচরণক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহব্যবস্থা অতি জটিলতার দ্বারা চিত্তব্যাপ্তির বাধা যাতে না ঘটায় এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।"

১৯৩৪-এর ৬ই আগস্ট তারিখে আশ্রমিকদের বলছেন, "কনস্টিট্যুশ্যান একটা নৈর্ব্যক্তিক, যান্ত্রিক জিনিস, তাতে কার্যপ্রণালীর একটা বাঁধা নিয়ম থাকে, সেইটেই সকল কর্মকে চালনা করে। লোকে আশঙ্কা করে যে, ব্যক্তিগত প্রভাব ও পরিচালনার একটা ক্ষণিকতা আছে, তা ছাড়া উত্তরকালবর্তী দ্বিতীয় ব্যক্তির মতান্তর হতে পারে। বাঁধা নিয়ম দ্বারা চালিত হলে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা থাকে।···কন্‌স্টিট্যুশ্যানের মধ্যে যে ত্রুটি আছে, সে হচ্ছে ব্যক্তিত্বের অভাব এবং যান্ত্রিকতার প্রবলতা। কিন্তু আধুনিক কালের মনোভাবই অনুষ্ঠানকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে রক্ষা করা, এখানেও তাই হল। কিন্তু এই যন্ত্রের মধ্য দিয়েই তো কাজ করতে হয়। অনুষ্ঠানের মধ্যে যে মানবশক্তি কাজ করে তা যাতে খর্ব না হয়, যান্ত্রিকতা যাতে প্রবল না হয়ে ওঠে তা তো দেখতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই আশঙ্কা এবং ভরসা—উভয়ের কথাটা মনে রাখা দরকার। অর্থ ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ এবং বিবিধ প্রয়োগ-পরিচালনার আইন-কানুন সৃজনী প্রতিভাকে—বিদ্যার উদ্ভাবনকে ব্যাহত করতে পারে। তাই নথির বন্ধন থেকে কানুনকে, পুঁথির বন্ধন থেকে বিদ্যাকে মুক্ত রাখার কথা ভাবা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার কথাও কিছু শোনা যাক। ৮ই পৌষ, ১৩৪২, তারিখে বলছেন,—"কন্‌স্টিট্যুশ্যনে নির্ভর রেখে আমি এর মধ্য থেকে অবকাশ নিয়েছি, কিন্তু এ কথা তো ভুলতে পারি নে যে, এ বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষত্ব যদি অবশিষ্ট না থাকে তবে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। সাধ্যের বেশি অনেক আমাকে এর জন্যে দিতে হয়েছে, কেউ সে কথা জানে না—কত দুঃসহ কষ্ট আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখে যাকে গড়ে তুলতে হয়েছে সে যদি এমন হয় যা আরও ঢের আছে, অর্থাৎ তার সার্থকতার মানদণ্ড যদি সাধারণের অনুগত না হয়, তবে কী দরকার ছিল এমন সমূহ ক্ষতি স্বীকার করবার? ··· এখন অনেক ছাত্র অনেক বিভাগ হয়েছে, সকলই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলছে। কর্মী সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে চিন্তার ক্ষেত্রে সেবার ক্ষেত্রে এক করে দেখতে পাচ্ছেন না—বিচ্ছেদ জন্মাচ্ছে।"

৮ই পৌষ, ১৩৪৫, তারিখে বলছেন, "বহুদিন এই আশ্রমে আমরা প্রচ্ছন্ন ছিলাম। ··· আজ যদি এই প্রতিষ্ঠান লোকচক্ষুর গোচর হয়ে থাকে তবে সেই প্রকাশ্য দৃষ্টিপাতের ঘাতসংঘাত ভালোমন্দ লাভক্ষতি সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে—কখনও পীড়িত মনে, কখনও উৎসাহের সঙ্গে। যাঁরা উপদেষ্টা পরামর্শদাতা বা অতিথিরূপে এখানে আসেন তাঁদের জানিয়ে রাখি, আমাদের এই বিদ্যায়তনে ব্যবসায়বুদ্ধি নেই। এখানে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত জনমতের অনুবর্তন করে জনতার মন রক্ষা করিনি, এবং সেই কারণে যদি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকি তবে সে আমাদের সৌভাগ্য। আমরা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে শ্রেয়কে বরণ করবার প্রয়াস রাখি। কর্মের সাধনাকে মনুষ্যত্বসাধনার সঙ্গে এক বলে জানি।" আজ জনমতের চাপে বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যচ্যুত হচ্ছে কি না তা ভেবে দেখতে পারি।

এবারে শোনা যাক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, পরিবর্তন প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য,—যে সকল বিষয়ে আমাদের মধ্যেও আলোচনার সূত্রপাত করে। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' রচনায় বিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন পাঠক্রম সম্বন্ধে বলছেন,—"সৃষ্টিকার্যে এই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে। নতুন নতুন কালের প্রেরণায় নতুন নতুন রূপ আপনাকে ব্যক্ত করতে থাকে এবং এই উপায়কেই কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তবে সে আপনার শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। সেই পরিবর্তমান আদর্শের অনুবৃত্তির দ্বারা পুরাতন কালের ভিত্তির উপরেই নতুন কালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই নিয়ে কোনো আক্ষেপ করা বৃথা। বস্তুত প্রাচীন কালের ছন্দে নতুন কাল তাল ভঙ্গ করলে সৃষ্টির সংগতি রক্ষা হয় না।"

৬ই আগস্ট, ১৯৩৪, তারিখের প্রাক্তনদের কাছে প্রদত্ত ভাষণেও বলেছেন,—"একটি অনুষ্ঠানের তিনটি দিক আছে, তার অতীত, বর্তমান এবং ভাবীকাল। অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ সুস্থ প্রাণের ধর্ম নয়। ··· ভাবীকালের জন্য এই আশ্রমে আমি প্রচুর স্বাধীনক্ষেত্র প্রসারিত রেখেছি—এখানে কোনো বিশেষ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিনি। কালে কালে মানুষের পরিবর্তন ঘটে থাকে—যারা একই কালকে জীবনে স্থায়ী করতে চায় তারা মৃত্যুর সঙ্গে রফা করে। তাই এটা আমি কখনো আশা করিনি যে এখানে যারা বয়স্ক ছাত্র ও অধ্যাপক আছেন তাঁদের মনকে আমি একটা ছাঁচে-ফেলা রীতিতে চালনা করব। ভাবীকালের বিকাশের জন্যও প্রশস্ত পথ আমি রেখেছি।"

এবং, সর্বশেষে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী-চিন্তা ও বিবর্তনের বিষয়ে আমাদের মনে যখন নানা প্রশ্নের উদয় হয়, তখন সেই সূত্রেও রবীন্দ্রনাথেরই মুখের কিছু কথা স্মরণ করে এই

প্রসঙ্গ শেষ করি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও তাঁরই সৃষ্ট বিশ্বভারতী সম্বন্ধে এই মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৭ তারিখে শান্তিনিকেতনে মন্দিরের ভাষণের কিছু অংশ শোনা যাক।—"এখানে তখন বাইরে ছিল সব দিকেই বিরলতা ও বিজনতা, কিন্তু সব সময়েই মনের মধ্যে ছিল একটি পরিপূর্ণতার আশ্বাস। একাগ্রচিত্তে সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করেছি, বর্তমান কালের তুচ্ছতা ইতরতা প্রগল্‌ভতা সমস্ত দূর করতে হবে। যাদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেছি, ভারতের যুগান্তরব্যাপী সাধনার অমৃত-উৎসে তাদের পৌঁছে দিতে পারব, এই আশাই ছিল অন্তরের গভীরে।···

"···প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এসেছিলুম, আমার জীর্ণ শক্তির অপটুতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করবার উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছিনে। মনে হয়, এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য। সব কিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করা, এতেই যেন তার স্পর্ধা।···

"ইতিহাসে বিপর্যয় বহু ঘটেছে, সভ্যতার বহু কীর্তিমন্দির যুগে যুগে বিধ্বস্ত হয়েছে, তবু মানুষের শক্তি আজও লোপ পায়নি। সেই ভরসার 'পরে ভর করে মজ্জমান তরী উদ্ধার-চেষ্টা করতে হবে, নতুন হাওয়ার পালে সে আবার যাত্রা শুরু করবে। কালের স্রোত বর্তমান যুগের নবীন কর্ণধারকেও ভিতরে ভিতরে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা সব সময়ে তাঁদের অনুভূতিতে পৌঁছয় না। একদিন যখন প্রগল্‌ভ তর্কের এবং বিদ্রূপমুখর অট্টহাস্যের ভিতর দিয়ে তাঁদেরও বয়সের অঙ্ক বেড়ে যাবে, তখন সংশয়শুষ্ক বন্ধ্যা বুদ্ধির অভিমান প্রাণে শান্তি দেবে না। অমৃত-উৎসের অন্বেষণ তখন আরম্ভ হবে জীবনে।

"সেই আশা-পথের পথিক-আমরা, নূতন প্রভাতের উদ্বোধন মন্ত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে গান করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, যে শ্রদ্ধায় আছে অপরাজেয় বীর্য, নাস্তিবাদের অন্ধকারে যার দৃষ্টি পরাহত হবে না, যে ঘোষণা করবে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥"

বিবিধ

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্রচর্চা

রামবহাল তেওয়ারী

'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা'য় গড়ে উঠেছে যে ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনপথ তাকে সহজভাবে আপন করে নিয়ে, সহজতরভাবে আমাদের উপহার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই আজ ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার আর এক নাম 'রবীন্দ্রনাথ'। এক সময় এ গৌরব ছিল রামায়ণ ও মহাভারতের। এই দুই মহাকাব্যে স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টিই বড়ো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারই আলাদা। তাঁর সম্পর্কে সহজেই বলা যায়—'তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ'। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছের মানুষ। আপন মানুষ। ব্যাস-বাল্মীকির মতো দূরের নন। তিনি ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা-সভ্যতা, অধ্যাত্ম-চিন্তন ও ধর্মসাধনাকে নতুন অর্থ ও তাৎপর্য দান করেছেন। ভাব-ভাষা-ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গির অপূর্বতায় অপরূপ করেছেন ভারতীয় সাহিত্যকে। সুন্দর, সরস, সমৃদ্ধ ও সহজ করেছেন ভারতীয়তাকে। তাঁর প্রতিভা-রশ্মির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্পর্শে পাপড়ি মেলেছে আধুনিক ভারতের সাহিত্য-শতদল। রূপে-রসে-গন্ধে ও স্বাদে তার স্নিগ্ধ বৈচিত্র্য যেমন অভিনব তেমনি বিস্ময়কর। তাতে ধ্বনিত হয়েছে জাতীয় সংহতির বলিষ্ঠ সুর। ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ্‌রা প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত হয়ে খুঁজে পেয়েছেন নিজের অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি। নব-সৃষ্টির সম্পদে সাহিত্য অগ্রসর হয়েছে ক্রমোন্নতির প্রশস্ত পথে, মিলনের দিকে।

রবীন্দ্রচর্চার দুটি ধারা—প্রথমটি সমর্থনসূচক এবং দ্বিতীয়টি বিরোধী। কী বাংলায়, কী অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ ও স্বীকৃতি সময়োচিত, পুরোপুরি অবাধ ও সানন্দ হয়নি। রবীন্দ্র-চর্চার ক্ষেত্রে তার ফল মন্দ হয়নি। রবীন্দ্রচর্চায় সমর্থন ও বিরোধিতা দুয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। সৎ, সক্রিয় ও গতিশীল বিরোধিতাও রবীন্দ্রচর্চার পরম সহায়ক। যাঁরা রবীন্দ্র-বিরোধীর ভূমিকায় সাহিত্যের আসরে নেমেছেন, তাঁরা নিজেরা তো রবীন্দ্র-চর্চা করেছেনই, উপরন্তু আত্মতুষ্ট রবীন্দ্রানুরাগীদেরও ঘা-মেরে সজাগ করেছেন, বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছেন রবীন্দ্রচর্চা। নানা বাদ-প্রতিবাদ, তীক্ষ্ণ ও বিরূপ সমালোচনার ফলে অনেক সময় অজানা-অচেনা দিক বেরিয়ে আসে। রবীন্দ্র-মূল্যায়নের নতুন নতুন দ্বার খুলে যায়। আবার বিরোধীদের ভুল ভ্রান্তিরও নিরসন ঘটে। তাতে অপ্রত্যাশিতভাবে রবীন্দ্রচর্চার ব্যাপ্তি ও গভীরতা বেড়ে যায়।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বাংলা ভাষার প্রসঙ্গ আসে। কিন্তু তা তো আমাদের প্রত্যেকেরই জানা। আর তার পরিধি এমন ব্যাপক ও গভীরতা এমন অতল যে, তা নিয়ে দশদিনের আলোচনা-সভাও অপর্যাপ্ত মনে হয়। তাছাড়া সে আলোচনা প্রতিদিন হচ্ছে এবং হবে। সুতরাং বর্তমান আলোচনাকে বাংলা থেকে সরিয়ে রাখাই ভালো।

রবীন্দ্রচর্চা বলতে আমরা সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর কৃতি-আশ্রিত সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, মানুষ ও বিশ্বের চর্চাই বুঝব।

সময়ের বিচারে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার তিনটি স্তর দেখা যায়। প্রথমটির সূচনা ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর। দ্বিতীয়টি দেখা দেয় ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে। আর তৃতীয় প্রবাহটি দেখা যাচ্ছে ১৯৮৬তে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্ম-জয়ন্তীকে উপলক্ষ্য করে।

নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হবার আগে বঙ্গেতর মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ অ-পরিচিত ছিলেন বললেই হয়। ওড়িয়া, অসমিয়া, হিন্দি ও মরাঠিতে রবীন্দ্র-পরিচিতি থাকলেও তাকে চর্চার পর্যায়ে ফেলা যায় না। নোবেল পুরস্কারের কল্যাণে বিশ্বের নানান দেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষও রবীন্দ্রনাথকে জানতে, তাঁর রচনা পড়তে আগ্রহী ও কৌতূহলী হয়ে উঠেন। ইংরেজি গীতাঞ্জলির জন্য রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঋষি কবিরূপেই সম্মানিত হন। তা জেনে প্রদেশ ভাষা ও ধর্মের বিভেদের উপরে উঠে সর্বভারতীয় আত্মা যেন বিমুগ্ধচিত্তে বলে উঠল—'তোমার গরবে গরবিনী আমি/রূপসী তোমার রূপে।' বাঙালির চিত্ত গেয়ে উঠল—

জগৎ কবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব,
বাঙালি আজি গানের রাজা বাঙালি নহে খর্ব।

রবীন্দ্র-দর্শনমুগ্ধ অসমিয়া কবি রত্নকান্ত বরকাকতী উদ্‌বুদ্ধচিত্তে লিখলেন—

বৈকুণ্ঠ বিহঙ্গ তুমি নরবেশে যেন উদিলা মর্ত্যৎ
বিশ্বপ্রাণ গান হই বাজিছে মাথোম তোমার কণ্ঠৎ।...
ধন্য পূব-পছিমর কোলাকুলি আজি স্বর্গ ধরাতল্
গ্রহ-তরা তপনর্ গোপন্ কাহিনী, ধন্য রাষ্ট্র হল!
ধন্য আজি ভারতর ব্যাকুল হৃদয় শত শতাব্দীর্
ধন্য ই তৃষিত প্রাণ দেখি বিশ্ব কবি ঋষি মূরুতির্ ॥

মরাঠি মাসিক-পত্র 'মনোরঞ্জনে' রবীন্দ্রনাথের সচিত্র পরিচয় এবং কৃতিত্বের জন্য প্রশস্তি ও গৌরববোধ তুলে ধরা হয় শ্রদ্ধার সঙ্গে। Indian War of Independence গ্রন্থের রচয়িতা, প্রখ্যাত মরাঠি স্বদেশভক্ত কবি ভি. ডি. সাভারকার তখন আন্দামান জেলে। জেল থেকেই তিনি রবীন্দ্র-প্রশস্তিমূলক একটি কবিতা রচনা করে কবির কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই কবিতাটির উপসংহারে ছিল—

কালিদাসের বীণাখানি নীরব ছিল তাঁর পরে,
রবির কাছে ফিরে এসে তান ধরেছে মৌসুরে।
স্বর্গীয় গান মুগ্ধ করছে বিশ্বজগৎ সৌরভে,
হে কবিবর! প্রণাম জানাই! ধন্য, তোমার গৌরবে।

এরপরই ভারতের বিভিন্ন ভাষায় ইংরেজি গীতাঞ্জলি অনুবাদের সাড়া পড়ে যায়। ধীরে ধীরে ইংরেজি থেকেই অন্যান্য কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধাদির অনুবাদও শুরু হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত প্রকৃতি ও তাঁর সৃজন-মননের যথার্থ পরিচয় দুর্লভই থেকে যায়। কারণ বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে অন্য ভারতীয়

ভাষায় যে অনুবাদ দাঁড়াত তা মূল থেকে বহুদূরের তৃতীয় স্তরের সামগ্রী—সেকথা বলাই বাহুল্য। তাই রবীন্দ্রনাথকে মূল বাংলায় পড়া, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা ও মূল থেকে অনুবাদের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে অসমিয়া, ওড়িয়া, সিন্ধি, হিন্দি, পাঞ্জাবি, রাজস্থানি, গুজরাটি, মরাঠি, কাশ্মীরি, উর্দু, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মলয়ালম ভাষাভাষী মানুষ বাংলা শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন। অনেকে বাংলা শিখতে শান্তিনিকেতনে আসা-যাওয়া শুরু করেন। কেউ ছাত্র আবার কেউ-বা শিক্ষকরূপে। এইভাবে ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা, অভিরুচি, সংস্কৃতি ও কৃতির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে চেনা-জানা, আপন-করা ও দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার কাজ শুরু হয়। ছাত্র হিসাবে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন—

গুজরাট থেকে—নগীনদাস পারেখ, প্রহ্লাদ পারেখ।

সিন্ধু থেকে—অর্জন ইস্রাণী, কৃশিন খাটওয়ানী।

অন্ধ্র থেকে—রায়া প্রলুই সুব্বারাও, মাল্লা ভারাপ্পু, ডঃ গোপাল রেড্ডি।

কর্নাটক থেকে—নারায়ণ সংগম, কৃষ্ণকুমার কলুর, শেষ কুলকরনী ও এ. লক্ষ্মণরাও, যিনি শিশুকবি 'হোয়শলা' নামে পরিচিত।

যাঁরা শিক্ষকরূপে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মরাঠি পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী ও কাকাসাহেব কালেলকার, উত্তরপ্রদেশের হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও বনারসীদাস চতুর্বেদী, উড়িষ্যা থেকে কুঞ্জবিহারী দাস প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষকতার শেষে তাঁরা স্ব স্ব স্থানে ফিরে গিয়ে রবীন্দ্রচর্চায় মনোযোগী হন। শান্তিনিকেতনে থেকেই কেউ কেউ নিজ ভাষায় রবীন্দ্রচর্চা শুরু করেছিলেন।

বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন ও নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন দেশের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন প্রদেশের মানুষকে বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রচর্চায় অনুপ্রাণিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যের বিচিত্রতর দিক তাঁদের মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে। বাংলা পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা হয়েছে ভারতের নানা স্থানে। রবীন্দ্রনাথও দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন। কোথাও কিছুদিন বসবাস করেছেন আবার কোথাও সভাসমিতিতে যোগ দিয়েছেন, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। তাঁর সম্মানেও উৎসব আয়োজন হয়েছে। তার ফলেও মানুষের মনে তাঁর সৃজনধারা ও বিচারধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাকে আপন করার আকাঙক্ষা জেগেছে। ভারতের সর্বত্র রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেবার কাজে গান্ধিজী, লোকমান্য তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও জওহরলাল নেহরু প্রমুখের সহযোগিতাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যার ফলে বাংলা ভাষার রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে সহজ ও সুলভ হয়ে উঠলেন। তাই আর ইংরেজি থেকে নয়, সরাসরি বাংলা থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদ সম্ভব হল।

ভারতের প্রায় সব ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথের বাংলা গীতাঞ্জলি, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক এমনকী সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা-সভ্যতা সংস্কৃতি-দর্শন সমালোচনা ও সাহিত্য-তত্ত্ব স্বদেশপ্রেম এবং বিশ্বমৈত্রীর সূক্ষ্ম ও গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত প্রবন্ধাবলির পঠন-অনুবাদ এবং চিন্তন-মনন শুরু হয়ে যায়। তাঁর ভাবধারা মানুষকে প্রাচীন ও নবীন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া এবং মিলনের উপযোগিতার সন্ধান এনে দেয়। মানুষ বুঝতে শুরু করে—জীবনে ও কর্মে সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধি ও অনুসৃতি ছাড়া—

'নাহি অন্য পথ'। এক্ষেত্রে রবীন্দ্র-সংগীতের অবদানও কম নয়। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের চির-আধুনিক বা শাশ্বত চিন্তাকে জনে জনে পৌঁছে দিয়ে, তাঁর স্বপ্নের ভারত গড়ে তুলতে ভারতের সকল প্রদেশের, সব স্তরেরই আধুনিক শিক্ষিত মনের মানুষ আত্মনিয়োগ করেন।

রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা ও গদ্যকাব্য, গীতিনাট্য, নাট্যকাব্য ও নৃত্যনাট্য, ছোটোগল্প ও উপন্যাসেরই অনুসৃতি ঘটেছে বিভিন্ন ভাষায়। স্বদেশী-সমাজ, সাধনা, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, মানুষের ধর্ম এবং জীবনস্মৃতি-র অনুবাদ—চিন্তাশীল সাহিত্য-শাখাকে নব উদ্যম ও নবীন চেতনা দান করেছে। ১৯২৬ সালে মরাঠি আর. জি. কানাডে 'রবীন্দ্রজীবনী' রচনা করেন। মলয়ালম ভাষায় পি. কুন্‌হিরামন নায়ার ও জে. সি. পালকক্কী রবীন্দ্রজীবনী রচনা করেন। তামিল ভাষাতে টি. এন. কুমারস্বামী, কন্নড় ভাষায় এম. ভি. আয়েঙ্গার রবীন্দ্রজীবনী রচনা করেছেন। প্রায় সব ভাষাতেই রবীন্দ্রজীবনী রচিত হয়েছে। রচিত হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমীক্ষাও। এই প্রসঙ্গে মলয়ালম ভাষায় ইউ. বালকৃষ্ণ পিল্লাই রচিত ভারত-ভাস্করণ, কে. কেশবন নায়ার রচিত বিশ্ব মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কবি অকাদমি প্রকাশিত রবীন্দ্র-সমীক্ষা উল্লেখযোগ্য। কাকাসাহেব কালেলকার 'রবীন্দ্র-মনন' এবং 'যুগমূর্তি রবীন্দ্রনাথ' রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে গুজরাটি ঝাঁওয়ের চাঁদ মেঘানীর 'রবীন্দ্র-বীণা', তামিল ভাষার কে. চন্দ্রশেখরণের 'রবীন্দ্র-কথা', হিন্দিতে সূর্যকান্ত ত্রিপাঠীর 'রবীন্দ্র-কবিতা-কানন', হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ' এবং ডঃ শিবনাথের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যকী সমীক্ষা' স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় সাহিত্য এবং সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে লেখা প্রবন্ধ এবং অভিনব সৃষ্টি বহু তরুণ সাহিত্যিককে নতুন সাহিত্য-সৃজনে অনুপ্রাণিত করেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে যুগান্তর। তাঁর প্রাচীন সাহিত্যের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' পড়ে, রবীন্দ্র-ভাবনাকে রূপায়িত করতে যাঁরা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে হিন্দি-কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত, গুজরাটের বোদাতকর, আসামের পদ্মনাথ গোহাঞি বড়ুয়া এবং কর্নাটকের শ্রীমতী ভারতী অর্থাৎ তিরুমলে রাজাম্মার নাম উল্লেখযোগ্য। মৈথিলীশরণ হিন্দিতে প্রখ্যাত কাব্য 'সাকেত' রচনা করেন। তাঁর যশোধরা কাব্য রচনার মূলেও রবীন্দ্র-ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। বোদাতকর গুজরাটি ভাষায় লেখেন 'উর্মিলা' কাব্য, পদ্মনাথ গোহাঞি বড়ুয়া অসমিয়া ভাষায় 'উর্মিলা' নামে সনেট রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি 'উর্বশী' কবিতাটি হিন্দির প্রখ্যাত কবি রামধারী সিংহ দিনকরকে 'উর্বশী' নামে কাব্যরচনায় প্রণোদিত করে। কাব্যটি মৈথিলীশরণ গুপ্তের সাকেতের মতোই হিন্দি সাহিত্যে অতি মূল্যবান সংযোজন। তামিলে উর্বশী কবিতাটি মূলের ছন্দ-ঝংকার এবং ধ্বনিমাধুরী বজায় রেখেই অনূদিত হয়েছে, তা বহু তরুণ কবিকে নব-কাব্য রচনায় উৎসাহিতও করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যটির আদর্শে কন্নড় ভাষায় কবি কে. ভি. পুট্টাপ্পা 'চিত্রাঙ্গদা' নামেই একটি গীতিনাট্য রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতা 'কণিকা' জাতীয় রচনা বিভিন্ন ভাষার কবিকে 'কণিকা'-চর্চায় উৎসাহিত করেছে। এ প্রসঙ্গে পদ্মনাথ গোহাঞি বড়ুয়ার 'অকণি' রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' অসমিয়াতে 'অকণি' নাম পেয়েছে। পদ্মনাথ গোহাঞির একটি 'অকণি'—

মিঠা আরু তিতা

মিঠাই সঁহারি কয়, "তিতা হের তিতা,
অরুচি, ঘৃণিত, ত্যাজ্য, তোরে সতে মিতা!"
প্রত্যুত্তরে তিতা কায়ে দিলে গহী নাই,—
"মোকে স্মরি মাথো তোক চিনে মোর ভাই।"

মনে পড়ে যায়—রবীন্দ্রনাথের কণিকার 'ফুল ও ফল' রচনাটি—

ফুল কহে ফুকারিয়া—'ফল ওরে ফল!'
কত দূরে রয়েছিস বল মোরে বল।
ফল কহে, মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি—
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি ॥

এই 'কণিকা' জাতীয় রচনা মরাঠি সাহিত্যেও খুবই জনপ্রিয়। মরাঠিতে এর প্রচলন করেন শ্রীগোপীনাথ তালভাল্কার। আর জনপ্রিয় করে তোলেন শ্রীমাধব জুলিয়ান। কেবল তাই নয়, 'কণিকা' এক রকমের বিশিষ্ট 'ছন্দ' রূপে গৃহীত হয়েছে এবং মাধবের ছন্দোরচনা গ্রন্থে 'লীলারতি' ছন্দের শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হল—অসমিয়া, ওড়িয়া, হিন্দি, মরাঠি, গুজরাটি, তামিল, মলয়ালম এবং কন্নড় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার কেবল ভাবই নয়, ভাষা ও ছন্দেরও স্বীকৃতি এবং অনুসৃতি ঘটেছে। কখনও কখনও ভাষার লালিত্য এবং ছন্দের মাধুর্য এমন মনোহারী হয়ে উঠেছে যে, অর্থ না বুঝতে পারলেও ভাষা ও ছন্দের আবেদনই বলে দেয় যে—হয় রবীন্দ্র-রচনা, নয় তার সমজাতীয় রচনার অংশবিশেষ পড়ছি বা শুনছি। এখানে অসমিয়া, ওড়িয়া ও হিন্দি কবিতা থেকে উদাহরণ নিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের ষট্‌কল পর্বের ২৩ মাত্রার দুটি পঙ্‌ক্তি এবং পর পর অসমিয়া, ওড়িয়া ও হিন্দির অনুরূপ দুটি করে পঙ্‌ক্তি পড়া যাক।

বাংলা— দুইটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়া বসো হে হৃদয়নাথ।
কল্যাণ করে মঙ্গল ডোরে বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত ॥
—কল্পনা : 'বিবাহমঙ্গল'

অসমিয়া— অগ্নিবীণার নুমালা বহ্নি স্তব্ধ করিয়া প্রলয় গান…
জীবন্ রঙেরে করিয়া দীপ্ত আনিলা হিয়াৎ স্নেহের বান।
—দেবকান্ত বড়ুয়া : 'দৃষ্টিসৃষ্টি'

ওড়িয়া— কি হেব আমর তম্বার পটা আজি এ রূপার জয়ন্তীরে?
স্বাধীন এ দেশে কি দেখুচু আমে সিন্ধু গঙ্গা কাবেরী তীরে?
—রাধামোহন গড়নায়ক : 'আজি এ রূপার জয়ন্তীরে'

হিন্দি— পাপোঁকে শুদ্ধি করণ চারু চরণ ধোয়কে।
তুম্ভী অখিল বেশ-বরণ বিশ্ব-শরণ রোয়কে ॥
—নিরালা : 'বেলা—৩৭'

সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালার হিন্দি পঙ্‌ক্তি দুটিতে প্রয়োজনে একটি করে মাত্রা বাড়ানো হয়েছে। তার যথার্থ রূপটি হল—

পাপোঁকে শুদ্ধিকরণ চারুচরণ ধোয়ে।
তুম্ভী অখিল বেশ-বরণ বিশ্ব-শরণ রোয়ে ॥

এই দুই পঙ্‌ক্তির ধ্বনিসুষমার সাম্য লক্ষ করা যায় রবীন্দ্রনাথের রচনায়—

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ আন অমৃত বাণী।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে ভারতীয় সাহিত্যে নবদিগন্ত উন্মোচন করে সমস্ত দেশ তথা জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন—সে দিকে অগ্রসর হতে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি ॥

বিশ্বকে ও বিশ্বের মানুষকে জানবার তাঁর এই সাধনা ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতে সঞ্চারিত হয়েছে। সংগীত রবীন্দ্র-সংস্কৃতির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অপরিহার্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। সেই রবীন্দ্র-সংগীতের চর্চা বাংলা প্রতিবেশী ভাষাগুলিতে তো বটেই, মরাঠি, গুজরাটি, তামিল, মলয়ালম ও কন্নড় প্রভৃতি ভাষাতেও বেশ আগ্রহ আন্তরিকতার সঙ্গে চলছে। বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্র-সংগীতের অনুবাদে যতদূর সম্ভব শুনে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা স্বাভাবিক। তারই সঙ্গে তার মূলের সুর, তাল, লয় ও ছন্দ ঠিক রাখতে হয়। ফলে শিল্পী ও ভাষা ভিন্ন হলেও রবীন্দ্র-সংগীত, রবীন্দ্র-সংগীতই থাকে। এইভাবে রবীন্দ্র-সংগীত চর্চার মাধ্যমে বঙ্গেতর প্রদেশের মানুষ পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি তথা বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক গীতের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথকে আরও কাছে, আরও আপন করে পাওয়ার ব্রত নিয়েছেন। ভারতের প্রায় সব ভাষাতেই রবীন্দ্র-সংগীতের চর্চা চলছে—এটা খুবই আনন্দের কথা। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর 'সংগীত গীতাঞ্জলি' (১৯২৭) গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। দেবনাগরী লিপিতে রবীন্দ্রনাথের গান, তার রাগ, তাল ও লয় নির্দেশ করে প্রত্যেক গানের স্বরলিপির লক্ষ্য ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে বইটিতে। অনুরূপ কাজ করেছিলেন হিন্দি সাহিত্যিক হংসকুমার তেওয়ারী। হিন্দি জগতে রবীন্দ্র-সংগীত চর্চাকে তিনি অনেকটা সহজ ও উপযোগী করে তুলেছেন। মলয়ালম ভাষায় বিজয় রাঘবন 'রবীন্দ্রসংগীত' নামে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ওড়িশার কবি লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্র রবীন্দ্রনাথের গানের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে যে-সব গান ও কবিতা রচনা করেন তা 'জীবন-সংগীত' (১৯৩২) নামে প্রকাশিত হয়। সিন্ধি ভাষায় রবীন্দ্র-সংগীত স্থানীয় লৌকিক সুরে বসিয়ে গাওয়ার চর্চা চলে আসছে বহুদিন ধরে। এ সব লালচাঁদ, অমর দিনোমল এবং এম. ইউ. মালকানী প্রমুখের প্রয়াসের ফল। তাতেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ সিন্ধিদের জীবন ও সাহিত্যের গভীরে স্থান পেয়েছেন, আর তাঁদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছেন। তামিলনাড়ুতেও রবীন্দ্র-সংগীতের চর্চা চলছে।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, জীবনী এবং মানসিকতার নানা দিক নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে, এখনও হয়। তার ফলে পাঠকসমাজ

সহজে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁর চিন্তা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা এবং বিচার-বিতর্ক করে চলেছেন। মরাঠি ভাষার 'মনোরঞ্জন', 'সাধনা' ও 'নবভারত', ওড়িশার 'যুগবীণা' ও 'উৎকল সাহিত্য', অসমিয়া 'জোনাকী' ও 'বিজুলী' এবং কোট্টায়ামের মলয়ালম ভাষার ন্যাশানাল বুক স্টলের স্পেশাল বুলেটিনে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসমীক্ষা ও তাঁর অনুসরণে নতুন রচনা প্রকাশিত হত। মাঝে মাঝে পত্রিকাগুলি রবীন্দ্র-সংখ্যাও প্রকাশ করত।

হিন্দি, মরাঠি, গুজরাটি, সিন্ধি ও তামিল প্রভৃতি কোনো কোনো ভাষায় রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে তুলনাত্মক আলোচনা ও গবেষণার কাজও শুরু হয়েছে। তেলুগুভাষী শ্রীনিবাস রাঘবনের 'তামিল সন্ত ও রবীন্দ্রনাথ' এবং হিন্দিতে 'টেগোর ঔর নিরালা', 'নিরালাকে কাব্য পর বঙ্গলা কো প্রভাব' ও 'মধ্যযুগীন হিন্দি সন্ত ও রবীন্দ্রনাথ'-জাতীয় গবেষণা-কর্ম স্মরণীয়। বহির্বঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ধীরে ধীরে ১৯৬১ সাল অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের একশো বছরের উৎসব উদ্‌যাপনের সময় এসে যায়, সেই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্র-প্রভাব বা রবীন্দ্রচর্চার সমীক্ষার একটি কেন্দ্রীয় প্রয়াস হয়। তাতে পাঞ্জাবি ভাষার ত্রিলোচন সিং ও সন্ত সিং সেখন ; মরাঠি ভাষার বি. ভি. ওয়ারেকার ও জি. ডি. খানোসকার ; গুজরাটি ভাষার উমাশঙ্কর যোশী ও কে. এম. মুন্‌সী ; মলয়ালম ভাষার জি. শঙ্কর কুরূপ ও সি. কুন্‌হন রাজা ; অসমিয়া ভাষার রত্নকান্ত বরকাকতী ; ওড়িয়া ভাষার গোপীনাথ মহান্তি ও কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ; কাশ্মীরি ভাষার জে. এল. কাউল, উর্দু ভাষার কিরাক গোরখপুরী ; তামিল ভাষার টি. এন. কুমারস্বামী ও কে. চন্দ্রশেখরণ ; সিন্ধি ভাষার হাশু কেবলরামানী ও রাম পাঁজওয়ানী ; তেলুগু ভাষার জি. ভি. সীতাপতি ; হিন্দি ভাষার হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ; কন্নড় ভাষার আদ্য রঙ্গাচার্য এবং বাংলা ভাষার শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের আলোচনা থেকে বোঝা যায়—বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্রচর্চা যে মানের ও যে পরিমাণের হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। অপরাপর ভাষার তুলনায় কাশ্মীরি ও উর্দুতে উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়েছে। এক্ষেত্রে সাহিত্য অকাদেমি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য অন্যান্য ভাষার সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরি এবং উর্দুতে প্রকাশের ব্যবস্থা করে কিছুটা সহায়তা করেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদ পাঠ করে কাশ্মীরের মানুষ বেদ-উপনিষদের বাণীর যুগোপযোগী সুর তাতে খুঁজে পেয়েছেন। তাই রবীন্দ্রচর্চার প্রয়োজনীয়তা তাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু তার জন্য পরিকল্পনা ও উদ্‌যোগ তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। তবে উর্দুতে রবীন্দ্রনাথ অপরিচিত নন। তিনি উর্দু সাহিত্যিকদের কাছে নব মানবতাবাদের শক্তির সজীব উৎসস্বরূপ। রবীন্দ্রচর্চার ফলে উর্দুতে নতুন সুর, নব অনুভূতি এবং অভিরুচি এসেছে। 'অদব-এ-লতীফ' অর্থাৎ নব নান্দনিক শৈলীর সৃষ্টি হয়েছে। তা সত্ত্বেও উর্দু সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাশিত স্বীকৃতি পাননি বলা চলে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের নব আবিষ্কার বা পুনরাবিষ্কার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তার জন্য চাই গহন-গভীর পঠন-পাঠনের সাহায্যে তাঁর স্বীকরণ, অনুধাবন এবং অনুসরণ। কিন্তু তার জন্য আমাদের হৃদয়-মন, পরিবেশ-পরিজন এবং স্থিতি ও পরিস্থিতি কি অনুকূল? হয় তো নয়। তাই আজ রবীন্দ্রনাথের সোয়া শো জন্ম-জয়ন্তীকে উপলক্ষ্য করে ভারত দেশটার আত্মসমীক্ষার উদ্‌যোগ শুরু হয়েছে। এই আত্মসমীক্ষা যদি আন্তরিক ও যথার্থ হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথ ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবেন—সমস্ত ভারতবাসীর আপনজন হয়ে উঠবেন তাতে সন্দেহ নেই।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার স্বরূপ ও গুরুত্ব নির্দেশ করে হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী তাঁর 'মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য মনে করি। তিনি বলেছেন— "ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দান হল—তিনি তাঁর মৌলিকতাকে উসকে দিয়ে তাতে শক্তি সঞ্চার করেছেন। চোখ খুলে দিয়েছেন দেশের সাহিত্যিকদের। লোভ ও মোহে অভিভূত আধুনিক সভ্যতার দুর্বলতার ধাতটি ধরে ফেলতে তাঁর ভুল হয়নি। প্রভাবশালী লেখকরা অপরের ব্যক্তিত্বকে অভিভূত করে ফেলেন। কিন্তু শ্রেয় নয় সে প্রভাব। সুস্থ প্রভাব মৌলিকতার গতিরোধ করে না, ব্যক্তিত্বের বিকাশ স্বচ্ছন্দ হয় এবং গ্রহীতার মনে নিজের প্রতি অনাস্থা জাগায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের প্রাণশক্তিকে স্পন্দিত করেছেন, নিজেকে জানবার শক্তি দিয়েছেন। উপনিষদ থেকে, বৌদ্ধসাহিত্য থেকে, মধ্যযুগের সন্তসাহিত্য থেকে এবং বিশাল দেশের বিভিন্ন কোণ থেকে এমন সব সামগ্রী আহরণ করেছিলেন, যার সাহায্যে ভারতের গৌরব উজ্জ্বল হয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মূল জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন সামগ্রী, সজীব মনে হলেও তাকে তিনি ত্যাগ করেছেন। যা সৎ ও মহৎ, প্রাণময় ও জীবন্ত—তার যথোচিত সম্মান করেছেন। এইভাবে ভারতীয় মনীষার উজ্জ্বল মহিমান্বিত রূপটি উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। দেশের সাহিত্যিকগণ তার থেকে প্রেরণা ও শক্তি লাভ করেছেন। এই মহৎ কর্মের প্রভাবে তাঁদের স্বকীয় বিশিষ্টতার সহজ স্ফুরণ ঘটেছে। এটাই প্রত্যাশিত ও বাঞ্ছনীয়। ভারতের মহৎ আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি তিনি দেশের শিল্পিসমাজকে উন্মুখ ও উদ্‌বুদ্ধ করেছেন।" কিন্তু সমগ্র দেশ তাঁকে বুঝতে পারল কৈ? পূর্বে উদ্‌ধৃত কণিকার 'ফুল ও ফল' কবিতাটি একটু বদলে বলতে ইচ্ছা করছে—

দেশ কহে ফুকারিয়া, 'রবি ওগো রবি!
কত দূরে রয়েছ, বল ওগো কবি!'
রবি কহে, 'হে নবীন, কেন হাঁকাহাঁকি—!
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি ॥'

রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি
রবীন্দ্রনাথ : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি
লেখক-পরিচিতি

রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি : বাংলা

কবি-কাহিনী। কাব্য। সংবৎ ১৯৩৫ [১৮৭৮]। গ্রন্থাকারে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক।

বন-ফুল। কাব্যোপন্যাস। ১২৮৬ [১৮৮০]। কবি-কাহিনীর পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেও, বন-ফুল দুই বৎসর পূর্বে রচিত ও মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

বাল্মীকিপ্রতিভা। গীতিনাট্য। শক ফাল্গুন ১৮০২ [১৮৮১]। দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১২৯২ [১৮৮৬]—অনেকগুলি গান 'পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে কালমৃগয়া গীতিনাট্য হইতে গৃহীত'।

ভগ্নহৃদয়। গীতিকাব্য। শক ১৯০৩ [১৮৮১]। [উৎসর্গ: কাদম্বরী দেবী]

রুদ্রচণ্ড। নাটিকা। শক ১৮০৩ [১৮৮১]। 'ভাই জ্যোতিদাদা'কে। রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রথম নাটক।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। পত্রাবলী। শক ১৮০৩ [১৮৮১]। 'ভাই জ্যোতিদাদা'কে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যগ্রন্থ। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ে প্রকাশিত নতুন সংস্করণ, পৌষ ১৩৬৭ [১৯৬১]।

সন্ধ্যাসঙ্গীত কবিতা। ১২৮৮ [১৮৮২]। গ্রন্থে ১২৮৮ মুদ্রিত থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে ১২৮৯ সালে প্রকাশিত। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্প-কর্তৃক সংকলিত পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ, ১৯৬৯।

কাল-মৃগয়া। গীতিনাট্য। অগ্রহায়ণ ১২৮৯ [১৮৮২]।

বউ-ঠাকুরানীর হাট। উপন্যাস। শক পৌষ ১৮০৪ [১৮৮৩]। 'শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী শ্রীচরণেষু'। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। প্রথম রচিত অসম্পূর্ণ (?) উপন্যাস 'করুণা' (ভারতী ১২৮৪-৮৫) স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়নি, গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডে প্রথম সংকলিত হয় আশ্বিন ১৩৬৯ [১৯৬৪]। বউ-ঠাকুরানীর হাট অবলম্বনে ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রায়শ্চিত্ত নাটক রচিত হয়। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রায়শ্চিত্ত পুনর্লিখিত হয়ে পরিত্রাণ নামে মুদ্রিত।

প্রভাত সঙ্গীত। কবিতা। শক বৈশাখ ১৮০৫ [১৮৮৩]। 'শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু'।

বিবিধ প্রসঙ্গ। প্রবন্ধ। শক ভাদ্র ১৮০৫ [১৮৮৩]। প্রথম প্রবন্ধ-পুস্তক।

ছবি ও গান। কবিতা। শক ফাল্গুন ১৮০৫ [১৮৮৪]। [কাদম্বরী দেবী]।

প্রকৃতির প্রতিশোধ। নাট্যকাব্য। ১২৯১ [১৮৮৪]। 'তোমাকে [কাদম্বরী দেবী] দিলাম'।

নলিনী। নাট্য। ১২৯১ [১৮৮৪]।

শৈশব সঙ্গীত। কবিতা। ১২৯১ [১৮৮৪]। 'তোমাকেই [কাদম্বরী দেবী] দিলাম'।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। কবিতা। ১২৯১ [১৮৮৪]। [কাদম্বরী দেবী]। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্প-কর্তৃক সংকলিত পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৭৬ : ১৮৯১ শক। নবজীবন পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১২৯১) প্রকাশিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' পরিশিষ্টে সংকলিত।

রামমোহন রায় প্রবন্ধ [১৮ মার্চ ১৮৮৫]। ভারতপথিক রামমোহন রায়, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১১ মাঘ ১৩৬৬, গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

আলোচনা। প্রবন্ধ। [১৫ এপ্রিল ১৮৮৫]। 'এই গ্রন্থ পিতৃদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম'।

রবিচ্ছায়া। সংগীত। বৈশাখ ১২৯২ [১৮৮৫]। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম সংগ্রহ-পুস্তক। '১২৯১ সনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে মুদ্রিত'।

কড়ি ও কোমল। কবিতা। ১২৯৩ [১৮৮৬]। 'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দাদা মহাশয় করকমলেষু'।

রাজর্ষি। উপন্যাস। ১২৯৩ [১৮৮৭] এই উপন্যাসের প্রথমাংশ অবলম্বনে 'বিসর্জন' (১২৯৭) নাটক রচিত।

চিঠিপত্র। ১৮৮৭। পরে গদ্যগ্রন্থাবলীর 'সমাজ' [১৯০৮] খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সমালোচনা। প্রবন্ধ। ১২৯৪ [১৮৮৮]। 'পূজনীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কর-কমলে'।

মায়ার খেলা। গীতিনাট্য। শক অগ্রহায়ণ ১৮১০ [১৮৮৮]। 'শ্রীমতী সরলা রায়'কে। 'আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার [নলিনী] সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব'।—বিজ্ঞাপন। আশ্বিন ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে [১৯৫০] গীতবিতানের নতুন সংকলিত তৃতীয় খণ্ডের অঙ্গীভূত।

রাজা ও রানী। নাটক। ২৫ শ্রাবণ ১২৯৬ [১৮৮৯]। 'পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় দাদা মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে'। রাজা ও রানীর আখ্যানভাগ অবলম্বনে তপতী (১৩৩৬) গদ্যনাটক রচিত হয়।

বির্সজন। নাটক। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ [১৮৯০]। 'শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণাধিকেষু'। 'রাজর্ষি [১৮৮৭] উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে নাট্যাকারে রচিত'। স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৮ [১৯৬১]।

মন্ত্রি অভিষেক। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ [১৮৯০]। 'লর্ড ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ উপলক্ষ্যে যে বিরাটসভা আহূত হয় এই প্রবন্ধ সেই সভাস্থলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত'।

মানসী। কবিতা। ১০ পৌষ ১২৯৭ [১৮৯০]। [মৃণালিনী দেবী?]

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি। প্রথম খণ্ড, ১৬ বৈশাখ ১২৯৮ [১৮৯১]। কবির ইংলন্ড-যাত্রার ভূমিকা। দ্বিতীয় খণ্ড ৮ আশ্বিন ১৩০০ [১৮৯৩]। 'শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত সুহৃদ্‌বরকে'। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ে প্রকাশিত নতুন সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৭ [১৯৬০]।

চিত্রাঙ্গদা। কাব্য। ২৮ ভাদ্র ১২৯৯ [১৮৯২]। 'স্নেহাস্পদ শ্রীমান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরমকল্যাণীয়েষু'। 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত'।

গোড়ায় গলদ। প্রহসন। ৩১ ভাদ্র ১২৯৯ [১৮৯২]। 'শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন প্রিয়বন্ধুবরেষু'। অভিনয়যোগ্য পুনর্লিখিত সংস্করণ, শেষ রক্ষা [১৯২৮]।

গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা। সংগীত ও গীতিনাট্য। শক ৮ বৈশাখ ১৮১৫ [১৮৯৩]। ১২৯৯ পর্যন্ত রচিত 'নূতন পুরাতন সমস্ত গান' এবং বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য সন্নিবেশিত।

সোনার তরী। কবিতা। ১৩০০ [১৮৯৪]। কবি-ভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের 'কর-কমলে'।

ছোট গল্প। ১৫ ফাল্গুন ১৩০০ [১৮৯৪]। 'পূজনীয় জ্যেষ্ঠসোদরোপম শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত আই. সি. এস. মহাশয় করকমলেষু'।

বিচিত্র গল্প। প্রথম ভাগ। ১৩০১ [১৮৯৪]।

কথা-চতুষ্টয়। গল্প। ১৩০১ [১৮৯৪]।

গল্প-দশক। ১৩০২ [১৮৯৫]। 'পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ আশুতোষ চৌধুরীর করকমলে'।

নদী। কবিতা। ২২ মাঘ ১৩০২ [১৮৯৬]। 'পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে'। পরে 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র-সংবলিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৭১ [১৯৬৪]।

চিত্রা। কবিতা। ফাল্গুন ১৩০২ [১৮৯৬]।

বৈকুণ্ঠের খাতা। প্রহসন। চৈত্র ১৩০৩ [১৮৯৭]।

পঞ্চভূত। প্রবন্ধ। ১৩০৪ [১৮৯৭]। 'মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সুহৃদ্‌বরকরকমলেষু'।

কণিকা। কবিতা। ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬ [১৮৯৯]। 'পরম প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের করকমলে'। স্বতন্ত্র শোভন সংস্করণ [১৯৪৮]।

কথা। কবিতা। ১ মাঘ ১৩০৬ [১৯০০]। 'সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানাচার্য করকমলেষু'। পরবর্তী কালে 'কথা ও কাহিনী' [১৯০৮] গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়।

কাহিনী। কবিতা, নাট্যকাব্য ও 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' প্রহসন। ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬ [১৯০০]। 'শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেবমাণিক্য মহারাজ ত্রিপুরেশ্বর করকমলে'।

কল্পনা। কবিতা। ২৩ বৈশাখ ১৩০৭ [১৯০০]। 'শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সুহৃৎকরকমলে'।

ক্ষণিকা। কবিতা। [২৬ জুলাই ১৯০০]। 'শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত সুহৃত্তমের প্রতি'।

ব্রহ্মমন্ত্র। ৮ মাঘ ১৩০৭ [১৯০১]।

গল্প। ১৩০৭ [১৯০১]। এই গ্রন্থ গল্পগুচ্ছের (মজুমদার এজেনসি-কর্তৃক প্রকাশিত) দ্বিতীয় খণ্ড।

নৈবেদ্য। কবিতা। আষাঢ় ১৩০৮ [১৯০১]। 'পরম-পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে'।

ঔপনিষদ ব্রহ্ম। প্রবন্ধ। শ্রাবণ ১৩০৮ [১৯০১]।

বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা। ১৩০৮ [১৯০১]।

চোখের বালি। উপন্যাস ১৩০৯ [১৯০৩]।

কাব্যগ্রন্থ। ১-৯ ভাগ। ১৩১০ [১৯০৩-১৯০৪]। এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যসংগ্রহ। এখানে নতুন পদ্ধতি অনুসারে, বিষয়-অনুযায়ী, কবিতাগুলি শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে। খণ্ড-নিবিষ্ট শ্রেণীগুলির উল্লেখ করা গেল—যাত্রা, হৃদয়-অরণ্য, নিষ্ক্রমণ, বিশ্ব, সোনার তরী, লোকালয়। নারী, কল্পনা, লীলা, কৌতুক, যৌবনস্বপ্ন, প্রেম। কবিকথা, প্রকৃতিগাথা, হতভাগ্য। সংকল্প স্বদেশ। রূপক, কাহিনী, কথা, কণিকা। মরণ, নৈবেদ্য, জীবনদেবতা, স্মরণ। শিশু। গান। নাট্য। চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত 'সংকল্প' 'স্বদেশ', ষষ্ঠ ভাগে মুদ্রিত 'স্মরণ' এবং সপ্তম ভাগে মুদ্রিত 'শিশু' তখনও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি।

কর্মফল। গল্প। ১৩১০ [১৯০৩]। নাট্যীকৃত রূপ 'শোধ-বোধ' [১৯২৬]।

রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী। হিতবাদীর উপহার। ১৩১১ [১৯০৪]। প্রধানত উপন্যাস নাটক ও ছোটোগল্পের সংকলন। ছোটোগল্প বিভাগে ('রঙ্গচিত্র') চিরকুমার সভা এবং উপন্যাস বিভাগে নষ্টনীড় সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। নষ্টনীড় বিশ্বভারতী-সংস্করণ গল্পগুচ্ছ (তিন খণ্ড, ১৯২৬) গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত।

আত্মশক্তি। প্রবন্ধ। ১৩১২ [১৯০৫]।

বাউল। গান। [৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫]

স্বদেশ। কবিতা। ১৩১২ [১৯০৫]। অধিকাংশ রচনা প্রথমে কাব্যগ্রন্থ [১৯০৩-১৯০৪] চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত ('সংকল্প', 'স্বদেশে'), পরে পুনরায় 'সংকল্প ও স্বদেশ' নামে মুদ্রিত—এবং সেই নামেই বর্তমানে প্রচলিত।

ভারতবর্ষ। প্রবন্ধ। ১৩১২ [১৯০৬]।

খেয়া। কবিতা। 'উৎসর্গ'-শেষে তারিখ, ১৮ আষাঢ় ১৩১৩ [১৯০৬]। 'বিজ্ঞানাচার্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু করকমলেষু'।

নৌকাডুবি। উপন্যাস। ১৩১৩ [১৯০৬]।

বিচিত্র প্রবন্ধ। গদ্যগ্রন্থাবলী ১ম ভাগ। বৈশাখ ১৩১৪ [১৯০৭]। এই সময় থেকে মোট ১৬ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা 'গদ্য গ্রন্থাবলী' নামে মুদ্রিত হয়।

চারিত্রপূজা। প্রবন্ধ। [২৮ মে ১৯০৭]।

প্রাচীন সাহিত্য। গদ্যগ্রন্থাবলী ২য় ভাগ। প্রবন্ধ। [১৩ জুলাই ১৯০৭]।

লোকসাহিত্য। গদ্যগ্রন্থাবলী ৩য় ভাগ। প্রবন্ধ [২৬ জুলাই ১৯০৭]।

সাহিত্য। গদ্যগ্রন্থাবলী ৪র্থ ভাগ। প্রবন্ধ। [১১ অকটোবর ১৯০৭]। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬১। 'মূল প্রবন্ধগুলির অতিরিক্ত চৌদ্দটি প্রবন্ধ বর্তমান সংস্করণের সংযোজনে কালক্রমে সংকলিত।'

আধুনিক সাহিত্য। গদ্যগ্রন্থাবলী ৫ম ভাগ। প্রবন্ধ। [১০ অকটোবর ১৯০৭]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-উপলক্ষ্যে পরিবর্ধিত সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ [১৯৬১]।

হাস্যকৌতুক। গদ্যগ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ ভাগ। কৌতুকনাট্য। [১০ ডিসেম্বর ১৯০৭]।

ব্যঙ্গকৌতুক। গদ্যগ্রন্থাবলী ৭ম ভাগ। কৌতুকনাট্য ও নিবন্ধ। [২৮ ডিসেম্বর ১৯০৭]।

প্রজাপতির নির্বন্ধ। গদ্যগ্রন্থাবলী ৮ম ভাগ। উপন্যাস। [২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮]। ১৩১১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী ('হিতবাদীর উপহার') গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয় ('চিরকুমার সভা' নামে)। এই উপন্যাসের নাট্যরূপ 'চিরকুমার সভা' ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

সভাপতির অভিভাষণ : পাবনা সম্মিলনী। ১৩১৪ [১৯০৮]। পরে 'সমূহ' [১৯০৮] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রহসন। গদ্যগ্রন্থাবলী ৯ম ভাগ। [১৬ এপ্রিল ১৯০৮]। এই গ্রন্থে গোড়ায় গলদ [১৮৯২] ও বৈকুণ্ঠের খাতা [১৮৯৭] একত্রে মুদ্রিত হয়।

রাজা প্রজা। গদ্যগ্রন্থাবলী ১০ম ভাগ। প্রবন্ধ। [৩০ জুন ১৯০৮]।

সমূহ। গদ্যগ্রন্থাবলী ১১শ ভাগ। প্রবন্ধ। [২৫ জুলাই ১৯০৮]।

স্বদেশ। গদ্যগ্রন্থাবলী ১২শ ভাগ। প্রবন্ধ। [১২ আগস্ট ১৯০৮]।

সমাজ। গদ্যগ্রন্থাবলী ১৩শ ভাগ। প্রবন্ধ। [৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]।

কথা ও কাহিনী। কবিতা। [১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]। মোহিতচন্দ্র সেন-কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের [১৯০৩-১৯০৪] পঞ্চম ভাগে মুদ্রিত 'কাহিনী' ও 'কথা' অংশের একত্র পুনর্মুদ্রণ।

গান। [২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]। যোগীন্দ্রনাথ সরকার-কর্তৃক প্রকাশিত।

শারদোৎসব। নাটক। [২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]। এর অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'ঋণশোধ' ১৯২১ খ্রি পুনর্লিখিত ও প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা। গদ্যগ্রন্থাবলী ১৪শ ভাগ। [১৭ নভেম্বর ১৯০৮]। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৩৫১।

মুকুট। নাটিকা। [৩১ ডিসেম্বর ১৯০৮]। 'বালক [১২৯২] পত্রে প্রকাশিত "মুকুট" নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত।'

শব্দতত্ত্ব। গদ্যগ্রন্থাবলী ১৫শ ভাগ। প্রবন্ধ। [২ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯০৯]। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ 'বাংলাশব্দতত্ত্ব' নামে, অগ্রহায়ণ ১৩৪২ [১৯৩৫]। এই সংস্করণ 'পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে' উৎসর্গিত। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯১।

ধর্ম। গদ্যগ্রন্থাবলী ১৬শ ভাগ। প্রবন্ধ। [২৫ জানুয়ারি ১৯০৯]। শব্দতত্ত্বের পূর্বে প্রকাশিত হলেও সংখ্যা অনুযায়ী পরে সন্নিবিষ্ট।

শান্তিনিকেতন। ১-৮ ভাগ। অনুলিখিত ভাষণ। [জানুয়ারি-জুন ১৯০৯]।

প্রায়শ্চিত্ত। নাটক। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'এ তারিখ '৩১শে বৈশাখ···১৩১৬' [১৯০৯]। 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের [১৮৮৩] নাট্যীকৃত রূপ। ভিন্নতর রূপ—পরিত্রাণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ [১৯২৯]।

চয়নিকা। কবিতা। ১৯০৯। ১৩৩২ ফাল্গুনে যে প্রথম বিশ্বভারতী-সংস্করণ ('তৃতীয় সংস্করণ') মুদ্রিত হয় তাতে কবিতা নতুন নির্বাচিত। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে নতুন নতুন কবিতা-গ্রন্থ থেকে কবিতা সংকলিত।

গান। ১৯০৯। ইন্ডিয়ান প্রেস-কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে দুই ভাগে 'গান' এবং 'ধর্মসঙ্গীত' নামে মুদ্রিত হয়। দ্রষ্টব্য, তৃতীয়-খণ্ড গীতবিতানে (ভাদ্র ১৩৬৪) 'রবীন্দ্রনাথের গানের সংকলন', পৃ. ৯৫৬, ছত্র ২-৯।

বিদ্যাসাগর-চরিত। প্রবন্ধ। [১৯০৯?]। পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫।

শিশু। কবিতা। ১৯০৯। মোহিতচন্দ্র সেন-কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে [১৯০৩-১৯০৪] সপ্তম ভাগ রূপে প্রথম মুদ্রিত। এর শেষাংশে প্রসঙ্গোপযোগী পূর্বপ্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা সংকলন করা হয়েছে।

শান্তিনিকেতন। ৯-১১ ভাগ। অনুলিখিত ভাষণ। [৯ম-১০ম ভাগ জানুয়ারি ১৯১০ এবং ১১শ ভাগ অকটোবর ১৯১০]।

গোরা। ১-২ খণ্ড। উপন্যাস। [১ ফেব্রুয়ারি ১৯১০]। 'শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু'।

গীতাঞ্জলি। কবিতা ও গান। ৩১ শ্রাবণ ১৩১৭ [১৯১০]।

রাজা। নাটক। [১৯১০]। 'অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ', অরূপরতন [১৯২০]।

শান্তিনিকেতন। ১২-১৩ ভাগ। ভাষণ। [২৪ জানুয়ারি ও ১০ মে ১৯১১]।

আটটি গল্প। [২০ নভেম্বর ১৯১১]। বালিকাদের উপযোগী গল্পের সংকলন।

ডাকঘর। নাটক। [১৬ জানুয়ারি ১৯১২]।

ধর্মের অধিকার। প্রবন্ধ। মাঘ ১৩১৮। [১৯১২]।

গল্প চারিটি। [১৮ মার্চ ১৯১২]।

মালিনী। নাটক। [২৩ মার্চ ১৯১২]। 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র অঙ্গীভূত প্রথম প্রকাশ ১৩০৩ বঙ্গাব্দে [১৮৯৬]।

চৈতালি। কবিতা। [২৩ মার্চ ১৯১২]। 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র অঙ্গীভূত প্রথম প্রকাশ ১৩০৩ বঙ্গাব্দে [১৮৯৬]।

বিদায়-অভিশাপ। নাট্যকাব্য। [১০ মে ১৯১২]। ১৩০১ বঙ্গাব্দে [১৮৯৪] 'চিত্রাঙ্গদা'র দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে প্রথম মুদ্রিত : 'চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় অভিশাপ'।

জীবনস্মৃতি। আত্মজীবনী। ১৩১৯ [১৯১২]। বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয়-সংবলিত নতুন সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৫০ [১৯৪৩]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি বিশেষ সংস্করণ, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৬৬ [১৯৫৯]।

ছিন্নপত্র। ১৩১৯ [১৯১২]। প্রথম আটটি পত্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এবং অন্যান্য পত্র ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত। এই গ্রন্থে মুদ্রিত 'ছিন্ন' পত্রসমূহের অখণ্ড বা পূর্ণতর পাঠ এবং আরও ১০৭টি নতুন পত্র একত্রে 'ছিন্নপত্রাবলী' নামে রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত, আশ্বিন ১৩৫৩ [১৯৬০]। এই সংকলনে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্রগুলি বর্জিত হয়েছে।

অচলায়তন। নাটক। [২ আগস্ট ১৯১২]। 'অভিনয়যোগ্য' সংস্করণ, গুরু [১৯১৮]।

স্মরণ। কবিতা। [২৫ মে ১৯১৪] মোহিতচন্দ্র সেন-কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের [১৯০৩-১৯০৪] ষষ্ঠ ভাগে প্রথম মুদ্রিত।

উৎসর্গ। কবিতা। উৎসর্গপত্রের তারিখ—১ বৈশাখ ১৩২১ [১৯১৪]। 'রেভারেন্ড সি. এফ. এণ্ডরুজ প্রিয়বন্ধুবরেষু'। মোহিতচন্দ্র সেন-কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে [১৯০৩-১৯০৪] বিষয়ানুযায়ী যে যে শ্রেণী বিভাগ করা হয় সে-সকল শ্রেণীর প্রবেশক কবিতা ও বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্গত অন্য কবিতার সংকলন।

গীতি-মাল্য। কবিতা ও গান। [২ জুলাই ১৯১৪]।

গান। [২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৪]। গান (১৯০৯) দ্রষ্টব্য।

গীতালি। কবিতা ও গান। ১৯১৪।

ধর্মসঙ্গীত। [২৭ ডিসেম্বর ১৯১৪]। গান (১৯০৯) দ্রষ্টব্য।

শান্তিনিকেতন। ১৪শ ভাগ। অনুলিখিত ভাষণ। ১৯১৫।

কাব্যগ্রন্থ। ১৯১৫-১৯১৬। ইন্ডিয়ান প্রেস-কর্তৃক দশ খণ্ডে প্রকাশিত। ১-৬ খণ্ড ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে এবং ৭-১০ খণ্ড ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নবম খণ্ডে মুদ্রিত ফাল্গুনী এবং বলাকা ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দেই স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

শান্তিনিকেতন। ১৫-১৭ ভাগ। অনুলিখিত ভাষণ। ১৯১৬।

ফাল্গুনী। নাটক। ১৯১৬। 'আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে'। প্রায় একই সময়ে কাব্যগ্রন্থের (১৯১৫-১৯১৬) নবম খণ্ডে মুদ্রিত। ঘরে-বাইরে। উপন্যাস। ১৯১৬। 'শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু'।

সঞ্চয়। প্রবন্ধ। ১৯১৬। 'শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নামে'।

পরিচয়। প্রবন্ধ। ১৯১৬।

বলাকা। কবিতা। ১৯১৬। 'উইলি পিয়র্‌সন বন্ধুবরেষু'। প্রায় একই সময়ে কাব্যগ্রন্থের (১৯১৫-১৯১৬) নবম খণ্ডে মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথ-কৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা-সহ রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৬৭ [১৯৬১]।

চতুরঙ্গ। উপন্যাস। ১৯১৬।

গল্পসপ্তক। [১৯১৬]।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। প্রবন্ধ। [২২ আগস্ট ১৯১৭]। পরে কালান্তর [১৯৩৭] গ্রন্থের অন্তর্গত হয়।

গুরু। নাটক। ১ ফাল্গুন ১৩২৪ [১৯১৮]। অচলায়তন [১৯১২] নাটকের 'অভিনয়যোগ্য' সংস্করণ।

পলাতকা। কবিতা। [অকটোবর ১৯১৮]।

অরূপরতন। নাটক। [১৯২০]। পূর্ববর্তী রাজা নাটকের [১৯১০] পরিবর্তিত রূপ।

পয়লা নম্বর। গল্প। বৈশাখ ১৩২৭ [১৯২০]।

ঋণশোধ। নাটিকা। [১৯২১]। শারদোৎসবের [১৯০৮] অভিনয়যোগ্য সংস্করণ।

মুক্তধারা। নাটক। বৈশাখ ১৩২৯ [১৯২২]।

লিপিকা। কথিকা। [১৯২২]।

শিশু ভোলানাথ। কবিতা। [১৯২২]।

বসন্ত। গীতিনাট্য। ফাল্গুন ১৩২৯ [১৯২৩]। পরে ঋতু উৎসবে [১৯২৬] সংকলিত হয়।

পূরবী। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৩২ [১৯২৫]। [ভিকটোরিয়া ওকাম্পো] 'বিজয়ার করকমলে'।

গৃহপ্রবেশ। নাটক। আশ্বিন ১৩৩২ [১৯২৫]। 'শেষের রাত্রি' গল্পের নাট্যরূপ।

প্রবাহিণী। গান। অগ্রহায়ণ ১৩৩২ [১৯২৫]।

সংকলন। প্রবন্ধ, পত্র, ডায়ারি ও কথিকা। ৯ আগস্ট [১৯২৫]।

গীতিচর্চা। গান। পৌষ ১৩৩২ [১৯২৫]। 'শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত'।

ঋতু-উৎসব। নাট্য-সংগ্রহ। ১৩৩৩ [১৯২৬]। বিভিন্ন ঋতুতে অভিনয়ের উপযোগী নাট্য এবং গীত-সংকলন। সূচী : শেষ বর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্ত, সুন্দর, ফাল্গুনী।

চিরকুমার সভা। নাটক। ফাল্গুন ১৩৩২ [১৯২৬]। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' [১৯০৮] উপন্যাসের নাট্যরূপ।

শোধবোধ। নাটক। [১৯ জুন ১৯২৬]। 'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ।

নটীর পূজা। নাটক। ১৩৩৩ [১৯২৬]।

রক্তকরবী। নাটক। ১৩৩৩ [১৯২৬]। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৭ [১৯৬০]।

লেখন। বাংলা ও ইংরেজি কবিতা। কার্তিক ১৩৩৪ [১৯২৭]। গ্রন্থে ১৩৩৩ মুদ্রিত হলেও, বস্তুত ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি। অধিকাংশ বাংলা কবিতা কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ-যুক্ত। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, ১৩৬৮ [১৯৬১]।

ঋতুরঙ্গ। গীতিনাট্য। ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ [১৯২৭]।

শেষরক্ষা। প্রহসন। শ্রাবণ ১৩৩৫ [১৯২৮]। 'গোড়ায় গলদ' [১৮৯২] নাটকের অভিনয়যোগ্য সংস্করণ।

যাত্রী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ [১৯২৯]। পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ও জাভা-যাত্রীর পত্র একত্রিত। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ পর্যায়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় :

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি, শ্রাবণ ১৩৬৮ [১৯৬১]।

জাভা-যাত্রীর পত্র, শ্রাবণ ১৩৬৮ [১৯৬১]।

পরিত্রাণ। নাটক। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ [১৯২৯]। 'প্রায়শ্চিত্ত' [১৯০৯] নাটকের পরিবর্তিত রূপ।

যোগাযোগ। উপন্যাস। আষাঢ় ১৩৩৬ [১৯২৯]।

শেষের কবিতা। উপন্যাস। ভাদ্র ১৩৩৬ [১৯২৯]।

তপতী। নাটক। ভাদ্র ১৩৩৬ [১৯২৯]। রাজা ও রানীর [১৮৮৯] আখ্যানভাগ অবলম্বনে রচিত গদ্যনাট্য।

মহুয়া। কবিতা। আশ্বিন ১৩৩৬ [১৯৩০]।

ভানুসিংহের পত্রাবলী। চৈত্র ১৩৩৬ [১৯৩০]। 'রানুর প্রতি ভানুদাদার আশীর্বাদ'। অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীর কন্যা রানু অধিকারীকে লিখিত পত্রাবলি।

নবীন। গীতিনাট্য। ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭ [১৯৩১]। পরে 'বনবাণী'র [১৯৩১] অন্তর্গত।

রাশিয়ার চিঠি। বৈশাখ ১৩৩৮ [১৯৩১]। 'কল্যাণীয় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ করকে'।

বনবাণী। কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৮ [১৯৩১]।

শাপমোচন। কথিকা ও গান। ১৫ পৌষ ১৩৩৮ [১৯৩১]।

গীতবিতান। ১-২ খণ্ড। গান। আশ্বিন ১৩৩৮ [১৯৩১]। তৃতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩৩৯]। কবি কর্তৃক বিষয়ানুক্রমে-সজ্জিত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, দুই খণ্ডে প্রচারিত, মাঘ ১৩৪৮ [১৯৪২]।

নতুন সংস্করণ, তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ—প্রথম খণ্ড পৌষ ১৩৫২, দ্বিতীয় খণ্ড আশ্বিন ১৩৫৪, তৃতীয় খণ্ড আশ্বিন ১৩৫৭। এই সংস্করণের ১-২ খণ্ড আশ্বিন ১৩৫৭। এই সংস্করণের ১-২ খণ্ড বস্তুত পূর্ববর্তী সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। ১-২ খণ্ডে নানা কারণে সংকলিত হয়নি যেসব গান, ১৩৫৭ [১৯৫০] আশ্বিনে মুদ্রিত তৃতীয় খণ্ডে সেগুলি সংকলিত হয়েছে, তাছাড়া সমুদয় গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য অচ্ছিন্ন আকারে সন্নিবিষ্ট।

সঞ্চয়িতা। কবিতা সংগ্রহ। পৌষ ১৩৩৮ [১৯৩১]। কবি-কর্তৃক সংকলিত ও কবির সপ্ততিবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত। পরবর্তী দুইটি সংস্করণে কবি-কর্তৃক বহু পূর্বসংকলন সংস্কৃত বা বর্জিত ও বহুতর নতুন কবিতা সংযোজিত হয়েছিল। আরও পরবর্তীকালের কাব্য থেকে কবিতা চয়ন করে প্রচলিত সংস্করণে (১৩৪৮, ২২ শ্রাবণের পর) সংযোজনরূপে দেওয়া হয়।

পরিশেষ। কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৯ [১৯৩২]। 'শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন করকমলে'।

কালের যাত্রা। নাট্য-সংলাপ। ৩১ ভাদ্র ১৩৩৯ [১৯৩২]। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে 'কবির সস্নেহ উপহার'। এর অন্তর্গত রথের রশি, কবির দীক্ষা।

পুনশ্চ। গদ্যকাব্য। আশ্বিন ১৩৩৯ [১৯৩২] উৎসর্গ : 'নীতু' [দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

Mahatmaji and the Depressed Humanity। ভাষণ। ডিসেম্বর ১৯৩২। 'To Acharyya Praphulla Chandra Ray'। এতে তিনটি বাংলা ভাষণও মুদ্রিত আছে—৪ঠা আশ্বিন, মহাত্মাজির শেষ ব্রত, পুণা ভ্রমণ। এগুলি পরে 'মহাত্মা গান্ধী' (১৯৪৮) গ্রন্থে সংকলিত।

দুই বোন। ফাল্গুন ১৩৩৯ [১৯৩৩]। 'শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু করকমলে'।

মানুষের ধর্ম। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত 'কমলা লেকচার্স'।

বিচিত্রিতা। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪০ [১৯৩৪]। 'পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ'।

চণ্ডালিকা। নাটিকা। ভাদ্র ১৩৪০ [১৯৩৩]।

তাসের দেশ। নাটিকা। ভাদ্র ১৩৪০ [১৯৩৩]। দ্বিতীয় সংস্করণ মাঘ ১৩৪৫, 'কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্রকে' উৎসর্গিত। 'একটা আষাঢ়ে গল্প' [প্রথম প্রকাশ ১৮৯২] রূপক গল্পের নাট্যরূপ।

বাঁশরি। নাটক। অগ্রহায়ণ ১৩৪০ [১৯৩৩]।

ভারতপথিক রামমোহন রায়। প্রবন্ধ। ১৪ পৌষ ১৩৪০ [১৯৩৩]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার অন্তর্গত পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১১ মাঘ ১৩৬৬ [১৯৬০]।

মালঞ্চ। উপন্যাস। চৈত্র ১৩৪০ [১৯৩৪]।

শ্রাবণ-গাথা। গীতিনাট্য। শ্রাবণ ১৩৪১ [১৯৩৪]।

চার অধ্যায়। উপন্যাস। অগ্রহায়ণ ১৩৪১ [১৯৩৪]।

শান্তিনিকেতন। ভাষণ। প্রথম খণ্ড। মাঘ ১৩৪১ [১৯৩৫] দ্বিতীয় খণ্ড। বৈশাখ ১৩৪২ [১৯৩৫]। কবি-কর্তৃক। মার্জিত পরিবর্জিত ও নতুন সংযোজন-যুক্ত।

শেষ সপ্তক। গদ্যকাব্য। ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ [১৯৩৫]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি পরিবর্ধিত সংস্করণে [১৯৬১] দশটি নতুন কবিতা সংযোজিত।

সুর ও সংগতি। [১ আগস্ট ১৯৩৫] 'অতুলপ্রসাদের স্মরণে'। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পত্রালাপ। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত পত্রও এতে আছে।

বীথিকা। কাব্য। ভাদ্র ১৩৪২ [১৯৩৫]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি পরিবর্ধিত সংস্করণে [১৯৬১] দশটি নতুন কবিতা সংযোজিত।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। ফাল্গুন ১৩৪২ [১৯৩৬]। চিত্রাঙ্গদা [১৮৯২] নাট্যকাব্যের নৃত্যাভিনেয় নতুন রূপ।

পত্রপুট। গদ্যকাব্য। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৩ [১৯৩৬]। 'কল্যাণীয় শ্রীমান কৃষ্ণ কৃপালনি ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী নন্দিতার শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে আশীর্বাদ'।

ছন্দ। প্রবন্ধ। আষাঢ় ১৩৪৩ [১৯৩৬]। 'কল্যাণীয় শ্রীমান দিলীপকুমার রায়কে'। পরিবর্ধিত সংস্করণ, কার্তিক ১৩৬৯ [১৯৬২]।

জাপানে-পারস্যে। ভ্রমণকথা। শ্রাবণ ১৩৪৩ [১৯৩৬]। 'শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু'। পূর্বতন জাপানযাত্রী [১৯১৯] ও নতুন পারস্যভ্রমণ একত্র গ্রথিত। স্বতন্ত্র আকারে পুনঃপ্রকাশ—পরিবর্ধিত তথ্যসমৃদ্ধ রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, জাপান-যাত্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ [১৯৬২] ; পারস্য-যাত্রী, ২৫ বৈশাখ ১৩৭০ [১৯৬৩]।

শ্যামলী। গদ্যকাব্য। ভাদ্র ১৩৪৩ [১৯৩৬]। উৎসর্গ : 'কল্যাণীয়া শ্রীমতী রানী মহলানবীশ'।

সাহিত্যের পথে। প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৪৩ [১৯৩৬]। 'কল্যাণীয় শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে', পরিবর্ধিত সংস্করণ, চৈত্র ১৩৬৫। সংযোজন অংশে দশটি নতুন রচনা সংকলিত।

পাশ্চাত্য ভ্রমণ। পত্র ও ডায়ারি। আশ্বিন ১৩৪৩ [১৯৩৬]। পরিবর্তিত য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র [১৮৮১] ও দ্বিতীয় খণ্ড য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি [১৮৯৩] একত্র সংকলিত।

প্রাক্তনী। অভিভাষণ-সংগ্রহ। পৌষ ১৩৪৩ [১৯৩৬]। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের বিভিন্ন সভায় কথিত। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, ৭ পৌষ ১৩৬৬ [১৯৫৯]।

খাপছাড়া। ছড়া। মাঘ ১৩৪৩ [১৯৩৭]। 'শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু বন্ধুবরেষু'। কবি-কর্তৃক অঙ্কিত বহু চিত্র ও রেখাচিত্র-সহ।

কালান্তর। প্রবন্ধ। বৈশাখ ১৩৪৪ [১৯৩৭]। সংস্করণ, পৌষ ১৩৫৫ [১৯৪৮]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণে [১৯৬১] সাতটি নতুন প্রবন্ধ সংযোজিত।

সে। গল্প। বৈশাখ ১৩৪৪ [১৯৩৭]। 'সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য করতলযুগলেষু'। কবি-কর্তৃক অঙ্কিত বহু চিত্র ও রেখাচিত্র-সহ।

ছড়ার ছবি। কাব্য। আশ্বিন ১৩৪৪ [১৯৩৭]। 'বৌমাকে' [প্রতিমা দেবী]। নন্দলাল বসু-কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র-সহ।

বিশ্ব-পরিচয়। বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৪৪ [১৯৩৭]। 'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রীতিভাজনেষু'।

প্রান্তিক। কাব্য। পৌষ ১৩৪৪[১৯৩৮]।

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য। ফাল্গুন ১৩৪৪ [১৯৩৮]। চণ্ডালিকা [১৯৩৩]। নাটকের নৃত্যোপযোগী রূপান্তর।

পথে ও পথের প্রান্তে। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ [১৯৩৮]। রানী মহলানবীশকে লিখিত পত্রাবলী।

পত্রধারা। ১-৩ খণ্ড। ১৩৪৫ [১৯৩৮]। ছিন্নপত্র, ভানুসিংহের পত্রাবলী ও পথে ও পথের প্রান্তে একত্র 'পত্রধারা' নামে প্রকাশিত হয়।

সেঁজুতি। কাব্য। ভাদ্র ১৩৪৫ [১৯৩৮]। 'ডাক্তার স্যার্ নীলরতন সরকার বন্ধুবরেষু'।

বাংলাভাষা-পরিচয়। প্রবন্ধ। ১৯৩৮। 'ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করকমলে'।

প্রহাসিনী। কাব্য। পৌষ ১৩৪৫ [১৯৩৯]।

আকাশ-প্রদীপ। কাব্য। বৈশাখ ১৩৪৬ [১৯৩৯]। 'শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু'।

শ্যামা। নৃত্যনাট্য। স্বরলিপি-সহ। ভাদ্র ১৩৪৬ [১৩৩৯]। পরিশোধ [১৮৯৯] কবিতা অবলম্বনে প্রথমে পরিশোধ নৃত্যনাট্য [১৯৩৬] হয়, তারই সুসমৃদ্ধ রূপান্তর।

পথের সঞ্চয়। লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা ১। ভাদ্র ১৩৪৬ [১৯৩৯]। ১৯১২-১৩ খ্রিস্টাব্দে য়ুরোপ ও আমেরিকা থেকে লিখিত পত্রাবলী। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, মাঘ ১৩৬৮ [১৯৬২]।

নবজাতক। কাব্য। বৈশাখ ১৩৪৭ [১৯৪০]।

সানাই। কাব্য। আষাঢ় [শ্রাবণ] ১৩৪৭ [১৯৪০]।

ছেলেবেলা। বাল্যস্মৃতি। ভাদ্র ১৩৪৭ [১৯৪০]।

চিত্রলিপি ১। সেপ্টেম্বর ১৯৪০। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের সংগ্রহ। চিত্র-বিষয়ক কবিতা ও তার ইংরেজি অনুবাদ-সহ।

তিনসঙ্গী। গল্প। পৌষ ১৩৪৭[১৯৪০]।

রোগশয্যায়। কাব্য। পৌষ ১৩৪৭ [১৯৪০]।

আরোগ্য। কাব্য। ফাল্গুন ১৩৪৭ [১৯৪১]। উৎসর্গ : 'কল্যাণীয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর'।

জন্মদিনে। কাব্য। ১ বৈশাখ ১৩৪৮ [১৯৪১]।

সভ্যতার সংকট। অভিভাষণ। ১ বৈশাখ ১৩৪৮ [১৯৪১]। শান্তিনিকেতনে অশীতিবর্ষপূর্তি-উৎসবের ভাষণ।

গল্পসল্প। খোশ-গল্প ও কবিতা। বৈশাখ ১৩৪৮ [১৯৪১]। 'নন্দিতাকে'।

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। প্রবন্ধ। আষাঢ় ১৩৪৮ [১৯৪১]।

কবির জীবনাবসানের পরে প্রকাশিত

স্মৃতি। শ্রাবণ ১৩৪৮ [১৯৪১]। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র।

ছড়া। কাব্য। ভাদ্র ১৩৪৮ [১৯৪১]।

শেষ লেখা। কাব্য। ভাদ্র ১৩৪৮ [১৯৪১]।

চিঠিপত্র ১। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯ [১৯৪২]। মৃণালিনী দেবীকে লিখিত পত্র। পরিবর্ধিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০০ [১৯৯৩]।

চিঠিপত্র ২। আষাঢ় ১৩৪৯ [১৯৪২]। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র।

চিঠিপত্র ৩। অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ [১৯৪২]। প্রতিমা দেবীকে লিখিত পত্র।

আত্মপরিচয়। প্রবন্ধ। ১ বৈশাখ ১৩৫০ [১৯৪৩]।

সাহিত্যের স্বরূপ। প্রবন্ধ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ, বৈশাখ ১৩৫০ [১৯৪৩]।

চিঠিপত্র ৪। পৌষ ১৩৫০ [১৯৪৩]। মাধুরীলতা, মীরা, নীতু, নন্দিতা ও নন্দিনীকে লিখিত পত্র।

স্ফুলিঙ্গ। কবিতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৫২ [১৯৪৫]। পূর্বপ্রকাশিত [১৯২৭] 'লেখন'-এর সগোত্র, তবে ইংরেজি রচনা বর্জিত। পরিবর্ধিত রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, চৈত্র ১৩৬৭ [১৯৬১]। এতে ৬২টি নতুন কবিতা সংযোজিত হয়েছে। পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৭।

চিঠিপত্র ৫। পৌষ ১৩৫২ [১৯৪৫]। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র।

সঞ্চয়ন। কবিতা-সংকলন। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৪ [১৯৪৭]।

মহাত্মা গান্ধি। প্রবন্ধ ও অভিভাষণ। ২৯ মাঘ ১৩৫৪ [১৯৪৮]।

মুক্তির উপায়। নাটক। শ্রাবণ ১৩৫৫ [১৯৪৮]। 'মুক্তির উপায়' [১৮৯২] গল্পের নাট্যরূপ।

গীতবিতান। তৃতীয় খণ্ড। গান। আশ্বিন ১৩৫৭ [১৯৫০]। এই খণ্ডে বহু অপ্রচলিত ও অপ্রকাশিত গান সংকলিত হয়েছে।

বিশ্বভারতী। প্রবন্ধ। ৭ পৌষ ১৩৫৮ [১৯৫১]।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। প্রতিষ্ঠা-দিবসের উপদেশ ও প্রথম কার্যপ্রণালী। ৭ পৌষ ১৩৫৮ [১৯৫১]।

বৈকালী। গান ও কবিতা। ৭ পৌষ ১৩৫৮ [১৯৫১]। ১৩৩৩ সালে মুদ্রিত, কিন্তু তখন প্রচারিত হয়নি। কবির হস্তাক্ষরের প্রতিচিত্ররূপে মুদ্রিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সংস্করণ, ৩২ আষাঢ় ১৩৮১ [১৯৭৪]।

চিত্রলিপি ২। ৭ পৌষ [১৯৫১]। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের সংগ্রহ।

সমবায়নীতি। প্রবন্ধ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালার শততম গ্রন্থ। ১৩৬০ [১৯৫৪]।

চিত্রবিচিত্র। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৬১ [১৯৫৪]। শিশুরঞ্জন বহু অপ্রকাশিত ও কয়েকটি পূর্বপ্রকাশিত কবিতার সংকলন।

ইতিহাস। প্রবন্ধ। ২২ শ্রাবণ ১৩৬২ [১৯৫৫]। এই গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধ পূর্বে কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি।

বুদ্ধদেব। কবিতা ও প্রবন্ধ। বুদ্ধপূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ [১৯৫৬]। বুদ্ধদেব-সম্বন্ধীয় বিবিধ রচনার সংকলন। কতকগুলি রচনা পূর্বে কোনো গ্রন্থ-ভুক্ত হয়নি।

চিঠিপত্র ৬। শক বৈশাখ ১৮৭৯ [১৯৫৭]। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত পত্র। প্রাসঙ্গিক অন্যান্য রবীন্দ্ররচনা-সহ। পৌষ ১৩৬৬ [১৯৫৯]। খৃষ্ট। প্রবন্ধ, ভাষণ, কবিতা ও গান। সংকলক পুলিনবিহারী সেন।

চিঠিপত্র ৭। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭ [১৯৬০]। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত পত্র।

ছিন্নপত্রাবলী। আশ্বিন ১৩৬৭ [১৯৬০]। ছিন্নপত্র [১৯১২] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত 'ছিন্ন' পত্রগুলি পূর্ণতর আকারে সংকলিত এবং তাঁকে লিখিত আরও ১০৭খানি 'নূতন' চিঠি সংকলন-পূর্বক রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত।

বিচিত্রা। রচনা-সংগ্রহ। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ [১৯৬১]। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সুলভ মূল্যে প্রচারিত।

ব্যক্তিত্ব। প্রবন্ধ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ [১৯৬১]। ইংরেজি *Personality* গ্রন্থের অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে নির্দিষ্ট-সংখ্যক মুদ্রিত।

পল্লীপ্রকৃতি। প্রবন্ধ, ভাষণ ও পত্র। ২৩ মাঘ ১৩৬৮ [১৯৬২]। বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়-সংবলিত।

বীরপুরুষ। কবিতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৯ [১৯৬২]। 'শিশু গ্রন্থের (১৯০৯) অন্তর্গত বীরপুরুষ কবিতার সচিত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ'।

গল্পগুচ্ছ। চতুর্থ খণ্ড। আশ্বিন ১৩৬৯ [১৯৬২]। ১২৯১-এর পূর্বে এবং ১৩৪০-এর পরে রচিত গল্পের এবং করুণা ও মুকুট-এর সংকলন। বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়-সংবলিত।

স্বদেশী সমাজ। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩৬৯ [১৯৬২]।

লক্ষ্মীর পরীক্ষা। কাব্যনাট্য। পৌষ ১৩৬৯ [১৯৬২]। 'কাহিনী'র (ফাল্গুন ১৩০৬) অন্তর্গত কাব্যনাট্যের স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ।

দীপিকা। বিবিধ রচনার সংগ্রহ। ২৫ বৈশাখ ১৩৭০ [১৯৬৩]।

চিঠিপত্র ৮। ২৫ বৈশাখ ১৩৭০ [১৯৬৩]। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্রাবলী।

চিঠিপত্র ৯। ২৫ বৈশাখ ১৩৭১ [১৯৬৪]। হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর পুত্র কন্যা জামাতা ভ্রাতা ও দৌহিত্রকে লিখিত পত্রাবলী।

নদী। কবিতা। বৈশাখ ১৩৭১ [১৯৬৪]। 'শিশু' গ্রন্থের (১৯০৯) অন্তর্গত নদী কবিতার সচিত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী-কর্তৃক চিত্রালংকৃত।

রূপান্তর। কবিতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৭২ [১৯৬৫]। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে মূল-সহ অনূদিত বা রূপান্তরিত কবিতাবলী।

সংগীতচিন্তা। প্রবন্ধ ও পত্র। বৈশাখ ১৩৭৩ [১৯৬৬]। সংগীত সম্বন্ধীয় বিভিন্ন রচনা, রচনাংশ, পত্র, সাক্ষাৎকার ও বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয়-সংবলিত।

রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী। পত্র। ২৫ বৈশাখ। ১৩৭৪ [১৯৬৭]। Letters to a Friend গ্রন্থের মলিনা রায়-কৃত বঙ্গানুবাদ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। প্রবন্ধ ও পত্র। ৭ পৌষ ১৩৭৫ [১৯৬৮]। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষপূর্তি-স্মারক গ্রন্থ।

কবির ভণিতা। প্রবন্ধ। বৈশাখ ১৩৭৫ [১৯৬৮]। রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের বিষয়ে মন্তব্য ও ভূমিকা।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। কবিতা। আশ্বিন ১৩৭৬ [১৯৬৯]। পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত।

অরবিন্দ ঘোষ। কবিতা ও প্রবন্ধ। ১৫ আগস্ট ১৯৭২। অরবিন্দ ঘোষের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত।

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা। কাব্যনাট্য। ফাল্গুন ১৩৮০ [১৯৭৪]। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে 'বিচিত্রা' পত্রের আষাঢ় ১৩৩৪ সংখ্যায় মুদ্রিত চিত্রভূষিত পাঠের পুনর্মুদ্রণ।

চিঠিপত্র ১১। আষাঢ় ১৩৮১ [১৯৭৪]। অমিয় চক্রবর্তী ও তাঁর মাতা অনিন্দিতা দেবীকে লিখিত পত্র। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধ-সহ।

প্রকৃতির প্রতিশোধ। বৈশাখ ১৩৮৪ [১৯৭৭]। পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ। পাঠসংকলন ও সম্পাদনা : কানাই সামন্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র। প্রবন্ধ ও কবিতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৮৪ [১৯৭৭]।

রাখী। কবিতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৮৫ [১৯৭৮]। কানাই সামন্ত-কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত।

মালঞ্চ। নাটক। আষাঢ় ১৩৮৬ [১৯৭৯]। মালঞ্চ [১৯৩৪] উপন্যাসের কবি-কৃত নাট্যরূপ।

ভগ্নহৃদয়। গীতিকাব্য/নাট্যকাব্য। মাঘ ১৩৮৮ [১৯৮২]। পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনা। পাঠসংকলন ও সম্পাদন : কানাই সামন্ত।

চিত্রাঙ্গদা। কাব্য। চৈত্র ১৩৯১ [১৯৮৫]। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত গ্রন্থ। পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ। অশ্রুকুমার সিকদার-কর্তৃক গ্রন্থপরিচয় ও চিত্রাঙ্গদার ইংরেজি ভাষান্তর -*Chitra*-রচনাকালীন পরিবর্তনের তালিকা-সংবলিত।

কৈশোরক। রচনা-সংকলন। বৈশাখ ১৩৯৩ [১৯৮৬]। লীলা মজুমদার কর্তৃক সংকলিত। ১২৫তম রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত।

রাজা ও রানী। নাটক। বৈশাখ ১৩৯৩ [১৯৮৬]। পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত।

চিঠিপত্র ১২। ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩ [১৯৮৬]। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ও রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রাবলী।

সূর্যাবর্ত। কবিতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৯৫ [১৯৮৯]। শঙ্খ ঘোষ-কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত।

মন্ত্র-কবিতা-গান। গান ও স্বরলিপি। ২৫ বৈশাখ ১৩৯৭ [১৯৯০]। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সুরারোপিত।

চিঠিপত্র ১৩। পত্র। ফাল্গুন ১৩৯৮ [১৯৯২]। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, করুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্নিকা দেবী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত। নিরঞ্জন সরকার ও অনাথনাথ দাস-সংকলিত ও সম্পাদিত।

হে চিরনূতন। কবিতা, গান, প্রবন্ধ। ২৫ বৈশাখ ১৪০০ [১৯৯৬]।

প্রবাহিণী। গান। নতুন সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০২ [১৯৯৫]। কানাই সামন্ত সম্পাদিত।

চিঠিপত্র ১০। পত্র। নতুন সংস্করণ, আষাঢ় ১৪০২ [১৯৯৫]। দীনেশচন্দ্র সেন ও অরুণচন্দ্র সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত উভয়ের পত্রাবলী। ২৫ বৈশাখ ১৩৭৪-এ প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের পর রবীন্দ্রবীক্ষা ১৭ থেকে সংকলিত আরও ২৬টি পত্র সংযোজিত।

চিঠিপত্র ১৫। পত্র। শ্রাবণ ১৪০২ [১৯৯৫]। যদুনাথ সরকার ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত উভয়ের পত্রাবলী। ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত।

চিঠিপত্র ১৬। পত্র। ৭ পৌষ ১৪০২ [১৯৯৫]। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত উল্লিখিত কবিগণের পত্রাবলী। শ্রীমতী সুতপা ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

যোগাযোগ নাটক। পৌষ ১৪০২ [১৯৯৫]। জগদিন্দ্র ভৌমিক সংকলিত ও সম্পাদিত।

ছবি ও গান। পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ, ১৯৯৫। পাঠান্তরপঞ্জি ও গ্রন্থপরিচয় সহ। শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর রবীন্দ্রজীবনকথা গ্রন্থে প্রকাশিত জগদিন্দ্র ভৌমিক কৃত রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি এবং রবীন্দ্রজীবনী (১-৪) সর্বশেষ সংস্করণে মুদ্রিত তালিকা অনুযায়ী।

সহযোগিতায় ডঃ শিবানী রায় ও বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ENGLISH WORKS

GITANJALI (Song Offerings), London : The India Society. 1912, *Poems.*
Prose translations by the author of a selection of poems from *Gitanjali, Naivedya, Kheya, Gitimalya,* etc.

GLIMPSES OF BENGAL LIFE. Madras : G. A. Natesan. 1913. *Short Stories.*
CONTENTS : The Fruit-seller (*Kabuliwala*); The School Closes (*Chhuti);* A ResolveAccomplished *(Panraksha);* The Dumb Girl *(Subha);* The Wandering Guest *(Atithi);* The Look Auspicious *(Subhadrishti);* A Study in Anatomy *(Kankal);* The Landing Stairway *(Ghater Katha);* The Sentence *(Sasti);* The Expiation *(Prayaschitta);* The Golden Mirage *(Svarnamriga);* The Trespass *(Anadhikar Prabes);* The Hungry Stones *(Kshudhita Pashan).*
Translated by Rajani Ranjan Sen.
The translator's Introduction is dated June, 1913.

THE GARDENER. LONDON : Macmillan. [October] 1913. *Poems.*
Prose translations by the author of a selection of a selection of poems from *Kshanika, Kalpana, Sonar Tari,* etc.

SADHANA. LONDON : Macmillan. [October] 1913. *Essays* and *Lectures.*
CONTENTS. The Relation of the Individual to the Universe; Soul Consciousness; The Problem of Evil; The Problem of Self; Realisation in Love; Realisation in Action; The Realisation of Beauty; and The Realisation of the Infinite.
"These papers embody ...ideas which have been culled from several of the Bengali discourses ...to my students in my school at Bolpur ...'Realisation in Action' has been translated from my Bengali discourse on *'Karma-Yoga'* by ...Surendranath Tagore." Most of these papers were read by the author before Harvard University.

THE CRESCENT MOON. LONDON : Macmillan. [November] 1913. *Child-Poems.*
Translations by the author of poems mostly from *Sisu.*

CHITRA. LONDON: The India Society. 1913. *Drama.* A translation of *Chitrangada.*

THE KING OF THE DARK CHAMBER. LONDON : Macmillan. 1914. *Drama.*
A translation of *Raja.*
Translated by K. C. Sen.
The translation is erroneously attributed to the author in the title-page.

THE POST OFFICE. Churchtown, Dundrum, County Dublin : The Cuala Press. [July] 1914. *Drama.*
A translation of *Dakghar.*
Translated by Devabrata Mukhopadhyaya.

FRUIT-GATHERING. LONDON : Macmillan. [October] 1916. *Poems.* Translations of a selection of poems from *Gitimalya, Gitali, Balaka,* etc.

Fruit-Gathering was issued together with *Gitanjali* under the title *Gitanjali and Fruit-Gathering* by Macmillan (New York) in September 1918, with illustrations by Nandalal Bose, Surendranath Kar, Abanindranath Tagore and Nabendranath Tagore.

HUNGRY STONES AND OTHER STORIES. LONDON : Macmillan. 1916.

CONTENTS : The Hungry Stones *(Kshudhita Pashan);* The Victory *(Jay-Parajay);* Once there was a King *(Asambhav Katha);* The Home Coming *(Chhuti);* My Lord, the Baby *(khokababur Pratyabartan);* The Kingdom of Cards *(Ekta Ashadhe Galpa);* The Devotee *(Boshtami);* Vision *(Drishtidan);* The Babus of Nayanjore *(Thakurda);* Living or Dead *(Jivita o Mrita);* We Crown Thee King *(Rajtika);* The Renunciation *(Tyag);* The Cabuliwallah *(Kabuliwallah).*

Translated by various writers.

STRAY BIRDS. New York : Macmillan. [November] 1916. *Epigrams.*

MY REMINISCENCES. LONDON : Macmillan. 1917. *Autobiography.* A translation of *Jivansmriti.*

[Translated by Surendranath Tagore]

SACRIFICE AND OTHER PLAYS. LONDON : Macmillian. 1917.

CONTENTS : Sanyasi or The Asectic *(Prakritir Pratisodh);* Malini *(Malini);* Sacrifice *(Visarjan);* The King and The Queen *(Raja o Rani).*

THE CYCLE OF SPRING. LONDON : Macmillan. 1917. *Drama.* A translation of *Phalguni.*

'The greater part of the introductory portion of this drama was translated by Mr. C. F. Andrews and Prof. Nishikanta Sen and revised by the author.'

NATIONALISM. London : Macmillan. 1917. *Eassys.*

CONTENTS : Nationalism in the West; Nationalism in Japan; Nationalism in India.

The series is followed by 'The Sunset of the Century', adapted from some poems of *Naivedya.*

PERSONALITY. London : Macmillian. 1917 *Lectures delivered in America.*

CONTENTS : What is Art; The World of personality; My School; Meditation; Woman.

LOVER'S GIFT AND CROSSING. London : Macmillan. 1918. *Poems* and *Songs.* Translations of a selection of poems and songs from *Balaka, Kshanika, Kheya,* etc.

MASHI AND OTHER STORIES. London : Macmillan. 1918.

CONTENTS : Mashi *(Sesher Ratri);* The Skeleton *(Kankal);* The Auspicious Vision *(Subhadrishti);* The Supreme Night *(Ek Ratri);* Raja and Rani *(Sadar o Andar);* The Trust Property *(Sampatti-Samarpan);* The Riddle Solved *(Samasya-Puran);* The Elder Sister *(Didi);* Subha *(Subha);* The Postmaster *(Postmaster);* The River Stairs *(Ghater Katha);* The Castaway *(Apad);* Saved *(Uddhar);* My Fair-Neighbour *(Pratibesini).*

Translated by various writers.

THE PARROT'S TRAINING. Calcutta : Thacker, Spink & Co. 1918. *Allegorical Satire.*

A translation of 'Tota-Kahini', *Lipika.*

Translated by the author.

A new edition of the book, issued under the title *The Parrot's Training and Other Stories* (Visva-Bharati, October 1944) includes Trial of the Horse ('Ghoda', *Lipika:* trs. Surendranath Tagore), Old Man's Ghost ('Kartar Bhut', *Lipika:* trs. Amiya Chakravarty), and Great News ('Bado Khabar', *Galpasalpa;* trs. Amiya Chakravarty).

THE HOME AND THE WORLD. London : Macmillan. 1919. *Novel.*

A translation of *Ghare Baire.*

Translated by Surendranath Tagore.

THE FUGITIVE. Santiniketan : Santiniketan Press. 1919?. Poems.

Translations of a selection of poems from various books.

This is not identical with *The Fugitive* (1921), and was for private circulation.

GREATER INDIA. Madras : S. Ganesan. 1921. *Essays.*

CONTENTS : Our Swadeshi Samaj *(Swadeshi Samaj);* The Way to get it done *(Saphalatar Sadupay);* The One Nationalist Party *(Sabhapatir Abhibhashan, Pabna Sammilani,* in part); East and West in Greater India *(Purva o Paschim).*

THE WRECK. London : Macmillan. 1921. *Novel.*

A translation of *Naukadubi.*

GLIMPSES OF BENGAL. London : Macmillan. 1921. *Letters.*

Translation of a selection from *Chhinnapatra.*

Translated by SurendranathTagore.

THE FUGITIVE. London : Macmillan. 1921. *Poems* and *Songs.*

Translations of a selection of poems and songs from *Manasi, Sonar Tari, Gitimalya,* etc., and sketches from *Lipika.*

It also includes translations of the following dramas: Kacha and Devayani *(Viday-Abhisap);* and, from *Kahini,* Ama and Vinayaka *(Sati),* The

Mother's Prayer *(Gandharir Avedan),* Somaka and Ritvik *(Narakbas),* Karna and Kunti *(Karna-Kunti-Samvad);* and translations of a selection of Vaishnava and Baul songs, and Hindi songs of Jnanadas.

THOUGHT RELICS. New York : Macmillan. March 1921.

A new and enlarged edition of the book, edited by C. F. Andrews, was published by Macmillan (London) in 1929 under the title *Thoughts from Tagore.*

CREATIVE UNITY. London : Macmillan. 1922. *Essays* and *Lectures.*

CONTENTS: The Poet's Religion; The Creative Ideal; The Religion of the Forest: An Indian Folk Religion; East and West; The Modern Age; The Spirit of Freedom; The Nation; Woman and Home; An Eastern University.

LETTERS FROM ABROAD. MADRAS: S. Ganesan. 1924. *Letters.*

Letters to C. F. Andrews written during May 1920—July 1921.

GORA. London : Macmillan. 1924. *Novel.*

A translation of *Gora.*

Translated by W. W. Pearson.

THE CURSE AT FAREWELL. London : G. Harrap. 1924. *Drama.* A translation of *Viday-Abhisap.*

Translated by Edward Thompson.

The Augustan Book of Modern Poetry : RABINDRANATH TAGORE.

London : Ernest Benn. 1925.

Translations of 21 poems and 12 epigrams.

Translated by Edward Thompson.

TALKS IN CHINA. Calcutta. February 1925. *Addresses.*

CONTENTS : Autobiographical; To My Hosts; To Students; To Teachers; Leave Taking; Civilisation and Progress; Satyam.

RED OLEANDERS. London : Macmillan. 1925. *Drama.* A translation of *Raktakaravi.*

BROKEN TIES AND OTHER STORIES. London : Macmillan. 1925. CONTENTS : Broken Ties *(Chaturanga);* In the Night *(Nisithe);* The Fugitive Gold *(Svarnamriga);* The Editor *(Sampadak);* Giribala *(Manbhanjan);* The Lost Jewels *(Manihara);* Emancipation (from *Parisodh,* a poem).

FIREFLIES. New York: Macmillan. 1928. *Epigrams.* 'Fireflies had their origin in China and Japan where thoughts were very often claimed from me in my handwriting on fans and pieces of silk.'

LETTERS TO A FRIEND. London : Allen & Unwin. 1928.

Letters to C. F. Andrews.

This volume which consists of letters written during the years 1913-1922, is a revised and enlarged edition of *Letters from Abroad* (1924) consisting of letters written during 1920-21.

FIFTEEN POEMS OF RABINDRANATH TAGORE. Bombay : K. C. Sen. [1928].
Translations, in verse, of 15 poems from *Balaka*.
Translated by K. C. S. [Kshitischandra Sen]. For private circulation.

SHEAVES. Allahabad : Indian Press. 1929. *Poems* and *Songs*.
Selected and translated by Nagendranath Gupta.

THE CHILD. London : Allen & Unwin. 1931. *Poem*.
The Bengali version of this poem is 'Sisutirtha', *Punascha*, the English version being earlier.

THE RELIGION OF MAN. London : Allen & Unwin. 1931. *Lectures*. 'The chapters included in this book, which comprises the Hibbert Lectures, delivered in Oxford, at Manchester College, during the month of May 1930, contain also the gleanings of my thoughts on the same subject from the harvest of many lectures and addresses delivered in different countries of the world over a considerable period of my life.'

The Appendices include, among other things, 'Note on the Nature of Reality', being a conversation between Tagore and Einstein on July 14, 1930. and 'An Address in the Chapel of Manchester College, Oxford, on May 25, 1930, by Rabindranath Tagore'.

THE GOLDEN BOAT. London : Allen & Unwin. 1932.
CONTAINS translations principally of pieces from *Lipika*, and of a selection of poems.
Translated by Bhabani Bhattacharya.

MAHATMAJI AND THE DEPRESSED HUMANITY. Calcutta : Visva-Bharati. December 1932. *Address*.
Addresses, statements, etc. on the occasion of Mahatma Gandhi's 'epic fast' in September 1932. The book includes Bengali versions of some of the addresses.

MAN. Waltair : Andhra University. 1937.
Lectures delivered at Andhra University.

MY BOYHOOD DAYS. Santiniketan : Visva-Bharati. [December 1940] *Autobiography*.
A translation of *Chhelebela*.
Translated by Marjorie Sykes.

CRISIS IN CIVILIZATION. Santiniketan : Visva-Bharati. May 1941. *Address*.
A Message on completing his eighty years.

PUBLISHED AFTER THE DEATH OF THE AUTHOR

POEMS. Calcutta : Visva-Bharati. February, 1942.

Translations are by the author, with the exception of the last nine poems, translated by Amiya Chakravarty. The poems cover all major divisions in the poet's writings, 1886-1941.

In the Notes appended to the book, the title (or the first line) of the original Bengali composition and the book in which it first appeared are given. Wherever possible the year of the original composition has been indicated, failing which the year of the publication of the book in which it first appeared.

Edited by Krishna Kripalani in collaboration with Amiya Chakravarty, Nirmalchandra Chattopadhyaya and Pulinbihari Sen.

TWO SISTERS. Calcutta : Visva-Bharati. December, 1945. *Novel.*

A translation of *Dui Bon.*

Translated by Krishna Kripalani.

FAREWELL, MY FRIEND. London : The New India Publishing Company. [1949]. *Novel.*

A translation of *Sesher Kavita.*

Translated by Krishna Kripalani.

A new edition of the book *(Farewell, my Friend and the Garden,* Bombay : Jaico, August 1956) includes a translation, by Krishna Kripalani, of *Malancha.*

THREE PLAYS. Bombay : Oxford University Press. 1950.

Comprises translations of *Mukta-Dhara, Natir Puja* and *Chandalika.*

Translated by Marjorie Sykes.

FOUR CHAPTERS. Calcutta : Visva-Bharati. September 1950. *Novel.*

A translation of *Char Adhyay.*

Translated by Surendranath Tagore.

A TAGORE TESTAMENT. London : Meridian Books. 1953. *Autobiographical Essays.*

Translations of essays included in *Atmaparichay,* together with some poems selected by the translator to introduce the essays.

Translated by Indu Dutt.

A FLIGHT OF SWANS. London : John Murray. 1955. *Poems.*

Translations of poems from *Balaka* and the poem *'Matri-Abhishek'* ('He Mor Chitta'), *Gitanjali.*

Translated by Aurobindo Bose.

SYAMALI. Calcutta : Visva-Bharati. September 1955. *Poems.*

A translation of *Syamali.*

Translations by Sheila Chatterjee, with the exception of 'The Eternal March', translated by the author.

THE HERALD OF SPRING. London : John Murray. 1957.

Translations of poems from *Mahua.*

Translated *by Aurobindo Bose.*

OUR UNIVERSE. London : Meridian Books. 1958. *A Science Primer.*

A translation of *Visva-Parichaya,* with some poems included by the translator to introduce the chapters.

Translated by Indu Dutt.

BINODINI. New Delhi : Sahitya Akademi. March 1959. *Novel.*

A translation of *Chokher Bali.*

Translated by Krishna Kripalani.

THE RUNAWAY AND OTHER STORIES. Calcutta : Visva-Bharati. May 1959.

CONTENTS : The Runaway *(Atithi);* The Hidden Treasure *(Guptadhan);* Cloud and Sun *(Megh o Raudra);* False Hopes *(Durasa);* The Judge *(Vicharak);* Mahamaya *(Mahamaya);* Trespass *(Anadhikar Prabes);* The Conclusion *(Samapti);* The Stolen Treasure *(Chorai Dhan).*

Translated by various writers.

WINGS OF DEATH. London : John Murray. 1960. *Poems.*

Translations of poems from *Prantik, Rogasajyay, Arogya* and *Sesh Lekha.*

Translated by Aurobindo Bose.

POEMS FROM PURAVI. Santiniketan : Uma Roy. 8 May 1960.

Six poems from *Puravi* and one from *Sesh Lekha.*

Translated by Kshitis Roy. For private circulation.

LETTERS FROM RUSSIA. Calcutta : Visva-Bharati. September 1960.

A translation of *Russiar Chithi.*

Translated by Sasadhar Sinha.

An account of Tagore in Russia, based on notes kept by Amiya Chakravarty and other members of the poet's party, is printed in the appendix.

NATIR PUJA (THE COURT DANCER). Calcutta : Writers Workshop. 1961. *Drama.*

A translation of *Natir Puja.*

Translated by Shyamasree Devi. For private circulation.

A VISIT TO JAPAN. New York : East West Institute. May 1961. *Travel.*

A translation of *Japan-Yatri,* published 'in commemoration of Tagore Centenary'.

Translated by Shakuntala Rao Sastri.

DEVOURING LOVE. New York : East West Institute. May 1961. *Drama.*

A translation of *Raja o Rani,* published 'in commemoration of Tagore Centenary'.
Translated by Shakuntala Rao Sastri.

A BUNCH OF POEMS. Calcutta : Writers Workshop [1962].
Translation of five poems from *Syamali.*
Translated by Monika Verma.

MAHATMA GANDHI. Calcutta : Visva-Bharati. January 1963. *Essays* and *Discussion.*

THE CO-OPERATIVE PRINCIPAL. Visva-Bharati. February 1963. *Essay* and *Discussion.*

CHATURANGA. New Delhi : Sahitya Akademi. December 1963.
A translation of *Chaturanga.*
Translated by Asok Mitra.

ANTHOLOGIES AND COLLECTED WORKS

STORIES FROM TAGORE, Calcutta : Macmillan. 1918?
CONTENTS : The Cabuliwallah; The Home-Coming; Once there was a King; The Child's Return (My Lord, the Baby); and The Babus of Nayanjore, from *Hungry Stones and Other Stories.* Subha; The Postmaster; and The Castaway, from *Mashi* and *Other Stories.*
Master Mashai *(Master Masay)* and The Son of Rashmani *(Rasmanir Chhele),* first published in this book.
The selection is intended for use in schools.

POEMS FROM TAGORE. Calcutta : Macmillan. 1922?
An anthology of poems and songs compiled from the following : *Gitanjali; The Gardener; The Crescent Moon; Fruit-Gathering;* songs from *the Cycle of Spring; Stray Birds; Lover's Gift; Crossing;* and *The Fugitive.*
With an introduction by C. F. Andrews.
The selection is intended primarily for use in schools and colleges in India.

LECTURES AND ADDRESSES by Rabindranath Tagore : London; Macmillan. 1928.
Selected from the speeches of the poet by Anthony X. Soares. CONTENTS : My Life, from *Talks in China;* My School, from *Personality;* Civilization and Progress, from *Talks in China;* Construction *versus* Creation, an address delivered at the Gujarati Literary Conference, Ahmedabad, 1920; What is Art?, from *Personality;* Nationalism in India, from *Nationalism;* International Relations, a lecture delivered in Japan (1924);

The Voice of Humanity, an address given at Milan (1925); and The Realization of the Infinite, from *Sadhana.*

THE TAGORE BIRTHDAY BOOK. London : Macmillan. 1928.

Selected from the English Works of Rabindranath Tagore. Edited by C. F. Andrews.

COLLECTED POEMS AND PLAYS OF RABINDRANATH TAGORE. London : Macmillan 1936.

CONTENTS : *Gitanjali, The Crescent Moon, The Gardener, Chitra, Fruit-Gathering, The Post Office, Lover's Gift, Crossing, Stray Birds, The Cycle of Spring, The Fugitive and other Poems; Sacrifice and Other Plays; and Karna and Kunti* from *The Fugitive.*

While some of the books have not been reprinted in full, the 'other poems' added to *The Fugitive* include the following poems not published before in any other book : This Evil Day; Boro-Budur; Fulfilment; The Son of Man; Ruidas, the Sweeper; Freedom; The New Year; Krishnakali; W. W. Pearsen; and Santiniketan Song.

YOUR TAGORE FOR TO-DAY. Bombay : People's Publishing House. September 1945.

Edited by Hirankumar Sanyal.

Selections translated by Hirendranath Mukherjee.

A TAGORE READER. New York : Macmillan. [April] 1961.

An anthology, edited by Amiya Chakravarty, published in observance of the Centennial of Tagore's birthday. The selections appear under the following headings : Travel, Letters, Short stories, Autobiographical Writings, Conversations, Fables, Drama, On India, On Education, Art and Literary Criticism, Philosophical Meditations and Poetry, and include some new translations by the editor, whose introductory prefaces to each section include relevant information concerning the context in which the original material was written, brief discussions of the contents of the section, and facts concerning translations and publications.

TOWARDS UNIVERSAL MAN. Bombay : Asia Publishing House. 7 May 1961.

Essays.

A selection of essays on social, economic, political and educationsl topics to indicate Tagore's contributions in those fields, prepared by the Tagore Commemorative Volume Society, New Delhi, on the occasion of the Centenary of Tagore's birth.

CONTENTS : The Vicissitudes of Education *(Sikshar Herpher);* Society and State *(Swadeshi Samaj);* The Problem of Education *(Siksha-Samasya);* What Then? *(Tatah Kim);* Presidential Address [at Pabna] *(Sabhapatir*

Abhibhashan); East and West *(Purva o Paschim)*; Hindu University *(Hindu Visvavidyalaya)*; On the Eve of Departure *(Yatrar Purvapatra)*; The Master's will be done *(Kartar Ichchhay Karma)*; the Centre of Indian Culture; The Unity of Education *(Sikshar Milan)*; The Call of Truth *(Satyer Ahwan)*; The Striving for Swaraj *(Swaraj Sadhan)*; A Poet's School; City and Village (partly, *Palli-Prakriti)*; Co-operation *(Samavaya* I and *Samavayaniti)*; The Changing Age *(Kalantar)* and Crisis in Civilization *(Sabhyatar Samkat)*.

With an Introduction by Humayun Kabir, and Notes by Kshitis Roy on the essays, indicating the Bengali originals, the dates of their first publication and occasions of some of the addresses.

TAGORE AND MAN. Calcutta : Tagore Centenary Peace Festival All India Committee. November 1961.

An anthology of writings bearing on national freedom and international understanding, humanism and peace.

THE WAYFARING POET. Calcutta : Dunlop. December 1961.

An anthology with the theme of Tagore as a traveller.

BOUNDLESS SKY. Calcutta : Visva-Bharati. May 1964.

An anthology of short stories (8), essays (14), poems (49), a drama and a novel.

FAITH OF A POET. Bombay : Bharatiya Viday Bhavan. August 1964. Some essays and addresses arranged in three tiers, India, The World and Thoughts on education.

Edited by Sisirkumar Ghosh.

THE HOUSEWARMING AND OTHER SELECTED WRITINGS. New York : The new American Library. 1965.

An Anthology of short stories (19), plays (2), fables and prose sketches (6) and narrative poems (5).

Edited by Amiya Chakravarty.

Translated by Mary Lago, Tarun Gupta and the Editor.

TAGORE FOR YOU. Calcutta : Visva-Bharati. May 1966.

An anthology of essays and addresses, parables, letters and poems.

Edited by Sisirkumar Ghosh.

ONE HUNDRED AND ONE. Bombay : Asia Publishing House. 1966. The editor writes in his preface : "It is true that a large number of poems of Tagore have already been translated into English, and many of them by the poet himself, but it is equally true that the poems selected for translation have generally been of one type and not fully representative of Tagore's many splendoured genius.

'The earliest poem in this anthology is contained in a book published in 1881. The last poem was composed in 1941 barely a week before Tagore's death. They cover an expanse of sixty years and as the reader will see for himself how great imaginative sweep and energy and an amazing variety of interests..."

Translations are by : Abu Sayeed Ayyub, Amalendu Bose, Amalendu DasGupta, Amiya Chakravarty, Bhabani Bhattacharya, Buddhadeva Bose, Chidananda DasGupta, Hiren Mukherjee, Humayun Kabir, J. C. Ghosh, Kshitis Roy, Lila Ray, Monika Verma, Samar Sen, Sisir K. Ghosh, Somnath Moitra, Tarak Sen, and V. S. Naravane.

Edited by Humayun Kabir.

MOON, FOR WHAT DO YOU WAIT? New York : Atheneum. 1967. A Selection from Stray Birds.

Edited by Richard Lewis.

JOINT PUBLICATIONS

THE VISVABHARATI. Rabindranath and [C. F.] Andrews. Madras : Natesan. April 1923. *Essays.*

Tagore contributed :

The Visva-Bharati Ideal, pp. 1-26.

EAST AND WEST. Gilbert Murray and Rabindranath Tagore, Paris : International Institute of Intellectual Co-operation, League of Nations. 1935.

Two open letters exchanged between Gilbert Murray and Rabindranath Tagore.

RABINDRANATH TAGORE, Pioneer in Education. London : John Murray. 1961. *Essays and Exchanges* between Rabindranath Tagore and L. K. Elmhirst.

The following writings and discourses of Rabindranath Tagore are included in this book : A Poet's School; The Philosophical Approach to Sriniketan; The Parrot's Training; and The Art of Movement in Education.

Letters from Tagore appear on pp. 17, 23, 27-30, 33-34, 36-38, 43.

Tagore's conversations are reported in Mr.Elmhirst's Preface and his essay 'The Foundation of Sriniketan'.

TRUTH CALLED THEM DIFFERENTLY. Rabindranath and Mahatma Gandhi. Ahmedabad : Navajivan. July 1961.

The following essays, discourses and statements of Rabindranath Tagore are included in this book : Who is Mahatma?; A Liberated Soul; Non-co-operation, a form of 'Himsa'; Rammohun Roy 'not a pigmy'; The Call of Truth; The Cult of the Charkha; The Bihar Earthquake; Mahatma Gandhi; Gandhi the Man; A Last Appeal.

BOOK EDITED BY TAGORE

ONE HUNDRED POEMS OF KABIR. London : The India Society, 1914.

LIMITED AND SPECIAL EDITIONS

Three of Tagore's earliest books published in England or Ireland were issued in a limited edition : *Gitanjali, Chitra* and *the Post Office.* 750 copies each of *Gitanjali* and *Chitra* were printed for the India Society,of which 250 only were for sale. The Cuala Press edition of *The Post Office* consisted of 400 numbered copies.

BOLPUR EDITION : In October 1916, Macmillan (New York) issued a set of 10 volumes in a uniform 'Bolpur Edition', comprising books published by them till then : *Gitanjali, The Gardener, Sadhana, The Crescent Moon, Chitra, The King of the Dark Chamber, The Post Office, Fruit-Gathering, The Hungry Stones* and *Others Stories,* and *Songs of Kabir (One Hundred Poems of Kabir).*

BOOK BASED ON TAGORE STORY

MAHARANI OF ARAKAN. George Calderon. London : Francis Griffiths. 1915.
A Romantic Comedy in One Act.
Founded on Tagore's short story *Dalia.*

Courtesy : An Artist in Life. Niharranjan Ray. 1968.

রবীন্দ্রনাথ : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

বর্ষানুযায়ী রবীন্দ্র-জীবনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা, সমকালীন বিশ্ব ভারত ও বাংলার তথা কলকাতার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের কিছু ইঙ্গিত, সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্মমৃত্যু ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপ্রকাশ এই জীবনপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কোনো বিবরণই তথ্যগতভাবে পূর্ণাঙ্গ নয়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের পৃথক কালানুক্রমিক সূচি অন্যত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

১৮৬১ ৭ মে, বাংলা ১২৬৮ সাল, ১৭৮৩ শকাব্দের ২৫ বৈশাখ, সোমবার, ইংরেজি মতে মঙ্গলবার, মধ্যরাত্রিতে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পৈতৃক ভবনে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫) ও জননী সারদা দেবীর চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) ছিলেন একুশ বৎসর বয়স্ক, দ্বিতীয় সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩) উনিশ বৎসর বয়স্ক, তৃতীয় হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-১৮৮৪) সতেরো বৎসর বয়স্ক, চতুর্থ বীরেন্দ্রনাথ (১৮৪৫-১৯১৫) পনেরো বৎসর বয়স্ক, নতুনদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫) তেরো বৎসর বয়স্ক ও সর্বকনিষ্ঠ অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ (১৮৫৯-১৯২৩) প্রায় দুই বৎসর বয়স্ক। ভগ্নীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা সৌদামিনী (১৮৪৭-১৯২০)-র বয়স তখন চোদ্দ, মধ্যম সুকুমারী (১৮৫০-১৮৬৪)-র বয়স বারো, তৃতীয় শরৎকুমারী (১৮৫৪-১৯২০)-র বয়স সাত, চতুর্থ বর্ণকুমারী (১৮৫৬-১৯৩২)-র বয়স পাঁচ ও সর্বকনিষ্ঠ দিদি স্বর্ণকুমারী (১৮৫৭-১৯৪৮)-র বয়স চার বৎসর।

সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে মহারানী ভিকটোরিয়ার হাতে ন্যস্ত হয়। ভারতের শাসনব্যবস্থায় এখন শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠিত। রেললাইন বসেছে, ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে যোগদানের অনুমতি মিলেছে, কলকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে হাইকোর্ট স্থাপিত হয়েছে, সমদৃষ্টিতে বিচারের জন্য পেনাল কোড চালু হয়েছে।

এই বৎসর জন্মগ্রহণ করেন মতিলাল নেহেরু, মদনমোহন মালব্য, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রমুখ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ-ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তিরা। এঁদের সকলের সঙ্গেই পরবর্তীকালে কবির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদের জন্য এই বছরই লঙ সাহেব দণ্ডিত হন। ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালায় কৃষ্ণকুমারী অভিনীত হয়।

সংগ্রন্থ মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা ও কৃষ্ণকুমারী নাটক।

১৮৬২ ভারতের রাজধানীরূপে কলকাতা মহানগরীর বৈষয়িক সমৃদ্ধি ক্রমশই বর্ধমান। সমগ্র ভারতে একই বিচারব্যবস্থা প্রবর্তিত। নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। শিয়ালদহ থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেলপথ চালু হয় এবং দক্ষিণপূর্ব রেলপথও বিস্তৃত হতে থাকে। মধুসূদন ব্যারিস্টারি পড়তে এবং সত্যেন্দ্রনাথ আইসিএস হতে বিলেত যাত্রা করেন।

বোলপুর-সন্নিহিত রায়পুরের ভুবনমোহন সিংহের আমন্ত্রণে মহর্ষির ভুবননগর গ্রামে আগমন। কলকাতার ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা গ্রন্থরূপে প্রকাশিত। জোড়াসাঁকো ভবনে কেশবচন্দ্র সেনকে দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রদান।

জন্ম সংগীতাচার্য আলাউদ্দীন খাঁ (?)।

গ্রন্থ মধুসূদনের বীরাঙ্গনা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনা রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফ।

১৮৬৩ বোলপুর-রায়পুর সিংহ পরিবারের কাছ থেকে মৌরসিপাট্টায় কুড়ি বিঘা জমির বন্দোবস্ত নিলেন দেবেন্দ্রনাথ। ভুবননগর (তৎকালীন নাম) গ্রামে এইভাবে শান্তিনিকেতন আশ্রমের পূর্বসূচনা।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাইকোর্টে প্রথম ভারতীয় বিচারপতি নিযুক্ত। ওয়াহাবি আন্দোলন কঠোর হাতে দমিত। উমেশচন্দ্র মিত্রের বামাবোধিনী ও হরিনাথ মজুমদারের গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা এই বৎসর থেকে প্রকাশিত।

জন্ম স্বামী বিবেকানন্দ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, মানকুমারী বসু।

গ্রন্থ দীনবন্ধু মিত্রের নবীন তপস্বিনী।

১৮৬৪ ব্রিটিশ রাজশক্তি কর্তৃক ভুটান অধিকার ও উপনিবেশের সীমানা-বৃদ্ধি, ডুয়ার্স ও আসামে ব্রিটিশ অধিকার পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত।

বিদেশে নিদারুণ অর্থকষ্টে পতিত মধুসূদন কর্তৃক পত্রে বিদ্যাসাগরের সাহায্যপ্রার্থনা ও বিদ্যাসাগরের অর্থপ্রেরণ। আইসিএস উত্তীর্ণ হয়ে সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তন ও বোম্বাই প্রদেশে কর্মস্থলে যাত্রা। ভারতীয়দের আইসিএস পরীক্ষায় যোগদানের অধিকার সংকোচনার্থে বয়সসীমার হ্রস্বীকরণ।

জন্ম অবলা বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কামিনী রায়।

গ্রন্থ কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নকশা, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীরবাহু কাব্য।

১৮৬৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের অবসান, ক্রীতদাসপ্রথা রহিত করার জন্য আইনপ্রণয়ন।

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপবৃদ্ধি।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর-কর্তৃক পাথুরিয়াঘাটায় বঙ্গরঙ্গালয় স্থাপন। শোভাবাজারে প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটিতে একেই কি বলে সভ্যতা-র অভিনয়।

শিশু রবীন্দ্রনাথের পাঠশালা-জীবন শুরু হল। পরে কলকাতা ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে ভর্তি।

জন্ম রজনীকান্ত সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থপ্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী।

১৮৬৬ কলকাতা-দিল্লি সরাসরি রেলযোগাযোগ চালু হল। বিহারে নীলবিদ্রোহ দেখা দিল। মেরি কার্পেন্টারের উদ্যোগে বেঙ্গল সোশাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশান স্থাপিত হল। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মতবিরোধের ফলে নেতৃত্ব-সংকট ও ব্রাহ্মসমাজে অপরিহার্য ভাঙন, কেশবচন্দ্র কর্তৃক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব বহাল রইল আদি ব্রাহ্মসমাজে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পক্ষ থেকে ঘোষিত বহুবিবাহ-বিষয়ক নাটকরচনার পারিতোষিক লাভ করলেন নবনাটকের নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। জোড়াসাঁকোয় অভিনীত হল সেই নাটক।

গভর্নর জেনারেল লর্ড লরেন্সের পার্টিতে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী যোগ দেওয়ায় রক্ষণশীল সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনা উঠল।

জন্ম দীনেশচন্দ্র সেন, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, গোখেল গোপালকৃষ্ণ, লোকেন পালিত।

গ্রন্থ মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী, দীনবন্ধু মিত্রের বিয়ে-পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা।

১৮৬৭ অ্যালফ্রেড নোবেল-কর্তৃক ডিনামাইট আবিষ্কার নোবেল-পুরস্কার-প্রবর্তনের সৌভাগ্য সূচনা করল। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরলেন মধুসূদন। রাজা নরসিংহ রায়ের চিৎপুর বাগানবাড়িতে হিন্দুমেলার উদ্‌বোধন হল, তৎকালীন নাম চৈত্রমেলা। উদ্যোক্তা দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র।

জন্ম গগনেন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা (মার্গারেট নোবেল), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপালচন্দ্র রায়।

মৃত্যু রাজা রাধাকান্ত দেব।

গ্রন্থ দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী।

১৮৬৮ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত আইনে শিক্ষাকে সরকারি দায়িত্ব বলে স্বীকার করা হল। কলকাতা-বোম্বাই সরাসরি রেলযোগাযোগ চালু হল।

কেশবচন্দ্র-কর্তৃক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দির স্থাপিত হল। কাদম্বরী দেবীর জ্যোতিরিন্দ্রপত্নী রূপে ছয় বছর বয়সে ঠাকুরবাড়ি প্রবেশ। জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর বিবাহ। এই দ্বিতীয় বছর থেকে হিন্দুমেলা স্থানান্তরিত হল বেলগাছিয়ায় আশুতোষ দেবের বাগানবাড়িতে, কার্যারম্ভ হল সত্যেন্দ্রনাথ রচিত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' এই জাতীয়সংগীতের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও নর্মাল স্কুলে পর্যায়ক্রমে ভর্তি হয়েছেন। গৃহশিক্ষক নীলকমল ঘোষাল ও রাখালদাস দত্ত।

জন্ম প্রমথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মৃত্যু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

গ্রন্থ শিবনাথ শাস্ত্রীর নির্বাসিতের বিলাপ। মতিলাল ঘোষের সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকা।

১৮৬৯ ভারত ও ইউরোপের জলপথের দূরত্ব তিন হাজার মাইল কমিয়ে দিয়ে সুয়েজখালে যানচলাচল শুরু হল।

শিয়ালদহে রেলস্টেশন নির্মিত হল। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বরলিপির সাংকেতিক চিহ্ন উদ্‌ভাবনে রত। গিরীন্দ্রকন্যা কাদম্বিনীর পুত্র জ্যোতিঃপ্রকাশের উৎসাহে বালক রবির পয়ার ছন্দে প্রথম কবিতা লেখার চেষ্টা। বর্তমান গৃহশিক্ষক নীলকমল ঘোষাল ও অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। জিমনাস্টিক শিক্ষক শ্যামাচরণ ঘোষ।

জন্ম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র সমাজদার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, দীনেন্দ্রকুমার রায়।

মৃত্যু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী, বিদ্যাসাগরের ভ্রান্তিবিলাস। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবলাবান্ধব পত্রিকা।

১৮৭০ ভারত ও ইংলন্ডের মধ্যে টেলিগ্রাফ যোগাযোগ স্থাপিত হল। কলকাতায় কলের জল চালু হল। বিদ্যাসাগর বিধবার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিলেন। কেশবচন্দ্র সেন ভারতসংস্কার সভা ও স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। ধর্মপ্রচারের জন্য কেশবচন্দ্র ইংলন্ডযাত্রা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলের ছাত্র। ঘরেও নানাবিদ্যার আয়োজন এবং গৃহশিক্ষক বাড়ছে। শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে পদার্থবিদ্যা, জিমনাস্টিক, শরীরবিজ্ঞান, অঙ্ক, জ্যামিতি, ভূগোল, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চিত্রাঙ্কন, সংগীত, কুস্তি সবই আছে।

জন্ম বলেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রাধানাথ শিকদার, মোহিতচন্দ্র সেন, যদুনাথ সরকার।

মৃত্যু কালীপ্রসন্ন সিংহ।

গ্রন্থ বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী ও নিসর্গসন্দর্শন। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিত মেময়েরস অফ দ্বারকানাথ টেগোর, অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। কেশবচন্দ্রের ইন্ডিয়ান মিরর সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকে রূপান্তরিত হল।

১৮৭১ ফ্রান্সে ক্রমবর্ধমান গৃহযুদ্ধ। জার্মানির রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছেন বিসমার্ক।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত আইসিএস হয়ে দেশে ফিরলেন। কাশীপুর বাগানবাড়িতে হিন্দুমেলার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ অভিভাকদের সঙ্গে এই প্রথম মেলায় অতিথি।

কলকাতার ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপে কিছুদিন রবীন্দ্রনাথ পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে পেনেটির বাগানবাড়ি কাটিয়ে আসেন।

জন্ম অবনীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ সেন, চার্লস ফ্রিয়র এন্ডরুজ, প্রিয়ম্বদা দেবী।

১৮৭২ ব্যালট অ্যাক্ট আইনে ইংলণ্ডে গোপন ভোটদানের প্রথা চালু হল। ভারতে প্রথম লোকগণনার শুরু। মেয়েদের বিবাহের নিম্নসীমা ১৪ বছর ধার্য করার আইন হল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হল। জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হল। সেখানে অভিনীত প্রথম নাটক নীলদর্পণ। নবগোপাল মিত্র খুললেন ন্যাশনাল স্কুল।

বাংলা স্কুল থেকে রবীন্দ্রনাথকে ভর্তি করানো হল ফিরিঙ্গিস্কুল বেঙ্গল একাডেমিতে।

জন্ম সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, অরবিন্দ ঘোষ।

গ্রন্থ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ জলযোগ, দীনবন্ধু মিত্রের জামাইবারিক, অমৃতলাল বসুর হীরকচূর্ণ।

১৮৭৩ ভিয়েনায় বিদ্যুৎ-চালিত কল স্থাপিত।

বাংলা বিহারে দুর্ভিক্ষ। দেশীয় বিচারকদের এজলাসে ইউরোপীয়দের বিচার নিষিদ্ধ করার আইন। ন্যাশনাল থিয়েটারে কপালকুণ্ডলার অভিনয়। বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম মহিলা অভিনেত্রী। কলকাতায় ঘোড়ায়-টানা ট্রাম চালু হল।

রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন। পরে পিতার সঙ্গে ফেব্রুয়ারিতে বোলপুর হয়ে হিমালয়যাত্রা, ডালহাউসি-বক্রোটা ভ্রমণের পর মে মাসে দেবেন্দ্রসঙ্গী কিশোরী চাটুজ্যের সঙ্গে কলকাতা প্রত্যাবর্তন। বক্রোটায় পিতার কাছে সংস্কৃত চর্চা, জ্যোতিষ সম্পর্কিত জ্ঞান-অর্জন, ইংরাজি গ্রন্থ অবলম্বনে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয় প্রবন্ধরচনার চেষ্টা।

জন্ম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী।

মৃত্যু মধুসূদন, দীনবন্ধু।

গ্রন্থ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাধারণী পত্রিকা।

১৮৭৪ নিউইয়র্কে বিদ্যুৎবাহিত ট্রাম।

নারী ও শিশু শ্রমিকদের শ্রমের পরিমাণ দশ ঘণ্টায় বেঁধে দেওয়ার আইন চালু হল। পুনায় অত্যধিক করভারে কৃষকবিদ্রোহ, বিহারে দুর্ভিক্ষ। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে আসামকে পৃথক করা হল। সিভিল সার্ভিস থেকে সুরেন্দ্রনাথকে পদচ্যুত করা হল। বিদ্বজ্জনসমাগম সভার প্রথম অধিবেশন।

বেঙ্গল একাডেমি থেকে কিশোর রবীন্দ্রনাথকে ভর্তি করানো হল বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটান স্কুলে। কিন্তু স্কুলের শিক্ষায় যথারীতি অনীহা। বড়ো দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্তৃক গৃহশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা। অন্যতম গৃহশিক্ষক আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ম্যাকবেথের অনুবাদপ্রয়াস।

ম্যাকবেথ পাঠের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় লিখিত অভিলাষ কবিতা, রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম প্রকাশিত কবিতা, তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের বলে স্বীকৃত ও কবি-কর্তৃক সমর্থিত। প্রকাশকাল নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৪। উক্ত পত্রিকায় পরবর্তী সংখ্যায় নামহীন জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক রচনাও রবীন্দ্রনাথের বলে অনুমিত।

গ্রন্থ আর্যদর্শনে আগস্ট-ডিসেম্বর ১৮৭৪ সংখ্যাগুলিতে বিহারীলালের সারদামঙ্গল প্রকাশ। অক্ষয় চৌধুরীর উদাসিনী কাব্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য প্রকাশিত। শিবপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত শ্রমজীবী শ্রমজীবনের উপর প্রথম ভারতীয় পত্রিকা।

১৮৭৫ প্রিন্স অব ওয়েলসের কলকাতা-আগমন।

পার্শিবাগানে রাজা কমলকৃষ্ণের সভাপতিত্বে হিন্দুমেলার নবম বার্ষিক অধিবেশন।

সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ-সহ রবীন্দ্রনাথ সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র। বালক রবির মাতৃবিয়োগ। নতুন গৃহশিক্ষক রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ কর্তৃক রবিকে বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যাওয়া। উদ্দেশ্য কবিকৃত

ম্যাকবেথ অনুবাদ শোনানো। হিন্দুমেলায় কবির স্বকণ্ঠে কবিতাপাঠ। পিতার সঙ্গে বোটে শিলাইদহযাত্রা।

জন্ম সরলাবালা সরকার।

মৃত্যু সারদা দেবী।

স্বনামে লিখিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা হিন্দুমেলায় পঠিত ও মুদ্রিত আকারে বিতরিত, অমৃতবাজার ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫-এ প্রকাশিত। বান্ধব মাঘ ১২৮১ সংখ্যাতেও প্রকাশিত হয় একটি কবিতা। বান্ধবের কবিতাটির শিরোনাম হোক ভারতের জয়। অমৃতবাজারের কবিতাটির নাম হিন্দুমেলার উপহার।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটকের জন্য জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ গানটি সম্ভবত এই সময়ে রচিত।

গ্রন্থ দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ, বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর।

১৮৭৬ টেলিফোন যন্ত্র উদ্‌ভাবিত হল।

দেশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির উদ্যোগে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন্ স্থাপিত হল। কলকাতায় নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন চালু হল।

সেন্ট জেভিয়ার্সে যাওয়ায় বিরতি ঘটল কিশোর রবির, শিক্ষক যথারীতি রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য ও জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য।

যদুভট্ট সম্ভবত এই সময়েই ঠাকুরবাড়ির সংগীতশিক্ষক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে গুপ্ত সমিতি সঞ্জীবনী সভায় রবীন্দ্রনাথের যোগদান। বোটে পুনরায় শিলাইদহযাত্রা। বিদ্বজ্জনসমাগম সভা দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রকৃতির খেদ কবিতা পঠিত, প্রতিবিম্ব ১২৮২ বৈশাখ সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত।

১৮৭৬ জানুয়ারি ৩১, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সিঁথির বাগানবাড়ি মরকতকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথ কলেজ রিইউনিয়ানের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দর্শন করেন।

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে প্রকাশিত কিশোর রবির অন্যান্য রচনা প্রলাপ কবিতা, বনফুল কাব্যোপন্যাস, ভুবনমোহিনী প্রতিভা অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী-র সমালোচনা। ভানুসিংহের পদাবলীর সূচনা।

জন্ম গগনেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

গ্রন্থ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম, রাসসুন্দরী দাসীর আমার জীবন, স্বর্ণকুমারী দেবীর দীপনির্বাণ, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর, দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী কাব্য।

১৮৭৭ ভিকটোরিয়া ভারতসম্রাজ্ঞী রূপে ঘোষিত। দিল্লি দরবার অনুষ্ঠান। দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ, নাগপুরে শ্রমিক আন্দোলন, চট্টগ্রামে চা-শ্রমিকদের উপর গুলিচালনা। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের দ্বারা দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ।

দেবেন্দ্রনাথের চীনভ্রমণে যাত্রা।

রাজা বদনচাঁদের টালার বাগানবাড়িতে হিন্দুমেলার একাদশ বর্ষের অধিবেশন।

হিন্দুমেলার অধিবেশনে কিশোর রবির দিল্লি দরবার কবিতাপাঠ, নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে পরিচয়, অলীকবাবু অভিনয়ে অংশগ্রহণ।

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে রবীন্দ্রনাথের আরও রচনাপ্রকাশ। ভারতী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৪, জুলাই ১৮৭৭) থেকে রবীন্দ্ররচনার প্রকাশ—যথাক্রমে ধারাবাহিক ভিখারিনী গল্প, মেঘনাদবধ কাব্যসমালোচনা প্রবন্ধ, ধারাবাহিক করুণা উপন্যাস (অকটোবর ১৮৭৭ থেকে) কবিকাহিনী; আর্যদর্শনে (মার্চ-এপ্রিল ১৮৭৭) ফুলবালা—আংশিক প্রকাশ।

জন্ম হরিনাথ দে, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু রমানাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী, রমেশচন্দ্র দত্তের মাধবীকঙ্কণ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের ম্যাটসিনীর জীবনবৃত্তান্ত। শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত অমৃতবাজার পত্রিকা রাতারাতি বাংলা থেকে ইংরেজিতে রূপান্তরিত।

১৮৭৮ গ্রামোফোনের প্রাক্‌রূপ ফোনোগ্রাফ যন্ত্র উদ্‌ভাবন। ইংরেজ-আফগান যুদ্ধ।

কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ-উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন ও সাধারণ ব্রাহ্ম- সমাজের প্রতিষ্ঠা।

বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে কিশোর রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদবাস, শাহিবাগ প্রাসাদে প্রথম জীবনের গীতরচনার সূচনা। ইংরেজি শিক্ষার জন্য ইংরেজি গ্রন্থ থেকে অনুবাদ ও গদ্যপ্রবন্ধ রচনা। মারাঠি পরিবারে আশ্রয়লাভ ও আন্না তড়খড়ের কাছে ইংরেজি শিক্ষাসূত্রে অন্তরঙ্গতা। অকটোবরে লন্ডনে উপনীত, স্কট পরিবারে স্থানলাভ। য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র নামে যাত্রাভিজ্ঞতা ভারতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। কবিকাহিনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

জন্ম যতীন্দ্রমোহন বাগচী

গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল, রমেশচন্দ্রের মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত।

১৮৭৯ এডিসন বিজলি বাতি আবিষ্কার করলেন।

রবীন্দ্রনাথের বিলাতপ্রবাসে পার্লামেন্টে ব্রাইট গ্লাডস্টোন প্রভৃতি রাজনীতিকদের বক্তৃতা শোনার অভিজ্ঞতা ঘটে। তাছাড়া বিলাতি জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয় ঘটে। লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে হেনরি মর্লির সাহিত্য-ক্লাসে যোগদান করেন। লন্ডনে তাঁর অভিভাবক সত্যেন্দ্রবন্ধু তারকনাথ পালিত, তাঁর পুত্র লোকেন রবির কনিষ্ঠ হলেও সহপাঠী। শিক্ষকের কাছে রবীন্দ্রনাথ লাটিনের পাঠ নিচ্ছেন, কিছু ইংরেজি গানও শিখেছেন।

লন্ডন থেকে লেখা পত্রধারা য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র নিয়মিত ভারতীতে প্রকাশিত হচ্ছে। কিছু কবিতারও সন্ধান পাওয়া যায়। ভগ্নহৃদয় কাব্য এখানে থাকাকালেই আরম্ভ হয়। স্কট-পরিবারে থাকার সময় স্কট-দুহিতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে।

জন্ম গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থ বিহারীলালের সারদামঙ্গল, রমেশচন্দ্র দত্তের রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, রজনীকান্ত গুপ্তের সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দ্য বেঙ্গলি পত্রিকা শুরু হল।

১৮৮০ গত বৎসর থেকে সূচিত ব্রিটিশ-আফগান যুদ্ধে ব্রিটিশদের প্রথমে বিপর্যয়, পরে কষ্টার্জিত জয় ঘটল।

পাঠ সম্পূর্ণ রেখে পিতৃনির্দেশে রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশে ফিরতে হল ফেব্রুয়ারিতে। প্রত্যাবর্তন-কালে জাহাজে ভগ্নহৃদয় কাব্যটিকে আরও পরিবর্ধিত করলেন, দেশে ফিরে সেটি সমাপ্ত হল। এপ্রিলে মানময়ী গীতিনাট্যের অভিনয়ে, অংশগ্রহণ করেন, গীতিরচনাও করেন। কবিকাহিনীর পর রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ বনফুল এই বৎসরই প্রকাশিত হয়।

জন্ম ক্ষিতিমোহন সেন রাজশেখর বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

গ্রন্থ দেবেন্দ্রনাথ সেনের ফুলবালা।

১৮৮১ আফ্রিকায় ইংরেজদের সঙ্গে প্রথম বুয়র যুদ্ধ শুরু হল। সেখানকার ওলন্দাজ উপনিবেশবাদীদের হাতে ব্রিটিশদের পরাজয় ঘটল।

ভারতে প্রথম লোকগণনার উদ্যোগ।

কেশবচন্দ্র সেনের ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের পরিবর্তিত নাম নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব মন্দির স্থাপিত হল।

কবির দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার ব্যবস্থা। বিলাতযাত্রার পূর্বদিন বেথুন সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকেল কলেজ হল-এ প্রথম ভাষণ সংগীত ও ভাব (সংগীত পরিবেশন-সহ)।

পরদিন (২০ এপ্রিল) বিলাতের পথে মাদ্রাজ-অভিমুখে যাত্রা ও মাদ্রাজ থেকে যাত্রাবিরতি। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মুসৌরিতে সাক্ষাৎকার।

ইতিপূর্বে ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬ তারিখে বিদ্বজ্জনসমাগম সভায় অধিবেশন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের সদ্যরচিত গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ও হেমেন্দ্রকন্যা প্রতিভা সরস্বতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। সংগীতনির্দেশনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। দেশী-বিদেশী সংগীতের এক নতুন পরীক্ষা। চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগনবাড়িতে কিছুকাল জ্যোতিরিন্দ্রসান্নিধ্যে বাস।

এই বৎসর মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে কবি প্রথম ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। ভারতীতে গদ্যপদ্য উভয়বিধ রচনাই নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বাল্মীকিপ্রতিভাও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে হাত দিয়েছেন।

জন্ম ও সি গাঙ্গুলি, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উইলিয়াম উইনস্টানলি পিয়ার্সন, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।

মৃত্যু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগেশ কাব্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতমহিমা, বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ।

১৮৮২ ফরাসি অধিকার থেকে মিশর ব্রিটিশের অধিকারে এল। গ্যারিবলডির মৃত্যু।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বেঙ্গল একাডেমি অফ মিউজিক স্থাপন করলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্থাপন করলেন সারস্বত সমাজ, রবীন্দ্রনাথ অন্যতম সম্পাদক। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট সরকার প্রত্যাহার করে নিল।

রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহ-উপলক্ষ্যে আয়োজিত সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষাৎকার। রবীন্দ্রনাথের সদ্য-প্রকাশিত কাব্য সন্ধ্যাসংগীতের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে মাল্যার্পণ।

১০ সদর স্ট্রিটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে অবস্থানকালে সকালে প্রভাতসংগীতের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে দার্জিলিং-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।

ডিসেম্বরে কালমৃগয়া গীতিনাট্যরচনা ও অভিনয়, অন্ধমুনির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ।

সন্ধ্যাসংগীত ও কালমৃগয়া প্রকাশিত হল।

জন্ম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিধানচন্দ্র রায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র রায়, কালীমোহন ঘোষ, গুরুসদয় দত্ত, অনুরূপা দেবী।

গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ।

১৮৮৩ দেশীয় বিচারকদের দ্বারা বিদেশীয় নাগরিকদের যে বিচার এতকাল অননুমোদিত ছিল তারই প্রস্তাব নিয়ে ইলবার্ট বিল রচনা।

দ্য বেঙ্গলি পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও প্রবন্ধের জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাদণ্ড হল। স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা। অ্যালবার্ট হল-এ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের উদ্‌বোধন।

যশোহরে নতুন করে নীলবিদ্রোহ দেখা দিল।

রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বাড়ছে। ভারতীর জন্য গদ্যপদ্য রচনা অব্যাহত। মে-জুন দু-মাস কারোয়ারে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে কাটিয়ে এলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে

কলকাতার চৌরঙ্গিতে কিছুদিন বাস। ডিসেম্বরে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ। বধূ মৃণালিনীর বয়স নয় বৎসর।

রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরানীর হাট, প্রভাতসংগীত ও বিবিধ প্রসঙ্গ প্রকাশিত।

জন্ম নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নিরুপমা দেবী, নন্দলাল বসু, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

মৃত্যু প্যারীচাঁদ মিত্র, যদুভট্ট, মহর্ষির জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরানী।

এই বৎসর কার্ল মার্কস-এর জীবনাবসান হয়েছে।

১৮৮৪ সমাজবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বার্নার্ড শ, অ্যানি বেসান্ত, এইচ জি ওয়েলসের উদ্যোগে ইংলন্ডে ফেবিয়ান সোসাইটি স্থাপন। মধ্যআফ্রিকার উপনিবেশবণ্টন নিয়ে পনেরোটি ইউরোপীয় দেশের সলাপরামর্শের জন্য বার্লিন কনফারেন্স বসল।

রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ বিষয়ে বিতর্ক শুরু হল সাময়িক পত্র অবলম্বন করে। স্বর্ণকুমারী-কন্যা হিরণ্ময়ীর বিবাহ-উপলক্ষ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অক্ষয় চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের যৌথরচনা ও অভিনয় 'বিবাহোৎসব'। সাবিত্রী লাইব্রেরিতে অকালকুষ্মাণ্ড প্রবন্ধ পাঠ করলেন ২ মার্চে। জ্যোতিরিন্দ্রপত্নী কাদম্বরী দেবীর শোচনীয় আত্মহত্যা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজ-ব্যবসায় ও সরোজিনী নামক জাহাজের বিপর্যয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধরচনা সরোজিনীপ্রয়াণ। গদ্যনাটক নলিনী ও কড়ি ও কোমলের কবিতারচনার ধারা। প্রকাশিত হল ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, নলিনী, শৈশবসংগীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

জন্ম সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

মৃত্যু কাদম্বরী দেবী (১৯ এপ্রিল ১৮৮৪, ৮ বৈশাখ ১২৯১), কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, হেমেন্দ্রনাথ।

গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হঠাৎ নবাব।

১৮৮৫ জার্মানিতে প্রথম মোটরগাড়ি চালু হল।

মহারাষ্ট্রে তিলক শিবাজি উৎসবের প্রবর্তন করলেন। বোম্বাইতে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেপ্টেম্বর-অকটোবরে রবীন্দ্রনাথ হাজারিবাগ-পালামৌ-ছোটনাগপুর সফর করে বোম্বাই শোলাপুরে সত্যেন্দ্র-সান্নিধ্যে গেলেন। কলকাতা প্রত্যাবর্তন করে আবার মহর্ষিসান্নিধ্যে বোম্বাইযাত্রা।

এই বৎসর রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গদ্যনিবন্ধ রামমোহন রায়, আলোচনা, এবং প্রথম গীতিসংকলন রবিচ্ছায়া। ভারতীতে পুষ্পাঞ্জলি কাদম্বরী প্রয়াণে লিখিত। রাজর্ষি, মুকুট ও অন্যান্য বহু রচনা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। এপ্রিলে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় বালক পত্রিকার প্রকাশ।

জন্ম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

মৃত্যু রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৮৬ ইংরেজ সেনাবাহিনী বর্মা আক্রমণ করে অধিকার করে নিল।

কলকাতায় সরকার-কর্তৃক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হল, আয়ের উপর কর আদায়ের আইন চালু হল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বিলেত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে দেশে ফিরলেন। কিন্তু লোকাচারসম্মত প্রায়শ্চিত্ত করতে অস্বীকার করায় গোঁড়া হিন্দু সমাজে তিরস্কৃত হলেন।

ভেঙে-যাওয়া তিন ব্রাহ্ম সমাজের সম্মিলন বসল, রবীন্দ্রনাথ বেদীতে বসলেন। কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে কবি স্বকণ্ঠে শোনালেন আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। স্টারে মহাসমারোহে বাল্মীকিপ্রতিভা পুনরনুষ্ঠিত হল।

এপ্রিল থেকে বালক বন্ধ হয়ে গেলে যৌথভাবে ভারতী ও বালক (১২৯৩ বৈশাখ) প্রকাশিত হল। জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথের নাসিকে সত্যেন্দ্র-সান্নিধ্যে যাত্রা। বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে কালমৃগয়ার কিছু অংশ যুক্ত করে দ্বিতীয় সংস্করণ নবরূপে বাল্মীকিপ্রতিভা প্রকাশিত হল। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কড়ি ও কোমল প্রকাশিত হল।

জন্ম কবির প্রথম সন্তান মাধুরীলতা (বেলা)। অন্যান্য অজিতকুমার চক্রবর্তী, জগদীশ গুপ্ত।

মৃত্যু রামকৃষ্ণ পরমহংস, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামনারায়ণ তর্করত্ন।

গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র, অক্ষয়কুমার বড়ালের কনকাঞ্জলি।

১৮৮৭ মহারানী ভিকটোরিয়ার শাসনের অর্ধশতক পূর্তি উপলক্ষ্যে জুবিলি উৎসবের সূচনা।

এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল।

হিন্দুবিবাহ নিয়ে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিতর্ক শুরু হল। সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশান হল-এ বাল্যবিবাহ নিয়ে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ পাঠ করলেন রবীন্দ্রনাথ।

মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে অনেকগুলি ব্রহ্মসংগীত রচনা করায় সন্তুষ্ট মহর্ষিদেবের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা পারিতোষিক পেলেন। সেপ্টেম্বরে স্ত্রীকন্যাসহ দার্জিলিংভ্রমণ। মায়ার খেলার গীতিরচনার সূত্রপাত হল। মানসীর কবিতাগুচ্ছের সূত্রপাত। গদ্য ও কবিতা রচনা, গীতিরচনা প্রবলবেগে চলেছে। প্রকাশিত হল রাজর্ষি উপন্যাস, চিঠিপত্র (কাল্পনিক পত্র)।

জন্ম মানবেন্দ্রনাথ রায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সুকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

মৃত্যু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর মডেল ভগিনী, নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক।

১৮৮৮ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত। গান্ধি বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে গেলেন।

শান্তিনিকেতন সম্পর্কে মহর্ষি-কৃত ট্রাস্ট ডিড সরকারিভাবে নথিভুক্ত হল। দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রথম ট্রাস্টি। শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হল (৪ কার্তিক ১২৫১)।

রবীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক কিছুদিন গাজিপুরে বাস করে গেলেন। মানসীর কবিতার ধারা চলেছে। পুত্র. রথীন্দ্রনাথের জন্ম।

এই গাজিপুরেই নিষ্ফল কামনার ইংরেজি অনুবাদ করেন। কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদের সূচনা এখান থেকেই।

এই বৎসর সমালোচনা ও মায়ার খেলা এই দুটি গ্রন্থের প্রকাশ।

জন্ম রথীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্র দেব, নরেশ মিত্র, মোহিতলাল মজুমদার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার রায়।

গ্রন্থ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মিঠেকড়া (কড়ি ও কোমলের ব্যঙ্গানুকৃতি)।

১৮৮৯ লন্ডনে শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল। বিসমার্কের বিরোধিতা সত্ত্বেও জার্মানিতে সমাজবাদের প্রচার অব্যাহত।

ভারতীয়দের উচ্চপদে রাজকার্যে নিয়োগের পক্ষে ভারত সরকারের আপত্তি। এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শোলাপুরে, সেখানেই রাজা ও রানীর সূচনা। মে-র মাঝামাঝি পুনা বাস, সেখানে রমাবাঈ-এর বক্তৃতা শোনার অভিজ্ঞতা। অকটোবরে পার্ক স্ট্রিটে সত্যেন্দ্রনাথের আবাসে রাজা ও রানীর অভিনয়, বিক্রমের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। ৩০ নভেম্বর এমারেলড থিয়েটারে পেশাদার শিল্পীদের দ্বারা রাজা ও রানীর অভিনয়।

নভেম্বরে সপরিবারে শিলাইদহে। রাজা ও রানী এই বৎসরই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

জন্ম কালিদাস রায়, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, শরৎচন্দ্র বসু, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, জওহরলাল নেহ্রু।

মৃত্যু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থ কামিনী রায়-এর আলো ও ছায়া, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোম্বাইচিত্র।

১৮৯০ জার্মানিতে বিসমার্কের পতন ঘটল।

সৈয়দ আমীর আলি হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান বিচারপতি নিযুক্ত। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য। জমিদারি পরিদর্শনের দায়িত্বলাভ করে রবীন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে পূর্ববঙ্গে যেতে হচ্ছে। সাজাদপুরে অবস্থানকালে বিসর্জন নাটক রচিত। জোড়াসাঁকোয় অভিনয়, রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির ভূমিকায়।

এপ্রিলে এমারেলড থিয়েটারে পঠিত মন্ত্রি-অভিষেক প্রবন্ধে ইংরাজের সদ্যগৃহীত নীতি অনুযায়ী দেশীয় ব্যক্তিকে রাজকার্যে নিয়োগে আপত্তির তীব্র সমালোচনা। আগস্টে দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা এবং এক মাস লন্ডনে কাটিয়ে নভেম্বর বোম্বাই প্রত্যাবর্তন। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে মন্ত্রি-অভিষেক পুস্তিকা, বিসর্জন নাটক ও মানসী কাব্যগ্রন্থ।

জন্ম হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এস ওয়াজেদ আলি, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিতকুমার হালদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে।

মৃত্যু লালন ফকির, শিবচন্দ্র দেব।

গ্রন্থ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-এর গ্যারিবলডির জীবনবৃত্তান্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্যামি এবং সাহেবিয়ানা। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করল।

১৮৯১ ইংলন্ডে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হল। অল্প বয়সী বালকের শ্রমদান নিষিদ্ধ হল। ব্রাজিলে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত।

স্বদেশে সহবাস-সম্মতি নিয়ে বহু বিতর্কের পর আইন চালু হল।

লোকগণনার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মদের হিন্দুরূপে গণ্য করার জন্য সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ। পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে আমলাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে জমিদার রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে হিন্দুমুসলমান ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলকে একাসনে বসালেন। চৈতন্য লাইব্রেরিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবন্ধ পাঠ। হিতবাদী নামক সদ্যপ্রকাশিত সাপ্তাহিকে ছোটগল্প রচনার সূচনা। অকাল-বিবাহ সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে মতবিরোধ। হিতবাদীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। জমিদারি পরিদর্শন উপলক্ষ্যে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ এবং উড়িষ্যার নানাস্থানে ভ্রমণ। চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের সূচনা। অন্যান্য গদ্য-পদ্য-গীতরচনার ধারাও অব্যাহত। ডিসেম্বরে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় সাধনা পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় রচনাপ্রকাশে নতুন উৎসাহসঞ্চার। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি প্রথম খণ্ড।

জন্ম রামানন্দপুত্র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কবির দ্বিতীয় কন্যা রেণুকা।

মৃত্যু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আন্না তড়খড়ে।

১৮৯২ কবির জমিদারিতে অবস্থানের সময়সীমা ক্রমবর্ধমান, সাহিত্যরচনাও পরিমাণে তীব্র গতিশীল।

মে মাসে সপরিবারে বোলপুরে কিছুদিন বাস। আগস্টে গোড়ায় গলদ রচনা ও ভারত-সংগীত সমাজে তার অভিনয়। নভেম্বরে কিছুদিন শোলাপুর ভ্রমণ। শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুকূলে বঙ্কিমচন্দ্র ও গুরুদাসের সমর্থনলাভ। চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্য সমাপ্ত।

এই বৎসর চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ এই দুটি মাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ।

জন্ম কালিদাস নাগ, নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, শচীন সেনগুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দাসী পত্রিকা প্রকাশ করলেন।

১৮৯৩ নিউজিল্যান্ডে প্রথম নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হল। শিকাগো ধর্মসম্মেলনে যোগ দিতে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রা। ভারতে অ্যানি বেসান্ত। বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচার স্থাপিত, স্থান : বিনয়কৃষ্ণ দেবের গৃহ।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধারা বিচিত্রমুখী ও প্রবলবেগে অব্যাহত। জমিদারিতে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে, কলকাতায়, ক্কচিৎ শান্তিনিকেতনে বাস।

অকটোবরে প্রকাশ্য সভায় ইংরেজ ও ভারতবাসী প্রবন্ধপাঠ। প্রকাশিত হল য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি ২য় খণ্ড এবং গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা।

জন্ম অমল হোম, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিমা দেবী, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, মেঘনাদ সাহা, শান্তা দেবী।

মৃত্যু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।

গ্রন্থ নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র, মানকুমারী বসুর কুসুমাঞ্জলি কাব্য, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আর্যগাথা। জগদীশচন্দ্র বসু ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের যৌথ উদ্যোগে মুকুল পত্রিকার প্রকাশ।

১৮৯৪ চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের কাছে চীনের পরাজয় ঘটল।

রামমোহন-ভক্ত সুইডিশ যুবক হ্যামারগ্রেনের কলকাতায় মৃত্যু এবং তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী হিন্দুবিধিতে তাঁর দেহ দাহ করার ব্যাপারে রক্ষণশীল সমাজে ঘোর বিক্ষোভ। 'বিদেশীয় অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া। বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রূপান্তরিত। রবীন্দ্রনাথ সহ-সভাপতি। সভাসমিতিতে একাধিক প্রবন্ধ পাঠ। ডিসেম্বরে সাধনার সম্পাদকত্ব গ্রহণ।

গ্রন্থ সোনার তরী, ছোটগল্প, বিচিত্র গল্প, কথা-চতুষ্টয়। বিদায় অভিশাপ চিত্রাঙ্গদার দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে মুদ্রিত।

জন্ম কনিষ্ঠ কন্যা মীরা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মাস্টারদা সূর্য সেন, কাজি আবদুল ওদুদ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শৈলবালা ঘোষজায়া, রমেশচন্দ্র দত্ত।

মৃত্যু বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, রেভারেন্ড লালবিহারী দে।

১৮৯৫ বিশ্বে উপনিবেশবাদের বিস্তার—চীনের মাঞ্চুরিয়ার একাংশ জাপানের, মিশর ব্রিটিশের, ইরিট্রিয়া ইতালির অধিকারে এল।

রঞ্জনরশ্মি ও বেতারতরঙ্গ দুই আবিষ্কারে বিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন।

জমিদারি দেখাশোনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকর্তৃক ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় কুষ্ঠিয়ায় কয়েকটি ব্যবসায়ের উদ্যোগ। সাহিত্য-সৃষ্টি পূর্ববৎ অবিশ্রাম বেগে প্রবাহিত। সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠার বার্ষিক সভায় বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ। শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবে যোগদান। সাধনা পত্রিকার দীপনির্বাণ।

'গল্প-দশক' একটা মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত।

জন্ম অহীন্দ্র চৌধুরী, সীতা দেবী।

গ্রন্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস।

১৮৯৬ ডিনামাইট বিক্রির লভ্যাংশ দিয়ে নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তন। অবিসিনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইতালির পরাজয়।

জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা ইংলন্ডে প্রশংসিত। বোম্বাইয়ে বিধ্বংসী প্লেগ।

অমরেন্দ্র দত্তের ক্লাসিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা। ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে কবিকর্তৃক স্বকণ্ঠে নিজসুরে বন্দেমাতরম্ গান পরিবেশন ও জোড়াসাঁকোয় প্রতিনিধি-অভ্যর্থনাকালে অয়ি ভুবনমনোমোহিনী গেয়ে শোনানো। বলেন্দ্রনাথের বিবাহ। মহর্ষি-কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে জমিদারির সর্বময় কর্তৃত্ব আইনসম্মতভাবে সমর্পণ। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যৌথভাবে ছোটদের জন্য সংস্কৃত পাঠ্যগ্রন্থ রচনার উদ্যোগ। উড়িষ্যাসফরকালে মালিনী রচনা।

প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি বলেন্দ্রনাথের বিবাহোপলক্ষ্যে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রিত নদী কবিতা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে, চিত্রা কাব্য ও কাব্যগ্রন্থাবলী (সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত)। এই কাব্যগ্রন্থাবলীতেই মালিনী ও চৈতালি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়।

জন্ম কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ, নীরেন্দ্রনাথ রায়।

মৃত্যু হরিনাথ মজুমদার।

গ্রন্থ দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কালীপ্রসন্ন ঘোষের নিশীথচিন্তা।

১৮৯৭ ইলেকট্রন আবিষ্কার।

গ্রিসের বিরুদ্ধে তুরস্কের যুদ্ধঘোষণা। রয়েল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার প্রদর্শিত।

বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাবর্তন। বিপুল সম্বর্ধনা, জুনে শোভাবাজার রাজবাড়িতে প্রদত্ত সম্বর্ধনায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত।

জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। নাটোর প্রাদেশিক সম্মেলন ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত হওয়ায় অতিথিরূপে উপস্থিত রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তন। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ইংলন্ডে প্রশংসিত হওয়ায় স্বদেশে তাঁর সম্বর্ধনাসভায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি। কাহিনীর কাব্যনাট্যগুলির রচনা। ডিসেম্বরে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে গান্ধারীর আবেদন পাঠ। পঞ্চভূত ও বৈকুণ্ঠের খাতা প্রকাশিত।

জন্ম সুভাষচন্দ্র বসু, দিলীপকুমার রায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, পরিমল গোস্বামী, প্রবোধচন্দ্র সেন, মণীন্দ্রলাল বসু, তুলসী লাহিড়ী, তুষারকান্তি ঘোষ, অজিতকুমার দত্ত।

গ্রন্থ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের আলিবাবা, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের হাসিখুশী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত বীণাবাদিনী সংগীতপত্রিকার প্রকাশ।

১৮৯৮ স্পেনের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধসংঘাত।

কেশরী পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক রচনা প্রকাশের দায়ে তিলক কারারুদ্ধ। তিলকের মামলার খরচ তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিকের অর্থসংগ্রহের উদ্যোগ। মার্চে সিডিশন বিল পাশ ও তার প্রতিক্রিয়ায় টাউন হল-এর সভায় কবিকর্তৃক কণ্ঠরোধ প্রবন্ধ পাঠ। মে-জুনে প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকা গমন ও সভাপতি রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজি-ভাষণের কবিকর্তৃক তাৎক্ষণিক বঙ্গানুবাদ প্রচার। শিলাইদহে পল্লীউন্নয়নের বিবিধ পরিকল্পনা ও প্রয়াস। বলেন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তিনিকেতনে ধর্মভিত্তিক শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়স্থাপনের পরিকল্পনা।

এই বৎসর কবির কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

জন্ম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজি নজরুল ইসলাম, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

মৃত্যু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রামতনু লাহিড়ী।

গ্রন্থ দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সিরাজদ্দৌলা।

১৮৯৯ দ্বিতীয় বুয়র যুদ্ধ শুরু।

লর্ড কার্জন দেশের সদ্যনিযুক্ত শাসক।

বিবেকানন্দ কর্তৃক বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা। কলকাতায় প্লেগ, নিবেদিতার সেবাকার্য। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর বিবাহ। অন্ধ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য অর্থসংগ্রহ।

কুষ্টিয়া ব্যবসায়ে ম্যানেজারের প্রতারণা। শিলাইদহের আলুচাষের চেষ্টায় অসাফল্য। দেবেন্দ্রনাথের উইল অনুযায়ী সম্পত্তিভাগ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ভাগে বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ কণিকা।

জন্ম জীবনানন্দ দাশ, বনফুল, হিরণকুমার সান্যাল, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু বলেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু।

গ্রন্থ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্তৃক ঐতিহাসিক চিত্র পত্রিকার প্রকাশ।

১৯০০ বুয়রদের রাজধানী প্রিটোরিয়া ব্রিটিশ সেনাদের অধিকারে। নৌশক্তিরূপে জার্মানির আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রায় নানা কর্মের ও দায়িত্বের বৈচিত্র্য এবং সাহিত্যচর্চায় বহুমুখিতা। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অর্থকষ্ট, কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ে ঋণশোধের জন্য তারকনাথ পালিতের কাছে অর্থগ্রহণ। মে মাসে পক্ষকালের জন্য দার্জিলিং সফর। ডিসেম্বরে ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে বিসর্জন অভিনয়। রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে।

এই বৎসর প্রকাশিত গ্রন্থ কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, গল্পগুচ্ছ ১ম। গত বৎসর ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের বেদী থেকে প্রদত্ত ব্রহ্মোপদেশনা ঔপনিষদিক ব্রহ্মের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হল। এটি রবীন্দ্ররচনার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ।

জন্ম শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, উদয়শঙ্কর, সজনীকান্ত দাস।

মৃত্যু রজনীকান্ত গুপ্ত।

গ্রন্থ সরলা দেবীর শতগান, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, জলধর সেনের হিমালয়।

১৯০১ হেগ-এ আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপিত।

লন্ডনে গবেষণার কাজ সুসম্পন্ন করার প্রয়োজনে জগদীশচন্দ্র বসুর জন্য কবির অর্থসংগ্রহের উদ্যোগ এবং ত্রিপুরারাজের সাহায্যদান। ১৫ জুলাই মজফফরপুরে মুখার্জি সেমিনারিতে প্রথম কবিসম্বর্ধনা।

রবীন্দ্র-সম্পাদনায় নব পর্যায় বঙ্গদর্শনে চোখের বালি রচনার সূত্রপাত। জুনে জ্যেষ্ঠ কন্যা মাধুরীলতার বিবাহ, পাত্র বিহারীলালের পুত্র শরৎচন্দ্র, তখন মজফফরপুরে ওকালতি বৃত্তিতে বৃত। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ও তাঁকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য আমন্ত্রণ। এলাহাবাদ সফর ও সদ্যপ্রকাশিত প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়। জুলাই মাসে মধ্যমকন্যা রেণুকার বিবাহ, পাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

অকটোবরে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে। পতিসর থেকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ করে শান্তিনিকেতনে সংস্কৃত শিক্ষকরূপে নিয়োগ। ২২ ডিসেম্বর ৭ পৌষ মহর্ষির আশীর্বাদ ও সম্মতিতে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। প্রথম পর্বের শিক্ষক ব্রহ্মবান্ধব, রেবাচাঁদ, লরেন্স, জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবধন বিদ্যার্ণব।

এই বৎসর প্রকাশিত গ্রন্থ উপনিষদ ব্রহ্ম, নৈবেদ্য, গল্পগুচ্ছ ২য়।

জন্ম প্রমথনাথ বিশী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিয় চক্রবর্তী, মনোজ বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী।

মৃত্যু মহারানী ভিক্টোরিয়া

গ্রন্থ যদুনাথ সরকারের হিস্ট্রি অফ ঔরংজীব, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর নেড়া হরিদাস, যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চা-কুলির আত্মকাহিনী।

১৯০২ লন্ডনে রয়েল সোসাইটি গবেষণাগারে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার প্রদর্শিত হল।

ডন সোসাইটি অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা। বিবেকানন্দের প্রয়াণ, বিবেকানন্দের শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা। কলকাতায় প্রথম বিদ্যুৎচালিত ট্রাম।

ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ। নতুন প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আশ্রমে ছাত্রদের অবৈতনিকপ্রথা রদ, বেতন গ্রহণের সিদ্ধান্ত। অর্থসংগ্রহের জন্য পুরীর বাড়ি বিক্রয়, স্ত্রীর গহনা বিক্রয়, নিজস্ব গ্রন্থাগারের অংশ বিক্রয়। মৃণালিনী দেবীর পীড়া ও তাঁকে কলকাতায় আনা এবং পত্নীর জীবনাবসান।

পৌষে শান্তিনিকেতনে।

প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে স্মরণ-এর কবিতাগুচ্ছ, যদিও গ্রন্থাকারে এই বছর প্রকাশিত হয়নি।

জন্ম সুনির্মল বসু, মণীশ ঘটক, গোপাল হালদার, জরাসন্ধ।

মৃত্যু স্বামী বিবেকানন্দ, মৃণালিনী দেবী।

১৯০৩ বিজ্ঞানের কেরামতিতে আকাশে বিমানের ব্যবহার। ব্রিটিশ সৈন্যের তিব্বত অভিযান। সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষ্যে দিল্লিতে সমারোহের উদ্যোগ। বঙ্গবিভাগের ঘোষণা মার্চে। কন্যা রেণুকার পীড়ায় চিকিৎসার জন্য হাজারিবাগ যাত্রা। হাজারিবাগে রবীন্দ্রনাথের নতুন উপন্যাস নৌকাডুবির সূচনা। মে মাসে কন্যাকে নিয়ে আলমোড়ায়। এখানে শিশুর কবিতাগুচ্ছের সূচনা। মোহিতচন্দ্র সেনের উপর বিদ্যালয়ের ভারঅর্পণ। মোহিতচন্দ্র সেন প্রস্তাবিত কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন অংশের জন্য ভূমিকা কবিতারচনা : উৎসর্গ। কন্যার মৃত্যু।

এই বৎসর প্রকাশিত হল চোখের বালি, কর্মফল, মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ (স্মরণ ও শিশু সংযোজিত)

জন্ম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, যোগেশচন্দ্র বাগল, অনাদিকুমার দস্তিদার, নীহাররঞ্জন রায়।

মৃত্যু মধ্যম কন্যা রেণুকা ; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯০৪ এশিয়া ও আফ্রিকায় অবস্থিত উপনিবেশগুলির স্বার্থচিন্তায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পারস্পরিক আঁতাত। মাদাম কুরির রেডিয়াম আবিষ্কার। রুশ-জাপান যুদ্ধারম্ভ।

উচ্চশিক্ষার উপর কার্জনের নিয়ন্ত্রণ চালু করার প্রয়াস।

এপ্রিল থেকে জুনে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ-কলকাতা-মজফফরপুর বারাণসী সফর। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে গিরিডি বাস। অকটোবরে জগদীশচন্দ্র, নিবেদিতা, যদুনাথ সরকার-সহ বুদ্ধগয়া সফর। বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের কারণে হিতবাদী প্রকাশককে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী দু-হাজার কপি বিক্রয়। পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে। এই বৎসর কেবল হিতবাদী সংস্করণ রবীন্দ্র- গ্রন্থাবলী প্রকাশিত। বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থের জন্য প্রথম আত্মজীবনী রচনা ও দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে বিরোধ-সূচনা।

জন্ম বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, রাধারানী দেবী, মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, জসীমউদ্দিন।

মৃত্যু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়।

গ্রন্থ শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সখারাম গণেশ দেউস্করের দেশের কথা, দীনেশচন্দ্র সেনের রামায়ণী কথা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সন্ধ্যা পত্রিকার প্রকাশ।

১৯০৫ ইঙ্গ-ফরাসি সামরিক চুক্তি। রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশপক্ষের পরাজয়।

বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা ও তার প্রতিক্রিয়া। বয়কট প্রস্তাব, সভাসমিতি-শোভাযাত্রা-প্রতিবাদে উত্তাল দেশ। রাখীবন্ধন।

১ জুলাই রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে আগরতলায়। শরতে গিরিডি-বাস। বঙ্গচ্ছেদ-দিবসে রাখীবন্ধন ও অরন্ধন ব্রত পালনের আহ্বান। সভাসমিতিতে বিপুল বেগে অংশগ্রহণ। কুষ্ঠিয়ায় বয়নবিদ্যালয় ও পতিসরে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন।

গ্রন্থ আত্মশক্তি ও বাউল।

জন্ম প্রবোধকুমার সান্যাল, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজকুমার মল্লিক।

মৃত্যু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

গ্রন্থ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতাপসিংহ, জলধর সেনের জাতীয় সংগীত সংগ্রহ জাতীয় উচ্ছ্বাস।

১৯০৬ ব্রিটেনে শ্রমিকদের কাজের সময় দশঘন্টা নির্ধারিত হল। ট্রেড ইউনিয়নে শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকারও স্বীকৃত।

দেশে গুপ্ত বিপ্লববাদের প্রসার ঘটছে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ গঠনে আত্মশক্তির উপর গুরুত্ব দিতে চান। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে মার্কিনদেশে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান শেখার জন্য প্রেরণ। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় দায়িত্ব ত্যাগ। বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি, পুলিশি অত্যাচারে সভা পণ্ড।

চারিদিকে জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা। অরবিন্দ ঘোষের অধ্যক্ষতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত। পূর্ববঙ্গে বন্দেমাতরম্ স্লোগান নিষিদ্ধ। স্বদেশী উন্নয়নের চেষ্টায় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল প্রতিষ্ঠা। পুলিন দাসের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতি। ঢাকায় মুসলিম লিগ গঠন। পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে।

এই বৎসর প্রকাশিত হয় খেয়া, নৌকাডুবি ও ভারতবর্ষ।

জন্ম সতীনাথ ভাদুড়ী, হুমায়ুন কবির, শচীন দেববর্মন, আবু সয়ীদ আইয়ুব।

মৃত্যু মোহিতচন্দ্র সেন।

অন্যান্য গ্রন্থ বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সম্পাদনায় যুগান্তর, অরবিন্দ ঘোষ বিপিনচন্দ্রের উদ্যোগে বন্দেমাতরম্ ইংরেজি দৈনিক।

১৯০৭ ফেব্রুয়ারিতে শান্তিনিকেতনে কবিপুত্র বালক শমীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রথম ঋতুউৎসব। মুঙ্গেরে শমীন্দ্রের মৃত্যু। জুনে কন্যা মীরার বিবাহ, জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। নগেন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ্যাশিক্ষণের জন্য আমেরিকায় প্রেরণ। রাজনৈতিক উত্তেজনা থেকে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের নিষ্ক্রমণ। দেশে ক্রমবর্ধমান হিন্দুমুসলমান সংঘর্ষ। বেলা ও মীরাকে নিয়ে চার মাস শিলাইদহে বাস।

এই বৎসর বিচিত্র প্রবন্ধ, চারিত্রপূজা, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক গ্রন্থগুলি গদ্যগ্রন্থাবলী সিরিজে (১-৭) প্রকাশিত হয়।

জন্ম বিধায়ক ভট্টাচার্য।

মৃত্যু কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

গ্রন্থ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গভাষার লেখক।

১৯০৮ তরুণ তুরস্কে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

দেশে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও রাজনৈতিক উত্তেজনা, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বৃদ্ধি। সংবাদ-পত্ররোধ-আইনের সাহায্যে সরকার-কর্তৃক বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যা, যুগান্তর নিষিদ্ধ ঘোষণা। সন্ধ্যা সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব গ্রেপ্তার ও অসুস্থতার ফলে মৃত্যু। লালা লাজপত রায় পাঞ্জাব থেকে বহিষ্কৃত। দেশমান্য তিলকের ছয় বছর কারাদণ্ড। চিত্তরঞ্জনের অসামান্য মামলা-পরিচালনায় অরবিন্দ কারামুক্ত। অনেকগুলি বোমার মামলা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নতুন গৃহ-উদ্‌বোধন সম্পন্ন, রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্ত সেন পরিচয় স্থাপন। শান্তিনিকেতনে প্রথম বর্ষামঙ্গল। পূজাবকাশে শারদোৎসব অভিনয়। বর্ষশেষে পৌষউৎসবে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে।

এই বৎসর প্রকাশিত গ্রন্থ প্রজাপতির নির্বন্ধ, রাজাপ্রজা, স্বদেশ, সমাজ, শারদোৎসব, মুকুট, কথা ও কাহিনী গান (সিটি বুক সোসাইটি)।

জন্ম বুদ্ধদেব বসু, পুলিনবিহারী সেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, লীলা মজুমদার।

মৃত্যু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ক্ষুদিরাম (ফাঁসিতে), প্রফুল্ল চাকী (আত্মহত্যায়) ; সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (রেণুকার স্বামী) ; মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ; ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

গ্রন্থ দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা, মেবারপতন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তীর্থসলিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় মডার্ন রিভিউ মাসিকের প্রকাশ।

১৯০৯ মর্লি-মিন্টো সংস্কার দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারল না। সন্ত্রাসবাদ ক্রমবর্ধমান, বোমা বা গুলিতে ইংরেজ রাজপুরুষরা প্রায়ই আক্রান্ত। যুগান্তর, অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ।

মীরাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কালকা যাত্রা, পথে এলাহাবাদে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের আতিথ্য গ্রহণ ; নেপালচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পরিচয় ; রথীন্দ্রনাথ কৃষিবিজ্ঞান পাশ করে দেশে ফিরলে তাঁকে নিয়ে জমিদারিতে যাত্রা। গীতাঞ্জলির গান রচনার শুরু। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে বিরোধের তীব্রতাবৃদ্ধি, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের অশ্লীলতার অভিযোগ।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও পাঠকের দ্বারা নির্বাচিত এবং নন্দলাল কর্তৃক চিত্রায়িত রবীন্দ্রনাথের প্রথম নির্বাচিত কবিতাসংকলন চয়নিকা প্রকাশ। মডার্ন রিভিউ-র ডিসেম্বর সংখ্যায় সমস্যাপূরণ গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত, রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রথম অনুবাদ।

চয়নিকা ব্যতীত এই বৎসর প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ শান্তিনিকেতন (১-৮), শব্দতত্ত্ব, ধর্ম (গদ্যগ্রন্থাবলী ১৫, ১৬), প্রায়শ্চিত্ত, গান (ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস), বিদ্যাসাগর-চরিত, শিশু (প্রথম পুস্তকাকারে)।

জন্ম সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ, বিষ্ণু দে।

মৃত্যু অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, নবীনচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাধাকিশোর মাণিক্য।

গ্রন্থ দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান।

১৯১০ দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রের জন্ম।

দেশে সন্ত্রাসবাদের কারণে নির্বিচার গ্রেপ্তার, সাভারকার-এর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, পুলিন দাস গ্রেপ্তার। অরবিন্দ কর্তৃক পণ্ডিচেরি আশ্রম স্থাপন। হিন্দুমহাসভা গঠিত।

রথীন্দ্রনাথের বিবাহ, পাত্রী গগনেন্দ্রভগ্নী বিনয়িনীর বিধবা কন্যা প্রতিমা। ৮ মে শান্তিনিকেতনে প্রথম কবির জন্মদিবস পালন। শিক্ষক ও কর্মীদের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত অভিনয়। অকটোবরে প্রায়শ্চিত্তের পুনরভিনয়, ধনঞ্জয়ের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। পূজাবকাশে রাজা রচনা। শিলাইদহে ৮০ বিঘা জমিকে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র করে ট্রাকটর দিয়ে চাষ।

রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনা বিষয়ে সাহিত্যপত্রিকায় নিন্দামূলক সমালোচনা। মডার্ন রিভিউতে ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের ইংরেজি অনুবাদপ্রকাশ।

ডিসেম্বরে পৌষউৎসবে শান্তিনিকেতনে খ্রিস্টোৎসব। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে শান্তিনিকেতন (৯-১১), গোরা, গীতাঞ্জলি ও রাজা।

জন্ম দেবনারায়ণ গুপ্ত, আশোকবিজয় রাহা।

মৃত্যু রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু।

গ্রন্থ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তীর্থরেণু।

১৯১১ চীনে ক্ষমতার শীর্ষে জাতীয়তাবাদী নেতা সানইয়াৎ সেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে ইতালির যুদ্ধ ঘোষণা ও ত্রিপোলি অধিকার।

পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষ্যে দিল্লি দরবার। এই অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা। ভারতে আবার লোকগণনা। ফ্যাকটরি আইনে নারী ও শিশুদের কাজের সময়সীমা দৈনিক বারো ঘন্টায় বেঁধে দেওয়া হল। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে।

বর্ষশুরুতে অবনীন্দ্রনাথের গৃহে ব্রিটিশ শিল্পী রোটেনস্টাইন এবং জার্মান দার্শনিক কাউন্ট কাইজারলিংয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। মডার্ন রিভিউতে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সহযোগিতায় আনন্দকুমারস্বামী কর্তৃক রবীন্দ্রকবিতার প্রথম অনুবাদপ্রকাশ। শান্তিনিকেতনে রাজা-র অভিনয়। কবির পঞ্চাশৎ জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান। পূজাবকাশে শারদোৎসব অভিনয়।

প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে শান্তিনিকেতন (১২-১৩), আটটি গল্প।

জন্ম জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

মৃত্যু ভগিনী নিবেদিতা, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন।

গ্রন্থ দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত।

১৯১২ বলকান যুদ্ধ ; সার্বিয়া গ্রিস বুলগেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের তুরস্ক-আক্রমণ ও তুরস্কবিজয়। মাঘোৎসবে জনগণমনঅধিনায়ক ব্রহ্মসংগীতরূপে গীত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ জন্মবার্ষিকী উৎসবের অনুষ্ঠান। গীতিমাল্যের গান রচনা ও স্বরচিত কবিতার স্বকৃত অনুবাদ প্রচেষ্টা। গোপন সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে শান্তিনিকেতন আশ্রম- বিদ্যালয়ে সরকারি কর্মচারীদের পুত্রকন্যাদের ভর্তির উপর নিষেধাজ্ঞা। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধ রচনা। নববর্ষ দিবসে ভাষণ রোগীর নববর্ষ। ২৪ মে পুত্র ও পুত্রবধূসহ বিলাত পাড়ি। মধ্য-জুনে লন্ডনে রোটেনস্টাইনকে ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি-প্রদান। ৭ জুলাই কাব্যপাঠের আসরে উপস্থিত ইয়েটস, মে সিনক্লেয়ার, ইভলিন আন্ডারহিল, আর্নেস্ট রিজ, ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ, এজরা পাউন্ড, রবার্ট ট্রেভেলিয়ন, এলিন মেনল, হেনরি নোভিনসন প্রমুখ। ৮ জুলাই ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ক্লাব কর্তৃক সম্বর্ধনা। ১২ জুলাই ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক কবি- সম্বর্ধনা। আগস্টে ইংলন্ডের উপকণ্ঠে বাস। লন্ডনে ফেরার পর বার্নার্ড শ, এইচ জি ওয়েলস, স্টপফোর্ড ব্রুক, স্টার্জ মুর, জন গলসওয়ার্দি, রবার্ট ব্রিজেস, জন ম্যানসফিল্ড, ডবলু এইচ হাডসন প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। কেমব্রিজের ছাত্র ক্ষিতীশচন্দ্র সেন কর্তৃক রাজা-র এবং দেবব্রত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ডাকঘরের অনুবাদ। নভেম্বরে ইয়েটস-এর ভূমিকাসহ গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ, প্রকাশক ইন্ডিয়া সোসাইটি। মুদ্রণ সংখ্যা ৭৫০, কেবল বিতরণের জন্য। নভেম্বর-ডিসেম্বরে আমেরিকার নিউইয়র্ক-আরবানায় ভ্রমণ ও ভাষণ। হ্যারিয়েট মনরো সম্পাদিত শিকাগোর পোয়েট্রি পত্রিকায় গীতাঞ্জলির কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশ।

এই বৎসর প্রকাশিত গ্রন্থ ডাকঘর, গল্প চারিটি, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, অচলায়তন, মালিনী, চৈতালি।

জন্ম সুভো ঠাকুর, বিমল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুমথনাথ ঘোষ।

মৃত্যু সখারাম গণেশ দেউস্কর, মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

গ্রন্থ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র গৌড়লেখমালা, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্ন্যাসী, অক্ষয়কুমার বড়ালের এষা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কুহু ও কেকা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত ভারতবর্ষ পত্রিকার প্রথম প্রকাশ।

১৯১৩ তুরস্ক নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির লাভ-লোকসান ও ভাগ-বাঁটোয়ারা; ম্যাসিডোনিয়ার ভাগাভাগি নিয়ে বুলগেরিয়া-সার্বিয়ার মারামারি; নতুন রাষ্ট্র আলবানিয়ার জন্ম। মার্কিন দেশপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের গদর পার্টি গঠন।

জানুয়ারিতে আরবানা থেকে রবীন্দ্রনাথের শিকাগোয় আগমন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, রচেস্টারে ভাষণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিতি। ফেব্রুয়ারিতে নিউইয়র্কে, বস্টনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে ভাষণ, শিকাগো আরবানা হয়ে লন্ডনে প্রত্যাবর্তন।

এপ্রিলে আইরিশ থিয়েটারে ডাকঘরের অভিনয়। মে মাসে ক্যাকসটন হল-এ সাধনা বক্তৃতামালা। অকটোবরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

নভেম্বরে নোবেল-পুরস্কার ঘোষণা ও সমগ্র বিশ্বে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ২৩ নভেম্বর কলকাতা থেকে বিশেষ ট্রেনে পাঁচ শত বিশিষ্ট ব্যক্তির শান্তিনিকেতনে কবিকে সম্বর্ধনার জন্য আগমন এবং কবির ঈষৎতিক্ত প্রত্যভিভাষণে অতিথিদের ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া। ৩০ নভেম্বর কবির আশীর্বাদ নিয়ে এন্ডরুজের দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা। উদ্দেশ্য, সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গান্ধিকে সাহায্য করা। ২৬ ডিসেম্বর বিশেষ সমাবর্তনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডিলিট সম্মানপ্রদান।

ম্যাকমিলান কর্তৃক ইংরেজি গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার ও ক্রেসেন্ট মুন প্রকাশ, ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে চিত্রা, গ্লিম্পসেস অফ বেঙ্গল লাইফ ও সাধনা প্রকাশ। এই বৎসর কবির কোনও বাংলা বই প্রকাশিত হয়নি।

মৃত্যু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

গ্রন্থ প্রমথ চৌধুরীর সনেট পঞ্চাশৎ, কামিনী রায়ের মাল্য ও নির্মাল্য, শরৎচন্দ্রের বড়দিদি।

১৯১৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। জার্মানি কর্তৃক ফ্রান্স আক্রান্ত। ভারতীয় সৈন্যদল ফ্রান্সে ইংরেজ পক্ষের হয়ে যুদ্ধরত।

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব থেকেই কবির মধ্যে অস্থিরতা।

জানুয়ারিতে সুইডিশ একাডেমির নোবেল পুরস্কার গভর্নর হাউসে লর্ড কারমাইকেল কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে প্রদান। ফেব্রুয়ারি পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে ভ্রমণ। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে ভাষণদান। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পিয়ার্সনের ৩০ মার্চ আশ্রমের কাজে যোগদান। এপ্রিলে রথীন্দ্রনাথের জন্য সুরুলে গবেষণাগার স্থাপিত। নন্দলালের শান্তিনিকেতনে আগমন।

বলাকার কবিতা রচনার সূত্রপাত। কবিজন্মদিনে অচলায়তন অভিনয়। গুরুর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। জুন থেকে নভেম্বরে পর্যায়ক্রমে রামগড়, লখনৌ, বুদ্ধগয়া, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লি, দার্জিলিং, শিলাইদহ, কলকাতা, এলাহাবাদ ভ্রমণ ও বলাকার কবিতারচনার ধারা। গান্ধিজীর দক্ষিণ আফ্রিকার ছাত্রদের আশ্রম পরিদর্শন।

ইউরোপ-এশিয়ার প্রায় সব ভাষাতেই গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রকাশ।

এই বৎসর গীতিমাল্য, গীতালি, উৎসর্গ, স্মরণ (পৃথক গ্রন্থাকারে), গান, ধর্মসংগীত, দ্য পোস্টঅফিস, দ্য কিং অফ দ্য ডার্ক চেম্বার, ইংরেজি সাধনা প্রকাশিত হয়।

মৃত্যু মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন।

গ্রন্থ শরৎচন্দ্রের বিন্দুর ছেলে।

প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজ পত্র ও চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত নারায়ণ এই বৎসর থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯১৫ বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন ফ্রান্স রাশিয়া সার্বিয়া বেলজিয়াম একপক্ষে, অন্যপক্ষে জার্মানি অস্ট্রিয়া। রাশিয়া জার্মানিকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত। ইংলন্ডে যুদ্ধের ট্যাংক তৈরি হল। ইতালি তুরস্ক বুলগেরিয়া যুদ্ধে যোগ দিল।

ভারতরক্ষা আইনে দেশে বিনাবিচারে গ্রেপ্তার। আফ্রিকা থেকে গান্ধির ভারতে আগমন। অস্ত্রের সন্ধানে এম এন রায়ের বিদেশে যাত্রা। গদরদলের সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা। বুড়ি বালামের তীরে বাঘাযতীনের মৃত্যু।

ফেব্রুয়ারিতে গান্ধির প্রথম শান্তিনিকেতনে আসা। মার্চে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের শান্তিনিকেতন-পরিদর্শন। এপ্রিলে শান্তিনিকেতনে ইস্টারের ছুটিতে কবির সদ্য-রচিত ফাল্গুনীর অভিনয়। রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউলের ভূমিকায়। জুনে সম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের স্যার উপাধিলাভ। সেপ্টেম্বরে ফিজি-র শ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এন্ড্রুজ ও পিয়ারসনের ফিজি যাত্রা। অকটোবরে রবীন্দ্রনাথের কাশ্মীরভ্রমণ, বলাকার কবিতারচনা। নভেম্বরে শেক্‌সপিয়রের ত্রিশতবার্ষিক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবিতারচনা। ডিসেম্বরে রামমোহন লাইব্রেরিতে শিক্ষার বাহন পাঠ।

এই বৎসর গল্প-উপন্যাস রচনায় আবার রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ জেগেছে। সবুজ পত্রের জন্য গল্প ও চতুরঙ্গ উপন্যাস লিখতে ব্যস্ত, কিন্তু প্রকাশিত গ্রন্থ কম। কেবল শান্তিনিকেতন (১৪) ও কাব্যগ্রন্থ (১-৬)।

মৃত্যু বাঘা যতীন, গোখেল, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

গ্রন্থ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার বাল্যকথা ও বোম্বাইপ্রবাস, দ্বিজেন্দ্রলালের গান।

১৯১৬ বিশ্বযুদ্ধে রুমানিয়ার যোগদান। মিত্রপক্ষের নৌবাহিনী দ্বারা জার্মানি অবরুদ্ধ। ব্রিটেনের উপকূলে জার্মানির বোমাবর্ষণ।

লখনৌ-এ কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে চুক্তির দ্বারা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে আসন বণ্টন বিষয়ে সাময়িক সমঝোতা। অ্যানি বেসান্ত কর্তৃক হোমরুল লিগ স্থাপন।

জানুয়ারিতে বাঁকুড়া-দুর্ভিক্ষে সহায়তাকল্পে জোড়াসাঁকোয় ফাল্গুনীর ঐতিহাসিক প্রযোজনা ও রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে অন্ধ বাউলের অবিস্মরণীয় ভূমিকা। ফাল্গুনীর মুখবন্ধরূপে অভিনীত বৈরাগ্যসাধনে তরুণ কবিশেখরের ভূমিকাতেও রবীন্দ্রনাথের চমকপ্রদ অভিনয়। ফেব্রুয়ারিতে পতিসরে জমিদারি পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পল্লী-উন্নয়ন কর্মসূচি, হিতৈষী সভাস্থাপন। মার্চে সরকারের ছাত্রপীড়ননীতির প্রতিবাদে ছাত্রশাসনতন্ত্র প্রবন্ধরচনা। মে থেকে আবার ভ্রমণসূচি—জাপানের পথে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে অবস্থিতি ও কবিসম্বর্ধনা। পেনাং বন্দর, সিঙ্গাপুর, হংকং হয়ে কোবে ও ওকাসায় উপস্থিতি। জুনে জাপানের নানা অঞ্চলে সফর, বক্তৃতা, ওকাকুরার সঙ্গে সাক্ষাৎ, দ্য নেশান ও দ্য স্পিরিট অফ জাপান দুটি বিষয়ে একাধিক ভাষণ প্রদান। বক্তৃতায় জাপানি জাতীয়তা তথা আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমালোচনা। কবি-অভ্যর্থনায় সরকারি মহলের শীতলতা। কবির মার্কিন-মুলুকে আগমন। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর তিন মাসে সিয়াটল, পোর্টল্যান্ড, সানফ্রানসিসকো, সেন্ট বারবারা, লস এঞ্জেলস, ডেনভার, ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন, ব্রুকলিন, সানডিয়াগো, সল্টলেকসিটি, শিকাগো, আইওয়া, ইন্ডিয়ানাপোলিস, পিটসবার্গ, কেন্টাকি, ন্যাশভিল, ডেট্রয়েট, ক্লিভল্যান্ড, নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে ধারাবাহিক বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় ন্যাশনালিজম ও পারসোনালিটি। বক্তৃতা শুনে শ্রোতাদের একাংশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া। ক্লিভল্যান্ডে শেকস্‌পিয়ার উদ্যানে বৃক্ষরোপণ।

এই বৎসর প্রকাশিত গ্রন্থ শন্তিনিকেতন (১৫-১৭), ফাল্গুনী, বলাকা, ঘরে বাইরে, সঞ্চয়, পরিচয়, চতুরঙ্গ, গল্পসপ্তক, কাব্যগ্রন্থ ৭-১০ (ফাল্গুনী ও বলাকাসহ) ইংরেজি গ্রন্থ ফ্রুট-গ্যাদারিং, হাংরি স্টোনস অ্যাণ্ড আদার স্টোরিস, স্ট্রে বার্ডস।

মৃত্যু প্রিয়নাথ সেন ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

গ্রন্থ শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অভ্র ও আবীর।

১৯১৭ রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব। বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা জাপান ও চীনের যোগদান। ভারতে গান্ধির নেতৃত্বে চম্পারনের নীলবিদ্রোহে জয়লাভ, ভারতে সত্যাগ্রহের সূচনা।

আমেরিকা শফরান্তে জাপান হয়ে মার্চের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, মে মাসে বিচিত্রা ক্লাবে কবিজন্মদিন উদ্‌যাপন—শান্তিনিকেতনের বাইরে প্রথম কবিজন্মোৎসব। জুলাই মাসে

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কবিসম্বর্ধনা, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-কর্তৃক অভিনন্দন-পাঠ। অ্যানি বেসান্তের অন্তরীণ দশা, কবির প্রতিক্রিয়া কর্তার ইচ্ছায় কর্ম প্রবন্ধে প্রকাশিত। সেপ্টেম্বরে বিচিত্রা ক্লাবের উদ্যোগে ডাকঘর নাটকের ঐতিহাসিক অভিনয়। অ্যানি বেসান্ত, গান্ধিজী, মালব্য, তিলকের কংগ্রেস-অধিবেশন উপলক্ষ্যে কলকাতায় অবস্থানের সৌজন্যে ডাকঘর-এর অভিনয়-দর্শন। শিক্ষা-সংস্কারের জন্য গঠিত স্যাডলার কমিশন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত প্রকাশ। ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধমান বিরক্তি ও সমালোচনা।

এই বৎসর প্রকাশিত হয় কর্তার ইচ্ছায় কর্ম এই একটি মাত্র বাংলা পুস্তিকা। ইংরেজি গ্রন্থ— দ্য সাইকল অফ স্প্রিং, মাই রেমিনিসেন্সেস; স্যাক্রিফাইস অ্যান্ড আদার প্লেজ, পারসোনালিটি, ন্যাশানালিজম।

মৃত্যু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও গোবিন্দচন্দ্র রায়।

অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের ১ম খণ্ড, দেবদাস ও চরিত্রহীন উল্লেখ্য।

১৯১৮ জার্মানি কর্তৃক ইতালি আক্রমণ, মিত্রপক্ষের জার্মানিতে প্রবেশ। ১১ নভেম্বর যুদ্ধশেষ। ব্রিটেনে নারীর ভোটাধিকার।

মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে ভারত-শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব, ভারতীয়দের অসন্তোষ। আমেদাবাদে সুতাকল-মজুরদের আন্দোলনে গান্ধির অনশন, মজুরদের বেতনবৃদ্ধি। গুজরাটে সত্যাগ্রহ।

কলকাতায় বিজ্ঞানকলেজ স্থাপন।

জানুয়ারিতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের অনুকূলে গান্ধিজীকে পত্রপ্রদান, কিন্তু জোরজবরদস্তির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী। ফেব্রুয়ারিতে অচলায়তন ভেঙে গুরু রচনা। মে মাসে বিচিত্রা গৃহে জন্মোৎসব। পিয়ার্সনকে ব্রিটিশ পুলিশ পিকিংয়ে গ্রেপ্তার করে ইংলন্ডে অন্তরীণ রেখেছে এই সংবাদে বিচলিত কবি কর্তৃক এন্ড্রুজকে বড়োলাট চেমসফোর্ডের কাছে সিমলায় প্রেরণ। জাপানে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করার জন্য পিয়ার্সনের উপর ইংরেজ সরকারের ক্রোধের কারণ, চেমসফোর্ড কর্তৃক এন্ড্রুজকে জ্ঞাপন। ১৬ মে জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার জীবনাবসান। দুঃসহ শোককে গভীরে প্রচ্ছন্ন রেখে কর্মব্যস্ত জীবনযাপন। ভানুসিংহের পত্ররচনা। জুলাইতে সমবায়নীতি বিষয়ে প্রবন্ধ। অকটোবরে দক্ষিণ-ভারত সফর। দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে কৌতূহল। ডিসেম্বরে প্যাটেল-এর আন্তরবর্ণ বিবাহ-বিল সমর্থন করে খোলা চিঠি। পৌষ উৎসবে বিশ্বভারতী গৃহের ভিত্তিস্থাপন।

এই বৎসর প্রকাশিত হয় গুরু ও পলাতকা। ইংরেজি গ্রন্থ মাসি অ্যান্ড আদার স্টোরিজ, স্টোরিজ ফ্রম টেগোর, প্যারটস ট্রেনিং, লাভারস গিফট অ্যান্ড ক্রসিং।

মৃত্যু মাধুরীলতা, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, অজিতকুমার চক্রবর্তী।

গ্রন্থ শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত।

১৯১৯ মেকসিকোয় এম এন রায় কর্তৃক সোভিয়েতের-বাইরে-প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গঠন। ভার্সাইয়ে যুদ্ধান্ত সন্ধিপত্ররচনা, পরাস্ত রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে বিজয়ীর বাঁটোয়ারা-ব্যবস্থা।

দেশে মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট অনুযায়ী গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ। বিনাবিচারে গ্রেপ্তারের স্বপক্ষে রাওলাট অ্যাক্ট জারি, গান্ধিজী কর্তৃক দেশব্যাপী হরতালের ডাক। ১০ এপ্রিল পাঞ্জাবে সামরিক আইন। গান্ধিকে রবীন্দ্রনাথের খোলা চিঠি।

দক্ষিণ-ভারত সফরান্তে মার্চে অ্যানি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলাররূপে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান কালচার। পরে কলকাতার নিউ এম্পায়ারে সেই একই বক্তৃতা, টিকিট কেটে বক্তৃতার এই প্রথম আয়োজন। ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। ৩০ মে স্যার উপাধি প্রত্যাখ্যান করে লর্ড চেমসফোর্ডকে কবির খোলা চিঠি। ২৬ জুন রোমাঁ

রলাঁর অনুরোধে স্বাধীনতাকামী সংঘের ঘোষণাপত্রে কবির স্বাক্ষরদান। ৩ জুলাই বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের সূচনা। অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী। পূজাবকাশের পূর্বে শারদোৎসব অভিনয়। সন্ন্যাসীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। অকটোবর-নভেম্বরে শিলং সিলেট গৌহাটি সফর।

এই বৎসর জাপানযাত্রী, দ্য সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান কালচার, দ্য হোম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্লড প্রকাশিত হয়।

মৃত্যু অক্ষয়কুমার বড়াল, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

১৯২০ মতিলাল নেহেরু ও চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক আইনবৃত্তি ত্যাগ ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

মার্চ থেকে মে, রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমভারত সফরে। সর্বত্র বিশ্বভারতীর জন্য প্রচার ও সাহায্যের আবেদন। বিদেশে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসাহায্য ও আদর্শপ্রচারের উদ্দেশ্যে মে মাসে ইউরোপ যাত্রা। লন্ডনে নতুন প্রীতি-সম্পর্ক—কানিংহাম গ্রাহাম, গিলবার্ট মারে, নিকোলাস রোয়েরিখ, টি ই লরেন্স, লরেন্স বিনিয়ান। তবে অন্যত্র স্যার উপাধি পরিত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় শীতল অভ্যর্থনা ও কবি-সম্পর্কে রাজভক্ত ইংরেজের ঔদাসীন্য। আগস্টে প্যারি শহরে বিদগ্ধজনের সঙ্গে পরিচয়, ফাউস্টের অভিনয় দর্শন। পরবর্তী কয়েকমাস ক্রমাগত বক্তৃতা ও সফর— আমস্টারডাম, রটারডাম, দ্য হেগ, লাইডেন, বুটরেক্ট্, ব্রাসেলস, লন্ডন, নিউইয়র্ক, ব্রুকলিন, প্রিন্সটন।

এই বছর প্রকাশিত গ্রন্থ অরূপরতন ও পয়লা নম্বর।

মৃত্যু বালগঙ্গাধর তিলক, দেবেন্দ্রনাথ সেন, শরৎকুমারী চৌধুরানী।

গ্রন্থ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেনের মেয়ে, শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। ফজলুল হক মুজফফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম-এর সম্পাদনায় নবযুগ পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৯২১ চীনে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত। সোভিয়েত রাশিয়ায় লেনিনের নতুন অর্থনৈতিক নীতি ঘোষিত। অসহযোগ আন্দোলনে ভারতবর্ষে ক্রমশ জনগণের অংশগ্রহণ ও উত্তেজনাবৃদ্ধি। চিত্তরঞ্জনের কারাদণ্ড। আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়েতে শ্রমিক-ধর্মঘট। সুভাষচন্দ্র বসুর আইসিএস-এর সংস্রব পরিত্যাগ। অসহযোগের বিরোধিতা করে প্রবীণ নেতা বিপিনচন্দ্র পালের রাজনীতি থেকে প্রস্থান।

জানুয়ারি থেকে মার্চ রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ও ইংলন্ড সফর। আমেরিকায় এলমহার্স্টের সঙ্গে পরিচয়। ২৫ জানুয়ারি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ। ৮ এপ্রিল লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের সভায় পূর্ব-পশ্চিমের মিলনবিষয়ে ভাষণ। মধ্য-এপ্রিলে রোমাঁ রলাঁ ও প্যাট্রিক গেডেস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১৬ এপ্রিল প্রথম বিমান-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এপ্রিল-মে মাসে স্ট্রাসবুর্গ, জেনিভা, লুসার্ন, ডামস্টার্ট, বার্লিন, মিউনিক, হামবুর্গ, ডেনমার্ক, কোপেনহেগেন, স্টকহোমে বক্তৃতা ও বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়। ২৯ মে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাকীর্ণ কক্ষে বক্তৃতা ও রেকর্ডে কবিকণ্ঠ-সংরক্ষণ। জুনে মিউনিক ডামস্টার্ট ফ্রাংকফুর্ট ভিয়েনা প্রাগ স্টুটগার্ট-এ বক্তৃতা। জুলাইয়ের মাঝামাঝি বোলপুরে ফেরা। আগস্টের মাঝামাঝি শিক্ষার মিলন রচনা করে গান্ধির অসহযোগিতানীতির সমালোচনা ও দেশব্যাপী বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েও সত্যের আহ্বান লিখে গান্ধিজীর পুনশ্চ সমালোচনা। সেপ্টেম্বরে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্যও কবির সমালোচনা। ষাট বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার কারণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-কর্তৃক সম্বর্ধনা। নভেম্বরে শান্তিনিকেতনে সিলভাঁ লেভি-র অতিথি-অধ্যাপকরূপে আগমন।

ঋণশোধ নাটক ব্যতীত এই বছর কবির ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় গ্রেটার ইন্ডিয়া, পোয়েম্স ফ্রম টেগোর, দ্য রেক, গ্লিম্পসেস ফ্রম বেঙ্গল, দ্য ফিউজিটিভ এবং থট রেলিক্স।

মৃত্যু সুরেশচন্দ্র সমাজপতির।

১৯২২ স্টালিন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি। ইতালিতে মুসোলিনির ক্ষমতাদখল।

চিত্তরঞ্জন কর্তৃক স্বরাজ পার্টি গঠন। দেশে অসহযোগ আন্দোলনের হিংসাত্মক পরিণতির আশঙ্কা করে ৪ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গলি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের পত্রপ্রকাশ।

জানুয়ারিতে মুক্তধারা রচনা। ফেব্রুয়ারিতে চৌরিচৌরায় জনতার হাতে পুলিশহত্যা। অসহযোগের হিংসাশ্রয়ী পরিণাম সম্পর্কে কবির আশঙ্কার বাস্তব পরিণতি। শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন কেন্দ্রের উদ্‌বোধন, পরিচালক এল্মহার্স্ট। ১৭ ফেব্রুয়ারি নাট্যকার মলিয়েরে-এর ত্রিশত জন্মবর্ষোৎসব উপলক্ষ্যে কবির ভাষণ। ১০ মার্চ ছয় বছরের জন্য গান্ধিজীর কারাদণ্ডের সংবাদে মুক্তধারা অভিনয়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত। ২৬ মে বিশ্বভারতী সোসাইটির রেজেস্ট্রিকরণ। রবীন্দ্র-রচনার সর্বস্বত্ব বিশ্বভারতীতে হস্তান্তরিত। ৮ জুলাই শেলির মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কলকাতায় ভাষণ। ৯ জুলাই রামমোহন লাইব্রেরিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রয়াণ উপলক্ষ্যে স্মরণসভায় কবিতাপাঠ। ২৮ জুলাই বিশ্বভারতী সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় শারদোৎসব অভিনয়ে কবির সন্ন্যাসীর ভূমিকাগ্রহণ। সেপ্টেম্বরে সফর ব্যাঙ্গালোরে, অকটোবরে ম্যাঙ্গালোরে, সিংহলে। নভেম্বরে কেরালার বিভিন্ন স্থানে সফর। প্রত্যাবর্তনের পর ডিসেম্বরে গুজরাটে। পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে।

এই বৎসর বিশ্বভারতীতে অতিথি অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি ছাড়াও উইন্টারনিৎস, লেসনি, স্টেলা ক্র্যামরিশ, কলিনস, স্লোমিথ ফ্লম, বেনোয়া, বগদানভ, গেদেস, স্টানলি জোনস। এলমহার্স্ট এন্ডরুজ পিয়ার্সন ও আশ্রমের কাজে নিযুক্ত।

কবির প্রকাশিত গ্রন্থ লিপিকা, মুক্তধারা ও শিশু ভোলানাথ। ইংরেজি ক্রিয়েটিভ ইউনিটি।

মৃত্যু সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অন্যান্য গ্রন্থ দীনেশচন্দ্র সেনের ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাকুঠি। নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ধূমকেতু পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী-সহ প্রকাশিত।

১৯২৩ জার্মানিতে হিটলারের ব্যর্থ অভ্যুত্থান। তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের গণ অভ্যুত্থান।

চিত্তরঞ্জন দাস কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র।

জানুয়ারিতে অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে। কবিকর্তৃক সম্বর্ধিত। লর্ড লিটনের আশ্রম পরিদর্শন, অধ্যাপকদের সভা-বয়কট। ফেব্রুয়ারি কারারুদ্ধ নজরুলের নামে বসন্ত গীতিনাট্য উৎসর্গ, কলকাতায় বসন্ত গীতিনাট্যের অভিনয়। মার্চে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য বারাণসী যাত্রা ; সেখান থেকে লখনৌ অতুলপ্রসাদের কাছে, তারপর বোম্বাই হায়দ্রাবাদ পোরবন্দর সফর, এপ্রিলে বোলপুরে প্রত্যাবর্তন। এপ্রিলের শেষে শিলং-এ, রক্তকরবী রচনায় নিযুক্ত। জুলাই বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের জন্ম। আগস্টের শেষে কলকাতা এম্পায়ার মঞ্চে বিসর্জন, জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। পূজাবকাশে পূরবীর সূচনা। রথযাত্রা নাটক। নভেম্বরে কাথিয়াবাড় সফর। পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে।

এই বৎসর প্রকাশিত হয় বসন্ত।

মৃত্যু পিয়ার্সন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত।

গ্রন্থ শরৎচন্দ্র রচিত দেনাপাওনা, মণীন্দ্রলাল বসুর রমলা। দীনেশরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় কল্লোল পত্রিকার প্রকাশ।

১৯২৪ দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তীব্রতা বৃদ্ধি। সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেলে বন্দি। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স নামক কালাকানুন জারি ও বিনাবিচারে শত শত তরুণকে হাজতে পোরা। বন্দি থাকাকালীনই সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত।

জানুয়ারিতে জাপানি শিল্পী কালাহারা নির্মিত বৃক্ষকুটিরে কবির বাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে কবির তিনটি ভাষণ। মার্চের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথের চীনযাত্রা, এপ্রিল-মে চীনের

নানা স্থানে সফর ও বক্তৃতা। জুনে পুনরায় জাপানে। জাপানি সমাজের পাশ্চাত্য অনুচিকীর্ষার সমালোচনা। ২২ জুলাই শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন। সেপ্টেম্বরে অরূপরতন—অ্যালফ্রেড থিয়েটারে মূকাভিনয়। সেপ্টেম্বরে পেরু যাত্রার উদ্দেশ্যে আর্জেন্টিনা অভিমুখে, নভেম্বরে বুয়েনাস এয়ারসে উপস্থিতি এবং অসুস্থতার কারণে ভিকটোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্যগ্রহণ, ডিসেম্বর পর্যন্ত আর্জেন্টিনাবাস।

এই বৎসর প্রকাশিত হয় লেটার্স ফ্রম অ্যাবরড, কার্স অ্যান্ড ফেয়ারওয়েল, ইংরেজি গোরা।

মৃত্যু আশুতোষ চৌধুরী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

সজনীকান্ত দাসের শনিবারের চিঠি ও ফণীন্দ্রনাথ পালের যমুনা পত্রিকা প্রকাশিত।

১৯২৫ দেশব্যাপী চরকা-চালনা নিয়ে উত্তেজনা অব্যাহত। সরকারি দমননীতির ফলে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা ও নানাবিধ পুলিসি অত্যাচারে জনজীবন বিপর্যস্ত।

রবীন্দ্রনাথ জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আর্জেন্টিনা ত্যাগ করে ইতালির পথে, ২৩ জানুয়ারি পিপলস থিয়েটারে কবিসম্বর্ধনা। ২ ফেব্রুয়ারি ভেনিস থেকে ভারতাভিমুখে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ভারতে প্রত্যাবর্তন। মে মাসে শান্তিনিকেতনে পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা ও জন্মোৎসব। গান্ধিজী শান্তিনিকেতনে। জুলাই মাসে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান। স্টার থিয়েটারে পেশাদার শিল্পীদের চিরকুমার সভা-র অভিনয় দর্শন। সেপ্টেম্বরে মিসেস স্যাংগারকে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অভিমতপ্রদান। ২১ নভেম্বর ইতালি থেকে তুচ্চি ও ফর্মিকি শান্তিনিকেতনে অতিথি-অধ্যাপক। ১৯ ডিসেম্বর ভারতীয় দর্শন-কংগ্রেসে কবির সভাপতিরূপে ভাষণ। পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে।

এই বৎসর প্রবাহিণী, গৃহপ্রবেশ, পূরবী, টক্‌স ইন চায়না, পোয়েমস্, রেড অলিয়েন্ডার্স, ব্রোকেন টাইজ অ্যান্ড আদার স্টোরিজ এই কটি বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

মৃত্যু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ।

১৯২৬ জানুয়ারিতে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে সভাপতিত্বের জন্য লখনৌতে। ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা মৈমনসিংহ বরিশাল কুমিল্লা আগরতলা চাঁদপুর নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি পূর্ববংলার বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা, ভাষণ ও মার্চে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। এপ্রিলে কলকাতায় দাঙ্গা, রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া। মে মাসে কবিজন্মোৎসবে নটীর পূজা অভিনয়। ইতালি সরকারের আমন্ত্রণে ইতালি যাত্রা। ৩১ মে মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ইতালির বিভিন্ন শহরে কবি-সম্বর্ধনা ও ভাষণ ও ইতালিতে চিত্রাঙ্গদা অভিনয়দর্শন। ইতালি সরকারের আতিথেয়তায় কবির কৃতজ্ঞতা। ১৫ জুন কবির ইচ্ছানুসারে রোম থেকে অন্তরীণ ক্রোচেকে এনে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা। জুন-জুলাই ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত কবির বিশ্রামের জন্য সুইজারল্যান্ডে ভিলেনুভে যাত্রা ও রোমাঁ রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সেখানেই ফ্যাসিবাদী ইতালির স্বরূপ সম্পর্কে কবির নতুন অভিজ্ঞতা, কবির ভাষণকে বিকৃত করে ফ্যাসিবাদী শাসনের অনুকূলে ব্যবহারের অসদুদ্দেশ্য বিষয়ে সচেতনতা, ফর্মিকির কাছে কবির প্রতিবাদপত্র। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি, জুরিখে ফ্যাসিস্টদের দ্বারা উৎপীড়িত বাস্তুহারানোর সাক্ষাৎ লাভ, মুসোলিনি সম্পর্কে মোহভঙ্গ। ভিয়েনা প্যারি হয়ে লন্ডনে প্রত্যাবর্তন। সেখান থেকে অসলো, স্টকহোম, কোপেনহেগেন ইত্যাদি অঞ্চলে সফর ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সেপ্টেম্বরে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে প্রেরিত পত্রে ফ্যাসিবাদী বর্বরতা ও প্রতারণা সম্পর্কে কবির প্রকাশ্য সমালোচনা ও ইতালির পত্রিকাগুলিতে কবির বিরুদ্ধে উষ্মাপ্রকাশ। হামবুর্গ বার্লিন ড্রেসডেন প্রাহা ভিয়েনা বুদাপেস্ট বেলগ্রেড কায়রো হয়ে স্বদেশে। ডিসেম্বরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ডে কবির প্রতিক্রিয়া।

গ্রন্থ চিরকুমার সভা, শোধবোধ, নটীর পূজা, রক্তকরবী, ঋতুউৎসব, শেষবর্ষণ।

মৃত্যু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

অন্যান্য গ্রন্থ শরৎচন্দ্রের পথের দাবী, নরেন্দ্র দেবের ওমর খৈয়াম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাঁক, অমৃতলাল বসুর ব্যাপিকাবিদায়, ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণ। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সম্পাদিত গণবাণী প্রকাশিত হল।

১৯২৭ ব্রাসেলসে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলন শুরু। ব্রিটেনে ধর্মঘট-এর উপর নিষেধাজ্ঞা।

জানুয়ারিতে কলকাতায় নটীর পূজা অভিনয়, নটীর ভূমিকায় নন্দলাল-কন্যা গৌরী দেবীর নৃত্যের জন্য অভাবিত প্রশংসা লাভ ও উপালির ভূমিকায় স্বয়ং কবির অভিনয়। ফেব্রুয়ারি সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে সংবাদপত্রে কবির খোলা চিঠি! বসন্তোৎসবে নটরাজ ঋতুরঙ্গশালার অভিনয়। মার্চে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্বের জন্য রাজস্থান সফর। আমেদাবাদ হয়ে এপ্রিলে কলকাতায় ফেরা। মে-জুন শিলং-য়ে, যোগাযোগ উপন্যাস শুরু। জুলাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফর আরম্ভ, সিঙ্গাপুর মালাক্কা কুয়ালালামপুর তাইপিং পিনাং মালয় সুমাত্রা জাভা বালিদ্বীপ জাকার্তা বানদুং ব্যাংকক হয়ে অকটোবরে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বরে পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে।

প্রকাশিত গ্রন্থ লেখন ও ঋতুরঙ্গ।

মৃত্যু ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

অন্যান্য গ্রন্থ জীবনানন্দ দাশের ঝরা পালক, মোহিতলাল মজুমদারের বিস্মরণী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বেদে। বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত প্রগতি পত্রিকার প্রকাশ। মুজফফর আহ্‌মদ সম্পাদিত গণবাণী পত্রিকায় কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-র প্রথম বাংলা তর্জমা।

১৯২৮ কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধি-কর্তৃক প্রথম ডোমিনিয়ান স্টেটাস দাবি। সুভাষচন্দ্র কর্তৃক বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দল গঠন।

জানুয়ারিতে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল শান্তিনিকেতনে এলেন। মার্চে জোড়াসাঁকো ভবনে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা বিষয়ে নতুন ও প্রবীণ লেখকদের সভায় কবি। মে মাসে কবি আদেয়ারে বেসান্তের অতিথি, সেখানে শেষের কবিতা রচনার সূত্রপাত। পণ্ডিচেরিতে রবীন্দ্র-শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ। মে-র শেষে দ্বিতীয় সিংহলভ্রমণ। জুনে প্রত্যাবর্তন, বাঙ্গালোরে শেষের কবিতা রচনা সমাপ্ত। যোগাযোগ উপন্যাসও শেষ হল। মহুয়ার কবিতা রচনার পালা। জুলাই শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব, শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ। ২২ আগস্ট ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ভাষণ। সেপ্টেম্বরে চিত্রাঙ্কনের সূত্রপাত। ডিসেম্বরে ভাইসরয় লর্ড আরউইন কর্তৃক আশ্রমপরিদর্শন।

প্রকাশিত গ্রন্থ শেষরক্ষা এবং ইংরেজি ফায়ার ফ্লাইজ, লেটার্স টু এ ফ্রেন্ড, টেগোর বার্থডে বুক, লেটার্স অ্যান্ড অ্যাড্রেসেস।

মৃত্যু লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

অন্যান্য গ্রন্থ নজরুলের সঞ্চিতা, জসীমউদ্দীনের নকশিকাঁথার মাঠ, প্রবোধকুমার সান্যালের যাযাবর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রসকলি।

১৯২৯ ফ্লেমিং কর্তৃক পেনিসিলিন আবিষ্কার। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। অনশনে যতীন দাসের মৃত্যু।

জানুয়ারিতে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে সুন্দর অভিনীত। ব্রাহ্মসমাজের শতাব্দিপূর্তি উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ধর্ম মহাসম্মেলনের উদ্‌বোধন। ৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনে সমবায় সম্মেলন। ফেব্রুয়ারি-মার্চ বোম্বাই হয়ে কলম্বো সিঙ্গাপুর, হংকং, শাংহাই, কোবে, ইয়োকোহামা, এবং পরে কানাডার বিভিন্ন শহরে সফর ও বক্তৃতা। এপ্রিলে আমেরিকার লস এঞ্জেলস থেকেই পাশপোর্টের ঝামেলায় আমেরিকাত্যাগ। এপ্রিল-মে জাপানে। জুনে ইন্দোচীনের পথে সায়গনে, জুলাই

কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। আগস্টে তপতী রচনা, সেপ্টেম্বরে তপতীর অভিনয়, বিক্রমদেবের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। ডিসেম্বরে পৌষ-উৎসবে শান্তিনিকেতনে।

প্রকাশিত গ্রন্থ পরিত্রাণ, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, তপতী, মহুয়া। থটস ফ্রম টেগোর।

মৃত্যু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন দাস, অমৃতলাল বসু।

অন্যান্য গ্রন্থ বুদ্ধদেব বসুর সাড়া, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালি, জগদীশ গুপ্তের অসাধু সিদ্ধার্থ।

১৯৩০ নাৎসি জার্মানি হিটলারের নেতৃত্বে জাগছে। সি ভি রমন নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

স্বাধীনতা-আন্দোলনে ভারতের অগ্নিগর্ভ পরিবেশ। গান্ধির ডাণ্ডি অভিযান, চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন, টেগার্টের উদ্দেশে বোমা, বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিলডিং অভিযান, মেছুয়াবাজারে বোমার মামলা প্রভৃতি উত্তেজক ঘটনা।

জানুয়ারিতে রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমভারত সফর। মার্চে অকসফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতার উদ্দেশ্যে লন্ডনযাত্রা। পথে চিত্রচর্চা। মে মাসে প্যারিতে চিত্রপ্রদর্শনীর চেষ্টা এবং বুয়েনস এয়ারস থেকে ভিকটোরিয়া ওকাম্পোকে আনিয়ে তাঁর সাহায্যে প্রদর্শনীর আয়োজন ও প্রচারের ব্যবস্থা। প্যারিতেই কবির জন্মোৎসবপালন।

১১ মে ইংলন্ডে এসে গান্ধির লবণআইন ভঙ্গ, কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, শোলাপুরে সামরিক আইন জারি, ঢাকায় দাঙ্গাহাঙ্গামা। কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণার অর্ডিনান্স জারির কথা সবিস্তারে রবীন্দ্রনাথের জানার অভিজ্ঞতা এবং ১৬ মে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন। ১৯-২৬ মে হিবার্ট বক্তৃতা (দ্য রিলিজিয়ান অফ্ ম্যান) প্রদান। ২৪ মে কোয়েকারদের সভায় বক্তৃতা। লন্ডন থেকে জার্মানি ও ইউরোপের নানা শহরে সফর করে আমেরিকায় বক্তৃতা-সফর। জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বার্লিন, মিউনিক, ফ্রাংফুর্ট, মারবুর্গ, ডেনমার্ক, কোপেনহেগেন-এ চিত্রপ্রদর্শনী। ১২-২৪ সেপ্টেম্বরে রাশিয়াভ্রমণ ও বিপুল জনসম্বর্ধনা। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা দেখে কবি অভিভূত। অকটোবরে আমেরিকায় বক্তৃতা, সম্বর্ধনা ও চিত্রপ্রদর্শনী। নিউইয়র্ক, বস্টন, নিউহ্যাভেন, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও শিল্পকেন্দ্র পরিভ্রমণ করে ডিসেম্বরে লন্ডনে প্রত্যাবর্তন।

এই বৎসর প্রকাশিত হয় ভানুসিংহের পত্রাবলী ও দ্য রিলিজিয়ান অফ ম্যান।

মৃত্যু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থ অজিত দত্তের কুসুমের মাস, জসীমউদ্দীনের বালুচর, বুদ্ধদেব বসুর বন্দীর বন্দনা।

১৯৩১ চীনের মাঞ্চুরিয়া জাপানের অধিকারে এল।

বন্দীমুক্তি নিয়ে গান্ধি-আরউইন চুক্তি। দেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষবৃদ্ধি। বাংলায় সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ।

৮ জানুয়ারি বার্নার্ড শ-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপচারিতা, ৩১ জানুয়ারি ভারতে প্রত্যাবর্তন। মার্চে শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব, নবীন রচনা ও অভিনয়। মার্চের ১৭-১৯ কলকাতায় নবীন অভিনয়। মে মাসে কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট বুদ্ধিজীবীদের বৃহৎ সমাবেশে সুসমারোহে কবির ৭০তম জন্মোৎসব পালনের সিদ্ধান্ত। বকসা দুর্গের কারাবন্দিদের দ্বারা কবির জন্মোৎসব পালন। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় শিশুতীর্থের অভিনয়। ১৬ সেপ্টেম্বর হিজলি জেলে গুলিবর্ষণের ফলে রাজবন্দিদের মৃত্যুসংবাদে কবির প্রতিক্রিয়া ও প্রকাশ্য সভায় ধিক্কারজ্ঞাপন। ডিসেম্বরে টাউন হল-এ সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্রজন্মোৎসবের সূচনা ও এদেশে প্রথম কবির চিত্রপ্রদর্শনী। ২৭ ডিসেম্বর টাউন হল-এ কবিসম্বর্ধনা। দ্য গোলডেন বুক অফ টেগোর প্রকাশ। জোড়াসাঁকোয় নটীর পূজা, শাপমোচন অভিনয় ; সিনেট হল-এ ছাত্রসমাজ-কর্তৃক কবিসম্বর্ধনা।

প্রকাশিত গ্রন্থ দ্য চাইলড, রাশিয়ার চিঠি, শাপমোচন, বনবাণী, গীতবিতান ১-২, সঞ্চয়িতা, সহজ পাঠ।

মৃত্যু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শান্তা দেবী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

অন্যান্য গ্রন্থ নজরুল ইসলামের প্রলয়শিখা, শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চৈতালি ঘূর্ণি। জগদীশ গুপ্তের লঘুগুরু। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় পরিচয় পত্রিকার প্রকাশ।

১৯৩২ গোলটেবিল বৈঠক-শেষে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধিজীর গ্রেপ্তারে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া। রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী একদিন পূর্বেই স্থগিত ঘোষণা। সংবাদপত্রের সেনসর নীতিতে উদ্‌বেগ প্রকাশ। প্রশ্ন কবিতা রচনা। এপ্রিলে পারস্যে যাত্রা, বিমানে ভ্রমণ। পারস্যের বহু শহরে বিপুল সম্বর্ধনালাভের পর জুনে বিমানযোগে প্রত্যাবর্তন। ৬ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক কবিসম্বর্ধনা। ৮ আগস্ট জার্মানিতে দৌহিত্র নীতীন্দ্রের অকালবিয়োগ। সেপ্টেম্বরে শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে কালের যাত্রা উৎসর্গ। ২৬ সেপ্টেম্বর পুনা য়ারবেদা জেলে অনশনরত গান্ধিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও গান্ধিজীর অনশনভঙ্গ। পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে।

প্রকাশিত গ্রন্থ পরিশেষ, কালের যাত্রা, পুনশ্চ, গীতবিতান ৩; মহাত্মাজী অ্যান্ড ডিপ্রেস্‌ড হিউম্যানিটি, দ্য গোলডেন বোট, শীভ্‌স।

মৃত্যু বিপিনচন্দ্র পাল, স্বর্ণকুমারী দেবী, নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (নীতু), কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

অন্যান্য গ্রন্থ প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথমা, বিষ্ণু দে-র উর্বশী ও আর্টেমিস, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাজিত।

১৯৩৩ হিটলার জার্মানির চান্সেলর। অস্ট্রিয়ায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। জার্মানির লিগ অফ নেশনস ত্যাগ ও গোপন রণসজ্জা। জাতীয় কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ স্তব্ধ করার আয়োজন, সূর্য সেনের গ্রেপ্তার।

জানুয়ারিতে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষের ধর্ম শীর্ষক কমলা বক্তৃতা প্রদান। ফেব্রুয়ারিতে রামমোহনের মৃত্যুশতবর্ষে ইংরেজিতে ভাষণ, মার্চে শাপমোচন অভিনয়। এপ্রিলে গান্ধির পুনরায় অনশন-সংবাদে কবির উদ্‌বেগ। ১২ জুলাই উদয়শঙ্করকে শান্তিনিকেতনে কবিকর্তৃক সম্বর্ধনা-জ্ঞাপন। আগস্টে তাসের দেশ ও চণ্ডালিকা রচনা। সেপ্টেম্বরে ম্যাডান থিয়েটারে তাসের দেশ ও গদ্যনাট্য চণ্ডালিকা অভিনয়। নভেম্বর-ডিসেম্বরে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ ও বক্তৃতাসূচি, মাদ্রাজে রবীন্দ্রসপ্তাহ উদ্‌যাপনে কবির উপস্থিতি।

প্রকাশিত গ্রন্থ দুই বোন, বিচিত্রিতা, মানুষের ধর্ম, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, বাঁশরি, ভারত- পথিক রামমোহন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষার বিকিরণ।

মৃত্যু যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কামিনী রায়।

অন্যান্য গ্রন্থ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের আমরা, অন্নদাশঙ্কর রায়ের কালের শাসন, প্রবোধকুমার সান্যালের প্রিয়বান্ধবী, বুদ্ধদেব বসুর যেদিন ফুটল কমল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপনয়ন, মিছিল।

১৯৩৪ হিটলার জার্মানির সর্বময় কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত। পোলান্ডের সঙ্গে হিটলারের সখ্যস্থাপন। অস্ট্রিয়া দখলের চেষ্টা।

চীনে মাও সে তুঙ-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির লংমার্চ।

চট্টগ্রাম চব্বিশ ঘন্টার জন্য ব্রিটিশ শাসনমুক্ত। সূর্য সেন ও দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি। বিহারে বিধ্বংসী ভূমিকম্প।

জানুয়ারিতে শান্তিনিকেতনে সরোজিনী নাইডুর সম্বর্ধনা। আশ্রমছাত্রী কন্যা ইন্দিরাকে দেখার জন্য জওহরলাল ও কমলা নেহেরুর শান্তিনিকেতনে আগমন। ফেব্রুয়ারিতে বিহার ভূমিকম্পকে গান্ধিকর্তৃক অস্পৃশ্যতার অভিশাপ বলার প্রতিবাদে গান্ধিকে রবীন্দ্রনাথের পত্র। মে মাসে সিংহল

যাত্রা, শাপমোচন অভিনয় ও অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা। চার অধ্যায় রচনা। ক্যাভিনাচ দর্শনের অভিজ্ঞতা। জুলাইতে কলকাতায় গান্ধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার। আগস্টে শ্রাবণগাথা অভিনয়, আগস্টে শান্তিনিকেতনে সীমান্ত গান্ধি খান আবদুল গফুর খান। ২২ অকটোবর মাদ্রাজে কবির নাগরিক সম্বর্ধনা, চিত্রপ্রদর্শনী ও শাপমোচন অভিনয়। নভেম্বরে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ। ডিসেম্বরে বারাণসীতে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের উদ্‌বোধন। কলকাতায় নিখিলবঙ্গ সংগীত সম্মেলনে ভাষণ।

প্রকাশিত গ্রন্থ মালঞ্চ, শ্রাবণগাথা ও চার অধ্যায়।

মৃত্যু অতুলপ্রসাদ সেন, সূর্য সেন, দীনেশ মজুমদার।

অন্যান্য গ্রন্থ জসীমউদ্দীনের সোজনবাদিয়ার ঘাট, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের অমাবস্যা, অন্নদাশঙ্কর রায়ের কামনাপঞ্চবিংশতি।

১৯৩৫ ইউরোপে মন্দা বেকারি দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান। ফ্যাসিবাদও ক্রমশই প্রসারিত। মুসোলিনির ফ্যাসিবাদী বাহিনী কর্তৃক অবিসিনিয়া দখল। ব্রিটিশ-জার্মান নৌচুক্তি। প্যারিতে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলন।

জানুয়ারিতে গভর্নর এন্ডারসনের আশ্রম-পরিদর্শন ও প্রতিবাদে আশ্রমিক ছাত্রদের আশ্রম-ত্যাগ। ফেব্রুয়ারিতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথকর্তৃক সমাবর্তন ভাষণ প্রদান। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ, লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে কবির ইচ্ছানুসারে নির্মিত মৃৎকুটির শ্যামলীর উদ্‌বোধন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে সম্বর্ধনা। কিছুদিন কৈশোর-যৌবনের স্মৃতিবিজড়িত চন্দননগর গঙ্গাতীরে বাস। সেপ্টেম্বরে শারদোৎসব অভিনয়, সন্ন্যাসীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। অকটোবরে কালীঘাট মন্দিরে জীববলিবিরোধী আন্দোলন সমর্থন করায় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে কবির বিরুদ্ধে সমালোচনা। নভেম্বরে শ্রীনিকেতনে নবান্ন উৎসবের প্রবর্তন। শান্তিনিকেতনে জাপানি কবি নোগুচির সম্বর্ধনা। ডিসেম্বরে নিউ এম্পায়ারে অরূপরতন অভিনয়ে কবি ঠাকুরদার ভূমিকায়। পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে।

এই বৎসর কবির প্রকাশিত গ্রন্থ শেষ সপ্তক, বীথিকা এবং ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে মতবিনিময় সুর ও সংগতি। গিলবার্ট মারের সঙ্গে পত্রবিনিময় East and West।

মৃত্যু দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অন্যান্য গ্রন্থ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অর্কেস্ট্রা, দীনেশচন্দ্র সেনের বৃহৎবঙ্গ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাইকমল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিবারাত্রির কাব্য, জননী। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃশীলা, বনফুলের তৃণখণ্ড। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা পত্রিকার প্রকাশ।

১৯৩৬ স্পেনে ফ্যাসিবাদী সরকার কর্তৃক গণতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদের প্রতিক্রিয়ায় গৃহযুদ্ধ, বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও শান্তি-আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণ, লোরকা ও কডওয়েলের শোচনীয় মৃত্যুবরণ। রোমাঁ রলাঁর উদ্যোগে ব্রাসেলসে বিশ্বশান্তি সম্মেলন।

স্বদেশে ব্রিটিশ শাসকদের পরিকল্পিত ভারত-বিভাগ সম্পর্কে গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ—প্রথম স্বাক্ষরকারী রবীন্দ্রনাথ। নিখিলভারত প্রগতি লেখকসংঘ প্রতিষ্ঠা। মার্চে সদ্যরচিত চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের অভিনয় ; প্রথমে কলকাতার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে, পরে পাটনা এলাহাবাদ লাহোর দিল্লি প্রভৃতি শহরে। গান্ধি কর্তৃক বিড়লা গোষ্ঠীর কাছ থেকে কবিকে বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে ষাট হাজার টাকা প্রদান ও এই বয়সে কবিকে ঘোরাঘুরি না করার জন্য অনুরোধ। এপ্রিলে নববর্ষ-দিবসেই কবিজন্মদিবস পালনের রীতির প্রবর্তন। কৃষ্ণ কৃপালনির সঙ্গে দৌহিত্রি নন্দিতার বিবাহ সম্পন্ন। জুলাই মাসে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সিভিল লিবার্টিজ-এর সভাপতি পদগ্রহণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিসম্বর্ধনা। সেপ্টেম্বরে ব্রাসেলসে শান্তি ও স্বাধীনতাকামী আন্তর্জাতিক মহিলা সংঘের অনুরোধে বাণীপ্রেরণ অকটোবরে পরিশোধ নৃত্যনাট্য রচনা (শ্যামা-র পূর্বরূপ) ও আশুতোষ কলেজে অভিনয়। পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে।

এই বৎসর প্রকাশিত হয় নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, পত্রপুট, জাপানে-পারস্যে, শ্যামলী, সাহিত্যের পথে এবং কালেকটেড পোয়েমস অ্যান্ড প্লেজ।

অন্যান্য গ্রন্থ জীবনানন্দের ধূসর পাণ্ডুলিপি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রিয়া ও পৃথিবী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা, সরোজকুমার রায়চৌধুরীর কালো ঘোড়া।

১৯৩৭ চীন ও জাপান যুদ্ধে বিরত। স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেয়ে ব্রহ্মদেশ পৃথক রাষ্ট্র। চটকল ধর্মঘট। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি নামক রাজনৈতিক দলগঠন।

ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম বেসরকারি ব্যক্তি হিসাবে সমাবর্তন ভাষণ দানের জন্য রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত ও প্রথম বাংলায় ভাষণ দান। স্পেনে গৃহযুদ্ধের পরিণামে ফ্যাসিবাদ কর্তৃক গণতন্ত্রের নিধন। লিগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম অ্যান্ড ওয়ার-এর সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। এপ্রিলে চীনাভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন। চটকল ধর্মঘটে শ্রমিকদের দাবির প্রতি কবির সমর্থনজ্ঞাপন। এপ্রিল থেকে জুনে আলমোড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ। বিশ্বপরিচয় ও ছড়ার ছবি রচনা। আগস্টে আন্দামানে সরকারি অত্যাচারে প্রতিবাদে রাজবন্দিদের অনশন, ধর্মঘটের সমর্থনের আহূত জনসভায় কবির সভাপতিপদ গ্রহণ। ১০ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতন উত্তরায়ণে অকস্মাৎ সংজ্ঞালোপ ও আরোগ্যের পর প্রান্তিক-এর কবিতা রচনা। আরোগ্যের জন্য কলকাতায়।

পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে।

এই বৎসর প্রকাশিত কবির গ্রন্থ ম্যান, সে, খাপছাড়া, ছড়ার ছবি, বিশ্বপরিচয়, কালান্তর।

অন্যান্য গ্রন্থ বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতী, সমর সেনের কয়েকটি কবিতা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ক্রন্দসী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগুন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মোহানা।

১৯৩৮ ইউরোপে হিটলার মুসোলিনির ক্রমবর্ধমান দাপট, জার্মানি-কর্তৃক অস্ট্রিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস। জানুয়ারিতে এন্ডরুজ কর্তৃক হিন্দিভবনের ভিত্তিস্থাপন। মার্চে দোল-পূর্ণিমায় আশ্রমে নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা। পরে কলকাতায় নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার অভিনয়—কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র উপস্থিত। মে মাসে জন্মদিনে কবি কালিমপঙে। সেপ্টেম্বরে নোগুচির সঙ্গে জাপানের আগ্রাসিতা ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বিষয়ে কবির সমালোচনামূলক পত্রবিনিময়। সেপ্টেম্বরে হিটলার-কর্তৃক চেক দখল করায় লেসনির কাছে লিখিত পত্রে কবির গভীর উদ্‌বেগ ও বেদনা জ্ঞাপন, প্রায়শ্চিত্ত কবিতা রচনা। নভেম্বরে কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুতে কবির ভাষণ। ডিসেম্বরে কবির অনুপস্থিতিতে লন্ডনে কবির চিত্রপ্রদর্শনী। পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে। প্রকাশতি গ্রন্থ প্রান্তিক, চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য, পথে ও পথের প্রান্তে, সেঁজুতি, বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বাংলা কাব্যপরিচয়।

মৃত্যু গগনেন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যান্য গ্রন্থ অমিয় চক্রবর্তীর খসড়া, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক।

১৯৩৯ রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি, জার্মানির পোল্যান্ড ও ফিনল্যান্ড আক্রমণ, সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। জার্মানির বিরুদ্ধে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধঘোষণা।

কংগ্রেসের সরকারি প্রতিনিধিকে পরাজিত করে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস- সভাপতি। অবশেষে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্করণ, সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক নামক নতুন রাজনৈতিক দলগঠন। মহাজাতিসদন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ।

জানুয়ারিতে কবিকর্তৃক ত্রিপুরাধিপতি বীরবিক্রম মাণিক্যের সম্বর্ধনা, শান্তিনিকেতনে সুভাষচন্দ্রের সম্বর্ধনা। জওহরলাল কর্তৃক হিন্দিভবন উদ্‌বোধন। ফেব্রুয়ারি কলকাতায় শ্রী মঞ্চে নৃত্যনাট্য শ্যামার অভিনয়। এপ্রিল-মে-জুনে পুরী ও মংপুতে বাস। আগস্টে চীনাভবনে বোধিদ্রুমের চারারোপণ। ১৯ আগস্ট কংগ্রেস-থেকে-বিতাড়িত সুভাষচন্দ্র কর্তৃক মহাজাতিসদনের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, কবিকর্তৃক ভিত্তিস্থাপন। সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে কবি পুনরায় মংপুতে। ১৫ ডিসেম্বর মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির উদ্‌বোধনের জন্য যাত্রা, হাওড়া স্টেশনে কবির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের নিভৃতে আলাপ।

শান্তিনিকেতনে ফিরে ২০ ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে গান্ধিকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম। পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে।

এই বৎসর প্রকাশিত গ্রন্থ প্রহাসিনী, নৃত্যনাট্য শ্যামা, পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

মৃত্যু দীনেশচন্দ্র সেন, প্রসন্নময়ী দেবী।

অন্যান্য গ্রন্থ অজয় ভট্টাচার্যের ঈগল, অমিয় চক্রবর্তীর একমুঠো, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পৃথিবী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাত্রীদেবতা।

১৯৪০ ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কর্তৃক ফ্যাসিবাদী জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীকে সংহত করার রাজনৈতিক উদ্যোগ। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের উপর ইতালির আক্রমণ। ডানকার্কের যুদ্ধে জার্মানির কাছে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের পরাজয়। ফ্রান্সের বৃহৎ অংশ জার্মানির অধিকারে। ডেনমার্ক নরওয়ে হল্যান্ড বেলজিয়াম সবই জার্মানির কাছে পরাস্ত। জাপানের ভারত-আক্রমণ।

ফেব্রুয়ারিতে গান্ধি ও কস্তুরবার আশ্রম-পরিদর্শন ও আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তাঁদের সম্বর্ধনা, গান্ধিজীর কাছে কবির জীবনাবসানের পর আশ্রমের দায়িত্বগ্রহণের জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুরোধজ্ঞাপন। ২১ ফেব্রুয়ারি সিউড়ির মেলা উদ্‌বোধন। মার্চে বাঁকুড়ায় প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন, মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রস্থাপন; গ্রেট ব্রিটেনের ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সিভিল লিবার্টিজ-এর সভাপতি নেভিনসনের অনুরোধে কবির সহসভাপতির পদ গ্রহণ। এপ্রিল থেকে জুনে মংপু ও কালিমপঙে গ্রীষ্মযাপন। ৮ মে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে পত্র। আগস্টে অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শান্তিনিকেতনে এসে কবিকে সাম্মানিক ডি-লিট প্রদান। ৩ সেপ্টেম্বর কবির জীবনের শেষ বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে যোগদান। পুনরায় কালিমপঙে আনা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। নভেম্বরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে শান্তিনিকেতনে। পৌষ উৎসবে কবির শেষ ভাষণ আরোগ্য পঠিত।

এই বৎসর প্রকাশিত গ্রন্থ ইংরেজি : মাই বয়হুড ডেজ; বাংলা : নবজাতক, সানাই, চিত্রলিপি, রোগশয্যায়; রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম খণ্ড, অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড।

মৃত্যু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এন্ডরুজ, কালীমোহন ঘোষ, বিনয়কুমার সরকার, অমিতা সেন (খুকু)।

অন্যান্য গ্রন্থ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ হিন্দু হোটেল, বুদ্ধদেব বসুর নতুন পাতা, সমর সেনের গ্রহণ, মণীশ ঘটকের শিলালিপি, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উত্তরফাল্গুনী, প্রবোধকুমার সান্যালের নদ ও নদী। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় মৌচাক। সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় নিরুক্ত পত্রিকা প্রকাশিত। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় আধুনিক বাংলা কাব্য সংকলন প্রকাশিত।

১৯৪১ ইংলন্ডের উপর জার্মানির বিমান আক্রমণ, অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করে জার্মানির সোভিয়েত আক্রমণ; বিনা প্ররোচনায় পার্ল হারবারে জাপানের বোমাবর্ষণ; মিত্রশক্তির পক্ষে আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ও বিদেশে আজাদহিন্দ ফৌজ গঠন।

জানুয়ারির মাঘোৎসবে কবির শেষ ভাষণ পঠিত, ফেব্রুয়ারিতে জীবনের শেষ বসন্ত উৎসবের জন্য কবিতারচনা। ১৪ এপ্রিল কবির শেষ জন্মোৎসব, শেষ গদ্য ভাষণ সভ্যতার সংকট পাঠ, শেষ গান 'ঐ মহামানব আসে' ও 'হে নূতন' রচনা। পঁচিশে বৈশাখ কবির জীবৎকালের শেষ জন্মোৎসব সমগ্র দেশে উদ্‌যাপিত। জুনে রোগশয্যা থেকে মিস র‍্যাথবোনের ভারতবিদ্বেষের জবাব রচনা। ২৫ জুলাই চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আনীত। ৩০ জুলাই অস্ত্রোপচার। অসুস্থ অবস্থায় শেষবারের মতো মুখে মুখে কবিতা রচনা। চৈতন্যলোপ ও ৭ আগস্ট ১৯৪১, ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ দ্বিপ্রহরে কবির জীবনাবসান। সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মন্দিরে কবির পূর্ব ইচ্ছানুসারে গাওয়া হয় 'সমুখে শান্তিপারাবার'।

এই বৎসর প্রকাশিত গ্রন্থ আরোগ্য, জন্মদিনে, সভ্যতার সংকট, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ষষ্ঠ সপ্তম খণ্ড ও অষ্টম খণ্ড, ক্রাইসিস ইন সিভিলাইজেশান।

মৃত্যু জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। বের্গর্স, ভার্জিনিয়া উলফ, জেমস জয়েস।

অন্যান্য গ্রন্থ বিষ্ণু দের স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ, অন্নদাশঙ্কর রায়ের উড়কি ধানের মুড়কি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অহিংসা।

সূত্র : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী
রবীন্দ্রজীবনী (১-৪)
প্রশান্তকুমার পাল রবিজীবনী (১-৬)
সমীর দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথ ও সমকাল
মুকুলেশ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি ও সমকালের দর্পণে, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা রবীন্দ্রসংখ্যা ১৩৯৪
নেপাল মজুমদার ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (১-৬)

লেখক-পরিচিতি

অজিতকুমার ঘোষ (জন্ম ১৯১৯) : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ডিন শ্রীঘোষের মনন গবেষণা ও আগ্রহক্ষেত্র মূলত নাট্যসাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ হলেও বাংলা সাহিত্যের একাধিক ক্ষেত্র তাঁর পরিশীলিত কৌতূহল ও রসজ্ঞ বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ হয়েছে। মৌলিক ও সম্পাদিত গ্রন্থসংখ্যা পঁচিশের মতো।

অনুনয় চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৩৮) : মার্কসবাদী সাহিত্য-সমালোচক ও বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল সংস্কৃতি-আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী, 'নন্দন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা- সম্পাদক শ্রীচট্টোপাধ্যায় মননশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের প্রবন্ধকার—গ্রন্থসংখ্যা সাত।

অমিতা ঠাকুর (১৯১১-১৯৯২) : রবীন্দ্রসাহিত্যের আদি ভাষ্যকার অজিত চক্রবর্তীর কন্যা, ও দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র অজীন্দ্রনাথের পত্নী অমিতা দেবী নৃত্যগীত-অভিনয়ে শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় কবির বহু অনুষ্ঠানে একদা পটুতা দেখিয়েছেন। তপতীর অভিনয়ে বিক্রমবেশী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহিষী-র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে এই নাতবৌ-কে 'মহিষী' বলে ডাকতেন। কবির উৎসাহে অমিতা কিছু গদ্য-পদ্য রচনা করেছিলেন। তাঁর একাধিক স্মৃতিচারণায় ঠাকুর- পরিবার ও রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-প্রতিভা বিষয়ে অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের সন্ধান মেলে।

অমিতাভ চৌধুরি (জন্ম ১৯২৮) : বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্যের এবং আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতার পাঠ নিয়ে শ্রীচৌধুরি প্রথমে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনায় ও পরে সাংবাদিকতা-বৃত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তিনি সাংবাদিকতাসূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে তাঁর তথ্যসংগ্রহ ও গবেষণা-বৈচিত্র্য রবীন্দ্রচর্চায় নতুন মাত্রা যোজনা করেছে। ছড়া-রচনায় এবং শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রেও যশস্বী। রবীন্দ্রচর্চা বিষয়ে গ্রন্থসংখ্যা বারো এবং অন্যান্য বিষয়ে আরও সতেরোর মতো।

অরবিন্দ পোদ্দার (জন্ম ১৯২০) : সিমলার ইনস্টিটিউট অফ্ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এর প্রাক্তন ফেলো এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ পোদ্দার মার্কসবাদী দৃষ্টিতে বঙ্কিমমানস বিশ্লেষণ করে প্রথম পিএইচ-ডি পেয়েছিলেন। উনিশ শতকের নবচেতনা থেকে শুরু করে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের নানা এলাকায় তাঁর যুক্তিবাদী মননের উজ্জ্বল আলো পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-বিশ্লেষণে তাঁর একটি বুদ্ধিদীপ্ত গ্রন্থ গভীর বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। গ্রন্থসংখ্যা পঁচিশের মতো।

অরুণকুমার বসু (জন্ম ১৯৩৩) : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্রের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এবং কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি-অধ্যাপক ডঃ বসু সংগীত ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণাসমৃদ্ধ অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। পঞ্চাশের দশকে প্রগতি সংস্কৃতি-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন ও

বর্তমানে কলকাতার সংস্কৃতি-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন। সম্পাদিত ও মৌলিক গ্রন্থসংখ্যা পনেরোর মতো।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৩০) : বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করে ডঃ মুখোপাধ্যায় সদ্য অবসর গ্রহণ করেছেন। মননসমৃদ্ধ গবেষক ও সমালোচক শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য-আগ্রহ বিবিধ বিষয়-বৈচিত্র্যে স্ফুরিত। গ্রন্থসংখ্যা ইংরেজি ও বাংলা মিলিয়ে, সম্পাদনাসহ বত্রিশ।

কনক মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯২১) : ইংরেজি সাহিত্যের ইনি প্রাক্তন অধ্যাপিকা, গণতান্ত্রিক মহিলা আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেত্রী এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য। 'একসাথে' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীযুক্তা মুখোপাধ্যায় মূলত কবিরূপেই সুপরিচিত, তবে তীক্ষ্ণ বিচক্ষণ মননশীল প্রবন্ধ রচনাতেও আগ্রহী। কাব্য ও প্রবন্ধ সমেত মোট গ্রন্থসংখ্যা দশের মতো।

কুমার রায় (জন্ম ১৯২৬) : প্রখ্যাত নট, নাট্যনির্দেশক ও নাট্য-অধ্যাপক শ্রীরায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করে এখন নাট্যচর্চাতে নিবিষ্ট। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ভিজিটিং ফেলো ও কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক অকাদেমির পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যপরিচালক, দীর্ঘকাল বহুরূপী নাট্যসংস্থার সঙ্গে যুক্ত। নাট্যাভিনয়ের নানা প্রয়োগগত ও রবীন্দ্রনাট্যের প্রযোজনাগত প্রসঙ্গে লিখিত ও নাট্যজীবনীসহ তাঁর গ্রন্থসংখ্যা চার।

ক্ষুদিরাম দাস (জন্ম ১৯১৩) : সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষজ্ঞরূপে সুবিদিত, প্রবীণ গবেষক, আজীবন শিক্ষাব্রতী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ দাস এই অশীতিপর জীবনেও অধ্যয়ন গবেষণা ও রচনাকর্মে নিরলস। তিনি একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা, রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত।

ক্ষেত্র গুপ্ত (জন্ম ১৯৩০) : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, মধুসূদনের সমগ্র জীবন ও সাহিত্যকর্ম এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শিল্পরীতি তাঁর বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্র। এছাড়াও সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন।

গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩) : বিচিত্র প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী, বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, সাংবাদিক, পত্রিকাসম্পাদক, মার্কসবাদী পণ্ডিত ও রাজনৈতিক কারণে কারাদণ্ডিত এই মনীষী ইংরেজি সাহিত্য ও আইনবিদ্যা দুই বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পন্ন করে সুনীতিকুমারের অধীনে গবেষণা শুরু করেন এবং পরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসায় সমাজবিজ্ঞানীর মনন, তীক্ষ্ণধী যুক্তি ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতের সুষম সমন্বয় ঘটেছে। প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প-উপন্যাস, গ্রন্থ-সম্পাদনা ও স্মৃতিচারণা মিলিয়ে গ্রন্থসংখ্যা পঞ্চাশের মতো।

চিত্তরঞ্জন লাহা (জন্ম ১৯৪০) : ডঃ লাহার শিক্ষাদীক্ষা বিহারের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্মজীবনে অধ্যাপনাসূত্রে প্রথমে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় পরে বিহার বিশ্ববিদ্যালয় ও রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর গবেষণা ও অধ্যয়নের ক্ষেত্র লোকসংস্কৃতি ভাষাতত্ত্ব মধ্যযুগীয় সাহিত্য আধুনিক সাহিত্য সর্বত্র প্রসারিত। মৌলিক ও সম্পাদিতসহ গ্রন্থসংখ্যা দশের বেশি।

চিন্মোহন সেহানবীশ (১৯১৩-১৯৮৭) : বুদ্ধিজীবী, গবেষক, মার্কসবাদী চিন্তাবিদ্ এবং প্রগতিশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী ও সংগঠকরূপে সেহানবীশ চল্লিশের দশক থেকে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ইত্যাদি সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সংস্রবে আসেন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। ভারত সোভিয়েত মৈত্রী আন্দোলনেও তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও বিপ্লবী আন্দোলন এবং রবীন্দ্র-জীবনসাধনা সম্পর্কে তাঁর সবিশেষ আগ্রহের পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা, এবং রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ গ্রন্থ দুটিতে। এ ছাড়াও তিনি একাধিক গ্রন্থ ও বহু অসংকলিত প্রবন্ধের রচয়িতা। বিদ্যাসাগর-পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৮৫)।

জ্যোতির্ময় ঘোষ (জন্ম ১৯৩৯) : রবীন্দ্রভারতী যাদবপুর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে একাদিক্রমে অধ্যাপনার পর ডঃ ঘোষ বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক। তাঁর গবেষণার মূল ক্ষেত্র রবীন্দ্রচর্চা হলেও অধ্যাপক ঘোষ আধুনিক সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা মহল সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু। ঢাকা রাজশাহি চট্টগ্রাম হংকং ও বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৯৬)। গ্রন্থসংখ্যা ষোলো।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার (জন্ম ১৯৪০) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সঙ্গে কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল জড়িত, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের অতিথি-অধ্যাপক এবং সাংস্কৃতিক ভূতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি-বিষয়ে দশটির মতো গ্রন্থের রচয়িতা।

দেবীপদ ভট্টাচার্য (১৯২২-১৯৮৯) : প্রখর যুক্তিবাদী নিরভিমান ছাত্রবৎসল সাহিত্যরসজ্ঞ অধ্যাপক ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ ও পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে কয়েক বছরের জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মৌলিক গ্রন্থসংখ্যা মাত্র পাঁচ, তাঁর সম্পাদিত কয়েকটি গ্রন্থ গ্রন্থসম্পাদনার আদর্শরূপে সুধীসমাজে সমাদৃত।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (১৯১০-১৯৮৮) : একদা স্বল্পকালের জন্য অধ্যাপনা এবং যৌবনে দু-বছর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসচিবের দায়িত্ব পালন করলেও মূলত সাংবাদিকরূপেই প্রসিদ্ধ সেনগুপ্ত ১৯৩৮ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদনাকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মননশীল প্রবন্ধ ছাড়াও লঘুগুরু নানা ধরনের প্রবন্ধ রচনায় তাঁর নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। গ্রন্থসংখ্যা পঞ্চাশের মতো। রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৮৪)।

নরহরি কবিরাজ (জন্ম ১৯১৭) : ইতিহাসের বিশিষ্ট অধ্যাপক, পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে একদা সংশ্লিষ্ট, মূল্যায়ন পত্রিকার সম্পাদক, বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক শ্রীকবিরাজ বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়, আঞ্চলিক কৃষক বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থান এবং রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বহু মননশীল প্রবন্ধের রচয়িতা। বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থসংখ্যা আটটির মতো।

নারায়ণ চৌধুরী (১৯১২-১৯৯১) : সাহিত্য ও সংগীতের নানা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, মননশীল প্রাবন্ধিক, একাধিক গ্রন্থের লেখক চৌধুরী বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই মনীষা ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় রেখেছেন। আমৃত্যু ছিলেন গণতান্ত্রিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের সহৃদয় প্রেরণাদাতা। মৌলিক অনূদিত ও সম্পাদিত মোট গ্রন্থসংখ্যা পঞ্চাশের বেশি। বিদ্যাসাগর-পুরস্কারে সম্মানিত।

নেপাল মজুমদার (জন্ম ১৯২৬) : প্রগতিশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং দীর্ঘকাল নিরলসভাবে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক গবেষণায় নিরত শ্রীমজুমদার জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিক চেতনা-বিকাশের পটভূমিকায় ভারতে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে যে অভিনব গবেষণা ও তথ্যবিন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তার জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক মোট গ্রন্থসংখ্যা দশের মতো। রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত।

পবিত্র সরকার (জন্ম ১৯৩৭) : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ও পিএইচ-ডি উপাধিপ্রাপ্ত শ্রীসরকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন এবং দীর্ঘকাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ভাষাতত্ত্ব ও নাট্যবিষয়ের নিয়মিত ভাষ্যকার, গ্রন্থসংখ্যা পনেরোর মতো।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ (১৯২৯-১৯৯১) : কৃতী ছাত্র, নিরহংকার, মিতভাষী ঘোষ কলকাতা বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত ও তদানুষঙ্গিক সাহিত্যগবেষণায় ব্যুৎপন্ন ঘোষের গ্রন্থসংখ্যা দশের মতো।

প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬) : বাংলা ছন্দোবিজ্ঞান আলোচনায় ও রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম বিশেষজ্ঞরূপে খ্যাতনামা অধ্যাপক সেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে স্নাতকোত্তর পাঠে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে অধ্যাপনা-জীবন শুরু করার পূর্বেই ছন্দচর্চার আগ্রহে রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং আমৃত্যু ছন্দের বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও সর্বজনব্যবহার্য পরিভাষা রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪২ সালে বিশ্বভারতীর অধ্যাপনায় যোগ দিয়ে ১৯৬৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। আজীবন সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী প্রগতিশীল চিন্তার প্রতীক বিদগ্ধ বীক্ষণশীল আচার্য সেনের বিচিত্র বিষয়ে রচিত গ্রন্থসংখ্যা পনেরোর মতো। একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫) : প্রসিদ্ধ রবীন্দ্রজীবনীকার মুখোপাধ্যায় কিশোর বয়স থেকেই রবীন্দ্র-স্নেহ-সান্নিধ্যে ও আশ্রমিক শিক্ষায় কৃতার্থ হয়ে যথাবয়সে বিশ্বভারতীর একাধিক দায়িত্বপরায়ণ পদে নিযুক্ত হন ও গ্রন্থাগারিকরূপে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটিকে গড়ে তোলেন। সাহিত্য ইতিহাস প্রাচ্যবিদ্যা ভূগোল ভাষাচর্চা দর্শন গ্রন্থাগারবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে তাঁর মনীষার স্বাক্ষর থাকলেও আমৃত্যু তিনি বিপুল রবীন্দ্রজীবনী রচনার কাজেই মনন ও অধ্যবসায়ের সঞ্চয় দান করে গেছেন। অসংখ্য গ্রন্থের লেখক ও অজস্র সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৮৭) : সুলেখিকা জননী ইন্দিরা (সুরূপা) দেবী এবং মাতৃষ্বসা অনুরূপা দেবীর আনুকূল্যে সাহিত্য ও শিল্পকলায় আবাল্য আগ্রহ ও অধিকার নিয়ে যৌবনে কলেজীয় শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে ইনি শান্তিনিকেতনে শিল্পচর্চায় এবং সমাজসেবা ও গ্রামসংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধিজীর আদর্শে ও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় গ্রামাঞ্চলে সংগঠন ও লোকশিক্ষা-বিস্তারে বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং শিক্ষকতার বৃত্তি নিয়ে জাতীয় বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছেন। নাটক, চিত্রাঙ্কন, কাব্যরচনা এবং শিশুসাহিত্যচর্চায় তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। গ্রন্থসংখ্যা চোদ্দর মতো।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৪২) : পশ্চিমবঙ্গের একাধিক সরকারি কলেজে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকপদে অধ্যাপনারত শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় বৈদগ্ধ্য মনস্বিতা ও মেধার সুষম সমন্বয় ঘটেছে। গ্রন্থসংখ্যা পাঁচ।

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৭-১৯৮৭) : গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে সুঅধীতী এবং শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান উভয় বিষয়ে একাধিক নির্দেশক গ্রন্থের রচয়িতা। কাব্য কথাসাহিত্য এবং শিশুসাহিত্যচর্চা ও অনুবাদেও আগ্রহ ছিল। উদীচী নামের বিদগ্ধ রুচিশীল সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদনা করে গেছেন। গ্রন্থসংখ্যা কুড়ির মতো।

ভবতোষ দত্ত (জন্ম ১৯২৫) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপনার পর প্রথমে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন সমাপ্ত করে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে প্রকল্প-নির্দেশকরূপে যুক্ত ছিলেন। একাধিক আন্তর্জাতিক সম্ভ্রান্ত আলোচনাচক্রে ও ভারতের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়েছেন। গবেষণামূলক গ্রন্থসংখ্যা চোদ্দর মতো। বিদ্যাসাগর-পুরস্কারে সম্মানিত।

ভূদেব চৌধুরী (জন্ম ১৯২২) : ১৯৪৭ থকে প্রায় দু-দশক একাদিক্রমে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনার পর বিশ্বভারতীর অধ্যাপকরূপে আরও দু-দশক অতিবাহিত করে অধ্যাপক চৌধুরী বর্তমানে অবসর জীবনেও নিরলস গবেষণা

ও রচনাকর্মে নিয়োজিত আছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি মৌলিক বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বদেশে ও বিদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়েছেন। মৌলিক ও সম্পাদিত সহযোগে গ্রন্থসংখ্যা কুড়ির মতো।

মৈত্রেয়ী দেবী (১৯১৪-১৯৯০) : ভারতীয় দর্শনচিন্তায় অভিজ্ঞ এবং স্বদেশে ও বিদেশে সম্মানিত রবীন্দ্র-স্নেহ-সান্নিধ্যধন্য এই সাহিত্যব্রতী নিজস্ব রবীন্দ্রচর্চার গৌরবে এবং বিভিন্ন সেবামূলক কর্মে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক তথ্যনিষ্ঠ রচনাগুলি আকরগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাধন্য কিছু কাব্যকবিতা রচনা ছাড়াও স্মৃতিকথা ভ্রমণ ডায়েরি উপন্যাস ও প্রবন্ধ নানা দিকেই তাঁর লেখনী সাবলীল। ন হন্যতে উপন্যাসের জন্য আশাতীত সম্মান ও সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। গ্রন্থসংখ্যা চব্বিশ।

রামবহাল তেওয়ারী (জন্ম ১৯৪০) : উত্তরপ্রদেশে জন্ম এবং মাতৃভাষা হিন্দি হলেও অধ্যাপক তেওয়ারীর মাধ্যমিক থেকে পিএইচ-ডি ডিগ্রি অর্জন পর্যন্ত যাবতীয় শিক্ষাই পশ্চিমবঙ্গে, দীর্ঘকাল বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের সঙ্গে অধ্যাপনাসূত্রে সংশ্লিষ্ট। ছন্দ বিষয়ে তাঁর মনস্বিতা এবং আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় তাঁর অধিকার বিদগ্ধজনের স্বীকৃতি পেয়েছে। সর্বভারতীয় পত্রপত্রিকার নিয়মিত লেখক শ্রীতেওয়ারীর গ্রন্থসংখ্যা নয়।

লীলা মজুমদার (জন্ম ১৯০৮) : উপেন্দ্রকিশোর সুকুমার রায় পরিবারের আর এক প্রতিভাদীপ্ত সাহিত্যসেবী লীলা দেবী ইংরেজি সাহিত্যে শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় অধ্যাপনার কাজে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। চিত্রাঙ্কনেও তাঁর অধিকার আছে। শিশুসাহিত্য রচনাতেই শ্রীযুক্তা মজুমদার পারিবারিক ঐতিহ্যরক্ষা করেছেন, যদিও অনুবাদ ও বয়স্কপাঠ্য উপন্যাসও রচনা করেছেন। অনুবাদ সম্পাদনা ও মৌলিক একত্রে শতাধিক গ্রন্থ আছে। একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত।

শান্তিদেব ঘোষ (জন্ম ১৯১০) : আবাল্য শান্তিনিকেতনে লালিত, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও পল্লীসংগঠন-কার্যের অন্যতম সহায়ক কালীমোহন ঘোষের পুত্র শ্রীঘোষ কবি-নির্দেশে কৈশোর থেকেই নৃত্যকলা অভিনয় ও সংগীতচর্চায় অধিকার অর্জন করেন। বিশ্বভারতীর সংগীতভবনের একদা অধ্যক্ষ শ্রীঘোষ নৃত্য সংগীত ও অভিনয় শিল্পীরূপে কবির সঙ্গে বহুদেশ পরিভ্রমণ করেছেন, পরেও পৃথিবীর নানা অঞ্চলে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের আমন্ত্রণ পেয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রনৃত্যকলা ইত্যাদির অনুশীলন-বিষয়ে তাঁর গ্রন্থগুলি বিশেষজ্ঞতার উৎকর্ষে চিহ্নিত। একাধিক সম্মানে ভূষিত ও পুরস্কারে সম্মানিত।

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় (১৯৩২-১৯৯৩) : স্বনামপ্রসিদ্ধ রবীন্দ্রতথ্যভাণ্ডারী পুলিনবিহারী সেনের সান্নিধ্যে ও শিক্ষায় দীক্ষিত তথ্যসন্ধানী গবেষক ও সম্পাদনাকর্মে অভিজ্ঞ মুখোপাধ্যায় একাদিক্রমে দশ বছর অধ্যাপনার পর সাহিত্য অকাদেমি পূর্বাঞ্চল

শাখার সচিবের দায়িত্ব পালন করেন, পরে তাতে ইস্তফা দিয়ে সাংবাদিকতা অধ্যাপনা ও বিভিন্ন ধরনের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মননশীল প্রবন্ধগুলি অগ্রন্থিত আকারে প্রকীর্ণ।

শৈলজারঞ্জন মজুমদার (১৯০০-১৯৯২) : কয়েক বছর রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপনা ও আইনজীবীর অভিজ্ঞতার পর মজুমদার ১৯৩২ সালে শান্তিনিকেতনে রসায়নের শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন ও রবীন্দ্রসংগীতে আকৃষ্ট হয়ে দিনেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা শুরু করেন ও ক্রমে আশ্রমের সাংগীতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রসান্নিধ্যে থেকে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি-লিখন ও সংরক্ষণের কাজে এবং ১৯৩৯ সাল থেকে সংগীতভবনের অধ্যক্ষতার দায়িত্বে যুক্ত হন। রবীন্দ্রসংগীতের সুর সংরক্ষণ ও প্রচারে তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ ছিল। রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে তিনটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের ও অগ্রন্থিত বহু প্রবন্ধের রচয়িতা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানিত।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (জন্ম ১৯১৭) : কয়েক বৎসর কলকাতার বেসরকারি কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করে অধ্যাপক রায় পরে বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে যোগ দেন ও রবীন্দ্র-অধ্যাপক-পদে উন্নীত হয়ে ১৯৮২ সালে অবসরগ্রহণ করেন। তিনি এখনও অক্লান্তভাবে রবীন্দ্র-গবেষণা-প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন। আধুনিক কথাসাহিত্য বিষয়ে একাধিক মননশীল আলোচনা লিখলেও রবীন্দ্রচর্চাই তাঁর অধ্যয়ন ও গবেষণার মুখ্য কৃত্য। এই বিষয়ে মৌলিক ও সম্পাদিত গ্রন্থসংখ্যা পনেরোর মতো।

সুকুমারী ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯২১) : লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ ও যাদবপুরে অধ্যাপনা ও ১৯৮৬ সালে অবসরগ্রহণের পর শ্রীযুক্তা ভট্টাচার্য তিন বছরের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির প্রধান গবেষক-ফেলো মনোনীত হন। একই সঙ্গে সংস্কৃত ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্যতত্ত্বের অভিজ্ঞ অধ্যাপিকা একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছেন। তুলনামূলক পুরাণ বিষয়ে গবেষণাপত্র ছাড়া ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তাঁর কয়েকটি মননশীল গ্রন্থ বিষয়ের গৌরবে সমাদরলাভ করেছে।

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯২৬) : প্রথমে কলকাতার বেসরকারি কলেজে ও পরে বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করে ১৯৯১ সালে অবসর-প্রাপ্ত ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে বিশ্বভারতীর নিপ্পন ভবনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রে চিত্রকলায় অধিকার নিয়ে রবীন্দ্রচিত্রকলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সৃষ্টির সম্পর্কবিষয়ে গবেষণা করেছেন। পৃথিবীর নানা দেশে আমন্ত্রিত হয়েছেন। গবেষণামূলক গ্রন্থসংখ্যা চার।

হরপ্রসাদ মিত্র (১৯১৭-১৯৯৪) : অধ্যাপক মিত্র প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-অধ্যাপক-পদে কর্মরত থেকে ১৯৮২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। সাহিত্যের সকল শাখাতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ চারণা

ছিল। শেষ জীবনে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধনা বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়েছিলেন। তিরিশের দশক থেকে মিত্র বাংলা কাব্যের যশস্বী কবিরূপেও স্বীকৃত। সতেরোটি কাব্যগ্রন্থ ও চোদ্দটি গবেষণামূলক গ্রন্থ ছাড়া তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থসংখ্যাও অনেক; তিনি একটি গল্পগ্রন্থ ও একটি কিশোরপাঠ্য গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

হীরেন ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯২৫) : অর্ধশতক ধরে শ্রীভট্টাচার্য গণনাট্য আন্দোলনে এবং গত দু-দশক যাবৎ পুতুল-নাটককে সমাজসচেতন গণমাধ্যমরূপে তুলে ধরার পরীক্ষায় যুক্ত হয়ে আছেন। তাঁর একটি নাট্যসংকলন ও একটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ আছে, অগ্রন্থিত প্রবন্ধও অসংখ্য।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৭): প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ ও লোকসভার প্রাক্তন সদস্য, অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান শ্রীমুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অকসফোর্ডে, সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে কর্মজীবনের শুরু। মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী শ্রীমুখোপাধ্যায় সাংবাদিকতা ও সাহিত্যেও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজি বহু গ্রন্থের লেখক এবং একাধিক কালজয়ী গ্রন্থের অনুবাদক, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন।

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

'অকণি' (পদ্মনাথ গোহাঞি) ৪০৬
'অক্ষম' ('সোনার তরী') ১৫৮
অক্ষয় ('চিরকুমার সভা') ২৭২
অক্ষয়কুমার দত্ত ৪৪
অক্ষয় চৌধুরী ২৮৭
'অচলায়তন' ৪০, ৮৩, ১৩৮, ১৫৮, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৯, ২৮৬, ৩০৯, ৩১৪, ৩৭৩
অজিতকুমার ঘোষ ২৬৯
অজিতকুমার চক্রবর্তী ২০২, ২০৩, ২৮৬, ৩৮৬
'অতিথি' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৮
'অতীতের ছবি' (সুকুমার রায়) ২০৫
অতীন ('চার অধ্যায়') ৩০, ১৭৭
অথর্ববেদ ১৫৮
অদব এ লতীফ ৪০৯
অনিল ('বদনাম') ১৯৯
অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ৩৬১
অন্ধ বাউল ('ফাল্গুনী') ২৭৩, ২৭৪, ২৮০, ২৯৮, ৩১৫
অন্ধকাসুরের কাহিনী ১৫৮
অন্ধমুনি ('কালমৃগয়া') ২৭১, ২৭৯
'অপঘাত' ('সানাই') ৮৭
অপরেশ মুখোপাধ্যায় ২৭২
অপর্ণা ('বিসর্জন') ২৭২
'অপ্রমত্ত' ('নৈবেদ্য') ১৯৪
অবদান শতক ১৫৮
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬৯, ২৭০, ২৭২, ২৭৪, ২৭৮, ২৭৯, ২৮২, ২৮৬, ৩১৫, ৩৬০, ৩৯৬
'অবস্থা ও ব্যবস্থা' ১০৪
অবিনাশ ('বৈকুণ্ঠের খাতা') ২৭২
অবোধবন্ধু পত্রিকা ২৭৬
অভয়চরণ দাস ৪৬
অভিজিৎ ('মুক্তধারা') ৩৭৪
অভিজ্ঞা দেবী ২৭১
অভিনব গুপ্ত ১২৭
অভিশাপ ৩৪৪
অমর দিনোমল ৪০৮
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৭১, ২৭২
অমরেন্দ্রনাথ রায় ২৬৫
অমল ('ডাকঘর') ১৩৮, ২৭৭
অমিতা ঠাকুর ২৮৪
অমিতা সেন ২৮৩
অমিতাভ চৌধুরি ৮৩
অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী ২০, ৬৭, ৭৮, ৮৪-৮৭, ১২১, ২৬৩, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৫০, ৩৫২, ৩৬৪, ৩৭৫, ৩৯৭
অমিয়া ('নামঞ্জুর গল্প') ১৯৮
অমূল্য ('চার অধ্যায়') ৩০
অমৃতলাল বসু ৩২০
অমৃতসর কংগ্রেস ২৫
অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ দ্র°
অরবিন্দ পোদ্দার ৭৯, ৯০
অরুণকুমার বসু ৩০২
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ৯০
অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭৯, ২৮৪, ২৮৫
'অরূপরতন' ১৫৮, ২৭৪, ২৭৫, ৩১৮
অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ৭৭
অর্চনা পত্রিকা ২৬৫
অর্জন ইস্রাণী ৪০৫
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ২৬৯, ২৭৮
অলকা পত্রিকা ৮৭
'অলীকবাবু' ২৭৮, ২৭৯, ২৮৬
অশোক ১৫, ১৮৬
'অসন্তোষের কারণ' (শিক্ষা) ৯০
অসহযোগ আন্দোলন ২৫, ২৩৩, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮২, ৩৯৭
অসিতকুমার হালদার ২৭৩, ২৭৮, ২৮১, ২৮২, ৩৯৫
'অস্পষ্ট' ('নবজাতক') ১৫৭
'অহল্যার প্রতি' ('মানসী') ৪০, ১৫৮
অহীন্দ্র চৌধুরী ২৭২
অ্যানড্রুজ, সি. এফ. (রেভারেন্ড), এন্ডরুজ দ্র°
অ্যান্ডারসন, লর্ড ২৫
অ্যানি বেশান্ত, বেশান্ত অ্যানি দ্র°
অ্যারিস্টটল ১২৭, ১৩১
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ৩৪৮, ৩৫৫
আইজেনস্টাইন ৩৬৫
আইনস্টাইন ৫৩, ৫৮, ৩৬৪
'আইভ্যান হো' ২৫৯

আইসানডুলার যুদ্ধ ৭১, ৭২
আঁদ্রে জিদ ৩৬৯
আকবর ১১, ১২, ১৫, ১৮৬
আকবর হায়দরি, স্যার ১০২
আগস্ট আন্দোলন ৩৬
'আত্মপরিচয়' ১৫৩
'আত্মবোধ' (ভাষণ) ৩২১
'আত্মশক্তি ও সমূহ' ৬৬, ১২৬
'আত্মসমর্পণ' ('সোনার তরী') ১৫৮
আদিত্য ওহ্‌দেদার ২০
আদ্য রঙ্গাচার্য ৪০৯
'আধুনিক কাব্য' ('সাহিত্যের পথে') ১৩২, ২৫৪, ২৫৯
'আধুনিক সাহিত্য' ১৩২
আনন্দচন্দ্র মিত্র ৩০২, ৩২০
আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯
আনন্দময়ী ('গোরা') ১৭৬
আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ৩১৯, ৩২০
'আপদ' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৮
আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব ৫৮
আফগান যুদ্ধ ৭২
'আফ্রিকা' ('পত্রপুট') ২৮, ৭৭, ৭৮, ৮৫, ১২৩
আবদুর রব পেশোয়ারি ১৮
'আবরণ' ('শিক্ষা') ৯০, ৯৩, ৯৫, ৩৮৭
'আবির্ভাব' ('ক্ষণিকা') ১৫৭
আবুল কালাম আজাদ ৩৯৬
'আবোলতাবোল' (সুকুমার রায়) ২০৫, ২০৭
আমহার্স্ট, লর্ড ৪৪, ৩৫৯
'আমি' ('শ্যামলী') ১৫৬
আর জি. কানাডে ৪০৬
আরব্য উপন্যাস ৩৭২
আঁরি বারবুস, বারবুস দ্র°
'আরোগ্য' ১৫৬
'আরোগ্য' (কালান্তর) ৬৭
আর্চার, উইলিয়াম ২০৯, ২১০
আর্ট থিয়েটার ২৭২
আর্নলড, ম্যাথিউ ২৬১
আর্যদর্শন পত্রিকা ১৩, ১৪
আলবার্ট হল ১৩
'আলাপ-আলোচনা' ('সংগীতচিন্তা') ১৯৪
'আশা' ('পুরবী') ৩৩৩
আশা ('চোখের বালি') ১৭৫, ২৭২
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৯১, ৯২, ৯৮, ১০১
'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' ৩৮৬, ৩৮৭
'আশ্রমের শিক্ষা' ('শিক্ষা') ৩৯৯
'আহ্বান' ('পূরবী') ৬১, ১৭২
ইউনেস্কো ২২৪
ইউ. রামকৃষ্ণ পিল্লাই ৪০৬
'ইংরেজ ও ভারতবাসী' ১৫
ইঙ্গ-জুলু যুদ্ধ ৭০
'ইচ্ছাপূরণ' ('গল্পগুচ্ছ') ১৩৭
'ইতিহাস' ১৯৪
'ইন্‌টেলিজেন্ট উওম্যানস্ গাইড টু সোশ্যালিজম এ্যান্ড ক্যাপিটালিজম' ৩৬৯
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান ১৩
ইণ্ডিয়ান রায়ত, দি ৪৬
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ২৭০, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৭, ৩০৯, ৩১২, ৩১৩
ইন্দুমতী ('শেষরক্ষা') ২৭২
ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪২
ইবসেন, হেনরিখ ১৭৪, ২৫৯
ইম্পিরিয়াল ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকা কোম্পানি ৭৪
ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ৯০, ৯১, ৯৮
ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকা ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮০
ইয়ং বেঙ্গল ৪৪
ইয়াগো ('ওথেলো') ২৬২
ইয়েনুকভ ৩৬৫
ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯১
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৩৩৭
'ইস্থেটিক' (ক্রোচে) ২৬১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর দ্র°
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৮
উইনটারনিৎস ৩৯৫
উৎকল সাহিত্য পত্রিকা ৪০৯
উইলসন, মেজর অ্যালান ৭৫
উইলিয়ামস অরিয়াম ৩৬৪
'উৎসর্গ' ৫৩
উত্তীয় ('শ্যামা') ২৮৫
উদয়শংকর ২৮৭
উদয়াদিত্য ('প্রায়শ্চিত্ত') ২৩৩, ২৭১
উপাধি (নাইটহুড) ত্যাগ ৩৬৭
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২০২, ২০৩, ২০৬

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৩২০, ৩২১
উমা ('খাতা') ১৭৪
উমাশঙ্কর যোশী ৪০৯
'উর্বশী' ('চিত্রা') ৪০, ১২৭, ১৪৯, ৪০৬
'উর্বশী' (রামধারী সিংহ দিনকর) ৪০৬
উলস্‌লি, স্যর গার্নেট ৭২
উষা ১৭৮
ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ ৪৮, ৩৮০
ঊর্বশী, উর্বশী দ্র°
'ঊর্মিলা' (পদ্মনাথ গোহাঞি) ৪০৬
'ঊর্মিলা' (বোদাতকর) ৪০৬
ঊষা, অভিনেত্রী ২৭৪
ঋগ্‌বেদ ১৪৬, ১৫৪-১৫৯
'ঋণশোধ' ২৮৬
'ঋতুরঙ্গশালা', 'নটরাজ' ১৫৮
ঋতুসংহার ১৫০, ১৫১, ১৫৮
ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭০
'একরাত্রি' ('গল্পগুচ্ছ') ১৯৬, ১৯৭
এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক ২৩৭, ২৩৮
এডগার এলেন পো ১৬২, ১৬৫
এণ্ডরুজ, চার্লস ফ্রিয়ার, রেভারেণ্ড ৪, ১৮, ৮৪, ৩৮১, ৩৯১, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৭
এজরা পাউন্ড ১৭, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৯, ২৬০
এনায়েৎ করিম ১৯
'এবার চলিনু তবে' ১৫৮
'এবার ফিরাও মোরে' ('চিত্রা') ৩৩৬, ৩৫৮, ৩৫৯
এম ইউ মালকানী ৪০৮
'এমন কর্ম আর করব না' ('অলীকবাবু') ২৭৮, ২৮৬
এম ভি আয়েঙ্গার ৪০৬
এম সি সরকার ২০৭
এমারেলড থিয়েটার ২৭১, ২৭২
এম্পায়ার থিয়েটার ২৭১, ২৭৯, ২৮০
এ লক্ষ্মণ রাও ৪০৫
এলমহার্স্ট, লেনার্ড/লেওনার্ড নাইট ৩৩৮-৩৪০, ৩৮১, ৩৯৪, ৩৯৫,
এলা ('চার অধ্যায়') ২৯, ১৭৬, ১৭৭
এলিয়ট/এলিঅট, টি. এস. ১৭০, ২৫৫, ২৫৯-৬১, ২৬৫
এলেন পো, এডগার ১৬২, ১৬৫
এস কে রায় ৩৭৮
এসথেটিক্‌স ২৫৪
'ঐকতান' ('জন্মদিনে')
'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ('সাহিত্য') ১২৮, ২৫৯
ওকাম্পো, ভিক্টোরিয়া ৩২৬
ও' ডোনেল ৭০, ৭১
'ওথেলো' ২৬২
'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' (টলস্টয়) ১২৭
ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ওয়ার্ডস্বার্থ ৪০, ২৫৫, ২৫৬, ২৬১
ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ৯১
ওরিক জোন্স ২৫৯
ঔরঙ্গজেব ১১
কঙ্কাবতী (অভিনেত্রী) ২৭৪
'কঙ্কাল' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬২, ১৬৫, ১৬৭
কঙ্গো ফ্রি স্টেট ৭৭
'কড়ি ও কোমল' ১৫৬, ১৫৯, ১৭৩, ৩০৫
'কণিকা' ৪০৬, ৪০৭
'কথা' ৫২
'কথা ও কাহিনী' ১৫৮, ৩২৯
কনক মুখোপাধ্যায় ১৭০
'কন্‌গ্রেস' ('কালান্তর') ৬৭
কবি অকাদমি ৪০৬
'কবি কঙ্কণ চণ্ডী' ১৮৯
'কবি কাহিনী' ১৪২, ১৭৭, ২৫১
'কবিতা ও তত্ত্ব' (ভারতী) ২৫৯
'কবি পরিচিতি' ১৬৮
'কবির অভিভাষণ' ২৬০
'কবিসংগীত' ('লোকসাহিত্য') ১৫৯
কবীর ২১, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯৩
কমলমণি ('শেষরক্ষা') ২৭২
কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ৮৫
কম্যুনিটি প্রজেক্ট ৩১, ৩৬
'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' ('কাহিনী') ১৫৮
'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' ('কালান্তর') ৬৭
'কর্ম' ('চৈতালি') ১৬৪
'কর্মফল' ('চৈতালি') ১৫৮
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৩, ৯১, ১০০, ১০১, ২১১, ২২৭, ৩৪০
'কল্পক্রমাবদান' ১৫৮
'কল্পনা' ৫২, ১৫৭, ১৫৮, ৪০৭
কাই গোরোদভ, আ ৩৬৩
কাউন্টি কাউন্সিল ৩৩
কাকাসাহেব কালেলকার ৩৮৩, ৪০৫, ৪০৬

'কাকে মহাত্মা বলে' (ভাষণ) ৩৭৭, ৩৭৮
কাঙাল ফিকিরচাঁদ (হরিনাথ মজুমদার) ৩০৮, ৩১৯, ৩২১
কাঙাল হরিনাথ ৩১৯
কাঞ্চীরাজ ('রাজা') ২৩২, ২৩৫, ২৩৬
'কাদম্বরী' ১৫০, ১৫১, ১৫৭
কাদম্বরী দেবী ২৭১
কাদম্বিনী ('জীবিত ও মৃত') ১৭৪, ১৭৮
কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৪
কান্ট ২৫৭, ২৬০
কাফ্রি যুদ্ধ ৭০
'কাবুলিওয়ালা' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬২-৬৪
'কাব্যে গন্ধ' (প্রবন্ধ) ২৬৫
'কাব্যের উপেক্ষিতা' ('প্রাচীন সাহিত্য') ১২৯, ১৩২, ১৫১, ৪০৬
কামবুলা যুদ্ধ ৭১
কামাল পাশা ২২১
কারজন, লর্ড ১৪, ৯০, ৯১
'কার্পেলেস, আঁদ্রে' ৩৯৫
কার্মাইকেল, লর্ড ২৫
কার্ল মার্কস, মার্কস দ্র°
'কালমৃগয়া' ১৫৮, ২৭০, ২৭৯
'কালান্তর' ৬৬, ৬৭, ৭৭, ১৯৪, ১৯৫
'কালান্তর' (প্রবন্ধ) ৭, ৩৭, ৬৭, ৬৮, ১২৮, ১৭৬
কালিদাস ১০৯, ১২৯, ১৪৪, ১৪৭, ১৫০, ১৫১, ১৯১, ২৫৬, ২৬৪, ৪০৪
'কালিদাসের প্রতি' ১৫৮
কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী ৪০৯
কালী নারায়ণ গুপ্ত ৩২০
কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ ৩২০
কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৪৩
কালীমোহন ঘোষ ২৯৬, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৯৫
'কালের যাত্রা' ১৫৮, ৩৫৮
'কালো মেয়ে' ('পলাতকা') ১৭৩
'কাহিনী' ১৪৮
'কিং লিয়ার' ১২৭
কিটস, কীট্‌স দ্র°
কিপলিং, রুডিয়ার্ড ৬
কিরাক গোরখপুরী ৪০৯
কিশোরী চাটুজ্জে/চট্টোপাধ্যায় ২৪৩, ২৭৭
কীট্‌স, কিটস ১৫১, ২৫৯, ২৬১
কুঞ্জ বিহারী দাস ৪০৫
'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ' ('উৎসর্গ') ২০১
'কুটিরবাসী' ('বনবাণী') ৩৩৩
কুতবউদ্দীন ১১
কুমার রায় ১৬৯, ২৭৪, ২৭৫
কুমারসম্ভব ১৫০, ১৫১, ১৫৮
কুমার সেন ('রাজা ও রানী', 'তপতী') ২৭১, ২৭৪
কুমারস্বামী, আনন্দ কেন্টিশ ২০২
কুমারিল ভট্ট ৪১, ৩৫৮
কুমু/কুমুদিনী ('যোগাযোগ') ২৯, ১৭৫, ১৮০, ২৭৪
কুরী, মাদাম ৫৩
কুর্ত্‌নে, বোদুইন দ ২১৫
কুশজাতক ১৫৮
কুসুম ('ঘাটের কথা') ১৭৪, ১৭৮
কুসুমকুমারী (অভিনেত্রী) ২৭২
কৃত্তিবাস ২৪৩
'কৃপণ' ('খেয়া') ৩১৪
কৃশিন খাটওয়ানী ৪০৫
কৃষি ঋণদান সমিতি ৩৪০
কৃষ্ণকুমার কলুর ৪০৫
কৃষ্ণ কৃপালনি ১৭, ১৮, ২৬
কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি ৩২০
কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ৩০৩, ৩২০
কৃষ্ণভামিনী (অভিনেত্রী) ২৭২
কে. এম. মুনসী ৪০৯
কে কেশবন নায়ার ৪০৬
কে. চন্দ্রশেখরন ৪০৬, ৪০৯
কেটি মিত্তির ('শেষের কবিতা') ৩০
কেতকী ('শেষের কবিতা') ১৭৬
কেদার ('বৈকুণ্ঠের খাতা') ২০৬, ২৭২, ২৮৬
কেদার চৌধুরী ৩০৫
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ২০১
কেদারনাথ দাশগুপ্ত ৬
কেদারেশ্বর গুহ ৩৪৩
কেন্দুলির মেলা ২৯৬, ২৯৭
কে ভি পুট্টাপ্পা ৪০৬
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯১
কেরালা কলামণ্ডলম্‌ ২৯৯
কেশবচন্দ্র সেন ৩৫৭
কেশরলাল ('দুরাশা') ১৯৮
'কোট বা চাপকান' ('সমাজ') ১৯৪

কোমাগাটা মারু ১৭, ১৮
কোলরিজ ২৫৫
কৌণ্ডিল্য ('রাজা') ২৩২
কৌলীন্য প্রথা ৪৩
ক্রিস্তি, ম. প. ৩৬৫
ক্রুগার, পল ৭২
ক্রোচে ২৬১
ক্লাইভ বেল ২৫৬, ২৫৭
ক্লার্তে ১১২, ১১৩
ক্লিপ্‌পের চেখভা, অ. ল. ৩৬৫
'ক্ষণিকা' ১৫০, ১৫৭, ১৫৮
ক্ষান্তমণি ('শেষরক্ষা') ২৭২
ক্ষিতিমোহন সেন ২৭৩, ৩১৫, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৬
ক্ষুদিরাম দাস ৪৯
'ক্ষুধিত পাষাণ' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬২, ১৭৪, ১৭৮
'ক্ষুধিত পাষাণের উৎস সন্ধানে' ১৬৯
ক্ষেত্র গুপ্ত ১৯৬
ক্ষেত্রমণি ('নীলদর্পণ') ২৭১
খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৭১
'খাতা' ('গল্পগুচ্ছ') ১৭৪
'খাপছাড়া' ২০৭
খাভকিন্‌ল ৩৬২
খামখেয়ালি সভা ২৭২, ২৮৬
খিলাফত আন্দোলন ৩
'খেয়া' ৩১৪
'খেলা' ১৫৮
খ্রিস্টোফার্সন, পল ২২৪
'গঁকুর' পুরস্কার ১১১
গগনেন্দ্রনাথ ২৬৯, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৮, ২৮২, ৩৬০
গগন হরকরা ৩১৩
গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় ৩২০
গণনাট্য সঙ্ঘ ৩৫৪
গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০, ২৬৯
'গতি' ('সোনার তরী') ১৫৮
গদর পার্টি ১৭
গদাই ('শেষরক্ষা') ২৭২
গলসওয়ার্দি ১৭৫
'গল্পগুচ্ছ' ১৩৬, ১৬২, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৯, ১৯৬, ৩২৫
'গল্পসল্প' ১৬৫, ১৯৬, ২৭৭
'গানের গুঁতা' (সুকুমার রায়) ২০৭
'গান্ধারীর আবেদন' ('কাহিনী') ১৫৮
গান্ধি/গান্ধিজী, মহাত্মা/মহাত্মাজী ২৫, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৬১, ৮৬, ৯১, ১০৪, ১০৭, ১১৩, ১১৪, ২৩৩, ২৭৩, ৩৩৫, ৩৪৮, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮৪, ৩৯৬, ৪০৫
গারিবলডি ৬৮
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬৯
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৬৯, ২৭২
'গীতগোবিন্দ' ১৪৫
'গীতবিতান' ১৫৮
গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী ৩০৫, ৩০৯
'গীতাঞ্জলি' ১৮, ২৩, ৩৯, ৫৩, ৮৬, ১১০, ২০১, ২০৩, ৩০২, ৩৬২, ৩৯১, ৪০৪, ৪০৫
'গীতালি' ৫৩
'গীতিমাল্য' ৩৯০
গুণবতী ('বিসর্জন') ২৭২
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬৯
'গুরুদক্ষিণা' ৩৮৭
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২, ৯১, ২৭০
'গুরুদেব' ৩৬, ৩৩৫, ৩৪৯, ৩৭৬, ৩৭৭
গুরুসদয় দত্ত ২৯৭, ২৯৮
গুলফম হরি ২৭১
'গৃহপ্রবেশ' ২৭২
গোঁসাই ('রক্তকরবী') ২৭৪
'গোড়ায় গলদ' ২৭২, ৩০৫, ৩০৬, ৩২০
গোতিয়ের (থিয়োফিল) ২৬১
গোপালকৃষ্ণ গোখলে ৯০, ৯১, ১০২, ৪০৫
গোপাল ক্ষেপা ২৯৭
গোপাল রেড্ডি ৪০৫
গোপাল হালদার ২৭
গোপীনাথ তালভালকার ৪০৭
গোপীনাথ মহান্তি ৪০৯
গোবিন্দমাণিক্য ('বিসর্জন') ২৭১, ২৭২
গোবিন্দলাল ('কৃষ্ণকান্তের উইল') ১৬১
'গোরা' ২৮, ৪০, ৪৭, ১০৯, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৭৬, ৩৬০, ৩৬৩, ৩৭৩, ৩৯০
গোর্কি, ম্যাকসিম ১৭১, ২৫৯, ৩৬৩
গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৮, ৩২০
গৌরগোপাল ঘোষ ৩৪০

গ্যারিবলডি ১৯৭
গ্যারিবলডির জীবনবৃত্ত ১৪
গ্যেটে ১৭১
'গ্রন্থবার্তা' ২০
'গ্রাম্যসাহিত্য' ('লোকসাহিত্য') ১৯৫, ৩০৪
গ্রিম, ইয়াকব ২১৬
গ্রিম্‌স ল ২১৬
গ্রীন, গ্রেসেন ৩৪০
গ্রোবলার পিটার ৭৩
গ্লাডস্টোন ৬৮, ৭৪, ৭৬
'ঘরে বাইরে' ১৮, ২৪, ৩৭, ৪০, ১৫৩, ১৭৬
'ঘরোয়া' ২৮৬
'ঘাটের কথা' ('গল্পগুচ্ছ') ১৭৪
'চণ্ডালিকা' ১৫৮, ২৮৫
চণ্ডীদাস ১১, ১৯১
'চতুরঙ্গ' ৪০, ১৫৩
চন্দরা ('শাস্তি') ১৬৬, ১৬৭
চন্দ্র ('চিরকুমার সভা') ২৭২
চন্দ্র ('শেষরক্ষা') ২৭২
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩২০
চন্দ্রহাস ('ফাল্গুনী') ২৭৩
'চরকা' ('কালান্তর') ৬৭
'চলচ্চিত্তচঞ্চরি' ২০৪, ২০৫
'চলতি ছবি' ('সেঁজুতি') ৮৫
'চলন্তিকা' ২২১, ২২৭
'চার অধ্যায়' ২৪, ১৫৩, ১৭৬
চারু ('নষ্টনীড়') ১৬৬
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ২৭২, ৩৪২
চারুশীলা, অভিনেত্রী ২৭২
চার্চিল ৩৪৪
চিত্তরঞ্জন দাশ ২৫
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২২০
চিত্তরঞ্জন লাহা ১৮২
'চিত্রা' ৬৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৮, ৩৩৬
'চিত্রাঙ্গদা' ৪০, ১৫৮, ২৭২, ৪০৬
চিন্মোহন সেহানবীশ ১৭
চিয়াং কাইশেক ৮৫, ৮৬
'চিরকুমার সভা' ২৭২, ২৭৪
চিরঞ্জীব শর্মা ৩২০
'চিরদিনের দাগা' ('পলাতকা') ১৭৩
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৩৩
চীন-জাপান যুদ্ধ ৮৫
চীনভবন ৩৯৮
'চীনে মরণের ব্যবসায়' (ভারতী) ১০৩
চেখভ ৩৬৩, ৩৬৫
চেম্বারলেন ৩৪৪, ৩৪৫
চৈতন্য লাইব্রেরি ১৫
'চৈতালি' ১৫০, ১৫৮, ১৬৪, ১৬৯, ৩৩৬
চৈত্রমেলা ১০৩, ১০৬
'চোখের বালি' ১৬৭, ১৭৫, ২৭২
চৌরঙ্গি থিয়েটার ২৬৯
'চৌরপঞ্চাশিকা' ১৫৮
'ছন্দ' ২১১, ২২৮
'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' ('শিক্ষা') ৯০, ৯২
'ছাত্র-শাসনতন্ত্র' ('শিক্ষা') ৯০
'ছাত্র-সম্ভাষণ' ('শিক্ষা') ৯০
ছিদাম ('শাস্তি') ১৬৬
'ছিন্নপত্র'/'ছিন্নপত্রাবলী' ২৯, ৫১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৯, ২৪৪, ৩০৪, ৩২৩-২৫, ৩৩০
'ছিন্নপত্র' ('পলাতকা') ১৭৩
'ছুটি' ('গল্পগুচ্ছ') ১৩৭, ১৬৩, ১৬৪
'ছেলেবেলা' ১৪১, ২৭৬
'ছেলেভুলানো ছড়া' ('লোকসাহিত্য') ১৩২, ১৯২, ১৯৫, ২৪৮
'ছোটগল্প' ('গল্পগুচ্ছ ৪র্থ') ১৬৮
'ছোটো ও বড়ো' ('কালান্তর') ৬৭, ৩২১
জওহরলাল নেহরু ৮৫, ৩৯৬, ৪০৫
জগদানন্দ রায় ২৭৩, ২৮৩, ৩৮৬, ৩৯২
জগদিন্দ্রনাথ রায় ২৭২
জগদীশচন্দ্র বসু ৫২, ৫৩, ৩২৩, ৩৮৬
'জড় কি সজীব?' ৫২
'জন্মদিনে' ১৫৬, ১৫৭
জয়দেব ১৪৪, ১৪৫, ২৯৬, ২৯৭
জয়প্রকাশ নারায়ণ ৮৫
জয়সিংহ ('বিসর্জন') ২৭১, ২৭২, ২৭৯, ২৮০, ২৮৪
জসীমউদ্দিন ২৭৫, ২৮৩
জাতীয় কংগ্রেস ১৭১
জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কার্যসূচি ৩১
'জাতীয় বিদ্যালয়' ('শিক্ষা') ৯০, ৯৩
জাতীয় মেলা, হিন্দুমেলা দ্র° ৮
জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল ৯১
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ৯৩

জাতীয় সভা ৮-১১, ১৩, ১৪
'জাপানযাত্রী' ২৫৭
জাপানের চীন আক্রমণ ৮৩, ৮৫, ৮৬
'জামাই-বারিক' ২৭৬
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ২৫, ৩৬৭
জি. ভি. খানোসকার ৪০৯
জি. ভি. সীতাপতি ৪০৯
জিয়াউদ্দীন ৫
জি. শঙ্কর কুরূপ ৪০৯
জীবন গাঙ্গুলী (অভিনেতা) ২৭৪
জীবনময় রায় ২২২
'জীবন-সংগীত' ৪০৮
'জীবনস্মৃতি' ১৪১, ১৫৭, ২২৬, ২৪৩, ২৭৫, ২৮৬, ৩৬৩
'জীবনের ঝরাপাতা' ৩০৪
'জীবনের হিসাব' ২০৫
'জীবিত ও মৃত' ('গল্পগুচ্ছ') ১৭৪
জুলুযুদ্ধ ৭১, ৭২
জে. এল. কাউল ৪০৯
জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয় ২১৫
জেলেমিন, ভফ ৩৬৫
জে. সি. পালককী ৪০৬
জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ২৬৯
জোনাকী পত্রিকা (অসমিয়া) ৪০৯
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ২৭১
জ্ঞানদাস ১৯১
জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকা ২৫৪
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪৫, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, ২৮৬, ২৮৭, ৩০৬-০৮, ৩১৮-২০
জ্যোতির্ময় ঘোষ ১০৩
ঝাঁওয়ের চাঁদ মেঘানী ৪০৬
টলস্টয়/তলস্তয় ১২৯, ১৭১
টাইবারটন গেজেট ৭১
টি. এন. কুমারস্বামী ৪০৬, ৪০৯
টেনিসন ২৫৬, ২৬১
'টেগোর ঔর নিরালা' ৪০৯
'ঠাকুরমার ঝুলি' ২৪২
ঠাকুরদা ('রাজা', 'শারদোৎসব')২৩২, ২৩৪-৩৬, ২৭৩-৭৫, ২৭৯
'ডলস্ হাউস' ১৭৪
'ডাকঘর' ১৬, ৮৩, ১৩৮, ২৩৪, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৭, ২৮১, ২৮৬, ৩৪৯, ৩৫০,
ডাঙ্গে ৮৫
ডারউইন ৪০
ডেলি ক্রনিকল ৭১
ড্রামাটিক ক্লাব ২৭৯
তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা ২০৪
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৯, ৪৪, ৪৫
'তত্ত্বের বার্ধক্য' (ভারতী) ২৫৯
'তথ্য ও সত্য' ('সাহিত্যের পথে') ২৫৬
'তপতী' ২৭৪, ২৭৫, ২৮০, ২৮৫, ২৮৬
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ২৭১
'তপোবন' ('চৈতালি') ৯০, ৯৫, ১৫৮, ৩৮৬
'তপোভঙ্গ' ('পূরবী') ১৫০, ১৫৮
'তবু' ('মানসী') ৩০৯
তরেদভ, ভ ৩৬২
তলস্তয়, টলস্টয় দ্র' ২৩৯, ২৬১, ৩৬৩, ৩৬৫
তানবোসোরাজ, ভ. ৩৬৩
তাপস সেন ২৭৪
'তামিল সন্ত ও রবীন্দ্রনাথ' ৪০৯
তারকচন্দ্র ধর ৩৪২
'তাসের দেশ' ৮৩, ১৪৭, ১৫৮, ২২৭, ২৭৪ ৩১৬
তিনকড়ি ('বৈকুণ্ঠের খাতা') ২৭২
তিনকড়ি চক্রবর্তী (অভিনেতা) ২৭২
'তিন সঙ্গী' ১৬৪, ১৬৮, ১৯৬
তিরুমলে রাজাম্মা ৪০৬
তিলক, বালগঙ্গাধর ২২, ২৫, ৩৬, ২৭৩, ৪০৫
তুকারাম ৩৮০
তুচ্চি ৩৯৫
তুবিয়ানস্কি, ম. ৩৬৩
তুর্গেনেভ ৩৬৩
তৃপ্তি মিত্র ২৭৪
তোজো ৮৭
'তোতা কাহিনী' ('লিপিকা') ১৩৭, ২২৭
ত্রিলোচন সিং ৪০৯
ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ৩০২
ত্রোয়ানোভস্কি, ৩৬৩
দইওয়ালা ('ডাকঘর') ২৭৩
দ কুর্তনে, বোদুইন ২১৫, ২১৬
দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন ৩৮১
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ২৪২
'দস্তুর সভ্যতা' (প্রবাসী) ৩৫০
দয়ানন্দ অ্যাংলো বেদিক কলেজ ৯১

'দয়ালু মাংসাশী' ('বিবিধ প্রসঙ্গ') ৭২
দশরথ ২৭১
দ সোশ্যুর, ফের্দিনান্দ ২১৫, ২১৬
দন্তয়েভস্কি ৩৬৩
দাদা ('ফাল্গুনী') ২৭৩
দাদু, দাদু ১৮৬, ১৯৩
দামিনী ('চতুরঙ্গ') ২৯
দালি, সালভাদোর ২৫৮
'দালিয়া' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬২, ১৬৭
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৬, ২৬৯, ২৭১-৭৩, ২৯৭, ৩৯৩, ৩৯৫
দিব্যজ্যোতি মজুমদার ২৪১
'দিব্যাবদান' ১৫৮
দিলীপকুমার বিশ্বাস ২০৮
দিলীপকুমার রায় ২২৩, ২৫৭
দীনবন্ধু মিত্র ২৭৬
দীন বাউল ৩০৮, ৩১৯, ৩২০
'দুই বিঘা জমি' ('চিত্রা') ৩৪
'দুই বোন' ১৭৬
'দুঃখের আঁধার রাত্রি' ('শেষলেখা') ১২২
'দুরাশা' ('গল্পগুচ্ছ') ১৫৪, ১৬৭ ১৯৬, ১৯৭
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭২
দুর্গাবতী ১০
দৃষ্টিদান (গল্পগুচ্ছ) ১৬২, ১৬৫, ১৬৭
'দৃষ্টিসৃষ্টি' ৪০৭
'দে'জ পাবলিশিং' ৩২৬
'দেনা-পাওনা' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৩, ১৬৭, ১৭৪, ৩২৫
দেবকান্ত বড়ুয়া ৪০৭
'দেবতার বিদায়' ('চৈতালি') ১৫৮
দেবদত্ত ('তপতী') ২৭৪
দেবদত্ত ('রাজা ও রানী') ২৭১
দেবীপদ ভট্টাচার্য ৭০, ২২৬
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩, ২৪৬, ২৬৯, ২৭৭, ৩২২, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৮০, ৩৮৫, ৩৮৬
'দেশহিত' ('সমূহ') ১৯৪
দ্য গল ৩৫০
দ্বারকানাথ ঠাকুর ২১, ২৩, ২৬৯, ৩৩৭
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০, ৩৩
দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ২০১
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ২০৩, ২০৬
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৮, ৮৩-৮৭, ৮৯, ১২১, ১২৪, ১৯৭, ৩৪৪, ৩৫১, ৩৮১
ধনঞ্জয় বৈরাগী ('প্রায়শ্চিত্ত', 'মুক্তধারা') ২৩৩, ২৩৪, ২৩৮, ৩১৪, ৩১৫
ধর্মগোলা ২৬,৩৩
ধর্মমঙ্গল ১৮৯
ধর্মশিক্ষা ৯০, ৯৫, ৯৬
ধর্মানন্দ মহাভারতী ৩২
ধীরানন্দ রায় ৩৪২
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৫৭
'ধ্বংস' ('গল্পসল্প') ১৯৬, ১৯৭
ধ্বনিতত্ত্ব ২১১, ২১২-২১৮
ধ্বন্যাত্মক শব্দ ২১৬, ২১৭
নক্ষত্রমাণিক্য ('বিসর্জন') ২৭১
'নগরলক্ষ্মী' (কথা ও কাহিনী') ১৫৮
নগীনদাস পারেখ ৪০৫
নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩৮
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩২০
নজরুল ইসলাম, কাজী ১৮০
'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' ১৫০, ১৫৮
'নটীর পূজা' ২৭৪, ২৮৬
'নদী' ('চিত্রা') ২০০
ননীবালা রায় ৩৪১
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৩৮
নন্দনতত্ত্ব ২৫৪
নন্দলাল বসু ২৪, ২৭, ৪৬, ২৭৮, ২৮২, ২৯৭, ৩২৫, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৬
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ৩০২
নবগোপাল মিত্র ৯, ১৩, ১৪
'নবজাতক' ১২১, ১৫৭
'নবজাতকের উত্তরকাণ্ড' (প্রবাসী) ৩৪৬
'নবনাটক' ২৬৯, ২৭৬
নবনী দাস ২৯৭, ২৯৮
'নববর্ষা' ('ক্ষণিকা') ১৫৭, ৩৬৫
'নববর্ষ' ৭০
নবভারত পত্রিকা ৪০৯
'নবীন' ঋতুনাট্য ১৫৮
নবীন ('যোগাযোগ') ২৭৪
'নবীন তপস্বিনী' ২৭৬
নবীনমাধব ('শেষকথা') ১৯৯
'নরকবাস' ('কাহিনী') ১৫৮
নরহরি কবিরাজ ৪৩
নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিবেকানন্দ দ্র°

নরেশ ('তপতী') ২৭৪
নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলী ৩৯৭
'নষ্টনীড়' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬২,, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৯৬, ১৯৭
নাটাল মার্কারি পত্রিকা ৭৬
নাটোরের মহারাজ ২৮৭
নানক ১৮৮, ১৮৯, ৩৮০
'নামঞ্জুর গল্প' ('গল্পগুচ্ছ') ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯
নামদেব ৩৮০
নারায়ণ চৌধুরী ৩৭৬
নারায়ণ সংগম ৪০৫
নারায়ণী ('রাজা ও রানী') ২৭১
'নারী' ('কালান্তর') ৬৭
নিউ এম্পায়ার ২৭৪
নিওপ্লেটোনিক দর্শন ২৬৬
নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন ৪০৫
নিখিলেশ ('ঘরে বাইরে') ৩৭, ১৭৮
নিত্যপ্রিয় ঘোষ ১৬৯
'নিদ্রিতা' ('সোনার তরী') ১৫৮
নিবারণ (শেষরক্ষা) ২৭২
নিবেদিতা, ভগিনী ৩৬০
নিয়াবোঙ্গো ৮৫
নিরালা ৪০৭, ৪০৮
'নিরালাকে কাব্য পর বঙ্গলা কো প্রভাব' ৪০৯
নিরুপমা ('দেনা-পাওনা') ১৭৪, ১৭৮
'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ('প্রভাতসংগীত') ১০৩, ১৪২, ২০২
'নিশীথে' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৭
'নিষ্কৃতি' ('পলাতকা') ১৩৭
নীরবালা ('চিরকুমার সভা') ২৭২
নীলমাধব (অভিনেতা) ২৭১
নীলাদ্রিশেখর বসু ৩৪২
নীহারবালা (অভিনেত্রী) ২৭২
'নূতন বাংলা ব্যাকরণ' ২১৯
নেপাল মজুমদার ৮৪, ৩৪৪
নেভিনসন, এইচ. ডব্লু. ৮৮
নেভো দ্রম পত্রিকা ৩৬৫
'নৈবেদ্য' ২৩, ৫৩, ৫৯, ৭৫,. ১৫২, ১৫৮, ১৯৪
নোগুচি ৮৫, ৮৬
নোবেল পুরস্কার ৪০, ৮৩, ২০৩, ৩৬২, ৩৭০, ৩৯১, ৪০৪,
'নৌকাডুবি' ৩৬৩
ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি জার্মানি ৩২৪
ন্যাশনাল কলেজ ৯১
ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, বেঙ্গল ৯৩
ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সিভিল লিবার্টিজ ৮৮
ন্যাশনাল পেপার ৯
'ন্যাশনালিজম' ৪৭
'পঞ্চভূত' ১২৮ ১৯৫
'পণরক্ষা' ('কথা ও কাহিনী') ৩২৯
'পত্রপুট' ৮১, ১৮৯, ৩২১
'পত্রাবলী' (বিবেকানন্দ) ৩৫৮
'পথ ও পাথেয়' ('রাজাপ্রজা') ১৯৪, ৩৮৯
'পথের সঞ্চয়' ৪, ২৫৯
'পদরত্নাবলী' ১৯১
পদ্মনাথ গোহাঞি বড়ুয়া ৪০৬
পদ্মা গাঙ্গুলী ১৮
পবিত্র সরকার ২০৯
'পরশ পাথর ' ('সোনার তরী') ২০১
পরিচয় পত্রিকা ২২৮, ২৫৪
পরিচয় গুপ্ত ১৯
'পরিব্রাজক' ৩২০, ৩৫৮
পরিমল মিত্র ৩৪৩
'পরিশোধ' ('কথা ও কাহিনী') ১৫৮
'পরিহাসের গান' ৩০৬
পরেশবাবু ('গোরা') ২৮
পল ভালেরি ২৫৫, ২৬৫
পলমল্ গেজেট ৭৬
'পলাতকা' ১৭৩, ১৭৮
'পল্লীপ্রকৃতি' ৩৭, ৪৬
পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা ২২৭
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩৭, ২২৬
'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' ১৯৫
পাগলা কানাই ৩১৯
'পাগলা দাশু' ২০৭
পাবনা কনফারেন্স ১১৪, ১১৮, ৩৬৭
পায়োনিয়ার ফোর্স ৭৪
পার্থ বসু ২০৮
পালি প্রবেশ ৩৯২
পিকাসো ২৫৮
পিকিং অপেরা ২৮২
পিকিং-এ কবির জন্মদিন পালন ২৮২

পি. কুনহিরামন নায়ার ৪০৬
পিঠাপুরমের রাজা ৩৯৫
'পিতৃস্মৃতি' ৩০৪
পিয়ারসন, উইলিয়াম ৪, ২০১, ২০২, ২৮৩, ৩৮১, ৩৯১, ৩৯৪, ৩৯৫
'পুণ্যের হিসাব' ('চৈতালি') ১৫৮
পুতুল (অভিনেত্রী) ২৭২
'পুনর্মিলন' ('প্রভাতসংগীত') ২০২
'পুরস্কার' ('সোনারতরী') ১৪৮, ১৫৮, ২৫৬
পুলিন ('নিষ্কৃতি'-'পলাতকা') ১৭৮
পুলিনবিহারী সেন ১৬৩, ১৬৫, ১৬৯ ২২৬
পুশকিন ২৩৯, ৩৬২
'পূজারিণী' ('কথা ও কাহিনী') ১৫৮
'পূরবী' ১৪৬, ১৫৮, ১৭২, ৩৩২
পূর্ণ ('চিরকুমার সভা') ২৭২
পূর্ণদাস ২৯৭
'পূর্ব ও পশ্চিম' ('সমাজ') ২৩, ৩৯০
'পৃথিবী' ('পত্রপুট') ৫১
পৃথ্বীরাজ ১০, ১১
'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' ২৭৭
'পেজান্ট্রি অব বেঙ্গল, দি' ৪৬
পেতাঁ, মার্শাল ৩৫০
পেত্রভ, ফ. ন. ১২০, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭৫
'পোলিটিকাল ফিলসফি অব রবীন্দ্রনাথ' ৬৭
'পোস্টমাস্টার' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৩, ১৬৪, ১৬৭
'পৌল বর্জিনী' ২৭৬
'প্যারাডাইস লস্ট' ৩৮
প্যারি কমিউন ৪৬
প্যারিশ কাউনসিল ৩৩
প্যারিস নগরীর পতন ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫০
'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ৩০৫
'প্রচ্ছন্ন পশু' ৮৮
প্রণবরঞ্জন ঘোষ ৩৫৬
'প্রণয় প্রশ্ন' ('কল্পনা') ৩৬৫
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৩২০
প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস ১৬৯
প্রতাপ সিং ৯
প্রতাপাদিত্য ২৭১
প্রতিভা দেবী ২৭০
প্রতিমা দেবী ৩৩৬
'প্রত্যাবর্তন' ('জীবনস্মৃতি') ২৪৩
'প্রথম পূজা' ('পুনশ্চ') ২৫২
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৪, ৫, ২৫, ৩৫, ৪০, ৬৯, ৮৩, ৮৪, ১০৯, ১১০, ১১১, ৩৩৭, ৩৫১, ৩৯১
প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৩১৮, ৩২০, ৩২১
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৩৪, ৩৫, ২০১
প্রবাসী পত্রিকা ১৫, ৮৭, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ৩১৫, ৩২১, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৫০
প্রবোধচন্দ্র সেন ৭, ২২৫, ২২৮
প্রভা (অভিনেত্রী) ২৭২, ২৭৪
'প্রভাত উৎসব' ('প্রভাতসংগীত') ১৪২
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৩, ১৬৪, ১৬৯, ২৭৩, ২৭৪, ৩০৫, ৩০৯, ৩২১
প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৫, ৩৪২
'প্রভাত সংগীত' ১৪২, ২০২, ২০৩
প্রমথনাথ বিশী ৩২১
প্রমথ চৌধুরী ৩৩, ৩৪, ৩৭, ১০৬, ৩৩৬
প্রমথলাল সেন ২০১
প্রমা পত্রিকা ২২৭
প্রমোদকুমার ঠাকুর ৩১৭
প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞান ২১২
প্রশান্তকুমার পাল ২২৬, ২৭৭
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ২০১, ২০৬
প্রস্তুতি পর্ব : সুকুমার রায় সংখ্যা ২০৮
প্রহ্লাদ পারেখ ৪০৫
'প্রাচীন ভারত' ('চৈতালি') ১৫৮
'প্রাচীন সাহিত্য' ১২৯, ১৩২
'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' ৩৯০
'প্রাচ্য সমাজ' ১৮৩
প্রাথমিক শিক্ষাবিল ৯০, ৯১, ৯৮
'প্রায়শ্চিত্ত' ('নবজাতক') ১২১
'প্রায়শ্চিত্ত' ২৩২-৩৪, ২৮০, ৩০৫, ৩১৪, ৩২১
প্রিয়নাথ সেন ২৬৩
প্রীতীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২২৭
প্রেমচাঁদ লাল ৩৪১
প্লুটার্ক ৩৮
ফজলুল হক ৩৩
'ফরসাইট সাগা' ১৭৫
ফরাসী বিপ্লব ৪৮
ফর্বস, মেজর ৭৫
'ফাঁকি' ('পলাতকা') ১৭৩, ১৮০
ফার্থ, জে আর ২১৭

ফাগুলাল ('রক্তকরবী') ২৩৮
'ফাল্গুনী' ১৪৬, ১৪৯, ১৫১, ২৭৩, ২৭৪, ২৮০, ২৮১, ২৮৬, ২৮৭, ২৯৮, ৩১৫, ৩৩৮
'ফুল ও ফল' ('কণিকা') ৪০৭
ফেবিয়ান আন্দোলন, আয়াল্যান্ডি ৪৬
ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ ৩৫৪
ফ্রয়েড ৩৫৯
ফ্রাংকো, জেনারেল ৮৫
ফ্লান্ডার্স ও ডানকার্কের পতন ৩৪৭
'বউঠাকুরানীর হাট' ২৭১, ৩০৫
বগদানফ ৩৯৫
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১-১৫, ২২, ৪২, ৪৬, ১৩২, ১৪৯, ১৭৫, ১৮০, ২০৩, ২৫৯, ২৭০
বঙ্গদর্শন ১১, ১২, ১৪, ৪৫, ২৬২, ২৬৩, ২৮০, ৩৮৮
'বঙ্গদেশের কৃষক' ৪৫, ৪৬
বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গরোধ আন্দোলন ২২, ১৭১, ৩১১, ৩১৪, ৩৬৭, ৩৮৮
বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন ৪০৫
বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ৩৩
'বঙ্গীয় শব্দকোষ' ৩৯২
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৬৮
বন্ডেল ৩৮
'বদনাম' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৭, ১৯৬, ১৯৯
'বনফুল' ১৪২, ১৫১, ৩৩০
'বনবাণী' ৩৩৩
বনারসীদাস চতুর্বেদী ১৬৯, ৪০৫
'বনে ও রাজ্যে' ('চৈতালি') ১৫৮
বন্দেমাতরম্ ২২
'বন্ধন' ('সোনার তরী') ১৫৮
বর্ধমান, অ. অ. ৩৬৫
'বর্তমান ভারত' ৩৫৮
বর্ষামঙ্গল ২৮৭, ৩১৫, ৩১৬
'বর্ষামঙ্গল' ('কল্পনা') ১৫৭
'বর্ষাযাপন' ('সোনার তরী') ১৬৮
বলকান-তুর্কি যুদ্ধ ৮৩
বলশয় থিয়েটার ৩৬৫
'বলাকা' ৮০, ৮৪, ১১০, ১৭২
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩, ৩৮৬
'বসন্ত' ২৭১
বসন্ত রায় ('বউঠাকুরানীর হাট') ২৩৩, ২৭১
'বসুন্ধরা' ('সোনার তরী') ২৮, ৪০, ৪৯, ১৫৮
বসুবিজ্ঞান মন্দির ৫
বহুবিবাহ প্রথা ১৭০
বহুরূপী ১৬৯, ২৭০, ২৭২, ২৭৪
'বাইশে শ্রাবণ' ৮৮
'বাউলগান' ('সংগীতচিন্তা') ১৯৫
'বাউলবিংশতি' ৩২১
'বাউলের গান' ('সংগীতচিন্তা') ২৪৪, ৩২০
'বাংলা উচ্চারণ' ('বাংলা শব্দতত্ত্ব') ২১৩
'বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত' ৩২১
বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ১৯
'বাংলা বাউল ও বাউল গান' ৩২০, ৩২১
'বাংলা বানান ও রবীন্দ্রনাথ' ২২৭
'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' ২২৭
'বাংলাভাষা পরিচয়' ১৯৪, ২১১, ২১৭, ২১৯, ২২৬
'বাংলা শব্দতত্ত্ব' ২১০, ২১১, ২১৩, ২১৯, ২২২-২৪, ২২৬, ২২৭
'বাংলা শব্দদ্বৈত' ('বাংলা শব্দতত্ত্ব') ২১৬
'বাংলা সমালোচনা পরিচয়' ২৬৫
'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' ১৬৯
বাক্ সাহিত্য ২২৬
'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ' ২২৬
'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ৩২০
'বাঙ্গালার ইতিহাস' ১১
'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' ১২
'বাঙ্গালীর গান' ৩২১
বাটলার, স্যার হারকুর্ট ৯১, ৯৮
বাণভট্ট ১৪৪, ১৪৬
'বাতায়নিকের পত্র' ('কালান্তর') ৬৭, ১৯৫
বাবা সুরদিৎ সিং, সুরদিৎ সিং দ্র°
বায়রন ৩৬২
বারবুস, আঁরি ১০৯-১১২, ১১৯, ১৭১, ৩৬২
বার্লিন সম্মেলন ৭৬
বালক পত্রিকা ২৭৭
'বালক' ('পুনশ্চ') ২৪৩
বালজাক ১৭১
বাল্মীকি (কবি) ১৬০, ১৬১, ২৫৬, ৪০৩
বাল্মীকি ('বাল্মীকিপ্রতিভা') ৭২, ২৭০, ২৮৬
'বাল্মীকিপ্রতিভা' ৭২, ১৫৮, ২৭০, ২৭৭-৭৯, ২৮৬
বাল্যবিবাহ প্রথা ১৭০

'বাসবদত্তা' (সুবন্ধু রচিত) ১৪৮
বিক্রমদেব ('তপতী') ২৭৪, ২৭৫
বিক্রমদেব ('রাজা ও রানী') ২৭১, ২৭৯, ২৮৬
'বিচারক' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৫, ১৬৮
বিজয়রাঘবন ৪০৮
বিজয়াদিত্য ('শারদোৎসব') ২৭৯
'বিজয়িনী' ('চিত্রা') ১৫০
বিজুলী পত্রিকা ৪০৯
বিজ্ঞান আকাদেমি ৩৬৩
'বিদূষক' ('লিপিকা') ১৯৬, ১৯৭
বিদ্যাপতি ১১, ১৯১
'বিদ্যার যাচাই' ('শিক্ষা') ৯০
'বিদ্যা-সমবায়' ('শিক্ষা') ৯০, ৯৯
বিদ্যাসাগর ৩২, ৪২, ৪৫-৪৭, ১৭০, ১৮০, ২০৩, ২১৪
'বিদ্যাসুন্দর' ১৯২
বিধবাবিবাহ প্রথা ১৭০
বিধুশেখর ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী ৩, ৩৮৬, ৩৯২-৯৬
বিনায়ক মাসোজি ৫
বিনু ('মুক্তি'-'পলাতকা') ১৭৩
বিনোদ ('শেষরক্ষা') ২৭২
বিনোদিনী ('চোখের বালি') ১৭৫, ২৭২
বিপাশা ('তপতী') ২৭৪
বিপ্রদাস ('যোগাযোগ') ২৭৪
'বিবাহ মঙ্গল' ('কল্পনা') ৪০৭
বিবেকানন্দ, স্বামী ২৩, ৪২, ৩৫৬-৬০
'বিবেচনা ও অবিবেচনা' ('কালান্তর') ৬৭
বিভা ('বউঠাকুরানীর হাট'/'রাজা বসন্ত রায়') ২৭১
বি. ভি. ওয়ারেকর ৪০৯
বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ২৫৪
বিমলা ('ঘরে বাইরে') ২৯, ১৭৬, ১৭৮
বিল্হন ১৫৮
'বিলাসের ফাঁস' ('সমাজ') ১৯৪
বিশ্বজিৎ রায় ৩৪২
'বিশ্বপরিচয়' ৫৬, ৫৯, ৬১
'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' ('শিক্ষা') ৯০, ১০০, ১০১
'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' ৩৭
বিশ্বভারতী ৩-৬, ২১, ৩১, ৩৭, ১০০, ১১০, ১৫৩, ১৬৮, ২২৬, ২২৮, ৩২০, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪০-৪২, ৩৫৮, ৩৭০, ৩৮৫-৪০০
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ২২২
বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৯৫
বিশ্বভারতী সমবায়-কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৩৪০
বিশ্বভারতী সোসাইটি ৩৩৮, ৩৯৪, ৩৯৬
'বিশ্ব মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' ৪০৬
'বিশ্ব সাহিত্য' ('সাহিত্য') ১২৮
'বিষবৃক্ষ' ১২৭, ১৭৫
বিসমার্ক ৭৬
'বিসর্জন' ৪০, ১৬৪, ২৭১, ২৭২, ২৭৯-৮১, ২৮৩, ২৮৬, ৩০২, ৩০৫, ৩২০, ৩৩৬
বিহারী ('চোখের বালি') ১৭৫, ২৭২
বিহারীলাল চক্রবর্তী ১৪৩, ৩২০, ৩২১
বিহারীলাল সরকার ৩২০
'বীক্ষাশাস্ত্র' ২৫৪
বীণাবাদিনী পত্রিকা ৩০৬, ৩০৯, ৩১৮
বীমস্, জন ২১৪
বীমসের বাংলা ব্যাকরণ ২১৩
বীরচন্দ্র মাণিক্য ২৭৯
'বীরবাণী' ৩৬০
বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮৫
'বুদ্ধকথা' (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৩৮
বুয়র যুদ্ধ ৮৩
'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' ৯
'বৃহত্তর ভারত' ('কালান্তর') ৬৭
বেঙ্গল কেমিক্যাল ৩৫
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ৯১
'বেঙ্গল রায়ত' ৪৬
বেঙ্গল রুর‍্যাল প্রাইমারি এডুকেশন আইন ৯০
বের্গসঁ ৩৯, ৪০
বেল ক্লাইভ, ক্লাইভ বেল দ্র°
বেশান্ত, অ্যানি/আনি ২৫, ২৭৩, ৩৯২
বৈকুণ্ঠ ('বৈকুণ্ঠের খাতা') ২৭২
'বৈকুণ্ঠের খাতা' ২০৬, ২৭২, ২৭৪, ২৮৬
'বৈরাগ্য' ('সোনার তরী') ১৫৮
বৈষ্ণব পদাবলী ১৪৩
বোকেচ্চিও ৩৮
বোদাতকর ৪০৬
'বৌঠাকুরানীর হাট', 'বউঠাকুরানীর হাট' দ্র°
'ব্যাটেলশিপ পতেমকিন' ৩৬৫
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ৫, ১৯৫, ২০১, ৩৫৭
ব্রহ্মচর্যাশ্রম ৩-৫, ৩১, ৯০, ৯১, ১০১, ১৬৫, ৩৩৬

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১১০, ৩৮৬
ব্রাউনিং ২৬১
ব্রিজেস, রবার্ট ২০২, ২৫৯
ব্রুক, স্টপফোর্ড এ. ২৫৯
ব্লুমফিল্ড, লেওনার্ডে ২১১
ব্ল্যাকী (অভিনেত্রী) ২৭২
ভক্‌স ৩৬২-৬৪, ৩৬৬, ৩৬৭
'ভগিনী নিবেদিতা' ৩৬০
ভবতোষ দত্ত ৩১
ভবদত্ত ২৩২
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১০
ভরোনস্কি, আ. ৩৬৩
ভানুশেখ ৩১৯
'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ৩৯, ১৭৭
ভাণ্ডার পত্রিকা ৩৫
'ভাবুক সভা' ২০৩
ভারতচন্দ্র ১৪৩, ১৯০, ১৯২
'ভারতবর্ষ ও স্বদেশ' ৬৬
'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ('ইতিহাস') ১৫৮
'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' ('ইতিহাস') ২৮, ৪৭, ১৯৪
'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' ৮
'ভারত ভাস্করণ' ৪০৬
'ভারতসভা' ১৩, ১৪
ভারতী পত্রিকা ১০৩, ১৪৯, ১৬৫, ২১৯, ২৪৪, ২৪৫, ২৫৯, ২৬২, ২৬৩, ২৭৭, ২৮১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৯
ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস ৩২১
ভারতীয় সংগীত সমাজ ২৭২
'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' ৮৪
'ভারতের তলস্তয়' ৩৬৩
ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ৩৪৭
ভার্নাক্যুলার প্রেস অ্যাক্ট ৭০
ভালতের, আ. আ. ৩৬৫
ভালাথোল নারায়ণ মেনন ২৯৯
ভালেরি, পল, পল ভালেরি দ্র°
'ভাষা দেশ কাল' ২২৬-২৮
'ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' ২১৯
'ভাষাবিচ্ছেদ' ('শব্দতত্ত্ব') ২২৪-২৬
'ভাষার ইঙ্গিত' ('শব্দতত্ত্ব') ২১৬, ২১৭
'ভাষার কথা' ২২০
'ভিখারিনী' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৫
ভি. ডি. সাভারকার ৪০৪
ভীমরাও শাস্ত্রী ৪০৫, ৪০৮
ভীমরাও হাসুরকর ৩৯৩, ৩৯৫
'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' ১২৮
ভূর্জপত্র ২২৬
ভূদেব চৌধুরি ১৬০
ভূপতি ('নষ্টনীড়') ১৬৬, ১৯৭
ভূমিসূক্ত ১৫৮
ভের্নের, কার্ল ২১৬
ভেল্‌তমান, ল.স. ৩৬৫
ভ্রমর ('কৃষ্ণকান্তের উইল') ১৬১
'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' ৩২৫, ৩৪৯
মঙ্গলকাব্য ১৪৩
মঙ্গলা ('বউঠাকুরানীর হাট') ২৭১
মঞ্জুলিকা ('নিষ্কৃতি'-'পলাতকা') ১৭৪, ১৭৮
মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকা ২০২, ৩৭৮
মণীন্দ্রচন্দ্র সেন ৩৪২
মণীন্দ্র রায় ৩৪২
মণীন্দ্রলাল বসু ২০০
মণ্ডা ক্লাব, মানডে ক্লাব দ্র°
মতির মা ('যোগাযোগ') ২৭৪
মতিলাল নেহরু ২৫
মতিলাল সুর ২৭১
মদন ('মানভঞ্জন') ২৭৮
'মদনভস্মের পরে' ('কল্পনা') ১৪৫, ১৫৮
'মদনভস্মের পূর্বে' ('কল্পনা') ১৫৮
মদনমোহন মালব্য ২৫, ২৭৩
মধুসূদন ('যোগাযোগ') ১৭৫, ১৮০, ২৭৪
মধুসূদন দত্ত ১৪৩, ১৮০, ২৫৮
'মধ্যবর্তিনী' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৭
মধ্যস্থ পত্রিকা ৯
মধ্ব ৩৫৮
মনসার ভাসান ১৮৯
মনসুর উদ্দীন ৩২১
মনীষা দেবী ২৮৭
'মনুষ্য' ('পঞ্চভূত') ১৯৫
মনোমোহন গোস্বামী ২৭২
মনোমোহন বসু ৯, ১৩, ৩১১, ৩২০

মনোরঞ্জন পত্রিকা ৪০৪, ৪০৯
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ২৭২
মনোরমা ('পলাতকা') ১৭৩
ময়ূর ভট্ট ১৪৪
মস্কো আর্ট থিয়েটার ৩৬৫
'মস্তকবিক্রয়' ('কথা ও কাহিনী') ১৫৮
মহম্মদ আলী জিন্না ৯
মহম্মদ মনসুর উদ্দীন, মনসুর উদ্দীন দ্র°
'মহাকাব্যের লক্ষণ' ১৬৮
'মহাত্মাজী', গান্ধি দ্র°
'মহাবস্তু' ১৫৮
মহাভারত ৪২, ১৪৩, ১৫৪, ১৬১, ৪০৩
'মহামায়া' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৭
মহা-হিন্দু সমিতি ৯
'মহুয়া' ৪০
মহেন্দ্র ('চোখের বালি') ১৭৫, ২৭২
মহেন্দ্রলাল বসু ২৭১
মাওৎসে তুং/মাও সে তুঙ ২৪, ২৩০, ২৪০
মাঘোৎসব ২০৫
মাতিস ২৫৮
'মাদময়াজল দ্য মর্প্যাঁ' (গোতিয়ের) ২৬১
'মাদার' ৩৪৯
মাধব ('ডাকঘর') ২৭৩
মাধব ('প্রথম পূজা'-'পুনশ্চ') ২৫২
মাধব জুলিয়ান ৪০৭
মানডে ক্লাব (মণ্ডা ক্লাব) ২০৪, ২০৬
'মানভঞ্জন' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৭
'মানময়ী' ২৭৮
'মানসসুন্দরী' ('সোনার তরী') ৪০, ১৫৮
'মানসী' ১৪২, ১৫৮, ২২৫, ৩০৯, ৩২২
'মানুষের ধর্ম' ৬, ১৫৩, ১৬৮, ৩২১, ৩৫৩
'মায়াবাদ' ('সোনার তরী') ১৫৮
'মায়ার খেলা' ২৭১, ৩০৯
'মায়ের সম্মান' ('পলাতকা') ১৭৩
মার্কস, কার্ল ২১, ২৩০, ২৩৬, ৩৫৯
'মালঞ্চ' ১৭৬
'মাল্যদান' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৪
মাল্লা ভারাপ্পু ৪০৫
'মাস্টারমশায়' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৪, ১৬৫
'মিঠা আরু তিতা' ৪০৭
মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা ৩৬৬
মিল, জন স্টুয়ার্ট ৪০
মিলটন ৩৮
মীর মশাররফ হোসেন ১২
মীরাবাঈ ১৭৮, ১৮০
'মুকুট' ১৫৪, ১৬৫
মুকুল পত্রিকা ২০০
'মুক্তকুন্তলা' ('গল্পসল্প') ২৭৭
'মুক্তধারা' ৩৭, ১৪৯, ১৫৮, ২৩২, ২৩৭, ২৭৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩৭৪
'মুক্তি' ('পলাতকা') ১৭৩, ১৭৮, ১৮০
'মুক্তি' ('সোনার তরী') ১৫৮
মুজফ্‌ফর আহমদ ৩৬৬
মুনশীরাম, শ্রদ্ধানন্দ দ্র°
'মুসলমানির গল্প' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৭
মুসোলিনি, বেনিতো ৭৮, ৮৬, ৮৭, ১২০, ৩৫৪
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শহীদুল্লাহ দ্র°
'মূল্যপ্রাপ্তি' ('কথা ও কাহিনী') ১৫৮
মৃণাল ('স্ত্রীর পত্র') ১৭৪, ১৭৮, ১৮০, ১৯৭
মৃণালিনী দেবী ৩৮৬
'মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ' ৪০৬, ৪১০
মেই ল্যাঙ-ফাঙ্ ২৮২
'মেঘ ও রৌদ্র' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬০, ১৬২, ১৬৩, ১৯৬, ১৯৮
'মেঘদূত' ১২৯, ১৪৪, ১৫১, ১৯১, ২৬৪
'মেঘদূত' ('প্রাচীন সাহিত্য') ১২৯, ১৩২, ১৪৪
'মেঘদূত' ('মানসী') ১৫৭, ১৫৮
'মেঘনাদবধ কাব্য' ১৫৮
মেনন, ভালাথোল নারায়ণ, ভালাথোল দ্র°
'মেয়েলি ছড়া' ('লোকসাহিত্য') ২৪৮
মৈত্রেয়ী দেবী ৮৬, ৮৯, ৩২৫, ৩২৯, ৩৪৯
মৈথিলীশরণ গুপ্ত ৪০৬
মোড়ল ('ডাকঘর') ২৭৩
মোফাত্, জন ৭৩
মোহিতচন্দ্র সেন ৩৮৬
মৌলা বক্স ৮
ম্যাককিনন, উইলিয়ম ৭৪
ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান ৮৪
ম্যাটসনি/ম্যাটসিনি ৬৮, ১৯৭
ম্যাটাবিলি যুদ্ধ ৭২
'ম্যান অব প্রপার্টি', 'ফরসাইট সাগা' দ্র°
যতীন ('গৃহ প্রবেশ') ২৭২

যতীন দাশ ২৫
যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্ ৫, ৬, ২১, ৯৬, ৩৯৩, ৩৯৪
যদুনাথ সরকার ১৭
'যাত্রার পূর্বপত্র' ('পথের সঞ্চয়') ৪, ৩৯০
যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং ৯১
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৯১
যুগবীণা পত্রিকা ৪০৯
'যুগমূর্তি রবীন্দ্রনাথ' ৪০৬
যুগান্তর পত্রিকা ৩৪৯, ৩৫০
যুধিষ্ঠির ২৬২
যোগাযোগ ১৫৩, ১৭৫, ২৭৪
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ১৩, ১৪
যোগেশ চৌধুরী ২৭২, ২৭৪
য়্যুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল ৩৭৮
য়্যুনিভার্সিটি কলেজ, লণ্ডন ৭২, ২১২
'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ৭০, ১৭২
য়েটস ২৫৯, ২৬১
'রক্তকরবী' ১১১, ১২৭, ১৪৯, ১৫৮, ২৩৮, ২৩৯, ২৭৪, ৩১৬, ৩১৮, ৩৭০, ৩৭৩, ৩৭৪
রঘুনন্দন ১১
রঘুনাথ শিরোমণি ১১
রঘুপতি ('বিসর্জন') ২৭১, ২৭২, ২৭৯, ২৮৪, ২৮৬
রঙ্গ, এন. জি. ৮৫
'রঙ্গমঞ্চ' ('বিচিত্র প্রবন্ধ') ২৮০, ২৮৭
রজ্জব ১৮৬, ১৮৯
রঞ্জন ('রক্তকরবী') ৩৭৪
রত্নকান্ত বরকাবতি ৪০৯
রত্নেশ্বর ('তপতী') ২৭৪
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭৯, ২৮১, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪২, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৬
'রথের রশি' ২৩৯, ২৪০
রবি কাজি ৩
'রবিজীবনী' ২২৬, ২৭৭
রবিদাস ১৮৬, ১৯৩
রবিন্‌সন, এডুইন এ. ২৫৯
রবি রায় ২৭২, ২৭৪
'রবীন্দ্রকথা' ২৭১
'রবীন্দ্রকথা' (তামিল) ৪০৬
'রবীন্দ্রকবিতা কানন' ৪০৬
রবীন্দ্র কেলেকার ৩৭৯
'রবীন্দ্রচর্যা' ২২৬
'রবীন্দ্রচিত্রকলা : রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা' ৩২৬
'রবীন্দ্রজীবনী' ১৬৪, ১৬৯, ২৭৪, ৪০৬
'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলা ভাষা' ২২৬
'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' ৩২১
'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' ১৬৮
'রবীন্দ্রনাথের তরুণবন্ধু' ২০৮
'রবীন্দ্রনাথের রহস্যগল্প' ১৬৯
'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' ('কালান্তর') ৬৭, ১০৬
'রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী' ১৬৪, ১৬৯
'রবীন্দ্র-বিদূষণ ইতিবৃত্ত' ২০
'রবীন্দ্রবীণা' ৪০৬
'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' ৩২১
'রবীন্দ্রমনন' ৪০৬
'রবীন্দ্ররচনাবলী' ৩৭, ১৫৭, ১৬৮, ১৬৯, ২২৬, ২২৮
'রবীন্দ্রসংগীত' ৩২০, ৪০৮
'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগমে' ৩১৩
'রবীন্দ্রসঙ্গীত' ২০, ৩০৪
'রবীন্দ্রসমীক্ষা' ৪০৬
'রবীন্দ্র সাহিত্য কী সমীক্ষা' ৪০৬
'রবীন্দ্রসাহিত্যের নবরাগ' ১৬৯
'রবীন্দ্রস্মৃতি' ২৭০
'রবীন্দ্রায়ণ' ২২৬
রমেশচন্দ্র দত্ত ৪৬
রয়টার ৩৫৫
রয়াল ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ২০০
রয়েল থিয়েটার ২৭৮
রলাঁ, রমাঁ ১৭১, ৩৬২
রসিক ('চিরকুমার সভা') ২৭২
রাখিবন্ধন ৩৮৮
রাজকৃষ্ণ রায় ২৭০
'রাজটীকা' ('গল্পগুচ্ছ') ১৯৬, ১৯৮
রাজনারায়ণ বসু ৯, ১০, ১৩, ১৪, ২২
'রাজনীতির দ্বিধা' ৭২
'রাজপুত্তুর' ('লিপিকা') ২৪৪
'রাজর্ষি' ১৫৪, ২০০

রাজশেখর বসু ২০, ২০৭, ২২১
রাজসন্ন্যাসী ('শারদোৎসব') ২৭৪, ২৭৯
'রাজসিংহ' ১২৯, ১৩২, ২৫৯
'রাজা' ১৬, ৮৩, ১৫৮, ২৩১, ২৩২, ২৩৪, ২৩৫, ২৭৪, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৬, ৩০৯, ৩১৪
রাজা ('অরূপরতন') ২৭৪, ২৭৫
'রাজা ও রানী' ২৭১, ২৭৯, ২৮০, ২৮৬, ৩০৫, ৩২০
'রাজাপ্রজা' ৬৬, ১৯৪
'রাজা বসন্তরায়' ('বউঠাকুরাণীর হাটে'র নাট্যরূপ) ২৭১, ৩০৫
'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' ('সোনার তরী') ১৫৮
রাধামাধব কর (অভিনেতা) ২৭১
রাধামোহন গড়নায়ক ৪০৭
রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় (অভিনেতা) ২৭২
রানী চন্দ ১৬৭
রানীবালা (অভিনেত্রী) ২৭৪
রানী মহলানবীশ ৮৮
রাবণ ২৬২
রাম ২৬২, ২৭১
রামধারী সিংহ দিনকর ৪০৬
রাম পাঁজওয়ালী ৪০৯
রামবহাল তেওয়ারী ৪০৩
রামমোহন রায় ২১, ২৩, ৩৪, ৪২, ৪৪-৪৬, ১৭০, ২০৩, ২০৫, ৩৫৭-৫৯, ৩৮০
রামসর্বস্ব পণ্ডিত ২৭৫
রামানন্দ ১৯৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২০১, ২০৪
রামানুজ ৩৫৮
রামায়ণ ৪২, ১৪০, ১৪৩, ১৪৪, ২৫৮, ৪০৩
'রামায়ণ' ('প্রাচীন সাহিত্য') ১৫১
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৬১, ১৬৮, ২১৯, ৩৮৯
'রায়তের কথা' ('কালান্তর') ৩৩, ৩৭, ৬৭
রায়া প্রলুই সুব্বারাও ৪০৫
'রাশিয়ার চিঠি' ৩৭, ৪৮, ১১৩, ৩৬০, ৩৬৯-৩৭৫
রাষ্ট্রসংঘ ৬
রাসকিন, রাস্কিন দ্রঃ
রাসবিহারী ঘোষ ৯১
রাসবিহারী বসু ৮৬
'রাসমণির ছেলে' ('গল্পগুচ্ছ') ১৩৭
রাস্কিন/রাসকিন, জন ৭৬, ২৬১, ২৬৩
'রাহুর প্রেম' ('ছবি ও গান') ১৫৮, ২৫১
'রিটার্ন ফ্রম ইউ এস এস আর' ৩৬৯
রুজভেল্ট ৮৮, ৩৪৭-৪৯, ৩৫৩, ৩৫৫
'রুদ্রচণ্ড' ২৭৭
রুশ-জাপান যুদ্ধ ৮৩
রুশ বিপ্লব ৪৮, ১০৯, ১১০, ১৮১, ২৩০, ২৩৯, ৩৭১, ৩৭৩
রুপা কোম্পানি ২২৬
'রেজারেকশান' ৩৬৫, ৩৭৩
রেনো, মঁসিয়ে ৪৭-৫০
রেবা চাঁদ ৩৮৬
'রোগশয্যায়' ১৫৬, ১৫৯
রোটেনস্টাইন ৩৯০
রোডস, সেসিল ৭২-৭৫, ৭৭
রোহিণী ('কৃষ্ণকান্তের উইল') ১৬১
র‍্যাথবোন, মিস ৩৮১
লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্র ৪০৮
'লক্ষ্য ও শিক্ষা' ('শিক্ষা') ৯০, ৯৭
'লড়াইয়ে মূল' ('কালান্তর') ৬৭, ৩৫১
লতিকা রায় ২৮৩
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ৭২, ২১২
লবন আইন (অমান্য আন্দোলন) ১৭১
লবেঙ্গুলা ৭৩-৭৫
ললিত ('শেষরক্ষা') ২৭২
ললিতা ('গোরা') ২৯
লাবণ্য ('শেষের কবিতা') ৩০, ১৭৬
লাল চাঁদ ৪০৮
লালনশাহ ৩০১, ৩০৪, ৩০৯, ৩১৮-২০
লিপার্ট, এডওয়ার্ড ৭৪
'লিপিকা' ১৬৫, ১৯৬
লিভিংস্টোন ৭৭
লিয়র, এডওয়ার্ড ২০৭
লীগ অফ নেশনস্ ১০০, ৩৭১, ৩৭২
লীগ এগেনস্ট ফ্যাসিজম অ্যান্ড ওআর ৮৫
লীটন, লর্ড ৭০
লীলা মজুমদার ১৩৪, ২০৮
লীলা মিত্র ৯৮
লীলারতি ৪০৭

লুনাচারস্কি, আনাতোলি ৩৬৩
লেট্‌স্‌ ডায়রি ২৭৭
লেনিন ১৮, ১১১, ২৩৯, ৩৬১
'লে ফা' ১১১
লেবেদেভ, ভি. ৩৬২
লেব্রাঁ, প্রেসিডেন্ট ৩৫০
লেভি, সিলভ্যাঁ, সিলভ্যাঁ লেভি দ্র°
লেস্‌নি ৩৯৫
'লোকসাহিত্য' ১৩২, ১৯৫, ২৪৮, ৩১৪
'লোকহিত' ('কালান্তর') ৬৭
লোকেন পালিত ('জীবনস্মৃতি') ২২৬
লোয়েল, এমি ২৫৯
ল্যান্সডাউন, লর্ড ২৭৯
শওকৎ ওসমান ১৯
শকুনি ২৬২
'শকুন্তলা' ('প্রাচীন সাহিত্য') ১৫১
'শক্তিপূজা' ('কালান্তর') ৬৭, ১৯০
শঙ্করাচার্য ৪১, ১৫৪, ৩৫৮, ৩৫৯
শখলোভস্কি, ই. ৩৬২
শচীনদেব বর্মন ৩১৯
শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ৩০৪
শচীন্দ্রনাথ সেন ৬৭
'শতগান' ৩১২-১৪, ৩১৭
শনিবারের চিঠি পত্রিকা ২২০
শফর :
ইংলণ্ড/বিলাত ৪, ৬, ৭০, ১৪১, ১৪৯, ২৪৬, ৩৯০
ইয়োরোপ ৫, ৪১, ১২০, ১৪২, ৩৩৭, ৩৬৪
কানাডা ১৮
জাপান ৪, ৮৪, ৩৯১
ডেনমার্ক ৩৫
দক্ষিণ ভারত ৫
পূর্ববঙ্গ ২৪৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪, ৪১, ৮৪, ১০৯ ১২০, ৩৩৮, ৩৭৮ ৩৯১
রাশিয়া ৩৫, ৪৮, ১০৩, ১১৩, ৩৬৪
শ, জর্জ বার্নার্ড ৩৬৯
'শব্দতত্ত্ব' ২১০, ২১১
শম্ভু মিত্র ২৭২, ২৭৪
শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ২১৯
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮০, ২৫৯
শশিভূষণ ('মেঘ ও রৌদ্র') ১৬০, ১৬৩, ১৯৯
শশিভূষণ দাশগুপ্ত ৪০৯
শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ ২১০, ২২৬
শাৎস্কি, স. ত. ৩৬৫
শান্তিদেব ঘোষ ২০, ২৮৩, ২৯৬, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৮, ৩২০, ৩৩৩
'শান্তিনিকেতন' ১৫৩
শান্তিনিকেতন পত্রিকা ৫
'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ' ৩৮৭
'শাপমোচন' ১৫৮, ৩১৮
'শারদোৎসব' ২৩১, ২৩২, ২৭৪, ২৭৯-৮১, ২৮৬, ৩১৪, ৩১৫
'শাস্তি' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬২, ১৬৫-৬৮, ৩২৫
'শিক্ষা' ৯০, ১৯৪, ২১১, ২২৩
শিক্ষা ও সংস্কৃতি ('শিক্ষা') ৯০, ১০১
'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান' ('সংগীত চিন্তা') ৩২১
'শিক্ষাবিধি' ('শিক্ষা') ৯০, ৯৬-৯৭
'শিক্ষার বাহন' ('শিক্ষা') ৯০, ৯৮
'শিক্ষার বিকিরণ' ('শিক্ষা') ৯০, ১০১
'শিক্ষার মিলন' ('শিক্ষা') ৬৭, ৯০, ১০০
'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ ('শিক্ষা') ৯০, ১০২
'শিক্ষা সংস্কার' ('শিক্ষা') ৯০, ৯২-৯৩
'শিক্ষা সমস্যা' ('শিক্ষা') ৯০, ৯৩-৯৪
'শিক্ষার হেরফের' ('শিক্ষা') ১৯৪
শিবচরণ ('শেষরক্ষা') ২৭২
শিবনাথ ৪০৬
শিবনাথ শাস্ত্রী ২০০
শিবাজী ১৪, ১৮৬
শিবাজী উৎসব ১৪, ১৯৪
'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ' ('ইতিহাস') ১৯৪
শিলার ১৭১, ২৫৭
শিল্প বিপ্লব ৪৪
শিশিরকুমার ঘোষ ৩৪২
শিশিরকুমার ভাদুড়ী ২৭২, ২৭৪
'শিশুতীর্থ' ('পুনশ্চ') ৩৭৪
'শিশু ভোলানাথ' ১২০
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ২০০
'শূদ্রধর্ম' ('কালান্তর') ৬৭
শেংগেলি, গ. ৩৬৫
শেক্‌সপীয়ার ৩৮, ১২৯, ১৭০, ১৭১, ২৫৬, ২৫৯, ২৭১, ৩৬২

শেলি ৪০, ২৫৫, ২৬১
'শেষকথা' ('তিনসঙ্গী') ১৯৬, ১৯৯
শেষ কুলকরনী ৪০৫
'শেষবর্ষণ' ১৫৮
'শেষরক্ষা' ২৭২, ২৭৪
'শেষ লেখা' ১৫৬
'শেষ সপ্তক' ৫৮, ৬৩
'শেষের কবিতা' ১৪৪, ১৪৫, ১৫৭, ১৭৬
শৈল ('চিরদিনের দাগা'-'পলাতকা') ১৭৩
শৈলজারঞ্জন মজুমদার ২৮৮
শোর, র. ৩৬৫
শৈলেন চৌধুরী ২৭২, ২৭৪
'শৈশব সংগীত' ১৪২
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৩১৭
'শ্যামলী' ১৫৬
'শ্যামা' ১৫৮, ২৮৫
শ্যামা ('যোগাযোগ') ২৭৪, ৩১৮
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ৩২০
শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী ৯১
'শ্রাবণ গাথা' ১৫৮
শ্রীঅরবিন্দ, অরবিন্দ ঘোষ দ্র° ৯১, ৩৪৯
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৮
শ্রীচৈতন্য ১১, ১৮৬, ১৮৭
শ্রীনিকেতন ৩৩৯-৪২, ৩৭০, ৩৮৪, ৩৯৫
শ্রীনিকেতন গ্রামোন্নয়ন সমিতি ৩৩৯
শ্রীনিবাস রাঘবন ৪০৯
শ্রীমতী ভারতী ৪০৬
শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৩৫৬-৬০
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ১৯১
শ্রুতিভূষণ ('ফাল্গুনী') ১৪৬
'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' ('কথা ও কাহিনী') ১৫৮
শ্লেগেল ৩৮
সংগীত গীতাঞ্জলি ৪০৮
'সংগীতাচিন্তা' ১৯৪, ১৯৫, ৩২০, '৩২১
'সংগীতের মুক্তি' ('সংগীতচিন্তা') ৩২১
'সংস্কার' ('গল্পগুচ্ছ') ১৯৬-৯৮
সংস্কৃত প্রবেশ ৩৯২
সখি সমিতি, সখী সমিতি ২৬৮
সঙ্গীত প্রকাশিকা পত্রিকা ৩১২
'সঙ্গীত সংগ্রহ' ৩০২
'সঞ্চয়িতা' ১৮
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৪৬
সঞ্জীবনী সভা ১০
সতীদাহ প্রথা/সতী প্রথা ৪৩, ১৭০
সতীশচন্দ্র রায় ৩৮৬, ৩৮৭
'সত্য ও বাস্তব' ('সাহিত্যের স্বরূপ') ১৬৮
সত্যাগ্রহ আন্দোলন ১৭০
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০, ৩৮, ৩৯, ৭০, ২৭১, ২৭৯, ২৮৪, ২৮৬
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮০, ২৮১
সত্যেন্দ্রনাথ রায় ১২৭
সত্যের আহ্বান ('কালান্তর') ২৫, ৬৬, ৬৭ ৩৭৮
'সধবার একাদশী' ২৭৬
সন্ত সিং সেখন ৪০৯
সন্তোষকুমার মিত্র ৩৩৮, ৩৯৫
সন্তোষচন্দ্র ভঞ্জ ৩৪২
সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ২৭৩, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৯১, ৩৯৫,
সন্দেশ পত্রিকা ২০৩
'সন্ধ্যা' ২০১
'সন্ধ্যা সংগীত' ১৪২, ১৫৭, ২০২, ২৫১, ৩২২
'সফলতার সদুপায়' ('আত্মশক্তি ও সমূহ') ২২৬
সবুজপত্র ৩৩, ৮৩, ১৬৫, ১৬৮, ২০৬, ২২০
'সভ্যতার সংকট' ('কালান্তর') ২৬, ২৮, ৬৭, ৬৯, ১১৮, ১২২, ১৫৯, ১৭৭, ৩৬০, ৩৮১
'সমবায়' ('পল্লীপ্রকৃতি') ১০৪
'সমবায়নীতি' ('পল্লীপ্রকৃতি')৩৭
'সমস্যা' ('কালান্তর') ৬৭
'সমাজ' ৩৭, ১৯৪
'সমাজ ভাষাবিজ্ঞান' ২২৭
'সমাধান' ('কালান্তর') ৬৭
'সমাপ্তি' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৩-৬৫
'সমালোচনা' ১২৮
সমীরণ চট্টোপাধ্যায় ৩৪২
'সমুদ্রযাত্রা' ('সমাজ') ১৯৪
'সমূহ' ১৯৪
'সম্ভাষণ' (ভাষণ) ১০৭, ১১৭, ১১৮
সরলা দেবী ৩০৪, ৩১৩, ৩১৭, ৩১৮
সরস্বতী ('বাল্মীকিপ্রতিভা') ২৭০
সরোজিনী নাইডু ৩৯৬
'সরোজিনী' নাটক ২৭৫
সর্দার ('ফাল্গুনী') ২৭৩

সল্টিকভ, প্রিন্স ২১
সলুৎস্কি, আ. ক. ৩৬২
সলোভিওভ ৩৬৩
সাইমন কমিশন ৩৬৬, ৩৭২
সাঁসুসি থিয়েটার ২৬৯
'সাকেত' ৪০৬
'সাজাহান' ('বলাকা') ৩২৯
সাধনা পত্রিকা ১৫, ১৬৩, ২৪৮, ২৬২
সাধনা পত্রিকা (মরাঠি) ৪০৯
সাধারণ নাট্যশালা ২৬৯, ২৭০, ২৭১
'সানাই' ৮৭
'সামান্য ক্ষতি' ('কথা ও কাহিনী') ১৫৮
'সাম্যসাম' ১৮০
সার্জেন্ট প্ল্যান (১৯৪৪) ৯১
সাহানা দেবী ২৮৩
'সাহিত্য' ১২৮, ১৩১, ২৬২
সাহিত্য পত্রিকা ২৫৫, ২৬৬
সাহিত্য একাডেমি ৪০৯
'সাহিত্য তত্ত্ব' ('সাহিত্যের পথে') ২৬০, ২৬১
'সাহিত্য পরিচয়' (সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) ২৫৪
'সাহিত্যসৃষ্টি' ('সাহিত্যের পথে') ১২৮, ১৩২
'সাহিত্যের পথে' ১২৮, ১৩২
'সাহিত্যের মাত্রা' ('সাহিত্যের পথে') ২৫৯
'সাহিত্যের স্বরূপ' ১২৮, ১৩২, ১৬৮
সি কুনহন রাজা ৪০৯
সিদোরভ, আ. আ. ৩৬৫
সিপাহি যুদ্ধ ১৯৭
সিলভ্যাঁ লেভি ৩৯৫
সীতাদেবী ২৭৯, ২৮৩
'সীতারাম' ২৩৩
'সীমা' ('খেয়া') ৩১৪
সুইনবার্ন ৪০
সুকান্ত ভট্টাচার্য ২০০
সুকুমার রায় ২০০-০৮
'সুকুমার রায় ও ব্রাহ্মসমাজ' ২০৮
সুকুমার সেন ৩২০
সুকুমারী (অভিনেত্রী) ২৭১
সুকুমারী ভট্টাচার্য ১৪০
সুখময় মুখোপাধ্যায় ১৬৯
সুখলতা রাও ২০০
সুচরিতা ('গোরা') ২৮, ২৯
সুদর্শনা ('রাজা') ২৩২, ২৩৪
'সুদূর' ২০১, ২০২
সুধীরচন্দ্র কর ২৭৫
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২১০, ২১৬, ২১৯
'সুপ্তোত্থিতা' ('সোনার তরী') ১৫৮
সুবন্ধু ১৪৮
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ২৬৫
সুবোধ মুখার্জি ১৮
'সুভা' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬২, ১৬৫, ১৬৭
সুমিত্রা ('তপতী'-'রাজা ও রানী') ২৭১, ২৭৪
সুরজিৎ ঘোষ ২২৭
সুরজিৎ সিং, বাবা ১৭
সুরুল কৃষি সমিতি ৩৩৮
সুরেন্দ্রনাথ কর ৩৩২, ৩৯৩, ৩৯৫
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ২৫৪
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ২৫৫, ২৬৫, ২৬৬
সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় ৪, ৩৯২
সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী ৪০৬, ৪০৮
'সূর্যশতক' ১৪৪
'সে' ১৬৫, ১৯৬
'সেঁজুতি' ৮৫, ১৫৭
'সেকাল' ('ক্ষণিকা') ১৫০, ১৫৮
সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ২১৫
সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ ৯১
সেলোন, প্যারিস ৩২৪
সৈয়দ মুজতবা আলি ৫
'সোনার তরী' ১২৭, ১৪২, ১৪৩, ১৫৮, ১৬৮, ২৫৬
'সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ' ১০৩
সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সংস্থা ভক্স ৩৬২
সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ৩৬৬
সোমপ্রকাশ ৪৫, ৪৬, ২৭৬
সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২২
সোস্যুর, ফের্দিনান্দ দ ২১৫
সৌকত আলি ৩
'সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ' ২৭১, ২৭৩
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৫, ৩৬৪
স্কট ২৫৯
স্টপফোর্ড ব্রুক, ব্রুক স্টপফোর্ড দ্র°
স্টার থিয়েটার ২৭০-৭২

স্টিড, ডবলিউ টি ৭৬
স্টুয়ার্ট পার্নেল ৭১
স্টেয়ার্স, ক্যাপটেন ৭৭
স্ট্যানলি ৭৭
স্ট্যাম্প, ডেভিড ২১৬
স্ট্রেট, ডরোথি ৩৩৮
স্তালিন ৮৭, ৩৬১, ৩৬৯
'স্ত্রীর পত্র' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬২, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৪, ১৮০, ১৯৬, ১৯৭
'স্ত্রীশিক্ষা' ('শিক্ষা') ৯০, ৯৮
স্পেনসার, হার্বার্ট ৪০, ২৫৭, ৩৫৮
স্পেনের গৃহযুদ্ধ ৮৩, ৮৫
স্যাডলার কমিশন ৯০, ৯১, ৯৮
'স্বদেশ' ৩৭
স্বদেশী আন্দোলন ৯১, ১৭৬, ২০০, ৩১২
স্বদেশী গান ২১, ৩১১, ৩১২
'স্বদেশী সমাজ' ৩২, ৫৭, ৬৬. ১০৪, ১০৫, ১০৬
'স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট' ৬৬
'স্বরবর্ণ অ' ('শব্দতত্ত্ব') ২১৩
'স্বরবিতান' ৩০৫, ৩০৭
স্বরাজ দল ৩৩
'স্বরাজসাধন' ('কালান্তর') ৬৭
স্বর্ণকুমারী দেবী ২৬৯, ৩২০
'স্বর্ণমৃগ' ('গল্পগুচ্ছ') ৩২৫
'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' ('কালান্তর') ১৫, ৬৭, ৭৭, ১২৮
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ৬৭
হংসকুমার তেওয়ারী ৪০৮
হ. চ. হ., হরিশচন্দ্র হালদার দ্র°
হরপ্রসাদ মিত্র ৬৬
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২১৯, ২৭০
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮৬, ৩৯২
হরিনাথ মজুমদার ৩০৮, ৩১৯-২১
হরিভূষণ ভট্টাচার্য ২৭১
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৩২০
হরিশচন্দ্র হালদার ২৭৬-৭৮, ২৮২
হাইলেসেলাসি ৮৫
হাউস অফ কমন্স ৩৪, ৭১
হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ৩৯৫, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৯, ৪১০
হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ১০২
'হারামণি' (প্রবাসী) ৩১৫
'হালদারগোষ্ঠী' ('গল্পগুচ্ছ') ১৬৮
হাশু কেবল রামানী ৪০৯
হাসন রজা ৩১৯, ৩২০
হিজলি জেলে বন্দীহত্যা ৩৬৭
হিটলার ৮৩, ৮৬-৮৯, ১১৮, ৩৫০, ৩৫৪, ৩৭৫
হিতবাদী পত্রিকা ১৬৩, ১৬৭
'হিন্দস্বরাজ' ৩২
হিন্দু কলেজ ৪৩
'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' ৯
হিন্দু মহাসভা ৯, ৩৪৬
'হিন্দু মুসলমান' ('কালান্তর') ১৬, ৬৭
হিন্দুমেলা ৮-১০, ১৩, ১৪, ৩১১
'হিন্দুমেলার উপহার' ১০
হিরণকুমার সান্যাল ১৭, ২৩৩, ২৩৪
হিরণ্ময়ী দেবী ২৭৭
হিরিয়ানা ২৬৪
হীরেন ভট্টাচার্য ২২৯
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২০
হুপার, জে ২১৬
'হৃদয়ের গীতধ্বনি' ('সন্ধ্যাসংগীত') ২০২
হৃষীকেশ চন্দ ৩৪২
হেগেল ২০৫, ২৫৮, ২৬৬
হেডিন, স্বেন ১০১
হেমলতা দেবী ৩৩২
হেমেন্দ্রকুমার রায় ২৭১, ২৭৩, ২৭৪
হে, স্টীভন ২৬
'হোয়াট ইজ আর্ট' ২৬১
হোমরুল আন্দোলন ৭১
হোয়শয়া ৪০৫
হ্যারি টিম্বার্স ৩৬৪

'অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে' ২৯৪
'আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে' ৩১৫
'আকাশ-ভরা সূর্য-তারা' ২৯, ৫৪
'আকাশ হতে খসল তারা' ৩১৮
'আগুনের পরশমণি' ৩৩৩
'আজ আসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে' ৩০৫
'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়' ৩০৯, ৩১৪
'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ' ৩০৯

'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' ৩১৫
'আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ' ৩১৩
'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' ৩১৩
'আপনি অবশ হলি' ৩১৩
'আমরা চাষ করি আনন্দে' ৩৩৯
'আমরা পথে পথে যাব সারে সারে' ৩১৩
'আমরা বসব তোমার সনে' ৩২১
'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' ২২, ৩০৫
'আমাদের খেপিয়ে বেড়ায়' ৩১৫
'আমাদের পাকবে না চুল' ৩১৫
'আমাদের ভয় কাহারে' ৩১৫
'আমাদের যাত্রা হল শুরু' ৩১৩
'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' ২৩
'আমার এই দেহতরী' ৩১৩
'আমার গৌর ক্যানে কেঁদে এল' ৩১৪
'আমার দোসর যে জন ওগো তারে' ৩১৫
'আমার নাই বা হল পারে যাওয়া' ৩১৪
'আমার নিশীথরাতের বাদলধারা' ২৯২
'আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো' ৩১৬
'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে' ৩০০, ৩১৪
'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে' ৩১৫
'আমার মন বলে চাই চাই' ৩১৬
'আমার সোনার বাংলা' ৩০০, ৩১৩
'আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই' ৩০২, ৩০৩, ৩০৫, ৩২০
'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়' ৩০০, ৩১৪
'আমি কান পেতে রই' ৩১৫, ৩১৬
'আমি কে তাই আমি জানলেম না' ৩০২
'আমি কোথায় পাব তারে', ৩১৩
'আমি জেনে শুনে তবু' ৩০৪
'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই' ৩১৫
'আমি নিশি-নিশি কত রচিব' ৩০৫
'আমি ফিরব না রে ফিরব না আর' ৩১৪
'আমি ভয় করব না ভয় করব না' ৩১৪
'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব' ৩১৫, ৩১৬
'আমি যখন ছিলেম অন্ধ' ৩১৬
'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' ৩০৯
'আমি সব নিতে চাই' ৩১৪
'আমিই শুধু রইনু বাকি' ৩০৪
'এ পথ গেছে কোনখানে গো' ৩১৪
'এ বেলা ডাক পড়েছে' ৩০০, ৩১৫
'এই কথাটা ধরে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে' ৩১৫
'এই তো ভালো লেগেছিল' ৩০০, ৩১৫
'এই যে তোমার প্রেম ওগো' ৩০৯, ৩১৪
'এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে' ৩১৫
'এই সকাল বেলার বাঁদল-আঁধারে' ২৯০
'এক ফুলে চার রঙ ধরেছে' ৩১৬
'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' ৩০৫, ৩১৩
'একলা বসে একে একে' ৩১৫
'এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা' ৩১৪
'এবার তোর মরা গাঙে' ৩১২, ৩১৬
'এবার যমের দুয়োর খোলা পেয়ে' ৩০৫
'এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন' ২৯১
'এসো এসো ফিরে এসো' ৩০৫
'এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও' ২৯২
'ঐ আসনতলের মাটির পরে' ৩০০
'ঐ মহামানব আসে' ৬
'ও আমার দেশের মাটি' ৩১৪
'ও জোনাকি কী সুখে ওই' ৩১৩
'ও তো আর ফিরবে না রে' ৩১৫
'ও নিঠুর আরো কি বাণ আছে তোমার তূণে' ৩১৫
'ও মঞ্জরী ও মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' ২৯৩
'ও মন অসার মায়ায় ভুলে রবে', ৩১৩
'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর' ২৯৩
'ওগো এত প্রেম-আশা' ৩০৫
'ওগো তুমি পঞ্চদশী' ২৯৩
'ওগো তোমরা সবাই ভালো' ৩০৫, ৩০৬, ৩১৩
ওগো দখিন হাওয়া ও পথিক হাওয়া' ২৮৭
'ওগো সাঁওতালি ছেলে' ২৯২
'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে' ৩১৩
'ওর মানের এ বাঁধ টুটবে না কি' ৩০৫, ৩১৮
'ওরে আগুন আমার ভাই' ৩১৪
'ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে' ৩১৪
'ওরে তোরা নাই বা কথা বললি' ৩১৩
'ওরে ভাই মিথ্যা ভেবো না' ৩১৩
'ওলো সই ওলো সই' ৩০৯
'ওহে জীবনবল্লভ ওহে সাধনদুর্লভ' ৩০৫
'ওহে দিন তো গেল সন্ধ্যা হল' ৩১৮, ৩১৯
'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন' ৩১৪, ৩৩৯

'কণ্ঠে নিলেম গান আমার শেষ পারানির কড়ি' ২৮৯
'কথা কয় কাছে দেখা যায় না' ৩০৯, ৩১২
'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' ২৯, ৩০০
'কে তুমি প্রেমিক বাদক' ৩২১
'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে' ২৯১
'কোথা মা ভিক্টোরিয়া দেখ আসিয়া' ৩১১
'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার' ৩১৬
'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ' ৩১৪, ৩২১
'ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ' ৩০৯
'খাঁচার পাখি ছিল' ৩০৫
'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি' ৩০৩
'খ্যাপা তুই আছিস আপন' ৩০৫, ৩০৮, ৩২০
'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে' ৩০৪
'গাই গীত শুনাতে তোমায়' ৩৬০
'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ' ৩১৪
'চল লো ধনী বিনোদিনী আপন মন্দিরে' ৩১৭, ৩১৮
'চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো' ৩১৫
'ছি ছি চোখের জলে' ৩১৩
'জনগণমনঅধিনায়ক' ২০
'জানি নাই গো সাধন' ৩১৫
'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' ২৭৫
'তবু মনে রেখো' ৩০৫, ৩০৯
'তুমি এবার আমায় লহ' ৩০০
'তুমি কোন পথে যে এলে' ৩১৫
'তুমি বাহির থেকে দিলে' ৩১৬
'তুমি যে সুরের আগুন' ৩১৫
'তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন' ৩১৬
'তোমরা যা বলো তাই' ৩১৫
'তোমরা যা হোক ভ্যালা' ৩০৬
'তোমায় গান শোনাব' ৩১৮
'তোমার সুরের ধারা' ৩১৫
'তোর আপনজনে ছাড়বে' ৩১৩
'তোর শিকল আমায় বিকল করবে না' ৩১৫
'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে' ২৯২
'দিনান্তবেলায় শেষের ফসল' ২৯৪
'দুর্গা নামে রয় না জীবের ভয়ভাবনা' ৩২০
'দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ' ৩০২, ৩০৩, ৩১৩
'ধীরে বন্ধু ধীরে' ২৭৪
'নিশিদিন ভরসা রাখিস' ৩১৪
'নিশীথে যাইও ফুলবনে' ৩১৯
নীরবে থাকিস সখী' ৩১৮
'নূপুর বেজে যায়' ২৯১
'পাগল মানুষ চেনা যায়' ৩২১
'পাগলা হাওয়ার বাদল' ৩১৬
'পাতার ভেলা ভাসাই নীরে' ২৯৩
'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' ৩১৬
'প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে' ২৯৩
'প্রিয়ে তোমার ঢেঁকি হলে' ৩০৫
'ফাগুন তোমার হাওয়ায়' ২৯৭
'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়' ৩১৫
'ফিরে চল মাটির টানে' ৩৩৯
'বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা' ৩০০. ৩১৬
'বড়ো বেদনার মতো বেজেছে' ৩০৫
'বঁধু তোমায় করব রাজা' ৩০৯
'বলো কোন গুরুর করো অন্বেষণ' ৩১৬
'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা' ৩১৪, ৩১৬
'বসায়ে সখের মেলা রসের খেলা' ৩০৮
'বাংলার মাটি বাংলার জল' ২১, ৩১৩
'বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি' ৩১৪
'বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে শ্মশানঘাটে' ৩০৮
'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' ৩১৩
'বিরহ মধুর হল আজি' ২৯০
'বিশ্বসাথে যোগে যেথায়' ৪
'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি' ৩১৪
'বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের' ৩১৯, ৩২০
'ভালোবেসে সখী নিভৃত যতনে' ৩০৯
'ভেঙে মোর ঘরের চাবি' ৩০৩
'মধুর তোমার শেষ যে-না পাই' ২৯৪
'মন-মাঝি সামাল সামাল' ৩১২
'মন মোর মেঘের সঙ্গী' ২৯১
'মন রে ওরে মন' ৩১৬
'মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা' ৩১৫
'মম অন্তর উদাসে' ৩১৬
'মম মন উপবনে চলে অভিসারে' ২৯১
'মা কি তুই পরের দ্বারে' ৩০৩, ৩১৩
'মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে' ৩১৫

'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' ৩০৯, ৩১৪
'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ' ৩১৫
'মোর স্বপনতরীর কে নেয়ে' ৩১৬
'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' ৩১৫
'যদি তোর ডাক শুনে কেউ' ৩০০, ৩১২
'যদি তোর ভাবনা থাকে' ৩১৩
'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' ২৯২
'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী' ৩০৩, ৩১৩, ৩১৯
'যমের দুয়ার খোলা পেয়ে' ৩২০
'যা ছিল কালো ধলো' ৩১৪
'যার অদৃষ্টে যেমন জুটেছে' ৩২০
'যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে' ৩১৫
'যিনি সকল কাজের কাজী' ৩১৪
'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক' ৩১৩
'যে তোরে পাগল বলে' ৩১৩
'যেথায় তোমার লুঠ হতেছে' ৩১৪
'যোবতী ক্যান বা কর মন ভারী' ৩০৪
'রইল বলে রাখলে কারে' ৩১৪
'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' ৩১৮
'শরতে আজ কোন অতিথি' ৩১৫
'শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা' ২৯২
'শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়' ২৯০
'শুধু কি তার বেঁধে তোর কাজ ফুরাবে' ৩১৫
'শুধু তোমার বাণী নয় গো' ২৯১, ২৯৪
'শুভ্র প্রভাতে পূর্ব গগনে উদিল' ২৯৪
'শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা' ২৭০, ৩০৪
'শ্রাবণের গগনের গায়' ২৯৩
'সখী বয়ে গেল বেলা শুধু হাসিখেলা' ৩০৯
'সঘন গহন রাত্রি' ২৯৪
'সবকাজে হাত লাগাই মোরা' ৩১৪
'সবাই যারে সব দিতেছে' ৩১৫
'সার্থক জনম আমার' ২০, ৩১৩
'সুখে আছি সখা' ৩০৪
'সে কি ভাবে গোপন রবে' ৩১৫
'স্বপ্নে আমার মনে হল' ২৯৩
'হরি তোমার ডাকি' ৩০৫, ৩০৯, ৩১০, ৩১১
'হরি দিন তো গেল', দ্র° 'ওহে দিন তো গেল'
'হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে' ৩০৯, ৩১২
'হারে রে রে আমায়...' ৩১৪
'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' ৮৯
'হৃদয় আমার ওই বুঝি' ৩১৫
'হৃদয়ের একূল ওকূল' ৩০৫, ৩০৮
'হে আকাশবিহারী নীরদবাহন জল' ২৯৩

Aitchison, Jane ২২৮
Allen, Whetey ১৬৮
Archer, W. G ২২৫
Arnold, Mr. ২০১
'Art and Swadeshi' ২০২
Bow wow theory ২১৭
Bridges, D, Robert ২০২
Byng, Mrs, Crammer ২০১
'Call of Truth, The' ৩৭৮
Caxton Hall ৬
'Centre of Indian Culture, The' ৫,৬
Chatterjee, Suniti Kumar ২২৫
Cheshire, Mr. ২০১
Christopherson, Paul ২২৮
'Creative Unity' ২৫৭
Cuckoo theory ২১৭
East West Society দ্র° Union of East and West Society ২০১
Echo ৭০, ৭১
Firth, J.R. ২২৭
Fox, Ralph ১৬৮
'Gardener' ১৮
George Allen & Unwin ২১৫, ২২৬
'A Grammar of the Bengali Language' ২১৪
Great Sentinel, The ৩৭৮
Hindusthan Standard ৩৫৫
Howthrone, Nathaniel ১৬৮
'Hymn to Intellectual Beauty' ১৪৯
'Indian and Modern Art' ২২৫
Indian Philosophical Congress, The ১৯৩
'Indian War of Independence' ৪০৪
'India Through the Ages' ১৭
'King of the Dark Chamber' ৩৪৯
'Language' ২১১
Mead, Mr. ২০১

Mel, Shaowu ২৮২
'Nationalism' ১৮
New York Times ৩৪৮, ৩৫৫
'Novel and the people, The' ১৬৮
'ODBL' দ্র° Origin and Development of the Bengali Language ২২৫
'On Synchrony and Diachrony in Linguistics' ২২৬
'One Hundred Poems of Kabir' ১১৮
'Origin and Development of the Bengali Language, The' ২১০, ২১১, ২২৫
Orford University Press ২২৭
Penguiz ২২৮
'Personality' ১৮, ২৫৬
Poe, Edger Allan ১৬৮
'Poems of Rabindranath Tagore' ২০২
'Poet and the Charkha, The' ৩৭৭
Quest ২০১
'Rabindranath Tagore—A Biography' ১৭
'Religion of Man, The' ৩৫৩
Rothenstein,Mr. ২০১, ২০২
Sarbadhikary, Mr. ২০১
'Sadhana' ৬
'Second Language Learning, Myth and Reality' ২২৮
'Short Story in English, The' ১৬৮
'Speech' ২১৭
'Spirit of Rabindranath, The' ২০১, ২০২
'Study in Aesthetics : Lustra, The' ২৫৪
'Tongues of Men and Speech' ২২৭
'Truth Called Them Differently' ৩৭৯
Underhill Evelyn ১৮৮
Union of East and West Society, The ৬
University of Calcutta ২২৫
'Use of vernacular Languages in Education, The' ২৪৪
'Versuch einer Theorie Phonetischer Atternationen' ২১৫
'Wisdom of the East Series' ২০১, ২০২
'Works of Edger Ellan Poe' ১৬৮
Zhirmunsky V M ২২৬

সংকলন : স্বপন মান্না